মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৫ম খণ্ড] ফাল্গুন, ১৩১১ [৪র্থ সংখ্যা।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ,

সম্পাদিত।

সূচী।

কীর্ণহারের সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশহিতৈষী জমিদার শ্রীযুক্ত
বাবু সৌরেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের সম্পূর্ণ
ব্যয়ে বীরভূম জেলার অন্তর্গত
কীর্ণহার গ্রাম হইতে
শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য্য বি, এ,
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[বার্ষি]ক মূল্য ডাকমাশুল সহ ১৷৷০।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জররোগের একমাত্র

মহৌষধ।

অদ্যাবধি সর্ব্ববিধ জ্বর-রোগে
এমত আশু-শান্তিকারক মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত

মূল্য—বড় বোতল ১।, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ১৲ টাকা।
ছোট বোতল ৸০ আনা, ঐ ঐ ৸৶ আনা।
রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভ হয়।

এডওয়ার্ডস্

লিভার এণ্ড স্প্লীন অয়েণ্টমেণ্ট

অর্থাৎ প্লীহা ও যকৃতের অব্যর্থ মলম।

প্লীহা ও যকৃৎ নির্দ্দোষে আরাম করিতে হইলে আমাদিগের "এড-ওয়ার্ডস্ টনিক বা য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়্যাল্ স্পেসিফিক্" সেবনের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত পেটের উপর প্রাতে ও বৈকালে মালিশ করা আবশ্যক। যতই বর্দ্ধিতায়তনের প্লীহা, যকৃৎ বা অগ্রমাস হউক না কেন, ইহা নিয়মি-রূপে মাসেককাল মালিশ করিলে, এক-বারেই কমিয়া যাইবে। এই মলম মর্দ্দন দ্বারা আশু ফল পাইবেন।

ছয় আনা। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র লাগে।

ন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন

টকৃষ্ট পাল এণ্ড কোং

নাবাজার—(কলিকাতা)

৫ম খণ্ড] চৈত্র, ১৩১১ । [৪র্থ সংখ্যা ।

বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক ।

(১২০ পৃষ্ঠার পর)

মৃত্যু—১২৯৮ সাল, ১৩ই শ্রাবণ, (১৮২০ খ্রীঃ, ২৬শে সেপ্টেম্বর) মঙ্গলবার রাত্রি ২-১৮ সময় কলিকাতা বাদুড়বাগান বাটীতে ।

বংশ পরিচয়, পূর্ব্বকথা—বর্ত্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদের নিকট বনমালিপুর নামক গ্রামে, ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণের বাসস্থান ছিল। পিতামহ, রামজয় তর্কভূষণ মহাশয়, ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া পত্নী দুর্গাদেবী এবং শিশু সন্তানগুলিকে গৃহে রাখিয়া দেশত্যাগী হইয়া চলিয়া যান। দুর্গাদেবী, বীরসিংহ গ্রামের (পূর্ব্ব, হুগলি—বর্ত্তমান, মেদিনীপুর) প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ, পণ্ডিত উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা। তর্কভূষণ মহাশয়ের দেশত্যাগের পর কিছুকাল অতি কষ্টে বনমালিপুরে অতিবাহিত করিয়া, দুর্গাদেবী, দুই পুত্র ও চারি কন্যাসহ বীরসিংহ গ্রামে স্বীয় পিত্রালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূগণ কর্ত্তৃক মর্ম্মপীড়িত হইয়া কিয়ৎ কাল পর তথায় পৃথক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সুতা বিক্রয় করতঃ অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন—বৃদ্ধ পিতা উমাপতিও সময়ক্রমে গোপন ভাবে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে বিরত হইতেন না। জননীর এইরূপ অভাবনীয় ক্লেশ দর্শন করিয়া পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্ক বালক ঠাকুর দাস, তাঁহার আদেশ গ্রহণ করতঃ জ্ঞাতিপুত্র জগমোহন তর্কালঙ্কারের আশ্রয়ে কলিকাতা আগমন করিলেন।

বংশ তালিকা—

- ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার
  - নৃসিংহরাম
  - গঙ্গাধর
  - রামজয় তর্কভূষণ = দুর্গাদেবী
    - ১ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় = ভগবতী দেবী
      - ১ ঈশ্বরচন্দ্র = দীনময়ী দেবী
        - ১ নারায়ণচন্দ্র
        - ২ হেমলতা দেবী = গোপালচন্দ্র সমাজপতি
        - ৩ কুমুদিনী দেবী = অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়
        - ৪ বিনোদিনী দেবী = সূর্য্যকুমার অধিকারী
        - ৫ শরৎকুমারী দেবী = কার্ত্তিকেয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
      - ২ দীনবন্ধু
      - ৩ শম্ভুচন্দ্র
      - ৪ হরচন্দ্র
      - ৫ হরিশচন্দ্র
      - ৬ ঈশানচন্দ্র
      - ৭ শিবচন্দ্র (ভূতনাথ)
    - ২ কালিদাস
    - ৩-৬ চারি কন্যা (১ মঙ্গলা, ২ কমলা, ৩ গোবিন্দমণি, ৪ অন্নপূর্ণা)
  - পঞ্চানন
  - রামচরণ

অতি কষ্টে সামান্যরূপ ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিলে পর, তর্কালঙ্কার মহাশয় ঠাকুরদাসকে মাসিক দুই টাকা বেতনে একটি চাকুরী করিয়া দেন। দুই তিন বৎসর পর মাসিক পাঁচ টাকা হিসাবে বেতন হওয়ায়, জননী এবং শিশু ভাইভগ্নীগুলির কষ্টের অনেক হ্রাস হইল। এই সময়, পিতা রামজয় তর্কভূষণ মহাশয়, ৮ বৎসর কাল, দ্বারকা, জ্বালামুখী, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি নানা তীর্থ পর্য্যটন করিলে পর স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া বনমালিপুরে প্রত্যাগমন করেন। তথায় পত্নী ও সন্তানগণের সাক্ষাৎ না পাইয়া বীরসিংহে আসিয়া গোপনভাবে স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন; কনিষ্ঠা কন্যা অন্নপূর্ণা সর্ব্বাগ্রে পিতাকে চিনিতে পারিয়াছিল। পারিবারিক ঘটনাবলী শ্রবণ করিয়া তিনি বীরসিংহ গ্রামে বাস করাই শ্রেয়ঃজ্ঞান করিলেন। তদনন্তর তর্কভূষণ মহাশয় ঠাকুরদাসকে দেখিবার নিমিত্ত কলিকাতায় আসিয়া পূর্ব্বপরিচিত বড়বাজারনিবাসী ভাগবতচরণ সিংহের বাড়ীতে তাঁহাকে রাখিয়া আসিলেন। সিংহ মহাশয়ের কৃপায় ঠাকুরদাসের বেতন বৃদ্ধি হইল—মাসিক আট টাকা করিয়া পাইতে লাগিলেন। তখন ঠাকুরদাসের বয়স ২৩ কি ২৪ বৎসর; এই সময় গোঘাটনিবাসী, সাত্ত্বিকভাবাপন্ন রমাকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত ঠাকুরদাসের শুভ পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। ভগবতী দেবীর শৈশবাবস্থায় তাঁহার পিতা রমাকান্ত উন্মাদগ্রস্ত হইলে, মাতা গঙ্গা দেবী, স্বামী ও কন্যা সহ স্বীয় পিতা পাতুলনিবাসী পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আশৈশব বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের আদর্শ হিন্দু পরিবার মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া ভগবতী দেবী আদর্শ হিন্দুরমণী ও বিদ্যাসাগর জননী হইতে পারিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন জননীগর্ভে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহার জননী উন্মাদ পীড়াগ্রস্ত হন—পরে সন্তান ভূমিষ্ট হইলে প্রসূত রোগ হইতে মুক্তি লাভ করেন। রামজয় তর্কভূষণ মহাশয় এই বালকের ভাবী কীর্ত্তিলাভের কথা বুঝিতে পারিয়াই নাম রাখিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র।

শৈশব, ছাত্রজীবন—ঈশ্বরচন্দ্র, শৈশবে চপলস্বভাব ছিলেন। বালক কাল অবধি ঈশ্বরচন্দ্রের অসাধারণ মেধাশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পঞ্চম বৎসর বয়সে বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যারম্ভ করিয়া তিন বৎসর কাল পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করেন। এই সময়, রামজয় তর্কভূষণ মহাশয়, অতিসার

রোগে ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোক প্রাপ্ত হন। ঠাকুরদাস, পিতৃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে লেখাপড়া শিখাইবার উদ্দেশে ১২৩৫ সালের কার্ত্তিক মাসে কালিকাতা লইয়া আসিলেন। পিতাপুত্র উভয়েই ভাগবতচরণ সিংহ মহাশয়ের বড়বাজার বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন—ঠাকুরদাস এখন মাসিক দশ টাকা বেতন পাইতেন। বালক ঈশ্বরচন্দ্র, অতি শৈশবে মাতৃ-ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইলেও, সিংহ-পরিবারের স্নেহাতিশয্যে, সে দুঃখ আদৌ অনুভব করেন নাই। কলিকাতায় আসিয়া তিন মাস কাল এক পাঠশালায় পড়িয়া রক্তাতিসার রোগে সংশয়াপন্ন পীড়িত হন। এই নিমিত্ত পিতামহী স্বয়ং কলিকাতা আসিয়া তাঁহাকে বীরসিংহে লইয়া যান। রোগ-মুক্ত হইলে, পরবৎসর ১১৩৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ঠাকুরদাস, ঈশ্বরচন্দ্রকে পুনরায় কলিকাতা আনয়ন করিয়া ১ লা জুন (১৮২৯ খ্রীঃ) তারিখে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের ৩য় শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। তিন বৎসর কাল ব্যাকরণ-শ্রেণীতে পাঠ করার পর, ১১ বৎসর বয়সে সাহিত্য-শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। এই সময় তাঁহার উপনয়নক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সাহিত্য-শ্রেণীতে

উপনয়ন ও বিবাহ

২ বৎসর পাঠ করিলে পর, চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে, ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষীরপাই গ্রাম নিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য্যের অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা দীনময়ী দেবীর সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৫ বৎসর বয়সে, সাহিত্য-শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া, অলঙ্কার-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন এবং প্রভূত পরিশ্রম ও অসাধারণ প্রতিভাবলে ছয় মাস মাত্র সময়মধ্যে সমগ্র স্মৃতি-শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া "ল" কমিটীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। কিছু কাল পর, ত্রিপুরার রাজপণ্ডিতের পদ শূন্য হয়—সপ্তদশ বর্ষীয় বালক ঈশ্বরচন্দ্র এই পদের জন্য মনোনীত হন। কিন্তু তাদৃশ দূরদেশে যাইবার নিমিত্ত পিতার অনুমতি লাভে অসমর্থ হওয়ায়, উক্ত পদ গ্রহণ করিলেন না। অন্যান্য বিষয়ের পরীক্ষা প্রদান করিয়া ১৯ বৎসর বয়সে বেদান্ত-শ্রেণীতে উন্নীত হন। এই সময়, তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্কৃত পদ ও গদ্য রচনার জন্য দুইটি পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদনন্তর ন্যায় ও দর্শন পরীক্ষায় ১০০৲ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনার জন্য ১০০৲ এই দুই শত টাকা পুরস্কার লাভ করেন। ন্যায় ও দর্শন-শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে, দুই মাসের জন্য ব্যাকরণের ২য় শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে, ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র, মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে অস্থায়ীভাবে এই পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। চারি বৎসর কাল অধ্যয়নের পর, দর্শন-

শাস্ত্র-শ্রেণীর ষড়দর্শন বিষয়ক শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৪১ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে, নানাবিধ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতঃ সংস্কৃত ভাষার সকল বিভাগের পরীক্ষায় সমভাবে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিলেন।

বাল্যবন্ধু

ঈশ্বর চন্দ্রের পাঠ্যাবস্থায়, সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু স্কুল একই গৃহে অবস্থিত ছিল; এই নিমিত্ত ছাত্রাবস্থায়, হিন্দু কলেজের রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি সুবিখ্যাত ছাত্রমণ্ডলীর সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা জন্মিয়াছিল।

চাকুরী কার্য্যক্ষেত্র—১৮৪১ খ্রীঃ সংস্কৃত কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

"বিদ্যাসাগর"

হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র, "বিদ্যাসাগর" উপাধি লাভ করিলে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মার্শেল সাহেবের অধীনে ৺ মধুসূদন তর্কালঙ্কারের স্থানে প্রধান পণ্ডিতের পদে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির নিকট বাড়ীতে

ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষা শিক্ষা

ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া সমধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত হিন্দি, উড়িয়া ও উর্দ্দু ভাষায়ও সবিশেষ অধিকার লাভ করেন। ১৮৪৬ খ্রীঃ সংস্কৃত কলেজের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর পদ শূন্য হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত পদ প্রাপ্ত হইলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শ মত, এই সময় সমগ্র বঙ্গদেশে এক শত একটি বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া, সংস্কৃত কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে তত্তৎ বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ, বাবু রসময় দত্তের সহিত মনান্তর ঘটিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় অচিরে পদত্যাগ করেন। এই সময় হইতে ১৮৫৯ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি কোন কর্ম্ম করেন নাই। প্রথম পুত্র নারায়ণ চন্দ্র, এই সময় ১৮৪৯ খ্রীঃ

প্রথম পুত্র

(১২৫৬ সাল ৩০ শে কার্ত্তিক) জন্মগ্রহণ করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার বাবু দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিলে ১৮৫০ খ্রীঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়, ৮০ টাকা বেতনে ঐ পদ প্রাপ্ত হন। এই বৎসরই তাঁহার সহাধ্যায়ী বন্ধু, সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় জজপণ্ডিতের কার্য্যে মুর্শিদাবাদে গমন করেন। এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি বেথুন সাহেবের পরামর্শমতে মাসিক ৯০ টাকা বেতনে বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত

পদ গ্রহণ করেন। এই নিয়োগের কিছুদিন পর, বাবু রসময় দত্ত অধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করিলেন। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অবস্থা এবং উত্তরকালে কিরূপ ব্যবস্থা করিলে কলেজের উন্নতি হইতে পারে, এই বিষয় সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত রিপোর্ট পাঠ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা (১৮৫১ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে) বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই ঐ পদ প্রদান করিলেন। এখন হইতে সেক্রেটারী ও আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী এই দুই পদ সম্মিলিত হইয়া 'প্রিন্সিপাল পদের সৃষ্টি হইল।

প্রিন্সিপাল

বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্ব্ব প্রথম সংস্কৃত কলেজের এই পদ প্রাপ্ত হইয়া মাসিক দেড়শত টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়, (১) প্রাচীন হস্তলিখিত সংস্কৃত পুঁথিগুলি সংরক্ষণ ও মুদ্রণ, (২) ছাত্রদিগের বেতন গ্রহণের রীতি প্রবর্ত্তন (৩) উপক্রমণিকা, ঋজুপাঠ প্রভৃতি সংস্কৃত শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থাদি প্রণয়ন (৪) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ব্যতীত অপরাপর জাতির ছাত্রগণের সংস্কৃত কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবার অধিকার প্রদান (৫) দুই মাস গ্রীষ্মাবকাশ প্রবর্ত্তন (৬) সংস্কৃত ভাষার সহিত ইংরাজী ভাষা শিক্ষা প্রচলন প্রভৃতি নানাবিধ সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইলেন। ১৮৫৩ খ্রীঃ বেতন বৃদ্ধি হইয়া মাসিক তিনশত টাকা হইল। ১৮৫৫ খ্রীঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়, নদীয়া, হুগলী, বৰ্দ্ধমান, ও মেদিনীপুরে বাঙ্গালা ও ইংরাজী বিদ্যালয় সমূহের

এবং আসিষ্ট্যাণ্ট ইনস্পেক্টর

আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া মাসিক অতি-রিক্ত দুই শত টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন সর্ব্বশুদ্ধ উভয় পদের বেতন হইল, মাসিক পাঁচ শত টাকা। ১৮৫৬ খ্রীঃ পাবলিক্ ইন্‌ষ্টিটিউসন্ প্রতিষ্ঠিত হইলে, গর্ডন ইয়ং সর্ব্বপ্রথম ইহার ডাইরেক্টর নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করিলে, ইয়ং সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনান্তর হয়, কর্ত্তৃপক্ষগণের বিবিধ চেষ্টাতেও এই মনোবিবাদ নিবৃত্তি হইল না। ফলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় অসংকোচে ও অম্লানবদনে ১৮৫৮ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে, মাসিক পাঁচ শত টাকা বেতনের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

সাহিত্য-সেবা—১২৪৭ সাল বা ১৮৪০ খ্রীঃ কালিদাস-প্রণীত 'অভিজ্ঞান

শকুন্তল নামক নাটকের উপাখ্যান ভাগ অবলম্বন করিয়া "শকুন্তলা" নামক এক অতি উপাদেয় পুস্তক রচনা করেন। ১৮৪৭ খ্রীঃ "হিন্দী বৈতালপশিশি" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ "বেতাল পঞ্চবিংশতি" মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে এক নবযুগের প্রবর্ত্তন করিল। প্রথম সংস্করণে এই পুস্তকের ভাষা, সংস্কৃত শব্দের বাহুল্যবশতঃ, তাদৃশ প্রাঞ্জল হয় নাই বলিয়া ২য় সংস্করণে তৎপরিবর্ত্তে লালিত্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবিষ্ট হইবার পর, তত্রত্য ছাত্রদিগের ব্যবহারের নিমিত্ত "বাসুদেবচরিত" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ অবলম্বনে, এক পুস্তক রচনা করেন। কর্ত্তৃপক্ষগণের মনোমত না হওয়ায়, এই পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৪৮ খ্রীঃ "তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায়" মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশে উদ্যোগী হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয়, এই কার্য্য হইতে বিরত হন। এই আংশিক অনুবাদখানি, ১২৬৭ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ মার্শমান সাহেব কৃত History of Bengal এর, "বাঙ্গালার ইতিহাস" ২য় ভাগ নাম দিয়া প্রাঞ্জল ভাষায় এক বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৫০ খৃঃ Chambers's Biography নামক পুস্তকের অনুবাদ "জীবন চরিত" এবং ১৮৫১ খ্রীঃ Chambers's Rudiments of knowledge নামক পুস্তকের ভাবমাত্র অবলম্বনে"বোধোদয়"রচনা করেন। "উপক্রমণিকা"ও এই বৎসর রচিত হয়।। ১৮৫৬ খ্রীঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়, যখন বিধবাবিবাহের তুমুল আন্দোলনে সমগ্র দেশবাসীকে অতিশয় উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, যখন স্বয়ং পলমাত্র বিশ্রাম না করিয়া প্রতিপক্ষগণের আপত্তি খণ্ডনার্থ নানাবিধ শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া পুস্তকপ্রণয়নে ও বিধবাবিবাহ প্রচলনার্থ রাজবিধি প্রণয়নের চেষ্টায় একান্ত নিযুক্ত এবং যখন ইয়ং সাহেবের সহিত কার্য্যক্ষেত্রের বিবাদে সমধিক অগ্রসর, সেই বিষম গণ্ডগোল ও মানসিক অশান্তির সময়ও স্থিরচিত্তে শিশুদিগের পাঠোপযোগী দুই ভাগ "বর্ণপরিচয়, "কথামালা" ও "চরিতাবলী" প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৬২ খ্রীঃ "সীতার বনবাস" রচিত হয়, এই গ্রন্থের প্রথমাংশ 'উত্তর রাম চরিতের'অনুবাদ, তদ্ব্যতীত স্বাধীন রচনা স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে। বঙ্গভাষার গদ্য সাহিত্যে এরূপ প্রাসাদগুণবিশিষ্ট পুস্তক অদ্যাপি আর রচিত হয় নাই। ইহার পর "রামের রাজ্যাভিষেক" নামক পুস্তক

লিখিয়াছিলেন—মুদ্রাঙ্কন কার্য্যও প্রায় শেষ হইয়াছিল, এমন সময় অপর কেহ এই নামধেয় সমবিষয়াবলম্বনে পুস্তক রচনা করিয়াছেন জানিতে পারিয়া তাহার প্রচার বন্ধ করেন। ১৮৬৪ খ্রীঃ "আখ্যান মঞ্জরী", ১৮৬৯ খ্রীঃ "ব্যাকরণকৌমুদী" ৪র্থ ভাগ, ১৮৭০ খ্রীঃ সটীক 'মেঘদূত' এবং পীড়িতাবস্থায় বর্দ্ধমানে অবস্থানকালে,সেক্সপীয়র প্রণীত Comedy of Errors নামক নাটকের "ভ্রান্তিবিলাস" নামক মর্ম্মানুবাদ রচনা করেন। ১৮৭১ খ্রীঃ 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না'—১ম পুস্তক এবং পর বৎসর, উক্ত বিষয়ের ২য় পুস্তক প্রচার করেন।

এইরূপে, বিদ্যাসাগর মহাশয়, বহু আয়াস স্বীকার করিয়া, অসাধারণ প্রতিভাবলে, বঙ্গভাষায় মধুর ও সরল গদ্য রচনার পথ প্রদর্শন করিয়া বঙ্গ ভাষাকে তাঁহার নিকট চিরঋণে আবদ্ধ রাখিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ই "সোমপ্রকাশ" নামক, বিখ্যাত সংবাদ পত্রের জনক, তিনি স্বয়ং লেখনী চালনা করিয়া ইহাকে প্রতিষ্ঠা-ভাজন করিয়াছিলেন। "সোমপ্রকাশ" ও "তত্ত্ববোধিনী" ব্যতীত, বিদ্যাসাগর মহাশয় সময়ক্রমে অপর কোন কোন সংবাদ পত্রেও প্রবন্ধ লিখিতেন। এতদ্ব্যতীত, তিনি বহুতর অসমাপ্ত রচনা রাখিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, সমগ্র ভারতবর্ষের একখানি পূর্ণাঙ্গবিশিষ্ট ইতিহাস লিখিবার উপযোগী আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন; বার্দ্ধক্যে, শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন, তাহা সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বৃহৎ পুস্তকালয়টি, তাঁহার ঐকান্তিকী সাহিত্য-সেবার প্রকৃষ্ট নিদর্শন—নিত্য নবপ্রকাশিত পুস্তক ব্যতীত বহুতর প্রাচীন অপ্রকাশিত হস্তলিখিত পুঁথিও তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

নারী-সেবা, সমাজ-সংস্কার—মহামতি বেথুন, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একমাত্র উপযুক্ত পাত্রবোধে, তাহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি তাহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধনবিষয়ে বিশেষভাবে মনযোগী হইলেন। এই বেথুন-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতিবিধান হেতু বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের

স্ত্রী শিক্ষা

অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। বেথুন সাহেবের মৃত্যু হইলে, মতদ্বৈধ ঘটায় সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইহার পরিচালক ভার পরিত্যাগ করেন; কিন্তু এই বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহার আন্তরিক

মমতা ক্ষণেকের জন্যও তিরোহিত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রধান সহায় ছিলেন, অন্তিমকাল পর্য্যন্ত, স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণরূপ পক্ষপাতী থাকিয়া, তৎপ্রচলনে প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন। যখন আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি বৰ্দ্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর, নদীয়া, এই চারিটি জেলায় যে ৫০টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন, ইয়ং সাহেবের সহিত মনান্তর ঘটায় তৎসমুদয়ের ব্যয়ভার বহন করিতে গবর্ণমেণ্ট স্বীকৃত হইলেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়, উক্ত বিদ্যালয় সমূহের প্রত্যেকটিতে দুই জন করিয়া শিক্ষক, একজন করিয়া দাসী এবং বালিকাদের পাঠ্য পুস্তকাদির সমগ্র ব্যয়ভার একাকী বহন করিয়াছিলেন।

বিধবাবিবাহ

বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থন, বিধবাবিবাহে হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত প্রমাণ এবং বিধবাবিবাহ প্রচলন উদ্দেশে তিনি জীবনের অমূল্য সময় অতিবাহিত করিয়া স্বোপার্জ্জিত অগাধ ধনরাশি অকাতরে ব্যয় করিয়াছিলেন। অপরাপর ব্যয়ের কথা উল্লেখ না করিয়া, কেবল ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, তিনি ষাটটি বিধবার বিবাহের জন্য নিজ হইতে ৮২ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি বিধবাবিবাহের আবশ্যকতাবিষয়ক প্রবন্ধ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' লিখিতে আরম্ভ করেন। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, দিবারাত্রি পরিশ্রমের পর, হিন্দুদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহের বৈধতা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সমূহ সংগ্রহ করিলেন। উক্ত প্রমাণ সমূহের বলে, সদ্যুক্তি অবলম্বন করিয়া বিধবাবিবাহের আবশ্যকতা প্রমাণ করতঃ জনক জননীর অনুমতি অনুসারে ১৮৫৩ খ্রীঃ তদ্বিষয়ক স্বতন্ত্র পুস্তক প্রকাশ করিলেন। ইহাতে হিন্দু সমাজে ঘোরতর আন্দোলন হইয়া নানাবিধ কটূক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ স্রোতের মত আসিতে লাগিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎসমুদয় খণ্ডন করিয়া ১৮৫৫ খ্রীঃ বৰ্দ্ধিতাকারে, বিধবাবিবাহবিষয়ক পুস্তক দ্বিতীয়বার প্রচার করেন এবং আপত্তিকারীদিগের প্রতিবাদ যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, তাহা নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন করেন। এইরূপে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রানুসারে সম্পূর্ণরূপে বৈধ বলিয়া প্রমাণিত হইলে, বিধবাগর্ভজাত সন্তানেরা পাছে দায়ভাগের নিয়মানুসারে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন, এই নিমিত্ত, বিদ্যাসাগর মহাশয়, বিধবাবিবাহসম্বন্ধীয় আইন পাশ করাইবার উদ্দেশে, ন্যূনাধিক সহস্র গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের স্বাক্ষরিত

আবেদন পত্র সহ আইনের এক পাণ্ডুলিপি গভর্ণমেণ্ট সমীপে প্রেরণ করেন। সার্ রাধাকান্ত দেব প্রমুখ প্রায় ৩৭ সহস্র ব্যক্তি এই আইন প্রচলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। ১৮৬৬ খ্রীঃ ২৬ জুলাই (১২৬৩ সাল—১২ই শ্রাবণ) বিধবাবিবাহবিষয়ক আইন পাশ হইয়া গেল। এই বার বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাদিগের বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আইন পাশ হইবার তিন মাস পরই ২৩শে অগ্রহায়ণ তারিখে, খাটুয়ানিবাসী সুবিখ্যাত রামধন তর্কবাগীশের পুত্র, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সহিত, বর্দ্ধমানের অন্তর্গত পটলডাঙ্গানিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশম বর্ষীয়া বিধবা কন্যা (৪র্থ বর্ষে বিবাহ—৬ষ্ঠ বর্ষে বিধবা) কালীমতি দেবীর পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিধবাবিবাহ ব্যাপারে, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নানাবিধ বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল—দুষ্ট লোকে তাঁহার প্রাণনাশের পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতে ক্রটি করে নাই। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্থিরমতি বিদ্যাসাগর মহাশয়, তত্রাপি সঙ্কল্পিত ব্রত উদ্যাপনে কিছুতেই পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহাকে এই বিরাট ব্যাপারে, যে সকল ব্যক্তি সহায়তা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহারা পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন—বিদ্যাসাগর মহাশয় অগত্যাই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া এইরূপ ঋণজালে জড়িত হইয়াছিলেন যে, পুনরায় চাকুরি করিবার কল্পনা তাঁহার মনের মধ্যে উদয় হইয়াছিল।

১২৭৭ সালের ২৭শে শ্রাবণ, ২১ বর্ষ বয়স্ক পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সহিত খানাকুল কৃষ্ণনগরনিবাসী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একাদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যা ভবসুন্দরী দেবীর বিবাহ দিয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহার বিধবাবিবাহ প্রচলনে গভীর আন্তরিকতা প্রকাশ পাইতেছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, বঙ্গদেশীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের বহুবিবাহ প্রথা রহিত করিবার নিমিত্তও বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি এক

বহু-বিবাহ

বৃহৎ পুস্তকও লিখিয়াছিলেন। এই পুস্তকে, তিনি বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ সমাজের ইতিবৃত্ত সহ কৌলীন্যপ্রথা হেতু যে সকল গর্হিতাচরণ প্রশ্রয় পাইতেছিল, তৎসমুদয় অতি বিশদভাবে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের নিকট বর্দ্ধমানের মহারাজা প্রভৃতি বহু মান্যগণ্য লোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্রও প্রেরিত হইল; কিন্তু বিধবাবিবাহের গণ্ডগোলে পড়িয়া ইহা তত ফলপ্রসূ হয় নাই। ১৮৫৬ খ্রীঃ বহুবিবাহবিষয়ক আন্দোলনের সূত্র-

পাত হইয়া ক্রমাগত কুড়ি বৎসর কাল অল্পবিস্তর এ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল।

লোক-সেবা।—বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বপ্রথম, জন্মভূমি, বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করেন; এই অনুষ্ঠানে তাঁহাকে মাসিক তিন শত টাকা করিয়া ব্যয় করিতে হইত। এই বিদ্যালয় এক্ষণ তদীয় জননীর নামানুসারে "ভগবতী-বিদ্যালয়" নামে খ্যাত।

শিক্ষাবিস্তার

যাহাতে স্বরচিত পুস্তকগুলি সুন্দররূপে মুদ্রিত হয় এবং সাধারণের তৎসমুদয় গ্রন্থ প্রাপ্ত হইবার পক্ষে কোন অসুবিধা না হয়, এই নিমিত্ত তিনি "সংস্কৃত যন্ত্র" ও "সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়" স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮৬৪ খ্রীঃ নানা-বিধ পরিবর্ত্তনের পর কলিকাতা ট্রেনীং স্কুলের মেট্রপলিটন স্কুল নামকরণ হইলে উহা তাঁহার তত্ত্বাবধানে আইসে। ১৮৬৬ খ্রীঃ হইতে স্কুলের সমগ্র দায়িত্ব তাঁহার উপর পতিত হইল এবং ১৮৬৮ খ্রীঃ হইতে তিনি ইহার সমগ্র ব্যয়-ভার বহন করিতে লাগিলেন। বহু বিঘ্নের পর ১৮৭২ খ্রীঃ হইতে মেট্রপলিটন স্কুল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ত-র্ভূত হইয়া এফ, এ পরীক্ষায় ছাত্র প্রেরণের অধিকার প্রাপ্ত হইল। সুফল দেখিয়া ১৮৮১ খ্রীঃ হইতে কর্ত্তৃপক্ষেরা বি,এ পরীক্ষায় ছাত্র প্রেরণেরও অধিকার প্রদান করেন। মেট্রপলিটন কলেজের আয় কলেজের ব্যয় জন্যই নিয়োজিত হইত—নিজে কখন এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া তিনি এই কলেজ-গৃহের জন্য এক সুরম্য তৃতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ বড় বাজার এবং ১৮৮৭ খ্রীঃ বহুবাজার ও শ্যামবাজার ব্রাঞ্চ-স্কুল স্থাপন করেন।

মেট্রপলিটন ইনষ্টিটিউসন

বিদ্যাসাগর মহাশয় দয়ার সাগর ছিলেন। শৈশব হইতেই তাঁহার এই বৃত্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কত ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণমুক্ত করিয়াছেন, কত কন্যাদায়গ্রস্তকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি নিয়মিতরূপে মাসিক আটশত টাকারও অধিক বৃত্তি দান করিতেন, এ দানের কথা সাধারণে কাহাকেও জানিতে দিতেন না। এতদ্ব্যতীত সাময়িক ও এককালীন দান করিতেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তকে তিনি ঋণ করিয়া দশ সহস্র টাকা প্রদান করিয়া-ছিলেন। ১৮৬৭ খ্রীঃ অনাবৃষ্টিনিবন্ধন বিষম দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তিনি, চারি পাঁচ মাস কাল অন্নছত্র খুলিয়া অবিরাম অন্নদান করিয়াছিলেন।

দান

১৮৫৯ খ্রীঃ বর্দ্ধমানে অবস্থান কালে ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব সময়, জাতি বা ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। সাঁওতাল পরগণার অধীন খর্ম্মাটাড়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক বাগানবাটী আছে— তথায় অবস্থান কালে সাঁওতাল অধিবাসী ও অন্যান্য দীন দুঃখীকে অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ ও পথ্যাদি বিতরণ করিতেন।

পারিবারিক ও অন্যান্য কথা—বিদ্যাসাগর মহাশয় অতিশয় পিতৃমাতৃ ভক্ত ছিলেন—জনক জননীকে তিনি সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞান করিতেন। একান্নবর্ত্তী বৃহৎ পরিবারের তত্ত্বাবধারণভার, তিনি পিতামাতার উপর ন্যস্ত করিয়া অধিকাংশ সময় কলিকাতায় একক রহিতেন। বৃহৎ পরিবারের ব্যয়ভার তিনি একাই বহন করিতেন। তাঁহার বিলাসিতার লেশমাত্র ছিল না।

নানা কারণে বিদ্যাসাগর মহাশয় পারিবারিক জীবনে সুখী ছিলেন না; বরং তিনি ইহার প্রতি সময়ক্রমে সম্পূর্ণরূপ বীতশ্রদ্ধ হইতেন। তবে, শেষাবস্থায় কলিকাতায় কন্যা ও বালক দৌহিত্র লইয়া কিঞ্চিৎ সুখে কালাতিপাত করিতেছিলেন।

পিতা ঠাকুরদাস, একক কাশীবাস করিতেছিলেন। জননী ভগবতী দেবী তথায় কিছুকাল অবস্থানের পর ১২৭৭ সালের শেষ দিনে পতিপুত্র রাখিয়া অমরধামে গমন করেন। পরে, ১২৮৩ সালে ১লা বৈশাখ পিতা ঠাকুর দাস কাশীধামে পরলোক প্রাপ্ত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তদবধি নির্জ্জনবাসে জ্ঞানোন্নতি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্র অনুশীলনে সমধিক যত্নপর হইয়াছিলেন।

১২৮৩ সালের শেষভাগে, বাদুড়বাগানে একটি দ্বিতল বাটী প্রস্তুত করিয়া নিজ পুস্তকালয়টি উত্তমরূপে সুসজ্জিত করিয়া বহুদিনের ক্ষোভ দূর করেন।

১২৯৫ সালে ১লা ভাদ্র পত্নী দীনময়ী দেবী দেহত্যাগ করেন।

বিবিধ—১৮৮০ খ্রীঃ (১২৮৭) গবর্ণমেণ্ট, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে C. I. E. উপাধি প্রদান করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন; কিন্তু ধর্ম্মমতে সাধারণ হিন্দুদিগের অনুষ্ঠিত আচার পদ্ধতির বশীভূত ছিলেন না। তিনি আপন ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস সর্ব্বদা গোপন রাখিতেন।

সি,আই,ই

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক এ জগতে বিরল—সহস্র অনুরোধ ও বিপুল বাধা তাঁহার পর্ব্বতসদৃশদৃঢ়সঙ্কল্প, কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিত না।

বন্ধুবর্গ

কালীকৃষ্ণ মিত্র, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ মিত্র, শ্যামাচরণ দে, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, প্যারীচরণ সরকার, কালীচরণ ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দকৃষ্ণ বসু প্রভৃতি বুধমণ্ডলী, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধু ছিলেন—দুঃখে সুখে তিনি ইহাঁদের পরামর্শগ্রহণে সুখী হইতেন।

শেষ—১৮৬৯খ্রীঃ মেরি কারপেণ্টারের সহিত বালী-উত্তরপাড়া যাইবার সময় পথিমধ্যে গাড়ী হইতে পড়িয়া যকৃতে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। এই পতন অবধি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আশৈশব সুস্থ ও সবল শরীরে সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়। তদবধি তিনি মধ্যে মধ্যে নানাবিধ অসুখ অনুভব করিতেন। পত্নীর মৃত্যুর পর ১২৯৫ সালের ভাদ্র মাস হইতে তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত উদরাময় পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিলে, তিনি ফরাসডাঙ্গায় আসিয়া বাস করিলেন। ১২৯৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে কলিকাতা আসিয়া রীতিমত চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল। অনেক মতান্তরের পর ডাক্তার সালজর তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন সামান্যমাত্র উপশমের পর হিক্কা দেখা দিল। অবশেষে তিনি নিজ ব্যবস্থামত ঔষধ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ১৩ই শ্রাবণ বৈকাল ও সন্ধ্যার সময় জ্বর প্রবল হইল এবং সেই রাত্রেই ২—১৮ মিনিটের সময় বঙ্গদেশ ও সমগ্র ভারত অন্ধকার করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়, নিত্যধামে চলিয়া গেলেন।

("বিদ্যাসাগর"—চণ্ডীচরণ, বিহারীলাল, বিবিধ সাময়িক পত্রিকা—স্বরচিত জীবন-চরিত প্রভৃতি)

শ্রীশিবরতন মিত্র।

তুমি।

সাধে কি তোমারে প্রভু,
কহিছে করুণালয়।
ক্ষুদ্র আমি কি কহিব
এ জগত 'তুমিময়'।

যেদিকে ফিরাব আঁখি
কেবলি তোমার শোভা,
শশাঙ্কে তোমারি হাসি
তপনে তোমারি প্রভা!
তারকায় তব দৃষ্টি
উজ্জ্বল প্রশান্ত তাহা,
নীলাকাশ বুঝাইছে
তুমি যে অনন্ত, আহা!
এই জগতের মাঝে
এ জীবন মন প্রাণ,
যদিই কিছু না বুঝি—
বুঝিব তোমারি দান।
'আমার' 'আমার' বলি
লয়েছি নিকটে যাহা,
এক বিন্দু নহে কিছু
কেবল তোমারি তাহা।
সংসারের সুখ-হাসি
—নির্য্যাতন-পরিতাপ,
শুভ ও অশুভ আর
আশীর্ব্বাদ অভিশাপ—•
তোমারি সকল দেব!
আমার মঙ্গল তরে,
রচিয়াছ তুমি তাহা
তোমারি বাসনা ভরে।
তব ইচ্ছা হোক পূর্ণ
তোমারি হউক জয়,
এবিশ্বাস থাক মম
এজগত 'তুমি ময়'।
প্রকৃতির নব শোভা
তটিনীর কুলু-তান,

প্রস্ফুট পুষ্পের হাস্য
পাখীর কূজন গান;
লতার বিনম্র ভাব
তরুর বিশাল কায়া,
কেবলি বুঝিছি আমি
তোমারি সৌন্দর্য্য-ছায়া।
তোমার মহৎ ভাবে
জগত মহিমান্বিত,
ফিরিয়া আসিছে তাই
বসন্ত বরষা, শীত।
অনন্ত শকতি তব
অসীম রহস্যময়,
এ জগত আত্ম-হারা
তোমাতে পাইছে লয়।

শ্রীনগেন্দ্রবালা বসু,
বীরভূম।

কবির সমাধি।*

(ভুবনমোহিনী প্রতিভার বিখ্যাত কবি কর্ত্তৃক লিখিত)

১

প্রতপ্ত ময়ূখজালে দগ্ধ করি ধরাতলে
অস্তাচলে চলিল তপন;
সন্ধ্যা সুরবালা রঙ্গে ছায়া সহচরী সঙ্গে
ধীরে ধীরে করে আগমন।

২

কুসুমযৌবনা সতী স্নিগ্ধশ্যামোজ্জ্বল দ্যুতি
অতি অনুপম সুমাধুরী,
হেরি এ সুষমারাশি পুলক-সাগরে ভাসি
হাসিতেছে প্রকৃতি সুন্দরী!

* কীর্ণাহার গ্রামস্থিত বঙ্গের অমর কবি চণ্ডীদাসের পবিত্র সমাধিদর্শনে লিখিত।

৩

কাননে ফুটিছে ফুল, কুহরে কোকিল কুল,
বিহঙ্গ কাকলী কলরবে
উথলিছে দিকচয় সুরভি সমীর বয়,
মুগ্ধা ধরা কুসুমসৌরভে!

৪

লইয়া গোধনধনে আনন্দে রাখালগণে
গৃহে ফিরে গাহিয়া সঙ্গীত;
ধেনু-কণ্ঠে ঠুং ঠাং ঘণ্টা বাজে অবিরাম,
সুপ্তভাব হয় জাগরিত!

৫

পূরব গগনকোলে অমিয় কিরণ ঢেলে
হইতেছে পূর্ণচন্দ্রোদয়
যেন কলধৌত ধারা রঞ্জিত হ'তেছে ধরা,
সুধাধবলিত সমুদয়।

৬

এ মধুর সন্ধ্যাকালে ভাতে চন্দ্র করজালে
শান্তি পূর্ণ কবির সমাধি;
জীর্ণ ধ্বংস স্তূপতলে কালে রাখি পদতলে
ত্যজিয়া সংসার আধি ব্যাধি।

৭

শান্তির সুশয্যা'পরে নিদ্রা যায় অকাতরে
সাধু চণ্ডীদাস কবিবর।
দাঁড়ায়ে এ স্তূপপাশে ভাসিতেছি ভাবোচ্ছ্বাসে
প্রেমে অশ্রু ঝরে ঝর ঝর!

৮

কবির সমাধি'পরে মাধবী নিকুঞ্জ'পরে
গাহে পিক পাপিয়া মধুর,
উচ্ছ্বাস উঠিয়া তায় দিগন্ত ভাসিয়া যায়—
ভেসে যায় গগন সুদূর!

৯

মালতী মাধবী আদি বনফুল নানাজাতি
ফুটিতেছে চন্দ্রকরজালে,
মত্তমধুকরদলে মধু পিয়ে কুতূহলে
গুন্ গুন্ ঝঙ্কারে সুতালে!

১০

হেরি এ সৌন্দর্য্যরাশি যে সুখসাগরে ভাসি
কি কহিব? কেবা তা বুঝিবে?
অহো! ভাগ্যবান কবি! স্বয়ং প্রকৃতিদেবী
প্রেমোৎফুল্ল তোমার গৌরবে!

১১

ধন্য তুমি কবিবর! কবিকীর্ত্তি অনশ্বর
করিয়াছে অমর তোমারে!
তোমার মধুর গানে স্বর্গীয় বংশীর তানে
মৃতদেহে জীবন সঞ্চারে!

১২

এ বিদগ্ধ ধরাতলে প্রেমের পীযূষ ঢেলে
করিয়াছ স্নিগ্ধ সুশীতল,
এ দারুণ মরুমাঝে নন্দনকানন রাজে
ধন্য তব কবিত্বকৌশল!

১৩

বৈকুণ্ঠবিভব ছাড়ি মানবের বেশ ধরি
অবতরি বঙ্গভূমি পরে
রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথা বিশ্ববিমোহিনী গাথা
গাহিয়া ভুলালে চরাচরে!

১৪

বহুশত বর্ষ হ'বে ত্যজিয়া গিয়াছে ভবে
উড়াইয়া কীর্ত্তির কেতন।
বঙ্গীয় ভাষার গলে পরাইয়া কুতুহলে
হরিকণ্ঠকৌস্তভরতন!

১৫

অমরবন্দিত হয়ে, বিরাজ দেবেন্দ্রালয়ে
তব সম কেবা ভাগ্যবান;
অক্ষয় পুণ্যের ফলে চিরকাল ধরাতলে
গা'বে লোক তব গুণগান!

১৬

আছে ইহা জনশ্রুতি জীবিতে তোমার প্রতি
করে নাই কেহ সমাদর,
আসিয়া সংসার পরে অনাদরে অবিচারে
মনকষ্ট পাইলে বিস্তর।

১৭

তোমারে লম্পট, শঠ নির্লজ্জ কামুক, নট
বলিয়া সকলে দিত গালি,
পতিত করিয়া জেতে রেখেছিল সমাজেতে
আরোপিয়া কলঙ্কের কালি!

১৮

হায়রে অন্ধ সংসার সদ্‌গুণের পুরস্কার
এইরূপে হয় কিরে দিতে!
ক্ষণজন্মা মহাত্মারা জন্মিয়া জীবিতে তাঁরা
কিজন্য লাঞ্ছিত নানামতে?

২৯

জীবিতে মহাত্মাদিগে চিনিতে পারে না লোকে
তাঁহাদের আলোক প্রকৃতি
হেরি সাধারণ জনে জ্বলি মরে হিংসাগুণে
অকারণে রটায় অখ্যাতি!

২০

না মিটে তাহাতে আশ সাধিবারে সর্ব্বনাশ
উগারে দুঃসহ হলাহল,
হ'য়ে প্রতিহত তায় অকালে নিবায়ে যায়
প্রজ্বলিত প্রতিভা অনল!

২১

এইরূপে অবিচারে অশ্রদ্ধায় অনাদরে
অত্যাচারে হ'য়ে প্রপীড়িত,
ত্যজিয়া দেহ নশ্বর চণ্ডিদাস কবিবর
এই স্থানে চির সমাহিত !

২২

অহো ! ভাগ্যবান কবি রাহুগ্রস্ত হ'য়ে রবি
বিমলিন থাকে কতক্ষণ ?
ক্ষণেকে নিষ্প্রভ হ'য়ে দ্বিগুণ উজ্জ্বল হয়ে
চরাচরে বিতরে কিরণ !

২৩

তদ্রূপ তুমিও কবি রাহুগ্রাসমুক্তরবি
লভি দিব্য কীর্ত্তিকলেবর,
হইয়াছ প্রভান্বিত করিয়াছ উজ্জ্বলিত
এ অন্ধতমস্ চরাচর !

২৪

আজি এই বঙ্গধামে তোমার পবিত্র নামে
উৎফুল্ল না হয় কার মন ?
হইয়া ভকতি নত গৃহদেবতার মত
পূজে লোক তোমার চরণ !

২৫

বঙ্গের শিক্ষিত জন ভাবুক প্রেমিকগণ
এস সবে এ সমাধিস্থানে !
পূর্ব্ব পুরুষের পাপ স্মরি কর অনুতাপ
প্রায়শ্চিত্ত কর জনে জনে !

২৬

কবির সমাধি পরে অশ্রু বিসর্জ্জন করে
তাপদগ্ধ হৃদয় তাঁহার
সিক্ত করি, ভক্তি ভরে পূজ মৃত মহাত্মারে,
সদ্গুণের কর পুরস্কার !

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

থাকিলেও গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ও কুলশাস্ত্রদীপিকায় প্রকাশ আছে যে, তাঁহার নাম ছিল রামচন্দ্র মজুমদার। এই বংশের অতি প্রাচীন এক খণ্ড কুর্শীনামার শিরোভাগে কেবল মাত্র লেখা আছে, "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর পার্শ্বদ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদাস ঠাকুর।" তৎপরে তাঁহার পুত্র পৌত্রাদিগণের ধারাবাহিক নাম প্রকাশ আছে। সম্ভবতঃ গৌরাঙ্গের দ্বারদেশে নিত্যানন্দের প্রথম গৌরাঙ্গদাস সম্বোধন হইতেই বিপ্রের পূর্ব্ব নামের পরিবর্ত্তন হইয়া গৌরাঙ্গদাস নাম প্রচলিত হয়। ভক্তগণ এবং অন্যান্য সকলেও সেই হইতেই গৌরাঙ্গদাস বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিতে থাকেন। ইনিও সেই হইতেই সাধারণের নিকট গৌরাঙ্গদাস পরিচয় দিতে থাকেন। সুতরাং বংশধরগণ গৌরাঙ্গদাস নামেই কুর্শীনামাতে ইঁহাকে উল্লেখ করিয়াছেন, গৌরাঙ্গদাস কথাটী বংশের গৌরবজনক বলিয়া এখন পর্য্যন্ত বংশধরগণ আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন।

গৌরাঙ্গদাস কয়েক দিন নবদ্বীপধামে অবস্থান করার পর একদিন মহাপ্রভু আদেশ করিলেন, "গৌরাঙ্গদাস, আমি তোমাকে নিত্যানন্দের পদে সমর্পণ করিলাম। আমাতে এবং নিত্যানন্দতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। তুমি নিতাইচাঁদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গৃহে যাও, গৃহে থাকিয়াই হরিনাম প্রচার করিবে।" গৌরাঙ্গদাস প্রভুর আজ্ঞা শ্রবণ মাত্রেই কাঁদিয়া আকুল হইলেন, বলিলেন "প্রভু নিত্যানন্দ পদকমলের সুশীতল ছায়ায় কি আমাকে স্থান দিবেন? আমার কি এমন শুভদিন হইবে? নিতাই চাঁদ প্রভুর সম্মুখেই ছিলেন, প্রভু অনুমতি করিলেন "দয়াল ঠাকুর, এইবার গৌরাঙ্গদাসকে দয়া কর। অদ্য ইহার দীক্ষা দিয়া হরিনাম প্রচার জন্য ইহাকে স্বদেশে প্রেরণ কর।" নিতাই চাঁদ বিলম্ব না করিয়া গৌরাঙ্গদাসকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। উভয়েই গঙ্গা স্নান করিলেন, নিতাই চাঁদ গৌরাঙ্গদাসকে হরিনাম এবং দীক্ষা প্রদান করিয়া পবিত্র করিলেন। গৌরাঙ্গদাস ধন্য হইলেন। গৌরাঙ্গদাসের আনন্দের আর সীমা নাই, দুই বাহু তুলিয়া নিত্যানন্দের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া নাচিতে লাগিলেন। ক্রমেই আরও বৈষ্ণবগণ উপস্থিত হইয়া নাচিতেনাচিতে হরিনামের তরঙ্গ উঠাইলেন। তখন সকলেই মিলিত হইয়া মহাপ্রভুর প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলে, মহাপ্রভু তাহাতে যোগ দিয়া পরম আনন্দ বৰ্দ্ধন করিলেন। কিছুক্ষণ আনন্দের পর সকলেই উপবেশন করিয়া মহাপ্রভুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে লাগি-

লেন। দিবা অবসানপ্রায় দেখিয়া সকলেই যথাস্থানে গমন করিলেন। মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, গৌরাঙ্গদাস ঠাকুর এবং আগন্তুক ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে যাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না, তাঁহারা সেই স্থানেই থাকিয়া গেলেন। সকলেরই ভোজনান্তে মহাপ্রভু, গৌরাঙ্গদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গৌরাঙ্গ দাস, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, এখন তুমি গৃহে যাও। স্ত্রী পুত্র প্রতিপালন কর গিয়ে।" গৌরাঙ্গ দাস বলিলেন, "প্রভু, আমি আপনাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না, আমার আর সংসারে যাইবার ইচ্ছা নাই। আপনাদের পাদপদ্ম দর্শন না করিয়া আমি এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিব না, আমাকে সংসারে যাইবার আজ্ঞা করিও না।" মহাপ্রভু বলিলেন "তাহা হইতে পারে না, এখনও তোমার অনেক কার্য্য আছে, তুমি সাংসারিক না হইলে সে কার্য্য উদ্ধার হইবে না।" গৌরাঙ্গদাস কাঁদিতে লাগিলেন, নিতাই-গৌর-বিরহাশঙ্কা তাঁহাকে বড়ই ব্যাকুল করিয়া তুলিল। নিতাইচাঁদ বলিলেন, গৌরাঙ্গদাস, তোমার মনের ভাব সমস্তই আমি বুঝিতে পারিতেছি, তবে তোমাকে অধিক দিন থাকিতে হইবে না। আবার আসিয়া আমাদের সঙ্গ লাভ করিতে পারিবে। সম্প্রতি তোমার শান্তির জন্য এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি। তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, গৃহে গিয়া দেখিতে পাইবে যে, তোমার অভীষ্ট এক যুগলবিগ্রহ শালগ্রামসহ তোমাদের গ্রামে উপস্থিত হইবেন, এক উদাসীন লইয়া যাইবেন, তুমি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেই তিনি তোমাকে সেই সুঠাম অতি মনোহর যুগল বিগ্রহ শালগ্রাম শিলা প্রদান করিবেন, তুমি সেই বিগ্রহের সেবা পূজা করিয়া শান্তি লাভ করিবে, আর যাহাকে তাহাকে হরিনাম বিলাইবে। এই কার্য্যে মহাপ্রভু এখন তোমাকে নিয়োজিত করিলেন, আমারও এই অভিপ্রায়। সময় হইলে মহাপ্রভু তোমাকে তাঁহার চরণপ্রান্তে লইয়া আসিবেন।" গৌরাঙ্গদাস বলিলেন, "প্রভু, তোমরা যাহা করিবে, তাহাই হইবে। আমি ক্ষুদ্র জীব, তোমাদের উদ্দেশ্য কি করিয়া বুঝিব! আমি যাইতেছি, আমার কার্য্যে আমি যাইতেছি না, তোমাদের কার্য্যেই যাইতেছি। তোমরা যাহা করাইবে, তাহাই করিব; এ দেহ, প্রাণ, ধনৈশ্বর্য্য যাহা কিছু সমস্তই তোমার ঐ শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছি, আমার আর কিছুই নাই, আছে কেবল ঐ রাঙা পা দুখানি; দেখিও, উহা হইতে যেন আমাকে বঞ্চিত করিও না।" এইরূপ কথোপকথনের পর সে দিন গৌরাঙ্গ

দাস ঠাকুর শ্রীধাম নবদ্বীপে পরম সুখে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন প্রত্যুষে প্রভুগণের শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক স্বগৃহে গমন করিলেন।

গৌরাঙ্গ দাস ঠাকুরের নিবাস জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত বায়সা গ্রামে ছিল। এখনও বায়সা গ্রাম বর্ত্তমান আছে, কিন্তু এ বংশের কেহই তথায় নাই। গৌরাঙ্গ দাস ঠাকুরের পুত্রগণ ঐ স্থান পরিত্যাগ কালে কোন রূপ চিহ্ন রাখিয়া যান নাই, সুতরাং সেখানে এ বংশের আর কোনরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না, কালের গতিতে আর কোন প্রসঙ্গাধীনেও কেহ কিছু বলিতে পারে না। গৌরাঙ্গদাসের পুত্রগণের ঐ স্থান পরিত্যাগ এবং তাঁহাদের জীবনের মহা আখ্যায়িকা এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত হইবে।

সম্প্রতি রামচন্দ্র মজুমদার বা গৌরাঙ্গদাস ঠাকুরের বংশ পরিচয় প্রকাশ করা যাইতেছে, রামচন্দ্র মজুমদারকে আমরা গৌরাঙ্গদাস ঠাকুর নামেই উল্লেখ করিব। গৌরাঙ্গ দাস ঠাকুর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, কালি হাই বংশ বারেন্দ্র সমাজে বিশেষ সম্মানিত। সে সময় বারেন্দ্র সমাজে ইহাদের বিশেষ সম্মান ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মজুমদার উপাধি ইহাদের কি প্রকারে হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ না থাকিলেও প্রাচীন কালে সম্মানিত ব্যক্তি ব্যতীত মজুমদার উপাধি সকলে পাইতেন না। কালি হাই বংশের অনেক শাখা আছে, ইহারাও তাহার একটী শাখা। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ ও কুলশাস্ত্র-দীপিকায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

গৌরাঙ্গদাস ঠাকুর শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বাটীর ও গ্রামস্থ সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইলেন, সাগ্রহে কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তিনি কোথায় গিয়াছিলেন, কাহাকেও কিছু না বলিয়া কেন গিয়াছিলেন, ইত্যাদি প্রশ্ন করিলে, গৌরাঙ্গদাস অতি বিনীত ও কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমি শ্রীধাম নবদ্বীপে গিয়াছিলাম, নবদ্বীপে গৌরহরির পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে, তোমরা আর বৃথা সময় নষ্ট করিতেছ কেন, শীঘ্র যাও নিতাইগৌর দর্শন করিয়া চরিতার্থ হও গিয়ে। দয়াল নিতাই সকলকেই দয়া করিবেন, জীবের আর চিন্তা নাই। একবার সকলে হরিবোল হরিবোল বল, হরিনাম ব্যতীত সংসারে আর কিছুই নাই।" গৌরাঙ্গ দাসের এইরূপ ভাব দেখিয়া সকলেই বলিতে লাগিলেন, রামচন্দ্রের একি হইল। রামচন্দ্র কি উন্মাদ রোগাক্রান্ত হইয়াছে। রামচন্দ্র নাম শুনিয়া গৌরাঙ্গ

দাস বলিতে লাগিলেন "রামচন্দ্র কে? আমি রামচন্দ্র নই, গৌরাঙ্গ দাস, দয়াল নিতাই দয়া করিয়া আমাকে গৌরাঙ্গদাস করিয়াছেন, তোমরাও দয়া করিয়া আমাকে গৌরাঙ্গদাস বলিয়া ডাকিও, আমি তাহাতেই সুখী হইব। নিতাই গৌরের নাম আমাকে বড়ই ভাল লাগে।" প্রতিবাসীগণ গৌরাঙ্গদাস বায়ু-রোগাক্রান্ত স্থির করিয়া চিকিৎসার উপদেশ দিয়া নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন। বাটীস্থ সকলে নানা প্রকার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রোগের কিঞ্চিৎ মাত্র উপশম হইল না, বরং ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্রন্দন, নৃত্য, গীতে দিবা রাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। গৃহকার্য্যে মন নাই। স্ত্রীপুত্রের দিকে দৃষ্টি নাই, কেবল "নিতাই গৌর হরিবোল হরিবোল" বলিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

একদিন বায়সা গ্রামে প্রচার হইল যে, একটী জ্যোতির্ম্ময় সন্ন্যাসী অতি মনোহর, সুঠাম, যুগল রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি ও একটী শালগ্রাম শিলা লইয়া জলাশয়তীরে বটবৃক্ষমূলে অবস্থান করিতেছেন। গ্রামস্থ সকলেই তথায় ছুটিয়া যাইতেছে, সকলেই যাইয়া দেখিল, সন্ন্যাসী নাই, গৌরাঙ্গদাস নিমীলিতনেত্রে বিগ্রহ সম্মুখে বসিয়া আছেন, তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অবিরল বারিধারা পতিত হইয়া বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে, অস্পষ্টস্বরে বলিতেছেন, "প্রভু নিতাইচাঁদ, তোমার এত দয়া, এ নরাধমকে কি দেখিয়া তুমি এত দয়া করিলে, সত্যই তুমি দয়াল নিতাই।" উপস্থিত জনমণ্ডলী তখন গৌরাঙ্গদাসের এই ভাব দেখিয়া আর তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত সন্দেহ করিলেন না। সকলেরই হৃদয়ে ভক্তির ভাব আসিল, সকলেই একবাক্যে গৌরাঙ্গদাসকে ধন্য ধন্য বলিতে লাগিলেন, গৌরাঙ্গদাস ক্ষণকাল পরে গাত্রোত্থান করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীকে করযোড়ে বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন "আপনারা দয়া করিয়া আসিয়াছেন, একবার সকলেই হরির নাম করুন, হরির নাম ব্যতীত সংসারে আর কিছুই নাই।" গৌরাঙ্গদাসের কথায় সকলেই বিচলিত হইয়া হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন, গৌরাঙ্গদাসও তৎসহ মিলিত হইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তনে এক দিবারাত্রি তথায় অতিবাহিত করিয়া শ্রীবিগ্রহ নিজ গৃহে আনিয়া স্থাপন করিলেন। বায়সা গ্রামে সেই দিন হইতে হরিনামের মহাতরঙ্গ উত্থিত হইল। গ্রামস্থ এবং ভিন্ন স্থানের ভক্তগণ সেই দিন হইতে আসিয়া যোগ দিতে লাগিলেন! তখন সকলেই গৌরাঙ্গদাসকে আর সামান্য মনুষ্য বলিয়া মনে করিতে সাহস করিলেন না। এই দিন হইতেই গৌরাঙ্গ-

দাস জনসাধারণের চক্ষে বিশেষ ভক্তির পাত্র ও অসামান্য মহাত্মারূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। বায়সা গ্রাম হইতেই মহাত্মা গৌরাঙ্গদাস কর্ত্তৃক রাজসাহী অঞ্চলে মহাপ্রভুর নবপ্রবর্ত্তিত হরির নামের মহাতরঙ্গ উত্থিত হইয়া ক্রমে ক্রমে অন্যান্য মহাত্মাগণের সহযোগে সমস্ত রাজসাহী অঞ্চল প্লাবিত করিতে লাগিল।

গৌরাঙ্গদাস দিবারাত্র শ্যামসুন্দরের মনোহর যুগলমূর্ত্তির সেবা পূজায় মনোনিবেশ করিলেন,বিগ্রহের নাম কেহ রাধাশ্যাম, কেহ শ্যামসুন্দর, কেহবা শ্যামরায় বলিয়া উল্লেখ করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গদাস শ্যামরায়, বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ক্রমে শ্যামরায় নামই প্রচার হইল। গৌরাঙ্গদাসের ধনসম্পত্তি সমস্তই শ্যামরায়ের সেবায় ব্যয়িত হইতে লাগিল। ভক্তগণের আগমনে প্রতিদিন মহোৎসবের বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শ্যামরায়ের আরতি অন্তে মহা সকীর্ত্তনে সকলেই বিভোর হইয়া যাইতেন, গৌরাঙ্গদাস ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন, গৌরাঙ্গদাস ভাবে বিভোর হইয়া সংকীর্ত্তনের মধ্যে মনোহর নৃত্য করিতে থাকিতেন, তাঁহার নৃত্য দর্শনে ভক্তগণ স্থির থাকিতে পারিতেন না। তাঁহারাও নৃত্য করিতে থাকিতেন। মন্দিরস্থ যুগল বিগ্রহের দিকে নৃত্য সময়ে অনেকে দৃষ্টি করিয়া দেখেন যেন, রাধাশ্যামও নৃত্য দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। এই প্রকারে বায়সা গ্রামে আনন্দের স্রোত ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু প্রথমাবস্থায় সাধারণের যেরূপ কৌতূহল ছিল, এখন আর তাহা নাই, এখন যেন সকলেরই শ্যামরায় ও গৌরাঙ্গদাস স্থায়ী নিত্য বস্তু মনে হইতে লাগিল, নিত্যক্রিয়ার ন্যায় সকলেই প্রতিদিন প্রাতে ও সায়াহ্নে শ্যামরায়ের অঙ্গনে উপস্থিত হইয়া প্রণাম, আরতি দর্শন, চরণামৃত পান, কীর্ত্তনাদি করিয়া নিজ নিজ আবাসে চলিয়া যাইতেন, গৌরাঙ্গদাস যেন পূর্ণকাম হইয়া সাংসারিক অবস্থাতেই শ্যামরায়ের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া বিশুদ্ধ বৈষ্ণবাচারে দিন রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন, সকলেই মনে করিতে লাগিলেন—গৌরাঙ্গদাস আর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবেন না, শ্যামরায়ের সেবা পূজার জন্য গৃহেই থাকিতে বাধ্য হইবেন।

গৌরাঙ্গদাস যে সময় শ্রীধাম নবদ্বীপে গিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বেই তাঁহার একটী পুত্র হয়। তখন পুত্রের বয়স অল্প মাত্র ছিল, ইহাই কথিত আছে। সে সময় এমন কোনও নিয়ম ছিল না যে, কাহার

জন্ম মৃত্যু বা কোন ঘটনার সন তারিখ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে, সুতরাং তাহা জানিবার উপায় নাই। গৌরাঙ্গদাসের সেই পুত্রটীর নাম কালিদাস মজুমদার রাখা হইয়াছিল। কালিদাস ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, কিছু দিন পর গৌরাঙ্গদাস ঠাকুরের আর একটী পুত্র জন্মে। তাঁহার নাম শ্যামদাস রাখা হয়। শ্যামদাসের জন্ম শ্যামরায় বিগ্রহ প্রাপ্তির পর হইয়াছিল বলিয়াই সম্ভবতঃ শ্যামদাস নাম রাখা হইয়াছিল। কালিদাস পিতার পদানুসরণ করিতে লাগিলেন, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবাচার তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত করিতে লাগিল। কালিদাস বয়স্থ হইয়াছিলেন, গৌরাঙ্গদাস কালিদাসের প্রতি শ্যামরায়ের সেবা পূজার ভার ক্রমেই অর্পণ করিতে লাগিলেন, কালিদাসও পরমার্থজ্ঞানে কৃতার্থমনে পিতার ন্যায় শ্যামরায়ের সেবা করিতে লাগিলেন, বালক শ্যামদাস অগ্রজ কালিদাসসহ শ্রীমন্দিরে সর্ব্বদা অবস্থান, চরণামৃত পান, প্রসাদ গ্রহণ, শুদ্ধাচারে থাকা ইত্যাদি বিশুদ্ধভাবের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। সকলেই ভাবিতে লাগিল, শ্যামদাসও সময়ে একটী অমূল্য রত্ন হইবেন। বালকের প্রতিভা দেখিয়া অধ্যাপক মহাশয়ও বলিতে লাগিলেন, অন্যান্য বালকগণ দশ দিনেও যাহা করিতে না পারে, শ্যামদাস এক দিনেই তাহা শেষ করে। গৌরাঙ্গদাস জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি সেবার কার্য্য অর্পণ করিয়া দিবা রাত্র নির্জ্জনে বসিয়া হরিনাম স্মরণ, মনন, শ্রবণ, কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর, একদিন একটী ভক্ত আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "প্রভু আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন, বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হউন।" গৌরাঙ্গদাস বলিলেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াই পূর্ব্ব হইতে কালিদাসের হস্তে সেবা পূজার ভার অর্পণ করিয়াছি, এই সংবাদ পাওয়ার পরদিনই বাটীর সকলকে বলিয়া গৌরাঙ্গদাস প্রভু পাদপদ্মোদ্দেশে গমন করিলেন। যাঁহারা নিতান্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগকে "আমার আসিতে কত দিন হইবে, তাহা আমার বলিবার উপায় নাই, যাঁহারা লইয়া যাইতেছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন" ইহাই বলিলেন, কিন্তু গৃহিণীকে বলিয়া গেলেন, "সম্ভবতঃ আমি আর আসিব না, তুমি পুত্রগণ সহ শ্রীবিগ্রহের সেবা পূজা করিতে থাক, অতিথি সৎকার করিতে কদাচই অমনোযোগী হইবে না, আর আমি এই হরিনামের মালা তোমাকে দিয়া যাইতেছি, নিয়ম করিয়া জপ করিও, সংসারের বৃথা অশান্তিতে আকুল হইও না, অশান্তি আসিলেই

শ্যামরায়ের নিকট করযোড়ে শান্তি ভিক্ষা করিও, তিনিই শান্তি প্রদান করিবেন, সময়ে আবার দেখা হইবে।"

ভক্ত গৌরাঙ্গদাস সহ প্রভুগণের শ্রীধাম নবদ্বীপে আর দেখা হয় নাই। এবার নীলাচলে গিয়া প্রথম সাক্ষাৎ হয়। গৌরাঙ্গদাস নীলাচলে উপস্থিত হইয়া প্রভুগণের চরণরেণু গ্রহণান্তে ভক্তগণকে প্রণাম করতঃ করযোড়ে দণ্ডায়মান হইলে প্রভুর আদেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথ আদি দর্শন করিতে গমন করেন। মহাপ্রভু ভক্তগণের সহ তাঁহার পরিচয় করিয়া দিয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। কীর্ত্তনের সময় গৌরাঙ্গদাস ভাবে বিভোর হইয়া মনোহর নৃত্য করিতেন। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু তাহাতে বড়ই প্রশংসা করিতেন। সেই জন্য মহাপ্রভু পরে তাঁহার নৃত্যক নাম রাখিয়াছিলেন। কত দিন তিনি নীলাচলে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। গৌরাঙ্গদাসের বায়সা গ্রামে ফিরিয়া আসারও আর কোন উল্লেখ নাই। এই সমস্ত ঘটনার পরই অনেকে তাঁহাকে শ্রীধাম বৃন্দাবনে দেখিতে পাইয়াছিলেন, কথিত আছে তাঁহার পত্নীও তাঁহার সহ বৃন্দাবনে মিলিতা হন। বৃন্দাবনের বৃহৎ বৃক্ষতলই তাঁহাদের আশ্রয় স্থান ছিল। কিন্তু তাহাও নির্দ্দিষ্ট ছিল না, এক এক দিন এক এক স্থানে থাকিতেন। মাধুকুরির দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন, করপুটে শ্রীযমুনার বারি পান করিয়া পিপাসার শান্তি করিতেন। ইহার পর আর তাঁহাদের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না, সম্ভবতঃ শ্রীধামেই যুগল মুর্ত্তির অন্তর্ধান হইয়াছিল।

নীলাচল হইতে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু মধুর হরিনাম প্রদান করিয়া জীব উদ্ধার জন্য বঙ্গদেশে যে সময় পুনরাগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় কালিদাস তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। কালিদাস পিতৃদেবের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমার পিতা এখন শ্রীধাম বৃন্দাবনে আছেন। নীলাচল হইতে তাঁহাকে প্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে পাঠান হইয়াছে, তোমার জননীকেও কাহারও সহিত তথায় প্রেরণ করিও। কিন্তু তুমি এখন বৃন্দবনে যাইও না, শ্যামদাস সহ একত্রে শ্যামরায়ের সেবা করিতে থাক। শ্যামদাস বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তখন যেরূপ অভিমত হয়, করিও।" কালিদাস মাতাকে কাহার সহিত পিতৃসদনে শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারও কোন কথার প্রকাশ নাই।

শ্রীবনওয়ারি লাল গোস্বামী।

তুমি।

তুমি কি? তুমিত সখি
হৃদিরাণী মোর।
তুমি কি? তুমিত সতি
আমার জীবন-ডোর।
হৃদয়-আনন্দময়ী, তুমি যে গো আশাময়ী,
পরাণের স্বপ্নময়ী, অমৃতের ঘোর।
তুমি কি? 'তুমিত সখি
হৃদিরাণী মোর।

সকলি আঁধার যে গো
তোমার বিহনে,
তোমা'না হেরিলে অশ্রু
উথলে নয়নে।
চাঁদের কিরণ তুমি, আলোকরা বিশ্বভূমি,
তোমার চরণ চুমি' সংসার কাননে
পরাণ হাসিছে কত
মধুর স্বপনে।

আমি বাঁশরীর স্বর,
তুমি সেই রেণু;
বিকশ কুসুম তুমি,
আমি ফুলরেণু;—
তোমার কোমল বুকে কত না ঘুমাই সুখে,
তোমা বিনা মরি দুখে, ঝরে আঁখিজল।
আঁাধার সকলি যেন,
পরাণ বিকল।

মন্ত্রজালে ঘেরা আঁখি
জগৎ মাঝার,

তুমি আকাশের আলো
অনন্ত অপার।
তাই সাধ হয় মনে মিশিতে তোমার সনে,
আমি কেন এ জীবনে রহিব সসীম।
তুমি আকাশের আলো
অনন্ত অসীম।

সংসারগগনে তুমি
মোর ধ্রুবতারা,
তোমা বিনা নিমেষে যে
হই পথহারা।
তোমারি আলোক পেয়ে তোমারি সঙ্গীত গে'য়ে
ভ্রমিতেছি এ আঁধারে জগৎ মাঝার।
তুমি সখি জীবনের
সাধনা আমার।

শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গে বর্গী।

ইংরাজের কল্যাণে, আজ আমরা শান্তির কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া নানা সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছি। মায়াবিনী আশার মোহিনী মূর্ত্তিতে মুগ্ধ হইয়া, কখন আমরা দেবতার উপভোগ্য নন্দন-কাননের পারিজাত আহরণের চিন্তা করিতেছি; আবার কখন বা ছলে বা কৌশলে, চীৎকারে বা ক্রন্দনে, ত্রিদিবের রত্নসিংহাসন অপহরণের আকাঙ্ক্ষায় অহরহঃ চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু এমন দিন গিয়াছে, যে দিন অধিকক্ষণ আমরা শান্তির ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতে পাই নাই। বাঙ্গালী, সেই ঘোর দুর্দ্দিনে, ধন, মান, প্রাণ রক্ষার জন্য সদা সশঙ্ক থাকিত। কোন্ অবস্থাটা ভাল তাহার বিচার করিতেছি না—তবে প্রকৃত যাহা ছিল, তাহাই বলিতেছি। যে দিন বঙ্গের শেষ রাজা বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন যবন-ভয়ে পলায়ন করেন, সেই দিন হইতে দুর্ভাগ্য বঙ্গভূমি ক্রমান্বয়ে পাঠান, মোগল ও মহারাষ্ট্রগণের পদ-দলিত

হইতে থাকে। হিংস্র বন্য পশু যেমন একই বনে বাস করিয়া পরস্পরের শোণিতপান লালসায় অনবরত যুদ্ধ করে, সেই রূপ বাঙ্গালী, পাঠান, মোগল ও মারহাট্টাগণ আপনাদের সর্ব্বনাশের জন্য বঙ্গভূমি রক্তস্রোতে প্লাবিত করে। এই রূপে আপনাদের মধ্যে যুদ্ধ করিয়া যখন তাহারা ক্লান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তখন বিনা বাধায় ইংরাজের দাসত্বশৃঙ্খল গলায় পরিয়া শান্ত ভাব ধারণ করিল। এখন আলিপুরের পশুশালায় পিঞ্জরাবদ্ধ দুর্ব্বল নিস্তেজ সিংহব্যাঘ্রভল্লুকাদির ন্যায়, আমরা সকরুণ নয়নে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছি। অথবা বিধবা সপত্নীগণের ন্যায়, পূর্ব্ব বিবাদ ভুলিয়া গিয়া পরস্পরের গলা ধরিয়া রোদন করিতেছি।

এখন আমরা মহা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি। মারহাট্টাগণ যেরূপ পরাক্রমশালী হইয়াছিল, তাহাতে যদি তাহারা রাজনীতি কিছু বুঝিত, যদি আত্মকলহ ভুলিয়া;—যদি ভারতের বিভিন্ন অঙ্গে আঘাত না করিয়া, সমস্ত অঙ্গের পুষ্টিসাধনে সচেষ্ট হইত, তাহা হইলে ভারতের ইতিহাস আজ দাস জাতির ইতিহাস হইত না। নিরীহ বঙ্গবাসীর উপর তাহারা যে অত্যাচার করিয়াছিল, আমরা যথাসাধ্য তাহারই বিস্তৃত বিবরণ দিব।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতের বিভিন্ন জাতি একতা সূত্রে বদ্ধ হইতেছে। বাঙ্গালী, মারহাট্টা, পারসী, পঞ্জাবী, এবং হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ একই প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পরের প্রতি প্রীতিসম্ভাষণ করিতেছে। বাঙ্গালী মহারাষ্ট্রবীর শিবাজির উদ্দেশে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে। এমন সময়ে মারহাট্টাদিগের অত্যাচারকাহিনী তুলিয়া বাঙ্গালীর মনে তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ উৎপাদন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এই অত্যাচার কাহিনী বিবৃত করিয়া আমাদের মহারাষ্ট্রীয় ভ্রাতৃগণকে আমরা এই বলিতে চাই "ভাই, তোমরা কি শোচনীয় আত্মহত্যা করিয়াছ। প্রহার না করিয়া যদি কোলে টানিয়া লইতে, তাহা হইলে ভ্রাতায় ভ্রাতায় মিলিত হইয়া আমরা মহাশক্তিশালী হইতাম। তাহা হইলে, পলাশী, বা আসাই রণক্ষেত্রে ইংরাজের বিজয় নিশান উড়িত না। যেন এইবার আমরা বুঝিতে পারি, আত্মকলহ সর্ব্বনাশের মূল।" আর বাঙ্গালীও বুঝুক যে, তাহারা তরবারি ধরিতে জানিত, সে দিন যেমন সকলে সম্মিলিত হইয়া আত্মরক্ষা করিতে উদ্যোগী না হইয়া বিষম দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তেমনি আজ শান্তির দিনে, অসির পরিবর্ত্তে লেখনী ধরিয়া ও রণবাদ্যের পরিবর্ত্তে বক্তৃতা

মাত্র সম্বল হইয়াও যদি তাহারা এক-মত না হয়, তবে দ্রুতগতি অবনতির ঘোর অন্ধকার কূপে পতিত হইবে।

ঘেরিয়ার রণক্ষেত্রে স্বীয় প্রভু সরফরাজ খাঁর রক্তে সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত করিয়া, আলিবর্দ্দি বঙ্গের সিংহাসন আরোহণ করিয়াছেন। বঙ্গের অতুল ধন সম্পদের অধিকারী হইয়াও তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইল না। তিনি উৎকল বিজয়ের মানস করিলেন। অচিরে উৎকলে আলিবর্দ্দির বিজয়কেতন উড়িল। আলিবর্দ্দির আজ সৌভাগ্যের সীমা নাই। তিনি আজ ভারতের শিরোমণি স্বরূপ বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার একচ্ছত্র অধীশ্বর। ধন সম্পদে, লোক বলে তাঁহার তুল্য ভারতভূমে কে আছে? বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া তিনি মেদিনীপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় আলিবর্দ্দি মহা সমারোহে আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন। সে সময়ের নবাব ওমরাহ-দিগের ন্যায়, কুৎসিৎ ব্যসনের প্রতি তাঁহার প্রবৃত্তি ধাবিত হইত না। তাঁহার বীর-হৃদয় বীরোচিত ক্রীড়ায় আসক্ত হইত। মনের উল্লাসে তিনি মৃগয়া করিতে লাগিলেন। এক দিন তিনি সাঞ্চা নামক স্থানে মধ্যাহ্ন সময়ে নমাজ করিতেছেন, এমন সময় এক জন তহশীলদার সেই সময়েই তাঁহাকে ভীষণ সংবাদ দিল। সে বলিল "হুজুর, ভাস্করপণ্ডিতপরিচালিত চল্লিশ সহস্র মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী সৈন্য আপনার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে। তাহারা যেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সে স্থান এখান হইতে কুড়ি ক্রোশ দূরেও নহে। এই বিপুল সেনা দ্রুতগতি ধাবিত হইয়া আসিতেছে। আগামী কল্য সন্ধ্যার সময়, কিম্বা পরশ্ব প্রত্যূষে, তাহারা নিশ্চয়ই এখানে আসিয়া পঁহুছিবে।" এই আকস্মিক ভীষণ সংবাদে আলিবর্দ্দির দৃষ্টিতে বা মুখমণ্ডলে কোন রূপ বিস্ময় বা ভয়ের চিহ্নমাত্র দৃষ্ট হইল না। নির্ভীকভাবে অবিকম্পিতস্বরে বীরের ন্যায় তিনি উত্তর করিলেন—"কোথায় সে কাফে-রের দল? কোথায় গেলে আমি তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি দিতে পারি?"—

আলিবর্দ্দী মুখে যাহাই বলুন, এই আকস্মিক বিপদে তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল। যুদ্ধের অবসান হইল, এই ভাবিয়া, তিনি অধিকাংশ সৈন্যকে বিদায় করিয়া দিয়াছেন। এই সকল সৈন্য ও তাঁহার সেনাদলের অধিকাংশই মুরশিদাবাদ চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে মোট তিন চারি সহস্র অশ্বারোহী ও পঞ্চ সহস্র বন্দুকধারী সৈন্য আছে। এই অল্প সংখ্যক সেনা লইয়া তিনি

কিরূপে চল্লিশ সহস্র সৈন্যের সম্মুখীন হইবেন? সুচতুর দ্রুতগামী মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী সেনার হস্ত হইতে তাঁহার আত্মরক্ষার উপায় কি? কিন্তু আলি-বর্দ্দী বীরপুরুষ। তিনি বাহ্যতঃ কোন প্রকার উদ্বেগ বা ভয়ের চিহ্ন মাত্র না দেখাইয়াই বর্দ্ধমান অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বর্দ্ধমানে আসিয়া তিনি উক্ত নগরের উত্তর পার্শ্বে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। মারহাট্টাগণও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বর্দ্ধমানের দক্ষিণে আসিয়া উপস্থিত হইল। চিরাগত বর্ব্বর ও নিষ্ঠুর প্রথার অনুসরণ করিয়া তাহারা সমৃদ্ধ বর্দ্ধমান নগরে অগ্নিসংযোগ করিল। নিরীহ বর্দ্ধমানবাসী হিন্দুগণের, মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বধর্ম্মিগণের গৃহ, হিন্দুর প্রদত্ত অগ্নিতে ভস্মীভূত হইতে লাগিল। সুশোভন, ধন-শস্যপরিপূর্ণ বর্দ্ধমান, ভস্মস্তূপে পরিণত হইল। বর্দ্ধমান ধ্বংস করিয়া মারহাট্টাগণ আলিবর্দ্দীকে আক্রমণ করিল। অদম্য সাহসে বীরনবাব তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। প্রতিদিনই বহু খণ্ডযুদ্ধ হইতে লাগিল। নিশাগমে উভয় পক্ষই স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। কিছুতেই মারহাট্টাগণ অলিবর্দ্দীর সেই ক্ষুদ্র সেনার ধ্বংস সাধন করিতে পারিল না! ভাস্কর পণ্ডিত বিস্মিত হইলেন। যে মহারাষ্ট্রীয়গণের বীরদর্পে সমস্ত ভারতভূমি কম্পিত, যাহাদের সম্মুখ হইতে মুসলমানগণ বৃক-তাড়িত মেষদলের ন্যায় পলায়ন করে, স্বল্পসংখ্যক সেনা লইয়া বঙ্গের নবাব তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ প্রতিহত করিতেছেন। তিনি আলিবর্দ্দীর বীরত্বের কথা শুনিয়াছিলেন; তবেত তাহা মিথ্যা নহে! এরূপ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে জয় লাভ সহজসাধ্য নহে। সমগ্র সেনা লইয়া নবাবের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেও সাহস হয় না। যদি পরাজয় হয়, তবে তাঁহার সমগ্র সেনা ধ্বংস হইতে পারে, মান সম্ভ্রম সমস্ত নষ্ট হইতে পারে, বঙ্গজয় তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য নহে। কিছু অর্থ পাইলেই তিনি সন্তুষ্ট। এই রূপ ক্ষেত্রে যুদ্ধ অপেক্ষা সন্ধি করা শ্রেয়ঃ, এই ভাবিয়া তিনি নবাবসমীপে দূত প্রেরণ করিলেন। দূত আলিবর্দ্দীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল, "দেখুন মারহাট্টাগণ আপনার রাজ্যে আসিয়াছেন; তাঁহারা আপনার অতিথি। বহু-দূর আসিয়া তাঁহারা পরিক্লান্ত হইয়াছেন। দশ লক্ষ টাকা দিয়া আপনি ইঁহাদের আতিথ্য করুন। ইঁহারা স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।" কিন্তু এরূপ বিশিষ্ট অতিথির সৎকার করিয়া অক্ষয় ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে আলিবর্দ্দীর প্রবৃত্তি হইল না। বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাব অর্থ দিয়া মান সম্ভ্রম

রক্ষা করিবেন? শৌর্য্য, বীর্য্য, যাঁহার প্রধান সম্পত্তি. তিনি কি অর্থ দিয়া শত্রু জয় করিতেও সম্মত হন? আলিবর্দ্দির বীরহৃদয়ে কাপুরুষোচিত ভাব স্থান পাইল না! তাঁহার চির সহচর, বীরবর, আফগানযোদ্ধা মুস্তাফা খাঁইবা, এ নীচ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন কেন? সমরাঙ্গন যাঁহার ক্রীড়া ক্ষেত্র, নরশোণিত পাতে যাঁহার উৎকট উল্লাস, সেই মুস্তাফা খাঁ কি শান্তির কথায় কর্ণপাত করেন? আলিবর্দ্দী ঘৃণার সহিত ভাস্করের সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। সদর্পে ভাস্করকে বলিয়া পাঠাইলেন "সাধ্য থাকে, অগ্রসর হও।"

ভীষণ যুদ্ধ। অভাবনীয় প্রতারণা!! নবাবের এই গর্ব্বিত উত্তরে ভাস্কর পণ্ডিত ক্রুদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। বহু খণ্ড যুদ্ধ হইয়া গেল। এই রূপ ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ করিয়া আলিবর্দ্দীর বিরক্তি বোধ হইল। তিনি স্থির করিলেন, একেবারে তাঁহার সকল সৈন্য লইয়া মারহাট্টাদিগকে আক্রমণ করিবেন। এই সংকল্প করিয়া তিনি আদেশ করিলেন যে, সৈন্যগণ কেবল মাত্র অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যুদ্ধার্থে বহির্গত হইবে। যাবতীয় দ্রব্য শিবিরে রাখিয়া যাইতে হইবে। সৈনিকদিগের সহিত অপর কোন লোক যাইতে পাইবে না। অরুণোদয়ে তিনি অশ্বারোহণ করিয়া সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইতে আদেশ দিলেন। সৈন্যগণ "দীন দীন" রবে দিঙমণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া বীরদর্পে চলিল। তাহারা কিছু দূর অগ্রসর হইলে ভৃত্যবর্গ ও অপর যাবতীয় লোক নবাবের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া মারহাট্টাদিগের ভয়ে ভীত হইয়া সেনা দলে মিশিয়া গেল। ইহারা সৈনিকগণের দ্রুত গমনের সাতিশয় বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিল। এই সকল নিরাস্ত্র যুদ্ধানভিজ্ঞ লোক মিশ্রিত হওয়ায়, সৈন্য দলে ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথা হইতে আসিয়া নবাবের সেনাকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিল। এরূপ ভাবে আক্রান্ত হইয়াও নবাবের সেনা স্থির ভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল। নরশোণিতে ধরাতল রঞ্জিত হইতে লাগিল। মুসাহেব খাঁ নামক নবাবের এক জন সাহসী সেনাপতি নিহত হইলেন। তথাপি নবাবসৈন্য অমিতবিক্রমে শত্রুসংহার করিতে লাগিল। যুদ্ধে নবাবেরই জয় হইবে, এই রূপ সম্ভাবনা হইল। এমন সময় দিবা অবসান হইল। আলিবর্দ্দী দেখিলেন, তাঁহার আফগান সেনাপতিগণ তাঁহার পশ্চাৎ নাই। তবেত শত্রুগণ তাঁহাকে পশ্চাৎ

হইতেই আক্রমণ করিবে। তিনি যে উদ্দেশ্যে শিবির হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্যও ত সিদ্ধ হইল না। সমস্ত দিন যাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলেন, তাহারা বিশাল মহারাষ্ট্রীয় বাহিনীর অংশ মাত্র। মহারাষ্ট্রীয়দিগের শিবির এখনও অনেক দূরে। তিনি যে নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, সে উপায়ও নাই। শিবির যে বহু দূরে ফেলিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সেনাপতিগণের বিশ্বাসঘাতকতায় বুঝি তাঁহাকে সসৈন্যে ধ্বংস হইতে হইল। আলিবর্দ্দি এহ সকল নিমিষের মধ্যে চিন্তা করিয়া লইলেন। এ হেন বিপদেও তিনি চিত্তের স্বাভাবিক ধৈর্য্য ও হৃদয়ের বল হারাইলেন না। তিনি স্থির করিলেন, রণক্ষেত্রে নিশাযাপন করিবেন।

রজনীতে আলিবর্দ্দি যে স্থানে অবস্থান করিবেন, স্থির করিলেন, সেই স্থান বর্দ্ধমান হইতে ৬।৭ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। পূর্ব্বে বৃষ্টি হওয়ায় সে স্থান কর্দ্দমিত হইয়াছে। দাঁড়াইবার একটু স্থান নাই। কেমন করিয়া সেই কদর্য্য স্থানে রাত্রি অতিবাহিত করিবেন? নিকটে ৩।৪ খান পাল্কী ও একটা ক্ষুদ্র তাম্বু ভিন্ন আর কিছুই নাই। একটু অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমিতে সেই তাম্বু স্থাপিত হইল। বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নবাব সেই ক্ষুদ্র তাম্বুতে পাল্কীর উপর শয়ন করিতে বাধ্য হইলেন। অপর সৈনিকগণ সেই কর্দ্দমের উপর বসিয়া থাকিল। মুস্তাফা খাঁ প্রভৃতি আফগান সেনানীগণ স্ব স্ব সেনাসহ রণক্ষেত্র হইতে বহু দূরে অবস্থান করিতেছে। তাঁহারা আলিবর্দ্দির কিছু মাত্র সাহায্য করিতেছেন। তাঁহার এই ক্ষুদ্র সেনার অর্দ্ধেক আফগান সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত, সুতরাং অর্দ্ধেক সৈন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। সুযোগ বুঝিয়া পর দিবস প্রভাতে মারহাট্টাগণ চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তাঁহার শিবিরে যাহা কিছু ধনরত্ন, দ্রব্যসম্ভার ছিল, মারহাট্টারা তাহা লুণ্ঠন করিল। শিবিররক্ষকগণের অধিকাংসই হত বা আহত হইল। অবশিষ্টেরা পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। চতুর্দ্দিক হইতে দুৰ্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয়গণকর্ত্তৃক ভীষণভাবে আক্রান্ত হইলেও, আলিবর্দ্দী অমিতপরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দণ্ডে দণ্ডে তাঁহার বলক্ষয় হইতে লাগিল। তথাপি তিনি সপ্তরথি-বেষ্টিত বীর অভিমন্যুর ন্যায়, আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনাহারে, অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া তিনি আর কতক্ষণ যুদ্ধ করিবেন? বুঝি বা এইবার তাঁহাকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হয়। বুঝি বা বঙ্গের রাজমুকুট,

মারহাট্টাগণ তাঁহার মস্তক হইতে কাড়িয়া লয়! বুঝিবা আজ সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে যবনের সৌভাগ্য-সূর্য্যও চিরদিনের তরে অস্ত যায়! বুঝিবা আজ সরফরাজ খাঁর বধের প্রায়শ্চিত্ত হয়!

কিন্তু তাহা হইল না। আলিবর্দ্দীর দুঃখ দেখিতে না পারিয়া, তপনদেব অদৃশ্য হইলেন। মারহাট্টাগণও সংগ্রাম হইতে বিরত হইল। অদৃষ্টবলেই হউক, বা মারহাট্টাগণের অক্ষমতাতেই হউক, আলিবর্দ্দী সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দুর্গতির অবধি রহিল না। আহত ও মুমূর্ষুগণের গভীর হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে, নবাবের শিবির নারকীয় দৃশ্য ধারণ করিল। কিন্তু অনন্যোপায় হইয়া নবাবকে সে রাত্রি সেই স্থানেই অতিবাহিত করিতে হইল।

পৌরাণিক চিত্র।

কৌশিক ব্রাহ্মণ।

(৪)

মহর্ষি বেদব্যাস কৌশিক ব্রাহ্মণের উপাখ্যানচ্ছলে, আমাদিগকে যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, এই ধর্ম্মবিভ্রাটের দিনে, তাহা আমাদের অশেষ কল্যাণসাধন করিবে, সন্দেহ নাই। এই উপাখ্যানে মহর্ষি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন, "মানব, সাবধান! ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বরে ভুলিও না। সুদীর্ঘ শিখা ও তিলক ধারণ করিলেই কেহ ব্রাহ্মণ হয় না; বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি শাস্ত্র সকলের পারদর্শী হইলেও মানব ধার্ম্মিক হয় না। প্রাতঃস্নান, ত্রিসন্ধ্যা, ও যাগাদির দ্বারা উৎকট ক্ষমতা পাইলেও মানবের ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ হয় না। তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য কতকগুলি কর্ম্ম আছে। প্রকৃত ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে হইলে তোমাকে সর্ব্বাগ্রে সেইগুলি করিতে হইবে। নচেৎ বর্ণজ্ঞানশূন্য বালকের বেদ পাঠের চেষ্টার ন্যায় তোমার ধার্ম্মিক হইবার চেষ্টাও বিফল হইবে।"

পুরাকালে কৌশিক নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ধার্ম্মিক হইতে হইলে যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা তাঁহার সকলই ছিল। তিনি সদ্ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বেদাদি শাস্ত্র তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়াছিল। তপস্যা

দ্বারা তাঁহার ব্রহ্মতেজঃও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি মনে করিতেন, তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক কেহই নাই; তিনি সর্ব্বত্রই পূজা পাইবার অধিকারী। তিনি জানিতেন না যে, পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্ম এক নহে। তাঁহার বোধ ছিল না যে, লোকে পণ্ডিত অপেক্ষা ধার্ম্মিকেরই অধিকতর সম্মান করিয়া থাকে। একদিন কৌশিক বৃক্ষমূলে বসিয়া বেদোচ্চারণ করিতেছিলেন, এমন সময়, এক বকী বৃক্ষশাখা হইতে তাঁহার উপর পুরীষ ত্যাগ করিল। বেদজ্ঞ তপস্বীর ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইল। পক্ষী যে নিজ কর্ম্মের জন্য দায়ী নহে, কর্ম্মের শুভাশুভ বিচার করিবার যে তাহার শক্তি নাই, তিনি যে মহাতেজস্বী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তাহা জানিবার যে তাহার কোন সামর্থ্য নাই—তপোধনের তপোমার্জ্জিত বুদ্ধি তাহা তাঁহাকে বলিয়া দিল না। তিনি শাস্ত্র পাঠই করিয়াছিলেন—তাঁহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয় নাই। তিনি তপঃপ্রভাবে অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু রিপু দমন করিতে পারেন নাই। সেই জন্য রোষকষায়িত লোচনে তিনি বকীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বকী বিগতপ্রাণা হইয়া পতিত হইল।

কিন্তু মানুষ যতই দুর্ব্বৃত্ত হউক না কেন, ভগবৎকৃপা হইলে, তাহার জীবনে এমন এক শুভ মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন তাহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। জগতের বহু মহাপুরুষের জীবনে, অতি ক্ষুদ্র ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই শুভক্ষণ আসিয়া থাকে। নিষাদশরবিদ্ধ ক্রৌঞ্চ-মিথুন দর্শনে বাল্মীকি, কবি হইয়াছিলেন। কাহারও যথেচ্ছাচারিত দুইটি কথা শুনিয়া লালাবাবু, বৈরাগী হইয়াছিলেন। আর এই বকীকে স্বীয় কোপে নিহতা দেখিয়া ব্রাহ্মণের হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। এই অনুতাপই তাঁহার মঙ্গলের কারণ হইল। ধীরে ধীরে এই অনুতাপানল তাঁহার নিকৃষ্ট বৃত্তি নিচয়কে ভস্ম করিতে আরম্ভ করিল। স্বীয় অকার্য্যে ক্ষুণ্ণ হইয়া ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থ গ্রামাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় কোন গৃহস্থ ভবনে "ভিক্ষা দাও" বলিয়া প্রবেশ করিলেন। গৃহস্বামিনী ভিক্ষা আনয়নের জন্য গমন করিলেন। এমন সময় তাঁহার স্বামী ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সহসা গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি অতিথি ব্রাহ্মণের কথা ভুলিয়া গিয়া স্বামিপরিচর্য্যায় নিযুক্তা হইলেন।

এস্থলে এই রমণীর সম্বন্ধে কিছু কথা বলা আবশ্যক। তিনি সাতিশয় পতিব্রতা ছিলেন। তিনি পতিকে দেবতা বলিয়া মানিতেন; পতির প্রতি

তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণ আসক্ত ছিল। অন্য কোন চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পাইত না। তিনি সদাচারিণী, শুচি ও কর্ম্মকুশলা ছিলেন। তিনি দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের নিয়মমত শুশ্রূষা করিতেন। তবে এই সমুদয় কার্য্যই স্বামীর প্রীতির জন্য করিতেন। অন্য কোন ব্রত তাঁহার ছিল না। গম্ভীর ভাবে মহর্ষি বেদব্যাস বলিতেছেন :—

যাতু ভর্ত্তরি শুশ্রূষা তয়া স্বর্গে জয়ত্যুত।

স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে কোন যজ্ঞক্রিয়া, শ্রাদ্ধ, কি উপবাস কিছুই কিছু নহে, পতির প্রতি যে শুশ্রূষা তদ্বারাই তাহারা স্বর্গজয় করে।

অর্থাৎ স্বধর্ম্মে নিরত হও, আর তোমাকে কিছু করিতে হইবে না। তোমার ইহকালে ও পরকালে উভয়ত্রই শ্রেয়ঃ হইবে। এই সাধ্বী রমণী পতিসেবারূপ ধর্ম্মপালন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

পতির শুশ্রূষা করিতে করিতে তাঁহার ব্রাহ্মণের কথা স্মরণ হইল। তিনি ভিক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণ ক্রোধে জ্বলিতেছেন। ব্রাহ্মণ রোষপরবশ হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলেন। তিনি যে মহাতেজস্বী, ইচ্ছা করিলে তিনি যে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে পারেন, এরূপ ভয় প্রদর্শন করিতেও ত্রুটী করিলেন না। কিন্তু যাহার হৃদয় বিশুদ্ধ, যে জানে সে কোন অন্যায় কার্য্য করে নাই, তাহার কাহাকেও ভয় করিবার কারণ নাই! যিনি যতই বীর্য্যসম্পন্ন হউন না কেন, এরূপ লোকের কেশ স্পর্শ করিতে পারে, এমন সাধ্য কাহারও নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণকে অতি ক্রুদ্ধ দেখিয়াও সেই বিশুদ্ধ-হৃদয়া রমণী কিছুমাত্র ভীতা হইলেন না। নির্ভীকভাবে তিনি উত্তর করিলেন "মহাশয় আমি বকী নহি, যে আপনি আমাকে দৃষ্টিমাত্রেই বিনষ্ট করিবেন। আপনি আমার কোন অপকার করিতে সমর্থ নহেন।" তাহার পর রমণী বলিলেন যে, পতিসেবাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য; তজ্জন্য অতিথি ব্রাহ্মণকে উপেক্ষা করিলেও তাঁহার অধর্ম্ম হয় নাই। পতিসেবারূপ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আচরণ করিয়াই তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, ব্রাহ্মণ যে বকী-বধ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা তাঁহার অবিদিত নাই।

রমণী আরও বলিলেন যে, প্রকৃত ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদা করিবার সাধ্য কাহারও নাই। তিনি ব্রাহ্মণের অমিত তেজের কথা জানেন। কিন্তু সেই অতিথি ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিলেও যথার্থ ব্রাহ্মণ নহেন। তাহার

পর সেই পতিব্রতা রমণী মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মাচার্য্যের ন্যায় প্রকৃত ব্রাহ্মণের লক্ষণ সকল কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ

সমালোচনা।

১। উষা—শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। উষা এক খানি কবিতা পুস্তক। রূপে ও গুণে পাঠকের চিত্ত হরণ করিবে, বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। রবির কিরণ অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় চন্দ্র যেরূপ উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ হয়, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সম্পাতে প্রিয়নাথের প্রতিভাও তদ্রূপ হইয়া 'উষায়' প্রকাশিত হইয়াছে! 'উষার' সৌন্দর্য্য দেখিয়া আশা হয়, অচিরে প্রিয়নাথের প্রতিভা বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সুবিমল কিরণজাল বিস্তার করিবে।

২। নরোত্তমের আশ্রয় নির্ণয়—শ্রীবনওয়ারি লাল গোস্বামী প্রণীত। মূল্য ।০ চারি আনা। সাধু নরোত্তম ঠাকুর বৈষ্ণবগণের উপাসনার যে ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সরল ভাষায় তাহাই কথিত হইয়াছে। আধুনিক 'বৈরাগীর' দল যেরূপ অধর্ম্মপথে বিচরণ করিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়কে কলুষিত করিতেছে, এই গ্রন্থ হইতে তাহারই সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। সাধনার প্রকৃত পথ দেখিতে পাইয়া অনেকের হৃদয় প্রফুল্ল হইবে। বৈষ্ণবগণের এ পুস্তক পাঠ করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

৩। ঐতিহাসিক চিত্র—৯১০ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীনিখিলনাথ রায় বি, এল সম্পাদিত। কার্ত্তিক, ১৩১১। এই সংখ্যায় এই কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। ১। সীতারামের ধর্ম্মপ্রাণতা, ২। জগৎশেঠ, ৩। দানসাগর, ৪। রণজিৎসিংহ ও ইংরাজ। প্রতি প্রবন্ধেই সাবধানতা ও চিন্তাশীলতা লক্ষিত হইল। "সীতারামের ধর্ম্মপ্রাণতা" প্রবন্ধে সীতারামের ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা সম্বন্ধে সাধারণের মনে যে ধারণা আছে, তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছে। "জগৎশেঠ" নিখিল বাবুর সুলিখিত প্রবন্ধ। "দান সাগর" প্রবন্ধে বল্লাল সেনের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।

৪। বামাবোধিনী পত্রিকা—কার্ত্তিক, ১৩১১। এই সংখ্যায় কুমারী হেলেন কেল্‌নারের প্রতিকৃতিসহ সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। "অতি শৈশবে যখন তাহার বয়স দেড় বৎসর মাত্র, তখন তাহার উৎকট পীড়া হয়, এবং তাহাতে তিনটি প্রধান ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হয়।" এখন তিনি বেশ লেখা পড়া শিখিয়াছেন। "শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, যে বালিকার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, বাকশক্তি নাই, সেই বালিকা আপনাকে "পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সুখী মানুষ বলিয়া গৌরব করে।" বামাবোধিনীর অপরাপর প্রবন্ধও সুপাঠ্য।

৫। শ্রীবৈষ্ণব সন্দর্ভ—কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ। শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে প্রকাশিত, বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে পরিপূর্ণ। জ্বালা যন্ত্রণাময় সংসারে ভগবৎপ্রসঙ্গ হৃদয়ে শান্তি আনিয়া দেয়।

৬। ধূমকেতু—পৌষ ও মাঘ ১৩১১। নাম শুনিয়াই ভয় হয়। কিন্তু পাঠ করিলে ভয় দূর হয়। "সুবর্ণগ্রামের হিন্দু রাজন্যবর্গ" "ক্লিওপেট্রা ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত" ভাল প্রবন্ধ।

৭। প্রবাহ—মাঘ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। কলিকাতা, ৫নং বিন্দু পালিতের লেন হইতে প্রকাশিত। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের "বৈদিক তত্ত্ব" প্রবন্ধ অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকের আগ্রহ হইলে "বারান্তরে" এই প্রবন্ধ অধিকতর পরিমাণে প্রকাশিত হইবে।" দামোদর বাবুর "নবীনা" উপন্যাস এই সংখ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। বেশ মধুর হইতেছে। "গীতোক্ত ধর্ম্ম" সুলিখিত প্রবন্ধ। "দুঃখীর জীবন" গল্পটী সুমিষ্ট হইলেও, ইহা লিখিবার হেতু বুঝিলাম না। যাহা হউক, প্রবাহ পাঠ করিয়া আমরা অতীব সুখী হইয়াছি।

৮। অর্চ্চনা—২৯ নং পার্ব্বতিচরণ ঘোষের লেন হইতে প্রকাশিত পৌষ, ১৩১১।

"কর্ম্মফল ও গ্রহের ফের" অভিজ্ঞের লেখনীপ্রসূত নহে। 'মাধুরী' উপন্যাসের সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলাম না, কেননা প্রথম হইতে দেখি নাই। বাঙ্গালার প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার উপাদেয় প্রবন্ধ। আরত সব কবিতা। ভাল মন্দ দুই আছে।

কলিকাতা, ৩০/৫ মদনমিত্রের লেন, নব্যভারত-প্রেসে,
শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত। ১৩১১ সাল।

১।

বীরভূম

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

১ম খণ্ড] বৈশাখ, ১৩১২ [৪র্থ সংখ্যা।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ,

সম্পাদিত।

সূচী।

কীর্ণহারের সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশহিতৈষী জমিদার শ্রীযুক্ত
বাবু সৌরেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের সম্পূর্ণ
ব্যয়ে বীরভূম জেলার অন্তর্গত
কীর্ণহার গ্রাম হইতে
শ্রীদেবিদাস ভট্টাচর্য্য বি, এ,
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ১॥০। এই সংখ্যার মূল্য ৵১০।

বটকৃষ্ণ পালের

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জররোগের একমাত্র

মহৌষধ।

অদ্যাবধি সর্ব্ববিধ জ্বর-রোগে

এমত আশু-শান্তিকারক মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য—বড় বোতল ১৷, প্যাকিং ও ডাকমাশুল ১৲ টাকা।

ছোট বোতল ৸৹ আনা, ঐ ঐ ৸৶ আনা।

রেলওয়ে কিম্বা ষ্টীমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভ হয়।

এডওয়ার্ডস্

লিভার এণ্ড স্প্লীন অয়েণ্টমেণ্ট

অর্থাৎ প্লীহা ও যকৃতের অব্যর্থ মলম।

প্লীহা ও যকৃৎ নির্দ্দোষে আরাম করিতে হইলে আমাদিগের "এড-ওয়ার্ডস্ টনিক বা য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়্যাল্ স্পেসিফিক্" সেবনের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত পেটের উপর প্রাতে ও বৈকালে মালিশ করা আবশ্যক। যতই বর্দ্ধিতায়তনের প্লীহা, যকৃৎ বা অগ্রমাস হউক না কেন, ইহা নিয়মি-রূপে মাসেককাল মালিশ করিলে, এক-বারেই কমিয়া যাইবে। এই মলম মর্দ্দন দ্বারা আশু ফল পাইবেন।

মূল্য প্রতি কৌটা ।৵৹ ছয় আনা। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র লাগে।

পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সোল্ এজেন্টস্;—বটকৃষ্ট পাল এণ্ড কোং

৫ম খণ্ড]　　বৈশাখ, ১৩১২ ।　　[৫ম সংখ্যা

চণ্ডীদাসের নবাবিষ্কৃত পদ ।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের উদ্যোগ দেখিয়া যশোদার বিলাপ ।

তুরিরাগ ।

কোথারে সাজিয়েছ ।
কাহার জনম　　সফল করিতে
এ বেশ বনায়েছ ॥
চাঁদ মুখ চেয়ে　　যশোদা জননী
পড়ে মূরছিত হয়ে ।
কেমনে বাঁচিব,　　তিলেক না জীব
দেখহ বেকত হয়ে ॥
কিসের কারণে　　এ ঘর করণে
আ[illegible] ভেজায়ে দিয়া ।
তোমার [illegible]হনে　　মরিব সঘনে
যাব সে বাহির হয়া ॥
কেবল নয়ান　　তারার পুতলি
তোমা না দেখিলে মরি ।
যখন দেখিয়ে　　ও চাঁদ বদন
তবে সে চেতন ধরি ॥

যবে যাহ গোঠে ধেনুগণ লয়ে
সেখানে থাকয়ে প্রাণ।
যবে সে শুনিয়ে কুশল বারতা
শুনিয়ে বেণুর গান॥
অনেক তপের ফল পরশনে
পাইসে তোমা সে ধনে।
বিহি নিকরুণ এবে সে আনল,
দীন চণ্ডীদাস ভনে॥

শ্রীরাগ।

আর কি পরাণে জীব।
তোমা ধন ছারি কেমনে বঞ্চিব
এখনি পরাণ দিব॥
যশোদা রোহিণী চাঁদ মুখ চেয়ে
কাঁদয়ে করুণ স্বরে।
হিয়া আনচান কি যেন করিছে
পরাণ কেমন করে॥
মায়ের পরাণ ধৈরয না রহে
বিষম বেদনা পায়ে।
অচেতন তনু পড়িয়া ভূতলে
হলধর পানে চায়ে॥
আর সে কাহারে আনিয়া নবনী
সে চাঁদ বয়ানে দিব।
ঘনে ঘনে মুখ দূরে যাবে দুখ
এ শোকে কেমনে জীব॥
শুন নন্দঘোষ আমার বচন
গোপাল বিদায় দিয়া।
এঘর দুয়ারে আনল ভেজায়ে
যাব সে বাহির হয়া॥
আঁখি গেলে তারা কিছার জীবনে
বাঁচিতে কি আর সাধ।

অনেক তপের ফল পরশনে
বিহি সে করল বাদ॥
* * *
চণ্ডীদাস কহে শুনগো জননা,
এই সে ভালই মানি॥

রণক্ষেত্রে বাঙ্গালী।

(২)

পাঠক! মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত বাঙ্গালী সৈন্যের অস্ত্রক্রীড়া দেখিয়াছেন, এখন মুসলমান সৈন্যের সহিত অস্ত্র বিনিময় দেখুন। আমরা শেষ সংঘর্ষণেরই এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। মল্লাব্দ ১০৬০. খ্রীঃ—১৭৫৪ কি ১৭৫৫। মহারাজ চৈতন্যসিংহ মল্লভূমির সিংহাসনে—কিন্তু রাজকার্য্যে উদাসীন—ধর্ম্ম-চর্চ্চায় এবং দেবসেবায় সতত মগ্ন। মন্ত্রী কমল বিশ্বাসের উপর রাজ্যশাসন ভার অর্পিত। গর্ব্বিত মন্ত্রী "ছত্রপতি" এই গর্ব্বিত উপাধিতে ভূষিত হইয়া—শাসন সম্বন্ধে একান্ত স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার অত্যাচার এবং অসদ্ব্যবহারে প্রজাগণ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, মহারাজার খুল্লতাত-পুত্র দামোদর সিংহ মন্ত্রীর দুর্ব্বিনীত ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া রাজ্যপরিত্যাগ করিলেন এবং কিছুকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া মুর্শিদাবাদের নবাবের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা, তখন বঙ্গের "মুসলমান মসনন্দ" অধিকার করিয়াছেন, পূর্ণিয়া-অভিযানের উদ্যোগ হইতেছে, "হীরাঝিলে" দামোদর সিংহ নবাবের সাক্ষাৎ পাইলেন এবং সাদরে গৃহীত হইলেন। দামোদর সিংহ তেজস্বী সাহসী বীরপুরুষ ছিলেন—তিনি পূর্ণিয়া যাত্রী যোদ্ধৃগণের অনুগামী হইলেন এবং যুদ্ধে অতুল বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া নবাবের প্রসন্ন দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। নবাব পূর্ণিয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া দামোদর সিংহকে রাজসম্মানে সম্মানিত করিলেন এবং বহুতর সৈন্যসহ বিষ্ণুপুরে প্রেরণ করিলেন। "পতিতপাবন" নামক মল্লভূমির কোন কবি এই ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন।—

শুভক্ষণে নবাবের সঙ্গে দরশন।
পূবণ্যার গড়ে গেল করিবারে রণ॥

দলবল আসি যত নবাবে ঘেরিল।
দামোদর বাবু তার লস্কর কাটিল ॥
সেই হ'তে নবাবের বড় প্রিয় হল্য।
বিরণের সঙ্গে পাগ বর্দ্ধন করিল ॥
নবাবের দয়া বড় হল্য বাবু প্রতি।
তেনাথে করিয়া দিল নিজ সেনাপতি ॥
ইন্দ্রজিত পরসহীএ ডাকি বিদ্যমান।
দামোদরে সঁপ্যা দিল হা[illegible] পান ॥
সিতাব খাঁ বাসন্তী সা[illegible] [illegible]রপর।
সোফর খাঁ সাজিল সঙ্গে রাধা দামোদর
নবাবের কাছে তবে বিদায় হইয়া।
যাত্রা করিল বাবু লস্কর সাজায়্যা ॥

যাহা হউক, ভীমবিক্রান্ত যবনসৈন্য সঙ্গে লইয়া দামোদর সিংহ ও তদনু[illegible] যুগলকিশোর সিংহ মল্লভূমির রাজ সিংহাসন অধিকার করিতে যাত্রা করিলেন এ সংবাদ বিষ্ণুপুরে পৌঁছিল। ছত্রপতি কমল নিশ্চিন্ত রহিলেন না, তি[illegible] বিংশ সহস্র সৈন্যসহ সেনাপতি যুগল বিশ্বাসকে মুসলমান সৈন্যের গতিরো[illegible] করিতে পাঠাইলেন। মল্লভূমির উত্তরসীমান্তবর্ত্তী দামোদর নদের তী[illegible] সেনাপতি যুগল বিশ্বাস সৈন্য সুবিন্যস্ত করিয়া মুসলমান সৈন্যের অপেক্ষ[illegible] করিতে লাগিলেন। সানঘাটগোলার সন্নিকটে দামোদরের উভয় তী[illegible] যুযুৎসু শক্তিযুগল পরস্পর সম্মুখীন হইল। মধ্যে দামোদরের নিদাঘবিশু[illegible] ক্ষীণ স্রোত প্রবাহিত। উভয় পক্ষে ভীম বিক্রমে যুদ্ধ সমারব্ধ হইল দামোদরের বালুকারাশি এবং প্রবাহ রক্তরঞ্জিত হইল—তথাপি যুদ্ধের বিরা[illegible] নাই, প্রভাত হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত অস্ত্রের আঘাত প্রতিঘাত অবিশ্রা[illegible] তেজে চলিতে লাগিল—তথাপি কোন পক্ষ নিবৃত্ত হইল না। অবশে[illegible] বিজয়লক্ষ্মী মল্লভূমি সেনাপতির এবং সৈন্যের বীরত্বে আকৃষ্ট হইয়া তৎপক্ষে[illegible] জয়মাল্য অর্পণ করিলেন। সন্ধ্যা সমাগত প্রায়—এমন সময় মুসলমা[illegible] সৈন্য রণে ভঙ্গ দিল। বিষ্ণুপুরের বাঙ্গালী সৈন্য বিজয়োল্লাসে তাহাদে[illegible] অনুসরণ করিয়া বহুসৈন্যের প্রাণনাশ করিল। ক্রমে নৈশ অন্ধকা[illegible] গভীর হইয়া আসিল, রণক্লান্ত সৈন্যগণ অনুসরণ নিষ্ফল বুঝিয়া শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই যুদ্ধের শেষে দামোদর সিংহের ভ্রাত

যুগলকিশোর সিংহ বন্দী হইলেন। তিনি বরষার তিনটি আঘাত পাইয়াছিলেন। দামোদর সিংহ পরাজিত হইয়া মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন। দামোদর সিংহ যখন হতাবশিষ্ট মুসলমান সৈন্য লইয়া মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলেন, তখন বঙ্গের রাজনৈতিক গগনে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে—সে গগনের প্রধান গ্রহ তখন কেন্দ্রভ্রষ্ট, অস্তমিত-গৌরব, পতিত, ভূম্যবলুণ্ঠিত—তাহার স্থানে নূতনগ্রহ অভ্যুত্থিত। পলাশীর শোণিতরঞ্জিত সমরপ্রাঙ্গণে সৌভাগ্য-লক্ষ্মী পূর্ব্ব নবাব সিরাজের প্রতি বিমুখ হইয়াছিলেন। পরাজিত, বন্দীভূত সিরাজ জঘন্য ঘাতকের ঘৃণিত নিষ্ঠুর আঘাতে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। মির্জ্জাফর স্বীয় নারকীয় অকৃতজ্ঞতার পুরস্কার স্বরূপ বঙ্গের সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। তদীয় পুত্র মিরণ এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গের নবাব। মিরণের নিকট দামোদর সিংহ উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বাপর সকল বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে অধিক সৈন্য ও সাহায্য লাভ করিয়া পুনর্ব্বার স্বীয় অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিত পরসাহী, মিছির খাঁ বসন্তী প্রভৃতি সেনাপতিগণের উপর প্রধান সেনাপতি মিরমুগুন আলি (মুস্তান আলি?) দামোদর সিংহের সহিত বিষ্ণুপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দামোদর সিংহ এবার যুদ্ধ যাত্রার সংবাদ যতদূর পারিলেন গোপন রাখিলেন। এ দিকে প্রজাগণ, অসন্তুষ্ট, এমন কি বিদ্রোহী হইবার উপক্রম করিতেছিল। দামোদর সিংহ সসৈন্যে মল্লভূমির সীমায় প্রবেশ করিলেন, কিন্তু রাজধানীতে তাহার সংবাদ পৌঁছিল না। তিনি যখন বিষ্ণুপুর হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে জামকুণ্ডীতে উপস্থিত হইলেন, তখন ছত্রপতির কর্ণে দামোদর সিংহের দ্বিতীয় অভিযানের কথা উঠিল। ছত্রপতি তৎপর হইয়া—প্রধান সেনাপতি যুগল বিশ্বাসকে উপস্থিত সৈন্য সহ শত্রুর গতিরোধ করিতে পাঠাইলেন, সর্দ্দার দোলগোবিন্দ ও তিলকচান্দ সহকারী সেনাপতি পদে বৃত হইলেন। তখন দুর্গরক্ষক ও শান্তিরক্ষক সৈন্য সমূহই সর্ব্বদা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিত, বৃত্তিভোগী সৈন্যগণকে যুদ্ধের পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া সমবেত করিতে হইত। যে সকল সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল, তাহাদিগকে লইয়াই যুগল বিশ্বাস যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কবি পতিতপাবন দামোদর সিংহের পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি এই যুদ্ধযাত্রা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন।

রাজা বলেন শুন যুগল বচন আমার।
জামকুণ্ডী গড়ে যাহ হইয়া সর্দ্দার॥

যাত্রা করিল যুগল রাজ আজ্ঞা মানি।
যাত্রাকালে হৈল তার সম্মুখে যোগিনী ॥
যাত্রাকালে ভাবিল বিষাদ মনে ধন্ধ।
পতিত পাবন বলে যাত্রা হল মন্দ ॥
একাকার লস্কর সব বক্সি মেলায়।
ছতরপতি দাস সভায় দিচ্ছেন বিদায় ॥
ছতরপতি দাস বলে আগে চল ভাই।
বাকী সরঞ্জাম আমি পশ্চাৎ পাঠাই ॥
হাঁসা ঘোড়া খাসা জোড়া দিয়া কেহ গায়।
হানাদিতে জামকুণ্ডী হইল বিদায় ॥
হাজামত করি ঘরে করিল সাজন।
বির্ম্মরিষ হইয়া চলে যুগল চরণ ॥
দুই প্রহর বেলা যখন গগন মণ্ডলে।
একাকার হইয়া লস্কর সব চলে ॥
ভারে ২ চলে কত বারুদ গুলী তীর।
দলুরায় চলিলেন আর তিলক বীর ॥
চোকীদার হঞা দল চলে একাকার।
চলিল তিলকরায় দলু সরদার ॥

বিষ্ণুপুর হইতে তিন ক্রোশ দূরে হাসিপুকুর দুর্গের সন্নিকটে আবার উভয় সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইল। যুগল বিশ্বাস আরও সৈন্যের অপেক্ষা না করিয়া প্রচণ্ড বিক্রমে মুসলমান সৈন্য আক্রমণ করিলেন। বহুক্ষণ ভীষণ তেজে সংগ্রাম চলিল। বিষ্ণুপুরের বাঙ্গালী সৈন্য নির্ভীক সাহসে শত্রুসংহার করিতে লাগিল। কিন্তু বীর যুগল বিশ্বাস পরাক্রান্ত শত্রুকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন, তিনি শত্রুর বল না দেখিয়া শত্রুর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার সৈন্য অপেক্ষা শত্রু সংখ্যায় অনেক অধিক—যুদ্ধে যতই সৈন্য ক্ষয় হইতেছে, ততই তাঁহার শক্তি হ্রাস হইতেছে, জয় লাভের আশা সুদূরপরাহত। তিনি "হাসিপুকুর" দুর্গে আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু সম্মুখ সমরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে তাঁহার বীর হৃদয় সতত পরাঙ্মুখ। তিনি দেখিলেন—যুদ্ধের গতি শত্রুর অনুকূলে ফিরিয়াছে—আবার এই গতি স্বপক্ষে ফিরাইবার জন্য তিনি

প্রাণান্তপণে ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন—নৈরাশ্যের ভীষণ সাহসে হৃদয় বাঁধিয়া তিনি অসম্ভব, সম্ভব করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি মুসলমান সৈন্যের কেন্দ্রস্থল লক্ষ্য করিয়া অদম্য তেজে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণও তাঁহার সাহস এবং দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত ও উন্মাদিত হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিল—সেনাপতি উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতেছেন ও সৈন্যগণ সেনাপতিকে রক্ষা করিতে জ্ঞানশূন্য হইয়া শত্রুর উপর আপতিত হইতেছে। ভীষণ সাংঘাতিক লোকক্ষয়কর দারুণ সংগ্রাম অনেকক্ষণ চলিল, অবশেষে যুগল বিশ্বাস অস্ত্রাঘাতে অবসন্ন হইয়া অনন্ত বিশ্রামের জন্য বীরের ন্যায় সমরশয্যায় শয়ন করিলেন। যুগল বিশ্বাস বাঙ্গালী এবং জাতিতে কায়স্থ, মল্লভূমির শেষ বীর সেনাপতি, তিনি সংগ্রামে নিহত হইলেন—কিন্তু তাঁহার বীর নামে কলঙ্কের ছায়ামাত্র স্পর্শ করিল না। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুদ্ধে যেরূপ বিজয়গৌরবে মণ্ডিত হইয়াছিলেন, এ ক্ষেত্রে পরাজয়েও সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ ও অম্লান রহিল। ইঁহার পরাজয়ে শত্রুর জয় হইল—অথবা ঘটনা ও অবস্থা-চক্রের জয় হইল। ঘটনা ও অবস্থা চক্রে পড়িয়া চিরবিজয়ী যুগল পরাজিত হইলেন এবং পরাজিত হইয়াও পশ্চাতে গৌরবোজ্জল বীর নাম রাখিয়া গেলেন। তিনি পরাজিত হইয়াও যেন পরাজিত হইলেন না—জীবিত যুগল জীবনে পরাভব কিরূপ কখন দেখিলেন না, তিনি বিজয়ী বীরের মত অজেয় হৃদয়ের বলে সকল বাধা বিঘ্ন বৈষম্য পদদলিত করিয়া যেন কি এক ঘোর অদম্য নিদ্রায় অলস ও অভিভূত হইয়া পড়িলেন। শত্রুর হর্ষোল্লাস তাঁহাকে শুনিতে হইল না, পরাজয়ের বেদনা তাঁহাকে সহিতে হইল না—স্বীয় ~~বীর~~ সৈন্যগণের ছত্রভঙ্গ তাঁহাকে দেখিতে হইল না—তিনি প্রভুর জন্য কর্ত্তব্যের মহাযজ্ঞে আত্মপ্রাণ বলিদান করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি ~~ও অমর সম্মান~~ লাভ করিলেন। যুগল পরিচালিত মল্লভূমি-সৈন্য পূর্ব্ব যুদ্ধে যেরূপ সাহস, তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা প্রদর্শন করিয়াছিল, এ যুদ্ধে তাহারা তদপেক্ষা বীর্য্য ও পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, শত্রুর সংখ্যাধিক্যে তাহারা পরাজিত হইল। ~~কিন্তু~~ তাহারা শত্রুর যেরূপ ক্ষতি সাধন করিয়াছিল, তাহাতে শত্রুগণ আর দ্বিতীয় আক্রমণ সহ্য করিতে পারিত কি না সন্দেহ। তাহাদের বিজয়ের অভ্যন্তরে পরাজয়ের অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছিল। কিন্তু ভবিতব্যতার বিধান অন্যরূপ ছিল। তাহাদিগকে দ্বিতীয় আক্রমণ সহ্য করিতে হয় নাই। ভ্রাতৃ-বিরোধের ভীষণ

সন্তাপ ভারতীয় রাজলক্ষ্মী কখনও সহ্য করিতে পারেন নাই, ভারতীয় ইতিহাসে ইহাই চিরজাগ্রত সত্য, এ ক্ষেত্রে তাহার অন্যথা হইল না—মল্লভূমির রাজলক্ষ্মী সেই দিন হইতেই চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

মল্লভূমি যখন স্বাধীনতার ~~বিলাস~~ নিকেতন ছিল, তখন যে সমরবীর্য্যের অগ্নিশিখা এখানে ক্রীড়া করিত, ইহা কিছু বিচিত্র নহে, কারণ এইরূপ অগ্নিশিখার পরিখা মধ্যেই স্বাধীনতার সুরক্ষিত বিলাস ভবন। যে দিন যে দেশে এই বীর্য্যবহ্নি হীনশক্তি হইয়াছে, সেই দিন সেই দেশে স্বাধীনতার লীলা বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহাই জগতের ইতিহাস প্রচার করিতেছে। যেমন মল্লভূমির সামরিক বীর্য্য নিস্তেজ হইয়া পড়িল, অমনি মল্লভূমির সকল শক্তি পরাধীনতার কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। মল্লভূমির স্বাধীন রাজা সামান্য জমিদারে পরিণত হইলেন। রাজ-শাসন-সংক্রান্ত সকল বিধি ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইল। রাজস্ব প্রদানের উপর তাঁহার অস্তিত্ব বা স্থিতি নির্ভর করিতেছিল। এইরূপ বিপ্লবের সময় দেশে অরাজকতা বা দস্যুতার প্রভাব বৃদ্ধি হইয়া থাকে, বীরভূমিও মল্লভূমিতে তাহাই হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরের মহারাজা রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হওয়ায় বন্দী হইয়াছিলেন। হেসেলরিজ সাহেবের হস্তে তাঁহার জমিদারীর তত্ত্বাবধান ন্যস্ত হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষে দেশ ধনশূন্য হইয়াছিল। প্রজাগণের নিকট কর আদায়ের জন্য পীড়নও হইতেছিল। এই সময়ে মল্লভূমির নির্ব্বাপিতপ্রায় সামরিক বীর্য্য-বহ্নি নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। প্রজাগণ দস্যুগণের সহিত মিলিত হইয়া রাজশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক হাণ্টার সাহেব বলিয়াছেন, অপেক্ষাকৃত শান্তির সময়ে এইরূপ অভ্যুত্থান ঘটিলে ইহা বিদ্রোহ নামে কথিত হইবার যোগ্য হইত। *

বিদ্রোহিগণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া প্রকাশ্য দিবালোকে, ব্রিটিশ সৈন্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সমৃদ্ধিশালী নগরাদি লুণ্ঠন করিতে লাগিল—অনেক সময়ে ব্রিটিশ সৈন্যের সহিত সংঘর্ষণেও পশ্চাৎপদ হইল না। কিটিং(Keating) সাহেব তখন বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর। তখন শান্তি রক্ষার জন্য মাজিষ্ট্রেটের অধীনে সিপাহী সৈন্য থাকিত। কিটিং সাহেবের নিকট

* The disorders in Bissenpur would, in any less troubled time, have been called a rebellion. Page 18, Annals of Rural Bengal)

যে সৈন্য ছিল, তদ্দ্বারা এরূপ দস্যুতার কোন প্রতিবিধান অসম্ভব। আরও এক দল সৈন্য সত্বর প্রেরিত হইল এবং আট দিন পরে আরো সৈন্য প্রেরিত হইল, কিন্তু শেষোক্ত সৈন্যদল কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার পুর্ব্বেই বিদ্রোহী দস্যুদল অজয় নদী তীরবর্ত্তী ইলামবাজারনামক এক নগর লুণ্ঠন করিয়া লইল। বিষ্ণুপুর দুর্গই বিদ্রোহিদলের প্রধান আশ্রয় স্থান হইয়াছিল। তাহারা এই স্থান হইতে দলে দলে বহির্গত হইয়া বীরভূমি ও মল্লভূমির নানা স্থান লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইত। কিটিং সাহেব তদানীন্তন গভর্ণর জেনেরল লর্ড কর্ণওয়ালিসকে জানাইলেন যে, তাঁহার অধীন সামরিক বল দস্যুতা দমন পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। লর্ড কর্ণওয়ালিস অতি তৎপরতার সহিত যথেষ্ট সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা আসিয়া বিষ্ণুপুর দুর্গ অধিকার করিল। কিছু দিন গত না হইতে হইতেই বীরভূমে পার্ব্বতীয় দস্যুর উপ-দ্রব অতিশয় আসন্ন হইয়া উঠিল। কিটিং সাহেব বীরভূমিকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিষ্ণুপুর দুর্গস্থ সৈন্যগণকে সরাইয়া লইলেন। তাহারা নদী পার না হইতে হইতেই বিষ্ণুপুর দুর্গ বিদ্রোহিগণের হস্তে পতিত হইল। বিদ্রোহ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। মেদিনীপুরেও এই অশান্তির শিখা দেখা দিল। এদিকে বর্ষাকাল নিকটবর্ত্তী, বিষ্ণুপুর হইতে বিদ্রোহিগণকে শীঘ্র বিতাড়িত করিবার উপায় রহিল না। কিন্তু সৈন্য সাহায্যে যে শান্তি রক্ষার চেষ্টা হইতেছিল, অন্য উপায়ে তাহা সংঘটিত হইল। বিদ্রোহিগণ অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিল। এক বৎসর পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরের অধিবাসিগণ বিদ্রোহিগণকে সমাদরের সহিত বিষ্ণুপুরদুর্গে স্থান দিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের এই সমাদৃত বন্ধুগণ তাহাদের পক্ষে অনাহুত বিপদের ন্যায় হইয়া উঠিল। বিষ্ণুপুরবাসিগণও এই অসংযত দস্যুগণের উপদ্রবে উৎপীড়িত হইতেছিল। তাহারা এই অশান্তির বহ্নি নির্ব্বাপিত করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইল; তাহাদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে কাননাভ্যন্তরে লইয়া বিনষ্ট করিতে লাগিল এবং এইরূপে তাহাদের সংখ্যা ক্ষীণ হইয়া আসিলে, দস্যুর ন্যায় ইহাদিগকে দুর্গ হইতে দূরীভূত করিল। যে ভীষণ আশঙ্কাজনক ব্যাধি প্রশমন করিতে শাসকগণ চিন্তিত হইয়াছিলেন, তাহা এই প্রকারে উপশমিত হইল। লুণ্ঠন-লোলুপ দস্যু বা উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহীর দুর্দ্দমনীয় পরাক্রম বীরত্ব নামের যোগ্য নহে। পিণ্ডারো সিণ্ডারের আসনে বসিবার যোগ্য নহে। ডিক্‌টারনি

নেলসন্ বা ওয়েলিংটনের যোগ্য সম্মান পাইতে পারে না, রবার্ট মাগুয়ার নেপোলিয়ন হইতে পারে না, তান্তিয়াতোপী প্রতাপের সিংহাসনসমীপে স্থান পাইবে না। তবে বঙ্গদেশে দস্যু ও বিদ্রোহিগণের এই ভীষণ প্রভাব মল্লভূমির নির্ব্বাপিতপ্রায় বীর্য্যবহ্নির শেষ স্ফুরণ বলিয়াই এ স্থলে ইহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহাতে ব্রিটিস শাসনের অভ্যুদয়প্রত্যূষ পর্য্যন্ত মল্লভূমিতে বাঙ্গালীর বাহুবল এবং দৈহিক সাহসের পরিচয় প্রস্ফুটিত হইতেছে। উপযুক্ত নেতার অধীনে বাঙ্গালী সৈন্য কিরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। উপযুক্ত নেতার অভাবেও যে বাঙ্গালী সাহস ও শক্তির পরিচয় দিয়াছে, তাহাই এ স্থলে উল্লিখিত হইল। উপযুক্ত নেতার অভাবে সাহস ও শক্তি নিষ্ফল হইয়া থাকে। আবার উপযুক্ত নেতার অধীনে তাই জগতের ইতিহাসে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত করে। বিদ্রোহ, রক্তরাগভীষণ ঘোর অমঙ্গলরূপে প্রতীয়মান না হইয়া ইতিহাসের ক্রোড়ে স্বদেশের কল্যাণকর গৌরবজনক এক উজ্জ্বল আভায় সন্নিবেশিত হয়। ক্রমওয়েল বা ওয়াশিংটন, ম্যাটসিনি বা গ্যারিবল্ডী, একরূপ বিদ্রোহীর নেতা হইয়াও, স্বদেশবাসীর হৃদয়ে দেবতার ন্যায় পূজিত হইতেছেন। ইতিহাসে তাঁহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত, তাঁহাদের প্রতি কার্য্যে গৌরবের প্রদীপ্ত জ্যোতিঃ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। যাহা হউক, মল্লভূমির ইতিহাসে বাঙ্গালীর স্বভাবগত পৌরুষ সম্বন্ধে স্পষ্ট এবং প্রচুর প্রমাণ দৃষ্ট হয়, ইহাতে কত প্রত্যাপাদিত্য ও কত সীতারামের আবির্ভাব ও তিরোভাব দৃষ্ট হইবে, সহস্রাধিক বর্ষ যে দেশে স্বাধীনতার গৌরবপতাকা উড্ডীন ছিল, সে দেশ কত পরিবর্ত্তন, কত বিপ্লব, কত উপদ্রব, কত কত আক্রমণের তরঙ্গাভিঘাত সহ্য করিয়াছে এবং এক সামরিক শক্তির বলেই সেই সকল প্রচণ্ড তরঙ্গ প্রহারে স্বীয় স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছে। মুসলমান ন বাব সুজা, মুসলমান সেনাপতি জাফর খাঁ, মুসলমান সাহায্যে বলীয়ান বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র মল্লভূমির স্বাধীনতা হরণ করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থপ্রয়াস হইয়াছেন—পাঠান দলপতি গোরা খাঁ, বাহাদুর খাঁ এবং কোতলু খাঁ মল্লভূমির উপর শ্যেনবৎ উৎপতিত হইয়া ব্যর্থলক্ষ্য হইয়াছিলেন,—বিজয়দৃপ্ত বিদ্রোহিদলপতি সভাসিংহ প্রতিহিংসাবশে বিষ্ণুপুর-পতিকে হতগৌরব করিতে আসিয়া ব্যর্থশ্রম হইয়াছিলেন, এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র বৃহৎ কত ঘটনা আছে, রাজ্যবিস্তার নীতির বশে কত যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে,

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতে হইবে, মল্লভূমির সামরিক শক্তি কখনও নিষ্ক্রিয় বা অলস ছিল না, বহিঃশত্রুর সহিত বিরোধে, অন্তঃশত্রুর দমনে, অথবা রাজ্যবিস্তারে কোন না কোন প্রকারে বিষ্ণুপুরের বাঙ্গালী সৈন্যগণ সমরবীর্য্য প্রকাশের প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র পাইত। সময়, সুযোগ, শিক্ষা, সকলই বলবিক্রম বিকাশের অনুকূল ছিল। তখন অন্নাভাবের অন্তস্তাপ, জীবন সংগ্রামের কঠোরশ্রম, সংসার রক্ষার ভীষণ চিন্তা, বাঙ্গালীর জীবনীশক্তি শোষণ করিত না। তখন প্রত্যেক বাঙ্গালী গৃহস্থ শ্রমলব্ধ পূর্ণ প্রাচুর্য্যের মধ্যে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত—নানাবিধব্যাধিবিধ্বস্ত অধুনাতন বঙ্গের সজীবশ্মশানদৃশ্য তখন বাঙ্গালীর দূরকল্পনাতেও উদিত হইত না, তখন রোগজীর্ণ কঙ্কালসার কলেবর, শীর্ণ ক্ষীণ হস্তপদ, বিশুষ্ক বিবর্ণ বদনমণ্ডল, কোটর-প্রবিষ্ট নিষ্প্রভ নয়ন প্রভৃতি ভগ্ন স্বাস্থ্যের ভীষণ নিদর্শন সমূহ বঙ্গদেশে কদাচ নয়নগোচর হইত—তৎপরিবর্ত্তে দৃঢ়গঠিত কর্ম্মঠ দেহ, পুষ্টবিলষ্ঠ হস্তপদ, প্রসন্ন প্রভান্বিত বদন এবং প্রদীপ্ত পূর্ণ নয়ন স্বাস্থ্যের প্রফুল্ল রাগ প্রকটিত করিত, তখন প্রত্যেক গ্রামে দৈহিক উন্নতির জন্য ব্যায়ামক্ষেত্র বা ক্রীড়া-ক্ষেত্র ছিল, ইতর ভদ্র সকলেই উৎসাহের সহিত—মল্লবিদ্যা এবং অস্ত্রকৌশল শিক্ষা করিত, অতি প্রাচীনকাল হইতেই যুদ্ধ বিদ্যা সকল স্বাধীনজাতির নিকটই সমাদৃত, যুদ্ধক্ষেত্রে গৌরবলাভ মানবজীবনের একটি অতীব উচ্চাভি-লাষ, ভারতীয় সাহিত্যে এই ভাবের পুষ্টিকর পথ্য প্রভূত, সুতরাং বাঙ্গালীর হৃদয়েও এই ভাব সুষুপ্ত ছিল না। মল্লভূমি তখন স্বাধীন ছিল, বাঙ্গালীর পক্ষে সমরবিভাগে প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত ছিল এবং মল্লভূমির বলিষ্ঠ, উৎসাহ-শীল, উচ্চাভিলাষী যুবকগণ অনায়াসে সমর বিভাগে প্রবেশ করিতে পারিত, তাহাদের হৃদয়ের উচ্চতর বৃত্তি সমূহ স্ফূর্ত্তি পাইবার অবসর পাইত, দেশের জন্য, দেশপতির জন্য, গৌরবের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিতে শিক্ষা পাইত, যুদ্ধ বিদ্যায় শিক্ষিত হইত, যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন করিত। কেবল দৈহিক দৃঢ়তা, শ্রমসহিষ্ণুতা, সামর্থ্য ও সাহস নয়, প্রকৃত বীরত্ব যাহাকে বলে, তাহার দৃষ্টান্ত মল্লভূমির ইতিহাসে দুর্ল্ভ বস্তু নহে, সুতরাং বাঙ্গালীর বীরত্ব আকাশকুসুমবৎ কাল্পনিক পদার্থ নহে। সময়ের কঠোর পরিবর্ত্তনে এবং শিক্ষা এবং সুযোগের একান্ত অভাবে, বাঙ্গালী স্বীয় ললাটে কলঙ্কের "টীকা" ধারণ করিয়াছে।

শ্রীবলীন্দ্র সিংহ দেব।

শিক্ষা প্রবন্ধ।

(১)

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে শিক্ষা সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের বড়লাট তীক্ষ্ণদৃষ্টি লর্ড কর্জ্জন, এ দেশে পদার্পণ করিয়াই বুঝিতে পারেন যে, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে উপযুক্তরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় না। সেইজন্য যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি,এ, এম,এ, পাস করিয়া সংসারে প্রবেশ করিতেছেন, তাঁহারা, তথায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেছেন না। এইজন্য বড়লাট ইউনিভারসিটিজ্ বিল পাশ করিয়াছেন। এই আইনের উপকারিতা সম্বন্ধে মতবৈষম্য ঘটিয়াছে। অনেকে ইহাকে অতিশয় অনিষ্টকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা যে অসম্পূর্ণ হইতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুসৃত শিক্ষাপ্রণালীর যে সংশোধন আবশ্যক, এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। প্রকৃত শিক্ষা কি, কি উপায়ে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, সকল স্বদেশহিতৈষীরই এ বিষয়ে আলোচনা করা অতীব প্রয়োজনীয়। আমরা প্রতি মাসেই "বীরভূমি"তে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব, স্থির করিয়াছি। আবার এণ্ট্রান্স স্কুলের নিম্ন শ্রেণীতে, মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষা সম্বন্ধে যে অভিনব প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার উপযোগিতা বুঝাইয়া যাহাতে শিক্ষার পথ সুগম হইয়া আসে, সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে আমরা কুণ্ঠিত হইব না। তবে বিষয়টি যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি গুরুতর। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি এই কঠিন ব্যাপার সম্পাদনে সম্পূর্ন পারগ হইবে, আমরা এমত বিবেচনা করি না। সেই জন্য আমরা বিনীতভাবে বঙ্গের যাবতীয় অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। এই মহোদ্দেশ্য সাধনের আনুকূল্যে তাঁহারা কৃপা করিয়া যাহা কিছু লিখিয়া পাঠাইবেন, আমরা সাদরে তাহা প্রকাশিত করিব।

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

ঐ যে সদ্যঃপ্রসূত শিশু অরিষ্ট শয্যায় শয়ন করিয়া আছে, উহার আছে কি ? উহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক আছে। উহার হস্ত পদাদি আছে। আছে সব, নাই কেবল জ্ঞান। চক্ষুতে সকল পদার্থের প্রতিবিম্ব

পতিত হইতেছে, সত্য বটে, কিন্তু কোন পদার্থেরই জ্ঞান হইতেছে না। সে কিছুই দেখিতে পাইতেছে না। শরীরে কোন জিনিস পতিত হইলে, সে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। এইরূপ সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্যজগতের যাবতীয় পদার্থ তাহার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবার চেষ্টা করিতেছে বটে, কিন্তু কোন ফলই হইতেছে না। অকৃষ্ট ক্ষেত্রে বীজ বপনের ন্যায় সকলই বৃথা হইতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু তাহা হইতেছে না। মুহূর্ত্তে, মুহূর্ত্তে, প্রকৃতি-দেবী সুনিপুণা ধাত্রীর ন্যায় শিশুকে শিক্ষা দান করিতেছেন। ধীরে ধীরে তাহার জ্ঞানের উন্মেষ হইতেছে; ধীরে ধীরে পার্থিব নানা পদার্থ সম্বন্ধে তাহার স্থূল স্থূল জ্ঞান লাভ হইতেছে। কিন্তু শিক্ষাদান বিষয়ে প্রকৃতি দেবী অতি নিপুণা হইলেও, তাঁহার ক্ষিপ্রকারিতা নাই। তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা হইলেও, মানবের ক্ষুদ্র জীবনে তথায় শিক্ষা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব। সেই নিমিত্ত পরিণতবয়স্ক মানব, শিশুকে আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা, অল্প সময়ের মধ্যে প্রদান করিতে উৎসুক হয়। এই নিমিত্তই শিক্ষা প্রণালীর প্রবর্ত্তন, এই নিমিত্তই বিদ্যালয় স্থাপন। এই বিদ্যালয় ত্রিবিধ। ১ম, গৃহ, এখানে শিশু জনক জননীর নিকট জ্ঞানার্জ্জন করে। ২য়, পাঠাগার, এখানে শিশু শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করে। ৩য়, প্রকৃতির মহা বিদ্যালয়; এখানে শিশু প্রকৃতি দেবীর চরণতলে বসিয়া তাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে জ্ঞানরত্নরাজি সংগ্রহে চেষ্টিত হয়। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার বিদ্যালয়ে, বিশেষতঃ, দ্বিতীয় প্রকার বিদ্যালয়ে যেরূপ শিক্ষা প্রণালী অনুসৃত হওয়া কর্ত্তব্য, অর্থাৎ যেরূপ শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিলে, সহজে অল্প সময়ের মধ্যে, শিশু অধিক জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়, যথাসাধ্য তাহারই আলোচনা করিব।

শিক্ষার বিষয়।

শিক্ষার প্রয়োজন বুঝা গেল। এখন দেখিতে হইতেছে, শিশুকে কোন্ কোন্ বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে, শিশুর যাহা কিছু আছে, যে যে উপাদানে মানব শিশু গঠিত, শিক্ষা দ্বারা সেগুলির সম্পূর্ণতা সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে। শিশুর আছে কি? তাহার দেহ আছে; বুদ্ধি বৃত্তি, নৈতিক প্রবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির বীজ তাহাতে আছে।

উপযুক্ত শিক্ষা দ্বারা, যাহাতে তাহার দেহের প্রত্যেক অঙ্গ পরিণতি লাভ করিতে পারে, শিক্ষককে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। প্রকৃষ্ট শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করিয়া যাহাতে তাহার মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিগুলির স্ফুরণ হয় ও ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট হয়, শিক্ষককে তাহা করিতে হইবে। প্রথমে আমরা বুদ্ধি বৃত্তির কথাই বলিব।

শিক্ষকের কি কি গুণ থাকা কর্ত্তব্য।

কিন্তু এ সকল কথা বলিবার পূর্ব্বে, প্রথমে আমাদের দেখা কর্ত্তব্য, শিক্ষকের কি কি গুণ থাকা উচিত। অবশ্য তাঁহার শিক্ষণীয় বিষয়ে জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু কেবল জ্ঞান থাকিলে হইবে না। সেই জ্ঞান প্রদান করিবার শক্তিও তাঁহার থাকা আবশ্যক। সুতরাং দেখুন, বিদ্বান মাত্রেই সুযোগ্য শিক্ষক হইতে পারেন না। তাঁহার আরও অনেক গুণ থাকা আবশ্যক। কতকগুলি নিয়ম, কতকগুলি কৌশল, তাঁহার আয়ত্ত থাকা চাহি। শিক্ষাদান বড়ই দুরূহ ব্যাপার। একটা রক্তমাংস-অস্থিস্নায়ু প্রভৃতির সমষ্টিকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। এ বিষয়কে যিনি সামান্য বিবেচনা করেন, তিনি নিতান্তই ভ্রান্ত।

১। শিক্ষাদানের গূঢ় রহস্য জ্ঞান।

শিক্ষকের প্রথমেই বুঝা উচিত যে, তিনি ও শিশু একই প্রকার পদার্থ নহে। তিনি যে বিষয় যেরূপ ভাবে বুঝিতে পারেন, শিশু তাহা পারিবে না। তাঁহার মানসিক বৃত্তি নিচয় যে নিয়মে শাসিত, শিশুর মানসিক বৃত্তি সে নিয়মের বশবর্ত্তী নহে। শিক্ষককে দেখিতে হইবে, তিনি যে বিষয় যেরূপ ভাবে শিক্ষা দিতেছেন, শিশু তাহা সেরূপ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছে কি না। তিনি শিশুকে যাহা ইচ্ছা তাহা শিখাইতে পারেন না। শিশুর মানসিক বৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন না। করিলে, ফল বিষময় হইয়া দাঁড়াইবে। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা একথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। একজন কুম্ভকারকে একটি ঘট নির্ম্মাণ করিতে হইবে। তাহার নিকট যে মাটী আছে, তাহাতে যেরূপ ঘট হয়, তাহাকে ও তাহাই করিতে হইবে। তাহার অতিরিক্ত কিছু করিতে গেলে কিছুই হইবে না। সেইরূপ শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির যতটুকু শক্তি, তাহারই অনুরূপ শিক্ষা দিতে হইবে। এই বিষয় অবহেলা করিয়া নিজের মনের মত কাজ করিবার চেষ্টা

করিলে, শিক্ষাদানের চেষ্টা বিফল হইবে। শিশুতে যে উপাদান তিনি পাইলেন, শিক্ষককে তাহা লইয়াই কার্য্য করিতে হইবে। নূতন বৃত্তি সৃষ্টি করিবার সাধ্য তাঁহার নাই। এই বিষয় অবহেলা করায়, কত বালক চিরজীবনের জন্য উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে, এমন কি কাহারও কাহারও জীবন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়াছে ! *

২। অধ্যাপনায় অনুরাগ।

আমরা যে কার্য্যই করি না কেন, তাহাতে যদি আমাদের অনুরাগ না থাকে, তবে সে কার্য্য আমরা কখনই সুসম্পন্ন করিতে পারিব না। কোন কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে হইলে, সেই কার্য্যে নিজের সমুদয় শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে, মন প্রাণ ঢালিয়া দিতে হইবে। অনুরাগ না থাকিলে ইহা কি কখন সম্ভব? কাজটিতে ভালবাসা চাহি; কাজের প্রতি মনের একটা প্রবল টান থাকা চাহি। শিক্ষাদান কার্য্যেও শিক্ষকের সেইরূপ অনুরাগ আবশ্যক। যাঁহার এরূপ অনুরাগ নাই, যিনি শিক্ষাদানকে অতি পবিত্র ও প্রিয় পদার্থ বলিয়া বিবেচনা না করেন, তাঁহার শিক্ষা কার্য্যে ব্রতী হওয়া কদাচ উচিত নহে। এ দেশে এমন একদিন ছিল, যে দিন ব্রাহ্মণগণ অধ্যাপনাকেই জীবনের প্রিয়তম ও পবিত্রতম কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। অন্নাভাব তাঁহাদিগকে এই পবিত্র কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতে পারিত না। কিন্তু সেদিন গিয়াছে; আর শীঘ্র ফিরিবে বলিয়া বোধ হয় না। সে যাহা হউক, যিনি অধ্যাপনাকে অর্থোপার্জ্জনের প্রধান উপায় বলিয়া বিবেচনা করেন, অথবা অপর কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তিনি যেন শিক্ষক হইয়া শিশুগণের সর্ব্বনাশ সাধন না করেন। †

৩। ছাত্রপ্রীতি।

নিজ সন্তানের প্রতি পিতার যেরূপ স্নেহ, ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের সেইরূপ স্নেহ থাকা আবশ্যক। নিজের পুত্রটি কিসে সুবিদ্বান হইবে, কিসে

* Many a child is ruined for life, and many children are robbed of life itself, by the errors of parents and teachers that originate in ignorance of the laws of child life. (The Teacher's Manual of the Science and Art of Teaching, P 3).

† Teaching is the noblest of all professions but it is the sorriest of trades; and no body can hope to succeed in it who does not throw his whole heart in it,"

তাহার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধান হইবে, পিতা যেমন সস্নেহে তাহার চেষ্টা করেন, শিক্ষককেও ছাত্রের জন্য তাহা করিতে হইবে। শিক্ষক যদি ছাত্রকে স্নেহ করেন, তবে তাঁহার শিক্ষাদান কার্য্য সহজ হইয়া আসে। অনেক স্থলে দেখিয়াছি, শিক্ষক ছাত্রকে কোন বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন, ছাত্র বুঝিতে পারিতেছে না। শিক্ষকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। বলিলেন, "এমন গাধা ছেলে আমি কোথাও দেখি নাই।" শিক্ষক আর বুঝাইলেন না, ছেলেও বুঝিল না। ছাত্রের উপর স্নেহ থাকিলে কখনই শিক্ষক ঐরূপ ক্রুদ্ধ হইতে পারিতেন না, আর যদিই বা হইতেন, তাহা হইলেও অল্প সময়ের মধ্যেই স্নেহে তাঁহার ক্রোধকে দূর করিয়া দিত। আর একটী কথা, শিক্ষক যদি ছাত্রকে স্নেহ করেন, তবে ছাত্রও শিক্ষককে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিবে। ইহা অভ্রান্ত সত্য। ছাত্র শিক্ষককে ভক্তি করিলে, শিক্ষকের কথায় সে অধিক মনোযোগ প্রদান করিবে, অধিক পরিমাণে তাঁহার আদেশ ও উপদেশের অনুবর্ত্তী হইবে; সুতরাং শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণ উভয় কার্য্যই সম্পাদিত হইতে থাকিবে। এইরূপে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রীতি থাকিলে উভয়ের হৃদয়ের ভাব উভয়েই বুঝিতে পারেন। শিক্ষক সহজেই জানিতে পারিবেন, কোন্ কোন্ বিষয়ে ছাত্রের কাঠিন্য বোধ হইতেছে, আর ছাত্রও মন খুলিয়া নিজের অজ্ঞতা গুরুর নিকট প্রকাশ করিবে। শিক্ষা দানকালে স্নেহশীল শিক্ষক ছাত্রের অসাধ্য কোন কার্য্যই করিতে তাহাকে আদেশ করিবেন না। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটি গল্প বলিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহার উল্লেখ করিব।*

ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারক মহাত্মা মহম্মদের এক বৃদ্ধ শিষ্যছিল। ঐ শিষ্যের এক পুত্র ছিল; সে চিনি খাইতে বড় ভালবাসিত। কিন্তু বৃদ্ধ দরিদ্র, চিনি কিনিবার পয়সা তাহার জুটিতেছে না। অথচ পুত্রেরও চিনি নহিলে চলে না। এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বৃদ্ধ পুত্রের সহিত মহম্মদের শরণ লইল। মহম্মদ তাহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন, "তোমরা পনের দিন

He who takes his work as a dose is likely to find it nauseous.
(Lectures on Teaching, Sir Joshua Fitch M. A. L. L .D. P. 25.

¶ A Few Thoughts on Education by Sir Gooroodass Banerji Kt. M. A. D. L.—pp. 154-155

পরে আমার নিকট আসিও।” নির্দ্দিষ্ট দিনে বৃদ্ধ পুত্রকে লইয়া হাজির হইল। মহম্মদ গম্ভীর ভাবে পুত্রকে বলিলেন, “চিনি খাওয়ার অভ্যাসটা ছাড়িয়া দাও। অভ্যাস ছাড়িতে তোমার কষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা অসম্ভব নহে। অল্পে অল্পে চিনির পরিমাণ কম করিয়া দাও।” এই কথা শুনিয়া প্রণাম করিয়া পিতা পুত্র চলিয়া গেল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে বৃদ্ধ ফিরিয়া আসিয়া মহম্মদকে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয় এই সোজা কথাটা ভাবিয়া বাহির করিতে আপনার পনের দিন লাগিল, ইহার কারণ কি? মৃদু হাস্য করিয়া মহম্মদ উত্তর করিলেন “বাপু, আমি নিজে বড় চিনি ভালবাসিতাম। এই পনের দিন আমি চিনি খাওয়ার অভ্যাসটা পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। দেখিলাম, এ অভ্যাস পরিত্যাগ করা চলে। সেই জন্যই তোমার পুত্রকে ওরূপ আদেশ করিলাম। আমি যাহা পারি না, তাহা আমার শিষ্যদিগকে করিতে আদেশ করিব কেন?”

এই সকল ছাড়া শিক্ষকের আরও অনেক গুণ থাকা আবশ্যক। আমরা সঙ্ক্ষেপে সে গুলির উল্লেখ করিব। শিক্ষকের চরিত্রবান হওয়া আবশ্যক। বালকেরা শুদ্ধ তাঁহার কথার অনুবর্ত্তী হইবে না, তাঁহার কার্য্যেরও অনুকরণ করিবে। আমি যদি আমার উপদেশ গুলি নিজেই পালন না করি, আমার ছাত্রেরাইবা করিবে কেন? আমি ছাত্রদিগকে বলিলাম “মিথ্যা কথা বলিও না”—কিন্তু আমি তখনই দশটা মিথ্যা বলিয়া ফেলিলাম। ইহাতে ছাত্রেরা কখনই মিথ্যাকে ঘৃণা করিবে না। যে উপদেশের ফল হইল না, সে উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন কি? তবেই দেখুন, শিক্ষক যদি সর্ব্বপ্রকারে নীতি সম্পন্ন হন, তবে তাঁহার ছাত্রেরা নীতিমান হইবে, তিনি আশা করিতে পারেন। “Do what I say but do not what I do” এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক—অন্ততঃ শিক্ষকের এ কথা বলা চলে না।

ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, প্রফুল্লতা শিক্ষকের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। কোন বিষয় ছাত্রগণের আয়ত্ত করিতে বিলম্ব হইলে যেন তাঁহার বিরক্তি বোধ না হয়। তাঁহার গাম্ভীর্য্য থাকা চাই; ছাত্রগণ যেন তাঁহাকে অবহেলা করিতে না পারে। তাঁহার প্রফুল্লতা থাকা চাই:—ছাত্রগণ যেন আকৃতি দর্শনে ভীত না হয়। ফল কথা, রাজা দীলিপকে ভৃত্যগণ যে চক্ষে দেখিত, ছাত্রগণও যেন শিক্ষককে সেইভাবে দেখে।

ভীমকান্তৈর্নৃপগুণৈঃ স বভূবোপজীবিনাম্।
অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ ঃ॥

রঘুবংশ, ১ম সর্গঃ।

সমুদ্রে জলজন্তু আছে বলিয়া যেমন লোকে তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে ভীত হয়, আবার রত্ন আছে বলিয়া যেমন সমীপবর্ত্তী হয়, তেমনি রাজা দীলিপের অনুজীবিগণ, তাঁহার কঠোর গুণ ছিল বলিয়া তাঁহাকে ভয় করিত, আবার তাঁহার কোমল গুণে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহার নিকটে যাইতে উৎসাহিত হইত।

পৌরাণিক চিত্র। (৪)

কৌশিক ব্রাহ্মণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রমণী বলিতে লাগিলেন ঃ—

ক্রোধঃ শত্রুঃ শরীরস্থো মনুষ্যানাং দ্বিজোত্তম।
যঃ ক্রোধমোহৌ ত্যজতি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
যো বদেদিহ সত্যানি গুরুং সন্তোষয়েত চ।
হিংসিতশ্চ ন হিংসেত তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ!
জিতেন্দ্রিয়ো ধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায় নিরতঃ শুচিঃ।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
যস্য চাত্মসমোলোকো ধর্ম্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ।
সর্ব্বধর্ম্মেষু চ রতস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
যোঽধ্যাপয়েদধীয়ীত যজেদ্বা যাজয়ীতবা।
দদ্যাদ্বাপি যথাশক্তি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
ব্রহ্মচারী চ বেদান্ যোঽপ্যধীয়াদ্দ্বিজপুঙ্গবঃ
স্বাধ্যায়েচাপ্রমত্তোবৈ তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।

অর্থাৎ, হে দ্বিজোত্তম, ক্রোধ পদার্থটি মনুষ্যদিগের শরীরস্থিত শত্রু। যে ব্যক্তি ক্রোধ ও মোহ ত্যাগ করেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন। সংসার মধ্যে যিনি সত্য কথা কহেন, গুরুকে সন্তুষ্ট রাখেন এবং হিংসিত হইয়াও হিংসা না করেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া

জানেন। যিনি জিতেন্দ্রিয়, স্বাধ্যায় নিরত ও শুচি, এবং কাম ক্রোধ যাঁহার বশীভূত, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। সর্ব্বধর্ম্মে বিচরণকারী যে মনস্বী লোকমাত্রকেই আত্ম সদৃশ জ্ঞান করেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যিনি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন যাজন ও যথাশক্তি দান করেন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

অবশেষে সেই অদ্ভুত রমণী এই বলিয়া ব্রাহ্মণের দর্প চূর্ণ করিলেন ;—

ভগবানপি ধর্ম্মজ্ঞঃ স্বাধ্যায় নিরতঃ শুচিঃ।
নতু তত্ত্বেন ভগবন্ ধর্ম্মং বেৎসীতি মে মতিঃ॥

অর্থাৎ হে ভগবন, আপনিও ধর্ম্মজ্ঞ, স্বাধ্যায়নিরত ও শুচি বটেন, কিন্তু আমার বিবেচনায় আপনি যথার্থরূপে ধর্ম্মের মর্ম্ম জানিতে পারেন নাই। এইরূপ নানা উপদেশ দিয়া সেই রমণী ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "আপনি প্রকৃত ধর্ম্ম জানেন না ; মিথিলায় একজন ব্যাধ আছে, সে মাতাপিতার শুশ্রূষা করাকেই মহাধর্ম্ম বলিয়া জানে ; সে এই স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া ধার্ম্মিক হইয়াছে। সে আপনাকে প্রকৃত ধর্ম্ম কি, তাহা বলিয়া দিবে।"

বিস্মিত, স্তম্ভিত, হৃতদর্প ও লজ্জিত হইয়া ব্রাহ্মণ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তবে কি তাঁহার এত বেদপাঠ, এত তপস্যা, সমস্তই বৃথা হইল? ভিত্তি দৃঢ় না করিয়া সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই কি তাহা পতিত হইল? নিরক্ষরা গৃহস্থ রমণী কেবল পতিশুশ্রূষা করিয়াই তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর সুস্পষ্টভাবে ধর্ম্মের মহিমা জ্ঞাত হইয়াছে! সে যে ব্যাধের কথা বলিল, সে কি সত্যই মিথিলাতে বাস করে? হাঁ নিশ্চয়ই। রমণীত মিথ্যা বলিবে না। সে যে তাঁহার বকাবধ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছিল। নিশ্চয়ই ব্যাধ মিথিলায় বাস করে। তাহার নিকট তাঁহাকে যাইতে হইল। সেখানে তাঁহাকে কত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে হইবে, কত নূতন কথা শুনিতে হইবে।

মিথিলায় গিয়া ব্রাহ্মণ যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। যে মিথিলা নগরীতে ধার্ম্মিকপ্রধান রাজা জনক রাজত্ব করেন, যাহা "ধর্ম্মধ্বজ সমাকীর্ণা ও যজ্ঞোৎসববতী, তথায় এক বীভৎস পশুবধ-স্থান রহিয়াছে! রুধিরাক্ত কলেবরে একজন ব্যাধ মাংস বিক্রয় করিতেছে! এই ধর্ম্মব্যাধ! ইহার নিকট বেদজ্ঞ তপোবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইবে! কিন্তু ব্রাহ্মণের গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে ; আর তাঁহার

অহঙ্কার নাই। শিক্ষার্থীর পক্ষে বিনয়ই প্রধান সহায়। পতিব্রতা রমণীর কার্য্যকলাপ তাহার হৃদয়ে বিনয় সঞ্চার করিয়া দিয়াছে। ব্রাহ্মণ বিনীত ভাবে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। যখন সেই ব্যাধ তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিল ও তাঁহার আগমন কারণ বলিয়া দিল, তখন তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন।

মহা সমাদরে ব্যাধ ব্রাহ্মণকে গৃহে লইয়া চলিল। কদাচারসম্পন্ন ব্যাধ-ভবনে যাইতে ব্রাহ্মণ কিছু দ্বিধাবোধ করিলেন না। ব্যাধ ব্রাহ্মণকে নিজের বহির্বাটীতে বসাইয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক নিগূঢ় কথা বলিল। মহাত্মা যীশুখৃষ্ট যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজিত হইতেছেন, ব্যাধ সেই ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণের হৃদয়ে শান্তি প্রদান করিল। ভগবান বুদ্ধদেব যে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য রাজ্য ত্যাগ করিয়া ভিখারী হইয়াছিলেন, ব্যাধ সেই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম কথা বলিয়া ব্রাহ্মণের হৃদয়ে বিমল আনন্দের সঞ্চার করিল। আবার বেস্থাম, মিল প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া আজ কাল আমাদের নিকট মহাদার্শনিক রূপে গুরুবৎ পূজিত হইতেছেন, ব্যাধ সে সকল কথা বলিতেও বিস্মৃত হইল না।

অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া ব্রাহ্মণ ব্যাধকে বলিলেন যে "তুমি যে সকল কথা বলিলে, তাহা সমস্তই ন্যায়-যুক্ত। ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ধর্ম্ম বিষয়ের কোন কথাই তোমার অবিদিত নাই।" ব্যাধ বলিল "প্রভো আমি শাস্ত্র জানি না; নির্জ্জন গিরিগুহায় তপস্যাও করি নাই; গৃহী হইয়া আমি যে ধর্ম্ম আশ্রয় ও অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছি, তাহা আপনি স্বচক্ষে দর্শন করুন।"

এই বলিয়া ব্যাধ ব্রাহ্মণকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গেল। তথায় ব্রাহ্মণ দেখিলেন, ধর্ম্ম ব্যাধের পিতা ও মাতা শুক্লাম্বর ধারণ পূর্ব্বক পূজিত ও কৃতাহার হইয়া সুসন্তুষ্ট মানসে উত্তমাসনে গৃহদেবতার ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। ধর্ম্মব্যাধ সেই দম্পতীকে দেখিয়া অবনত মস্তকে তাহাদের চরণতলে পতিত হইল। তাহারাও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিল। তখন ব্যাধ বলিতে লাগিল :—

পিতা মাতাচ ভগবন্নেতৌ মে দৈবতং পরং।
যদ্দৈবতেভ্যঃ কর্ত্তব্যং তদেতাভ্যাং করোম্যহং॥
ত্রয়স্ত্রিংশদ্যথা দেবাঃ সর্ব্বে শক্রপুরো গমাঃ।
সংপূজ্যাঃ সর্ব্বলোকস্য তথা বৃদ্ধাবিমৌ মম॥

উপহারানাহরন্তো দেবতানাং যথা দ্বিজাঃ।
কুর্ব্বন্তি তদ্বদেতাভ্যাম্ করোম্যহমতন্দ্রিতঃ॥
এতৌ মে পরমং ব্রহ্মন্ পিতা মাতাচ দৈবতং।
এতৌ পুষ্পৈঃ ফলৈ রত্নৈ স্তোষয়ামি সদাদ্বিজ॥
এতাবেবাগ্নয়োমহ্যং যান্ বদন্তি মনীষিণঃ।
যজ্ঞা বেদাশ্চ চত্বারঃ সর্ব্বমেতৌ মম দ্বিজ॥
এতদর্থে মমপ্রাণাঃ ভার্য্যাপুত্রসুহৃজ্জনাঃ।
সপুত্রদারঃ শুশ্রূষাং নিত্যমেব করোম্যহং॥
স্বয়ঞ্চ স্নাপয়াম্যেতৌ তথা পাদৌ প্রধাবয়ে।
আহারং সংপ্রযচ্ছামি স্বয়ঞ্চ দ্বিজসত্তম॥
অনুকূলং তথা বদ্মি বিপ্রিয়ং পরিবর্জ্জয়ে।
অধর্ম্মে নাপি সংযুক্তং প্রিয়মাভ্যাং করোম্যহং॥
ধর্ম্মমেব গুরুং জ্ঞাত্বা করোমি দ্বিজসত্তম।
অতন্দ্রিতঃ সদা বিপ্র শুশ্রূষাং বৈ করোম্যহং॥
পঞ্চৈব গুরবোব্রহ্মণ্ পুরুষস্য বুভূষতঃ।
পিতা মাতাগ্নি রাত্মাচ গুরুশ্চ দ্বিজসত্তম॥
এতেষু যস্তু বর্ত্তেত সম্যগেব দ্বিজোত্তম।
ভবেয়ু রগ্নয় স্তস্য পরিচীর্ণাস্তু নিত্য শঃ।
গার্হস্থ্যে বর্ত্তমানস্য এষঃ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

ভগবন, আমার এই মাতাপিতাই আমার পরম দেবতা। লোকে দেবগণকে যেরূপ পূজা করে, আমি ইহাঁদিগকে সেইরূপ পূজা করিয়া থাকি। ইন্দ্রাদি দেবগণ যেমন সর্ব্বলোকের পূজ্য, সেইরূপ এই বৃদ্ধ দম্পতী আমার সর্ব্বপ্রকারে পূজনীয়। দ্বিজাতিরা দেবতাদিগের উদ্দেশে উপহার সকল আহরণ করতঃ যেরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, আমিও আলস্যশূন্য হইয়া ইহাঁদের নিমিত্ত সেইরূপ করি। হে ব্রহ্মণ, এই মাতা পিতাই আমার পরম দেবতা। ইহাঁদিগকে পুষ্প ফল, ও রত্ননিকর দ্বারা আমি সর্ব্বদাই পরিতুষ্ট করিয়া থাকি। হে দ্বিজ, মনীষীরা যে অগ্নিত্রয়ের কথা বলেন, আমার পক্ষে ইহাঁরাই সেই অগ্নি। হে বিপ্র, যজ্ঞ ও বেদ চতুষ্টয় প্রভৃতি যে কিছু আছে, সে সমস্তই আমার ইহাঁরা। আমার পঞ্চপ্রাণ, পুত্র কলত্র ও সুহৃজ্জন, সকলই ইহাঁদের নিমিত্ত। আমি পুত্র কলত্রের সহিত সততই

ইহঁাদের শুশ্রূষা করিতেছি। হে দ্বিজসত্তম, আমি স্বয়ং ইহঁাদিগকে স্নান করাই, স্বয়ং ইহঁাদের পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিই, এবং স্বয়ং আহার প্রদান করি। অপিচ যে বাক্য ইহঁাদের অনুকূল হয়, তাহাই বলি; অপ্রিয় কথা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জন করি। ইহঁাদের যাহা অভিপ্রায়, অধর্ম্মসংযুক্ত হইলেও আমি তদনুষ্ঠানে সঙ্কুচিত হই না। হে দ্বিজসত্তম, ইহঁাদের প্রিয় কার্য্য সাধনকেই গুরুধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকি; সর্ব্বদা নিরালস্য হইয়া ইহাদের শুশ্রূষাই করি। হে ব্রহ্মণ, কল্যাণকামী পুরুষের পক্ষে, পিতা, মাতা, অগ্নি, আত্মা ও গুরু,এই পঞ্চই গুরুপদবাচ্য। এই সকলে যিনি সম্যক্‌রূপে বর্ত্তমান থাকেন, তাঁহার নিত্যই অগ্নিত্রয়ের পরিচর্য্যা করা হয়। ফলতঃ গৃহস্থাশ্রমে বর্ত্তমান ব্যক্তির ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

এই বলিয়া ধর্ম্মব্যাধ ব্রাহ্মণকে বুঝাইলেন, যে পিতা ও মাতার শুশ্রূষা রূপ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার আত্মা বিশুদ্ধ হইয়াছে, সকল শাস্ত্র, সকল ব্যাপার সে জানিতে পারিয়াছে—এইরূপ স্বকর্ম্ম সাধন করাতেই সেই পতিব্রতা রমণীও সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন। তাহার পর সেই ব্যাধ ব্রাহ্মণকে বলিলেন :—

ত্বয়া বিনিক্‌তামাতা পিতা চ দ্বিজসত্তম।
অনিস্‌ষ্টোঽসি নিক্‌্রান্তো গৃহাত্তাভ্যাং অনন্দিত॥
বেদোচ্চারণ কার্য্যার্থ মযুক্তং তত্ত্বয়া কৃতম্‌।
তবশোকেন বৃদ্ধৌতাবন্ধীভূতৌ তপস্বিনৌ॥
তৌ প্রসাদয়িতুংগচ্ছমাত্বাং ধর্ম্মোঽত্যগাদয়ম্‌।

হে অনিন্দিত দ্বিজসত্তম, আপনি মাতাপিতাকে অবমানিত করিয়াছেন, যেহেতু তাঁহাদের অনুমতি না লইয়াই, বেদাধ্যয়নার্থ গৃহ হইতে নির্গত হইয়াছেন। ফলতঃ আপনার এই কর্ম্মটি নিতান্ত অযুক্ত হইয়াছে। আপনার শোকে সেই তপস্বী বৃদ্ধ দম্পতী অন্ধ হইয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত আপনি গমন করুন। এই ধর্ম্ম যেন আপনাকে পরিত্যাগ না করে।

নবজীবন পাইয়া কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ বিনীতভাবে বলিলেন :—

পতমানোঽদ্য নরকে ভবতাস্মি সমুদ্ধৃতঃ।
ভবিতব্য মথৈবঞ্চ যদৃষ্টোঽসি ময়ানঘ।

হে অনঘ, আমি নরকে পড়িতেছিলাম, অদ্য তোমা কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইলাম।

ভরসা করি ব্রাহ্মণের এই দৃষ্টান্ত আমাদিগকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিবে।

প্রাচীন আর্য্যজাতির বর্ণ-বিভাগ

ও

বাসস্থান নিরূপণ।

আধুনিক পাশ্চাত্য জাতি ও তাঁহাদের পদানুসরণকারী ইংরেজী-শিক্ষিত কোন কোন এতদ্দেশীয় ব্যক্তিও বলিয়া থাকেন যে, আর্য্যজাতির আদিমবাসস্থান ভারতবর্ষ নহে, তাঁহারা দিগ্‌বিজয় ব্যপদেশে অন্য স্থান হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া, এখানকার আদিম বাসেন্দা অসভ্য লোকদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক এই স্থানেই আপনাদের বাসস্থান নিরূপণ করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহাদের বংশপরম্পরা বিস্তৃত হইয়া কালক্রমে ভারত, হিন্দুর দেশ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা আরও বলেন যে, সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতিরাই প্রাচীন ভারতের আদিম বাসেন্দা। বলা বাহুল্য যে, এটা কেবল তাঁহাদের কপোলকল্পিত কথা মাত্র; প্রকৃতপক্ষে এসম্বন্ধে বিশ্বাসজনক প্রমাণ কিছুই নাই। বস্তুতঃ আমাদের শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিলে, ঐরূপ কথা ভ্রান্তিমূলক ও অলীক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে।

শাস্ত্রমতে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি; অন্যান্য দেশ ভোগভূমি মাত্র। বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে,—

"উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং যদ্‌ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততি॥

*　　*　　*　　*

ইতঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যশ্চান্তশ্চ গম্যতে।
ন খল্বন্যত্র মর্ত্ত্যানাং কর্ম্মভূমৌ বিধীয়তে॥

*　　*　　*　　*

চত্বারি ভারতবর্ষে যুগান্যত্র মহামুনে।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চান্যত্র ন কচিৎ॥

তপস্তপ্যন্তি মুনয়ো জুহ্বতে চাত্র যজ্বিনঃ।
দানানি চাত্র দীয়ন্তে পরলোকার্থমাদরাৎ॥
পুরুষৈর্যজ্ঞপুরুষো জম্বুদ্বীপে সদেজ্যতে।
যজ্ঞৈর্যজ্ঞময়ো বিষ্ণুরন্যদ্বীপেষু চান্যথা॥
অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্ম্মভূরেষা ততোঽন্যা ভোগভূময়ঃ॥
অত্র জন্মসহস্রাণাং সহস্রৈরপি সত্তম।
কদাচিল্লভ্যতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ॥
গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি, ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে, ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥
কর্ম্মাণ্যসঙ্কল্পিত তৎফলানি, সংন্যস্য বিষ্ণৌ পরমাত্মরূপে।
অবাপ্যতাং কর্ম্ম মহীমনন্তে, তস্মিল্লয়ং যে ত্বমলাঃ প্রয়ান্তি॥
জানীম নৈতৎ ক্ব বয়ংবিলীনে, স্বর্গপ্রদে কর্ম্মণি দেহবন্ধম্।
প্রাপ্স্যাম ধন্যাঃ খলুতে মনুষ্যা, যে ভারতেনেন্দ্রিয়বিপ্রহীনাঃ॥"

মহাসাগরের উত্তর ও হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণে যে বর্ষ অবস্থিতি করিতেছে, ভারত-সন্ততিরা যথায় বাস করিয়া থাকেন এবং যে স্থান হইতে মানব স্বর্গ, মোক্ষ, মধ্য ও অন্ত, অর্থাৎ অন্তরীক্ষ লোক ও পাতাল লোক প্রাপ্ত হয়, তাহারই নাম ভারতবর্ষ। একমাত্র ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোন স্থানেই মর্ত্ত্য মানব কর্ম্মভূমির মাহাত্ম্য জানেনা। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই যুগচতুষ্টয় কেবল মাত্র ভারতবর্ষের জন্যই কল্পিত হইয়াছে। অপর বর্ষে যুগ-ভেদের প্রয়োজন নাই। মর্ত্ত্য লোকের মধ্যে এই স্থানে বসিয়াই যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞে আহুতি দিয়া থাকেন এবং পরলোকের আদরার্থ যে কিছু দান কার্য্য, তাহাও এই স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বিষ্ণুকে যজ্ঞপুরুষ জানিয়া, তৎপ্রীত্যর্থে এই জম্বুদ্বীপের লোকেরাই যজ্ঞকার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। অন্য দ্বীপের ব্যবস্থা এরূপ নহে।

জম্বুদ্বীপ মধ্যে আবার ভারতবর্ষই পারলৌকিক কার্য্যানুষ্ঠান পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এক মাত্র ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি; অন্যান্য সমস্ত দেশ কেবল ভোগ-তৃপ্তির জন্যই অবস্থিত রহিয়াছে। প্রাণিগণ সহস্র সহস্র জন্মের পর কদাচিৎ পুণ্যবলে এই পুণ্যভূমি ভারতে মানবজন্ম লাভ করিয়া থাকে। স্বর্গবাসী দেবতারা বলিয়া থাকেন, "ভারতবাসীরা দেবগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ ও

ধন্য; কেন না কেবল তাঁহাদেরই জন্মভূমি স্বর্গ ও মোক্ষ, এই উভয় প্রাপ্তির হেতু। ভারতের পবিত্রমনা, নিষ্পাপ লোকেরাই তাঁহাদের সমুদায় কর্ম্মফল, পরমাত্মা-স্বরূপ অনন্ত বিষ্ণুতে সমর্পণ করিয়া, তাঁহাতেই বিলীন হইয়া থাকেন।” “স্বর্গপ্রদ পুণ্যকর্ম্ম ক্ষয় হইলে, সমুদায় ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া আবার ভারতে জন্মগ্রহণ করিব” এইরূপ কামনা দেবতারা সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন।

কেবল বিষ্ণুপুরাণ বলিয়া নহে, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই যে ভারতে আর্য্য-জাতির বাস, একথা হিন্দুর সকল শাস্ত্রেই প্রমাণিত ও সিদ্ধান্তীকৃত। ধর্ম্ম-শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিগণের মধ্যে মনুর প্রাধান্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। স্বয়ং বেদ বলিয়াছেন,—

“মনুর্বৈ যৎকিঞ্চিদবদৎ তদ্ভেষজম।”

অর্থাৎ মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহাই মহৌষধ। আবার শাস্ত্রান্তরেও দৃষ্ট হয় যে,—

“মন্বর্থ বিপরীতা তু যা স্মৃতিঃ সা ন শস্যতে॥”

অর্থাৎ মনুর মতবিরুদ্ধ কোন স্মৃতিশাস্ত্রই গ্রাহ্য নহে। কথিত আছে যে, একমাত্র মনুই মানবজাতির আদিপুরুষ। এবং মনুর নামের ব্যুৎপত্তি অনু-সারেই সাধারণ মনুষ্যজাতির নাম মানব হইয়াছে।* অতএব মনুর সময়ে সৃষ্টির অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়কে মূলভিত্তি করিয়া, যেরূপে নানা সঙ্কর-বর্ণের উৎপত্তি ও ভারতের যে যে অংশে তাহাদের বাসস্থান নিরূপিত হইয়া-ছিল, অদ্য আমরা এই প্রবন্ধে মনুসংহিতা হইতে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া, পাঠকগণকে উপহার দিব।

বর্ণ-বিভাগ।

“ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥
সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে॥
স্ত্রীষনন্তর জাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষ-বিগর্হিতান্॥

* নামসাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, ইংরেজী man ম্যান শব্দও এই মনু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চাণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম।
বৈশ্যরাজন্য বিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ ॥
ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যা বেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ ॥
যথৈব শূদ্রো ব্রাহ্মণ্যাং বাহ্যং জন্তুং প্রসূয়তে।
তথা বাহ্যতরং বাহ্যশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যে প্রসূয়তে ॥
সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজ-ধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণাস্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ ॥
শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনা শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥
মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বেঃ তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ ॥
ন তৈঃ সময়মন্বিচ্ছেৎ পুরুষো ধর্ম্মমাচরন্।
ব্যবহারো মিথস্তেষাং বিবাহঃ সদৃশৈঃ সহ ॥”

উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত বলিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই বর্ণত্রয় দ্বিজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উপনয়ন-সংস্কার বিহীন চতুর্থ বর্ণ শূদ্র দ্বিজ নহে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চারি বর্ণ ভিন্ন আর সকলেই সঙ্করজাতি। স্বপরিণীতা ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত সন্তান ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃ-স্বীয় পত্নী ক্ষত্রিয়াতে উৎপাদিত সন্তান ক্ষত্রিয়; বৈশ্য কর্ত্তৃক সবর্ণা ভার্য্যার গর্ভজাত সন্তান বৈশ্য এবং শূদ্রকর্ত্তৃক পরিণীতা শূদ্রার গর্ভজাত সন্তানই শূদ্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অসবর্ণা পত্নীতে সমুৎপন্ন সন্তান জনকের সহিত সবর্ণ হয় না; তাহারা নিশ্চিতই জাত্যন্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মন্বাদি ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, দ্বিজবর্ণত্রয় কর্ত্তৃক অনুলোমক্রমে অনন্তর-বর্ণজা পত্নীর গর্ভসম্ভূত সন্তানেরা মাতার হীনজাতিত্ব প্রযুক্ত পিতৃজাতি প্রাপ্ত না হইয়া তৎসদৃশ জাতি হইয়া থাকে। আবার বিলোমক্রমে শূদ্র কর্ত্তৃক বৈশ্যার গর্ভজাত সন্তান‘আয়োগব’ ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত সন্তান ক্ষত্তা এবং ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত সন্তান নরাধম চণ্ডাল আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহারা সকলেই বর্ণসঙ্কর মধ্যে পরিগণিত। অন্যোন্য স্ত্রীগমন, সগোত্রাদি

বিবাহ-সজ্ঘটন ও উপনয়নাদি-স্বধর্ম্মত্যাগ ইত্যাদি কারণে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মধ্যেও বর্ণসঙ্কর ঘটিয়া থাকে। শূদ্র কর্তৃক ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত চণ্ডালাদি সন্তানেরা যেরূপ নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত, আবার চণ্ডালাদি সঙ্করজাতি কর্তৃক ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের স্ত্রীতে সমুৎপাদিত সন্তানেরা তাহাদের অপেক্ষা আরও হীন। ব্রাহ্মণাদি দ্বিজত্রয়ের স্বজাতি-পত্নী-সম্ভূত সন্তানগণ এবং অনুলোমক্রমে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত বৈশ্যা-সন্তান (মাহিষ্য) এই ষড়্বিধ সন্তান দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী, অর্থাৎ ইহারা উপনয়নাদি দ্বিজসংস্কার-যোগ্য হইয়া থাকে। কিন্তু সূত প্রভৃতি প্রতিলোমজ তনয়েরা শূদ্রধর্ম্মা বলিয়া, তাহারা উপনয়নাদি সংস্কার ও যজনাধ্যয়নাদির অভাবে ক্রমশঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ পৌণ্ড্রক, ঔড্র, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ, এই সকল দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়গণের পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মদোষে শূদ্রত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। যাহারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের অন্তর্ভূত নহে, তাহারা সাধুভাষী হউক বা ম্লেচ্ছভাষীই হউক, ইহাদিগের দস্যু আখ্যা হইয়া থাকে। সাধু ব্যক্তিরা যখন বৈধ কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিবেন, তখন ঐ সকল নিন্দিত জাতির দর্শন স্পর্শনাদি ব্যবহারও নিষিদ্ধ। এই সকল হীনজাতির বিবাহ ও ঋণ গ্রহণাদি ব্যবহার তাহাদের স্বজাতির মধ্যেই পরস্পর সম্পন্ন হইবে।

বাসস্থান।

"সরস্বতী-দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥
হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাগ্বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদা সমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥
এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ।
শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেদ্‌বৃত্তিকর্ষিতঃ॥

মনুসংহিতা।

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী, এই দুই দেবনদীর মধ্যে যে প্রদেশ আছে, পণ্ডিতেরা সেই দেবনির্ম্মিত দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলিয়া থাকেন। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, কান্যকুব্জ

ও মথুরা, এই কয়টী দেশকে ব্রহ্মর্ষিদেশ বলে। এই ব্রহ্মর্ষিদেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিঞ্চিৎ হীন। উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি, এই উভয় পর্ব্বতের মধ্যস্থলে বিনশন * দেশের পূর্ব্বে ও প্রয়াগের পশ্চিমে যে দেশ আছে, তাহাকে মধ্যদেশ বলা যায়। পূর্ব্বপশ্চিমে সমুদ্রদ্বয় এবং উত্তরদক্ষিণে হিমালয় ও বিন্ধ্যগিরি ইহার মধ্যবর্ত্তী দেশের নাম আর্য্যাবর্ত্ত। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র, এই প্রকার কথার নির্দ্দেশ থাকাতে হিমালয় ও বিন্ধ্যাগিরি এই উভয় পর্ব্বতের সমসূত্র স্থান গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা সমুদ্রের উল্লেখ না থাকিলেও ক্ষতি হইত না। সুতরাং আমাদের বঙ্গদেশ অর্য্যাবর্ত্তের মধ্যেই পড়িতেছে। যাহা হউক, এই সমস্ত পবিত্র দেশকে আশ্রয় করা দ্বিজাতিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। পরন্তু শূদ্রগণ ও অপরাপর বর্ণসঙ্কর জাতিরা আপন আপন জীবিকার জন্য যে কোন দেশে বসতি করিতে পারে, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ।

শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়।

নবাবিষ্কৃত হিন্দু-বৈষ্ণব কবিগণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

এই প্রবন্ধ-ধৃত প্রথম তিনটি পদ একখানা অতি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত হইল। আদ্যন্ত না থাকায় উহার লিপিকালাদি জানিবার উপায় নাই। অবস্থা-দৃষ্টে উহাকে অন্ততঃ সার্দ্ধশতাব্দীর প্রাচীন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তাহাতে অনেকগুলি শাক্ত সঙ্গীত ও মুসলমান কবির পদাবলীও পাওয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে সেইগুলি 'পূর্ণিমা' ও শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয়ের "মুসলমান বৈষ্ণবকবি" গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

৪। বংশীদাস দাস। পদ সংখ্যা ১।

পদাবলীকারদের মধ্যে বংশীবদন নামক কবি আছেন, কিন্তু বংশীদাস নাই। সম্ভবতঃ ইহাঁর নাম এই প্রথম জানা গেল।

* সরস্বতী নদীর অন্তর্ধান প্রদেশকে বিনশন দেশ বলে।

তুরি বসন্ত।

কথ না চাতুরী কর কারে!

নাগর শ্যাম, কথ না রাতুরী কর কারে! (ধ্রু)

তোহ্মার চাতুরী যমুনার ঘাঠেরে।

গোঠে থাক ধেনু রাখ, সদাএ গোধূলি মাখ,

অক্ষরের লেস নাহি ঘঠে।

বোলের বোল বোলি নার, চতুর্ভুজ নাম ধর,

তোহ্মার চাতুরী যমুনার ঘাঠেরে।

হাসি হাসি কহ বাৎ, বামন হৈয়া চাঁন্দে হাত,

ঘনাইয়া ঘনাইয়া বৈস কাছে।

সোণার বরণ আহ্মা, কাচের বরণ তোহ্মা,

পরশে দল (?) হৈব পাছে॥

ঠেকিনু কানুর পাকে, কলসী লাগিল কাঁখে,

ছাড়িয়া না দিব হেন জানি।

কহে দাস বংশী দাস, কানু কহে একু পাশ,

শ্যাম অঙ্গে ঢালিয়া দিল পানি॥ ১৫।

৫। মাধব দাস। পদ-সংখ্যা—১।

পদ-লেখকদের মধ্যে মাধব দাস নামক কবি আছেন। তাঁহার পদ-সংখ্যা ৬৫ বলিয়া নির্দ্ধারিত। তাঁহার সহিত ইঁহার কোন সম্বন্ধ আছে কিনা, জানিনা।

বসন্ত রাগ।

আজু রস বৃন্দাবনে দোলএ গোবিন্দ।

নয়ান ভরিয়া দেখ চরণারবিন্দ॥

তছু পদপঙ্কজ ধেয়ানে ন পাএ।

ছো পহু গোপিনী সঙ্গে আবির খেলাএ॥

গোলক ছাড়িয়া পহু ক্ষিতি অবতারি।

কুসুমিত বৃন্দাবনে রাধা সঙ্গে রঙ্গ করি॥

দাস মাধবে ভণে মুকতির আশাএ। *

ভরসা গোবিন্দ মোরে রাখ রাঙ্গা পাএ॥ ১৬।

* মূলে 'মুকুতিরায়াস' রূপে লিখিত আছে।

৬। যদুনাথ। পদসংখ্যা—১।

পদকর্ত্তাদের মধ্যে যদুনাথ দাস নামক এক কবি আছেন। তাঁহার পদ-সংখ্যা ১৭ বলিয়া নিরূপিত। তাঁহার সহিত ইঁহার কোন সম্বন্ধ আছে কিনা, বলা সহজ নহে।

গো রামের মা, গোপাল পলাইল কোন বনে!
মন্দ মন্দ বোলে মোরে, লাগ পাইলে তোরে,
সাজাই করিমু ভাল মতে।
দধি দুগ্ধ রস লনী, সব খাইল জাদুমণি,
দুয়ারে মুছিছে হাত খানি।
আঙ্গুলি নিসান খানি, বেকত হৈবে জানি,
তাহে গোপাল ঢালি দিছে পানি॥
দধি দুগ্ধ স সাছি (?) উ্শচা † করি ছিকো গাছি,
তাতে আক্ষি থুইয়াছি লবনী।
আনিআ মথন দণ্ড, ভাঙ্গিল লবনী ভাণ্ড,
হেটে গোপাল পাতিছে মু'খানি॥
যশোদার মুখ হেরি, ঠারি দিছে রোহিণী,
হেরে বসিছে জাদুমণি।
অন্ধকার জেন নিশি, বেকত হৈয়াছে শশী,
ধাইয়া ধরিছে নন্দরাণী॥
যশোদা শ্যামের বান্ধে, ফুকরি ফুকরি কান্দে,
এইবার ছাড় ল (লো) জননি।
যদুনাথে কহে দড়, এবার গোপাল ছাড়,
আর কভো‡ ন খাইব লবনী॥ ১৭।

৭। নন্দলাল রায়। পদ-সংখ্যা—১।

এতন্নামধেয় কোন কবি পদকর্ত্তাদের মধ্যে নাই। সম্ভব তিনি এবার মাত্র পরিজ্ঞাত হইলেন।

ভোর।

মুই কেনে পিরীতি কৈলুম্ নিঠুর কালার সনে!
নিঠুর কালার প্রেম জ্বালারে না সহে পরাণে! ধু।

† উশ্চা—উচ্চ। ‡ কভো—কভু।

ঘরেতে বসিয়া শুনি মথুরা এ বাজাএ বাঁশী।
শুনিলে স্বপনে দেখি জাগিলে উদাসী॥
রে নাথ!
কলসীতে জল নাই রে যমুনা বহু দূরে।
চলিতে না পারি আমি কাল যৌবনের ভারে॥
রে নাথ!
বাও নাই বাতাস নাই কদম্ব কেন লড়ে
মুই নারীর কর্ম্মদোষে ডাল ভাঙ্গিয়া পড়ে॥
রে নাথ!
রায় নন্দ লালে কহে শুন লো যুবতী।
শ্যাম রূপ দরশনে পূরাইব আরতি॥ ১।৮।

৮। রামজি দাস। পদ-সংখ্যা—১।

এক রামজি দাস কৃত 'শশি চন্দ্রের পুঁথি' পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে ইহাঁর সম্বন্ধ কি, আজও নির্ণীত হয় নাই। 'রামজি' কি 'রামজয়'?

আসিতে তোমার কুঞ্জে ওগো শ্রীরাধে!
অন্বেষণে চন্দ্রাবলী ছিল সেই পথে॥
বলে ছলে আগলিএ (নিল) উহার কুঞ্জেতে।
সদাএ রাধে রাধে নাম জপি, নিদ্রা না আইসে দুই নয়ানে। (১)
ঠেল না রাই তব চরণে, রাধে বিনে প্রাণি না বাচে।
গলে পীতবাস বান্ধ্যে তব চরণে,
লেখ্যে দিব দাসখত তব পদেতে।
নিজ দাস কৈরে রাই রাখ আন্ধারে।
বৃন্দাবনের দাস হৈএ থাকিবো তোমার সনে॥ (২)
মেরু সমান করে প্রাণ কর সাবধান, (?)
মান ভিক্ষা চাইএ রাই কৃপা করি কর দান।
বসনে বদন ঝাপি ফিরা্যা বসিলে!
আপনার বন্ধু বোলি ফির্যা না চাইলে!
রাত্রি রাধা দিবাএ রাধা রাধা নাম স্বপনে॥ (৩)
শুন রসময়ী কহি আমার নাম রসমতি (পতি?)।

রস ছাড়া রহিতে নারি রসে মোর স্থিতি ॥
রাধা কানু একি মন দূরে কার কে ?
রাধাকৃষ্ণ ভিন্ন নয় সভাএ জানে ॥
তোমার লাগি গোপ নারী মাঠেতে ফিরি।
রামজি দাসে বোলে প্যারি ক্ষেম দুঃখ আপনে ॥ (৪) ১।৯

ক্রমশঃ
আবদুল করিম।

কান্দী রাজ বংশাবলী।

(১) অনাদিবর সিংহ (২) সূর্য্যধর (৩) বিশ্বরূপ (৪) বরাহ (৫) ভৈরব (৬ ডোমন (৭) ইমন (৮) লক্ষীবর করণগুরু (৯) ব্যাসসিংহ (করতিয়া) (১০) বলবান সিংহ (১১) শ্রীপতি (১২) বিনায়ক (১৩) রাজা লক্ষীধর (১৪) রুদ্রসিংহ (১৫) গণপতি (১৬) জীবধর সিংহ (১৭) লোহাগড় (১৮) রামচন্দ্র (১৯) উদয় (২০) গৌরীবর (২১) বিষ্ণুদাস (২২) হরেকৃষ্ণ সিংহ

লালাবাবু।

(সংসার-জীবনী)

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পরলোক গমনের পর তদীয় পুত্র প্রাণকৃষ্ণ সিংহ পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হন। রাধাকান্ত (গঙ্গাগোবিন্দের সহোদর) অপুত্রক হওয়ায়, প্রাণকৃষ্ণকেই তিনি দ্ব্যামুষ্যায়ণ বা 'দ্বিপিতৃক' দত্তক পুত্র রূপে গ্রহণ করেন। সেই সূত্রে প্রাণকৃষ্ণ, রাধাকান্তের পরিত্যক্ত সম্পত্তিও প্রাপ্ত হন। এইরূপে প্রাণকৃষ্ণ বহু অর্থের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাহার সহিত তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি সমূহ সংযুক্ত হইয়া প্রাণকৃষ্ণকে বিশেষ ধনবান করিয়াছিল। প্রাণকৃষ্ণের বিদ্যাবুদ্ধিও যথেষ্ট প্রশংসনীয় ছিল। গঙ্গাগোবিন্দের সময় হইতে তিনিও পিতার সহিত ওয়ারেন হেষ্টিংসের অধীনে রাজস্ব বিভাগের উচ্চ কর্ম্মে নিয়োজিত ছিলেন। ১৮০১ খ্রীঃ প্রাণকৃষ্ণ সিংহ কয়েকটী সম্পত্তি ক্রয় করিয়া পৈতৃক বিষয়ের যথেষ্ট উন্নতি বিধান করেন। পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় প্রাণকৃষ্ণ সিংহেরও ধর্ম্মবিষয়ে যথেষ্ট অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। শুনা যায়, তিনিও কান্দীতে দেব, দ্বিজ, ও অতিথি সেবার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ১২১৫ সালে তিপান্ন বৎসর বয়সে প্রাণকৃষ্ণের জীবন-লীলার শেষ হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় সুধী ও ধার্ম্মিকপ্রবর পুত্র ভারতবিখ্যাত লালাবাবু (কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ) পিতার প্রচুর ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হন।

বঙ্গীয় সন ১১৮২ সালে (১৭৭৫ খ্রীঃ) প্রাণকৃষ্ণের ঔরসে, শুভদিনে, শুভ ক্ষণে, বিখ্যাত কান্দীর রাজবংশ, বিশেষতঃ কলঙ্কিত গঙ্গাগোবিন্দ-কুল পবিত্র ও উজ্জ্বল করিবার নিমিত্ত, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলগৌরব বৈষ্ণবচূড়ামণি প্রাতঃস্মরণীয় মহানুভব কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ জন্ম পরিগ্রহ করেন। এই কৃষ্ণচন্দ্রই 'লালাবাবু' নামে সাধারণ্যে পরিচিত। হিন্দুর পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বৃন্দাবন ধামে রাধারাণীর নামের সহিত অদ্যাপি প্রত্যহ প্রত্যেক ব্রজবাসীর মুখে যাঁহার জয়সঙ্গীত হইয়া থাকে, যাঁহার অসাধারণ স্বার্থত্যাগ, কঠোর ব্রত-উদযাপন ও কৃষ্ণভক্তির বিবরণ শ্রবণ করিলে মনুষ্যমাত্রকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়; যাঁহার অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপ আজিও বঙ্গবাসীর গৃহে গৃহে বৃদ্ধাকর্ত্রীর কাহিনীর মধ্যে বিরাজ করিতেছে; এখনও যাঁহার কীর্ত্তিধ্বজা বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার শীর্ষস্থান শোভিত করিয়া সশব্দে উড্ডীন হইতেছে,

সেই পুণ্য-শ্লোক পূতচেতার বিবরণ শ্রবণে কাহার না অভিরুচি জন্মে ? তাঁহার জীবনচরিত প্রণয়নে যে যে উপকরণের প্রয়োজন, দুঃখের বিষয়, এক্ষণ তাহার অধিকাংশই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমরা অনেক যত্নে সেই অকপট সাধুচরিত্রের মধুময়ী প্রতিকৃতির একটী ছায়া মাত্র সংগ্রহ করিয়া অদ্য পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কায়স্থগণ "লালা" নামে বিখ্যাত, এইজন্য ঐ প্রদেশে অবস্থিতিকালে তদ্দেশবাসিগণ কৃষ্ণচন্দ্রকে লালাবাবু নামে অভিহিত করিতেন। *

লালাবাবুর পূর্ব্ব-পুরুষগণের বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা, দেবদ্বিজ ও অতিথি ভক্তির পরিচয় আমরা ইতঃপূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি, কিন্তু লালাবাবু তাঁহার অনতিদীর্ঘ জীবনের মধ্যে যে জ্ঞান, যে অধ্যবসায়, যে লোকোত্তর ধর্ম্মানুরাগ ও যে দেবভক্তি জগৎকে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অতুল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাল্যকাল হইতে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি যেমন উৎকৃষ্ট ও প্রশংসনীয় ছিল, ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও তেমনই বলবতী ছিল। আশৈশব ধর্ম্মবৃক্ষের সুশীতল ছায়াতলে দুর্ল্লভ মনুষ্য জীবনকে অবস্থানের অবসর প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়াই লালাবাবু অদ্যাবধি অমরভাবে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে উভয় ধামেই বিরাজিত রহিয়াছেন।

শশধরের অমৃতময় কিরণজাল সংস্পর্শে চন্দ্রকান্তমণি যেরূপ দ্রবীভূত হয় সেইরূপ দয়াময় সাধুচিত্তও জীবকুলের আর্ত্তনাদ শ্রবণে স্বতঃই বিগলিত হইয়া থাকে। মর্ত্ত, সাধুহৃদয়ের উপমা-সংগ্রহে অপারগ।

ত্রিদিবের কমনীয়পারিজাতপুষ্পদাম-পরিশোভিত ও অমরভোগ্য সুধাময় ফল-ভারাবনত মনোহর বৃক্ষসমন্বিত রমণীয় নন্দনোদ্যানই এই করুণাময় হৃদয়-ক্ষেত্রের একমাত্র উপমার সামগ্রী। উন্নতচেতা সাধুর হৃদয়-পর্ব্বত-

* কৃষ্ণচন্দ্রের, লালাবাবু নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে——

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, উচ্চবংশীয় কায়স্থগণ 'লালা' নামে খ্যাত, তাই গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহার প্রিয় পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্রকে সাদরপূর্ব্বক "লালাবাবু" এই আদর সূচক নামে আহ্বান করিতেন। তদনুসারে অন্যান্য সকলেই তাঁহাকে 'লালাবাবু' বলিয়া আহ্বান করিতে থাকে। এই রূপে কৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বত্রই লালাবাবু নামে পরিচিত হইয়া উঠেন।

See *The Calcutta Review* No. CXV January, 1874, The Territorial Aristocracy of Bengal No. V, The Kandi Family.

বিনিঃসৃত করুণানদী কত সময়ে কত আর্ত্তের অনুর্ব্বর হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়া সে হৃদয়েরও উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। দয়াদ্র-হৃদয়ের শক্তি অপরিসীম। অন্ধকারময়ী অমারজনীর সহিত, কৌমুদী-পরি-প্লাবিতা শুক্লা যামিনীর যেরূপ প্রভেদ, পূতিগন্ধময় অশেষ যন্ত্রণাকর নরকের সহিত মন্দার মন্দাকিনী সুশোভিত সর্ব্বসুখদ স্বর্গধামের যেরূপ প্রভেদ, করুণাহীন কঠিন হৃদয়ের সহিত দয়াময় সাধুচিত্তেরও সেইরূপ পার্থক্য। এ হৃদয় ধনি-দরিদ্রের বিচার করে না এবং বাল্যযৌবন ও বার্দ্ধক্যনির্ব্বিশেষে এচিত্ত মনুষ্যদেহ অধিকার করিয়া থাকে। জীবের প্রতি দয়া প্রকাশই ধর্ম্ম। বৈষ্ণব ধর্ম্মেরও এই উপদেশ; সেই কারণেই বৈষ্ণবকবি লিখিয়াছেন—"জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব-সেবন। ইহা বৈ ধর্ম্ম নাই শুন সনাতন।" এই উপদেশের প্রথমাংশ লালাবাবুর অন্তঃকরণে বাল্যকাল হইতে স্বতঃই স্থানলাভ করিয়াছিল। একদা পিঞ্জরাবদ্ধ শুকপক্ষীর চীৎকার, তাহার পরাধীনতা-শৃঙ্খলে অবরোধ-জনিত দুঃখপ্রকাশ ও মুক্তিভিক্ষা-সূচক বলিয়া অনুমিত হওয়ায়, লালাবাবু করুণাপরবশ হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই দ্বিজটীকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন। বালকের ক্রীড়াকৌতুকাদির অভিনয় সন্দর্শন করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ চরিত্রের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। "child is the father of the man." মহাবীর নেপোলিয়ান শৈশবে তাঁহার সঙ্গিগণের সহিত যে সকল ক্রীড়ার অনুষ্ঠান করিতেন, সে সকল কেবল তাঁহার ভবিষ্যৎ বীরপ্রকৃতির পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। সুতরাং যে লালা বাবু উত্তরকালে এক সাধুচরিত্রের প্রতিকৃতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার বাল্যজীবনে এতাদৃশ করুণাসঞ্চার অবশ্যম্ভাবী।

বাল্যকাল হইতে লালাবাবুর অধ্যয়নেও বিশেষ আসক্তি ছিল। বহুদর্শী শিক্ষকবৃন্দের অধ্যাপনায় অল্পকালের মধ্যেই তিনি আরবী ও পারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া দেশের মধ্যে জনৈক উৎকৃষ্ট 'মুন্সী' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। এমন কি, তিনি অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের জটীল অংশ সমূহ ও স্বয়ং অনায়াসে অন্বয় ও ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইতেন এবং উক্ত দুর্বোধ গ্রন্থের অধিকাংশ স্থান তাঁহার কণ্ঠেই বিরাজ করিত। তাঁহার হস্তাক্ষরও বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল। তিনি যেমন সুন্দর লিখিতেন, তেমনি দ্রুতও লিখিতে পারিতেন।

তিনি স্বভাবতঃই সাধুপ্রকৃতির মনুষ্য ছিলেন। ঐশ্বর্য্য, সম্মান, ধন ও বিদ্যা, যে সকলের প্রত্যেকটী মনুষ্যের অভিমান বৃদ্ধির সাহায্যকারী, সেই সমস্তেরই অধিকারী হইয়া লালাবাবু কথনই গর্ব্ব বা বিলাসবাসনায় মনকে চালিত করেন নাই। যৌবনের ইন্দ্রিয়-ভোগ-লালসা তাঁহার উপর আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয় নাই। শুনা যায়, অনেক সময় তাঁহার বন্ধুবান্ধব তাঁহার চরিত্রের পবিত্রতা পরীক্ষার নিমিত্ত অসদুপায় অবলম্বন করিতে যাইয়া তাঁহার নিকট হইতে বিপরীত ফললাভ করিতেন।* তিনি প্রকৃতই পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ সন্দর্শন করিতেন।

লালাবাবু গঙ্গাগোবিন্দের জীবিতাবস্থাতেই রশোড়ানিবাসী গৌরমোহন ঘোষের (ঘটকের পুথিতে ইনি আঁকারী ঘোষ নামে বিখ্যাত) কন্যা বিখ্যাত রাণী কাত্যায়নীর পাণিগ্রহণ করেন। প্রাণকৃষ্ণ সিংহের সময়ে কান্দীর রাজ সম্পত্তি যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিল, সুতরাং লালাবাবু রাজার সন্তান হইয়াও বাধ্য হইয়া কিছুদিনের নিমিত্ত রাজদ্বারে দাসত্ব করিয়াছিলেন। কি কারণে তাঁহাকে এই দাসত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছিল, সাধারণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে তাহা লিপি করা গেল। ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

* (১) প্রবাদ এই যে, একদা লালাবাবু নৈশভোজনে গমন করিলে তাঁহার অজ্ঞাতসারে জনৈক রূপলাবণ্যময়ী বারবিলাসিনীকে তাঁহার শয্যাশায়িনী করা হইয়াছিল। লালাবা বিশ্রাম-শয্যায় গমন করিয়া অপরিচিতা রমণীকে তথায় শায়িতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত এবং তাহার পরিচয় লাভ করিতে উৎসুক হন। বারবিলাসিনী আপনাকে লালাবাবুর চরণসেবিকা বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলে তিনি অবাক হইয়া যান এবং অবিচলিতচিত্তে রমণীকে সাধুপদেশ প্রদান পূর্ব্বক বিদায় দেন। সেই উপদেশ লাভেই বারবনিতার মতি ফিরিয়া যায়।

(২) লালাবাবু রূপবান ছিলেন না। একদা তিনি বিষয় কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহার জনৈক বন্ধুর পরামর্শক্রমে এক বারনারী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া রহস্য করিয়া বলিয়াছিল "আহা! বাবুর কি মনোহর রূপ! আমি আপনার রূপে মোহিত হইয়াছি" ইত্যাদি। বারনারী সেস্থান পরিত্যাগ করিলে লালাবাবু বেশ্যার বিচরণ ভূমির উপর গঙ্গাজল ছড়াইয়া দিয়া স্থানের বিশুদ্ধি সম্পাদন করেন।

বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক।

ঈশ্বরচন্দ্র মল্লিক—

"জ্ঞানোল্লাস" রচয়িতা।

এই পুস্তকে দাতৃত্ব, আতিথেয়তা, দয়া, ধৈর্য্য প্রভৃতি নীতিবিষয়ক উপদেশ আছে। এই পুস্তকের আকার ক্ষুদ্র—১৮ পত্র; ১৮৫৪ খ্রীঃ মুদ্রিত হয়।

নিবাস—বড়বাজার, কলিকাতা।

ঈশ্বরচন্দ্র রায়, রাজা—

"সারদামঙ্গল" নামক সংগীত-গ্রন্থরচয়িতা।

ঈশ্বরচন্দ্র, নদীয়া কৃষ্ণনগরের রাজা ছিলেন। বংশতালিকা—৬ রুদ্র, ৫ রামজীবন, ৪ রঘুরাম, ৩ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, ২ গিরিশচন্দ্র, ১ ঈশ্বরচন্দ্র (১৭৮৯-১৮০২ খ্রীঃ, রাজত্বকাল), ২ গিরিশচন্দ্র, ৩ শ্রীশচন্দ্র, ৪ সতীশচন্দ্র ৫ ক্ষিতীশচন্দ্র।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত, কৃষ্ণনগর রাজ্যের ক্রমিক উন্নতি হইতেছিল, কিন্তু রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের অমিতব্যয়িতা ও উচ্ছৃঙ্খলতাদোষে তাহার অনেক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

রাজা শিবচন্দ্রের ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র, তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের বিরুদ্ধে, নবদ্বীপের জমিদারীসম্পর্কীয় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দানপত্র শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া কলিকাতা সুপ্রীমকোর্টে নালিশ করেন; বিখ্যাত পণ্ডিতগণের মতানুসারে উক্ত দানপত্র শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রমাণিত হয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা, দেশবিখ্যাত বহু গুণবান ব্যক্তি কর্ত্তৃক সমুজ্জ্বল রহিত। রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সময় ও রাজসভায় প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বেত্তা বিনয় বাচস্পতি, শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, কাশীনাথ চূড়ামণি, রামলোচন ন্যায়ভূষণ, রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, রামদাস সিদ্ধান্ত, কালীকিঙ্কর বিদ্যাবাগীশ, কৃপানাথ তর্কভূষণ প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতগণ বিরাজ করিতেন। এতদ্ব্যতীত, ত্রিবেণীতে তৎকালে জগন্নাথ পঞ্চানন এবং শান্তিপুরে রাধামোহন গোস্বামী বর্ত্তমান ছিলেন।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের রচিত গীতগুলি গাহিয়া, তৎকালে কৃষ্ণনগর নিবাসী গোপ, তৈলকার এবং আচার্য্য ব্রাহ্মণগণ যথেষ্ট উপার্জ্জন করিত।

ঈশ্বরচন্দ্র সরকার—

"প্রভাস খণ্ডের" অনুবাদক।

উদয়চন্দ্র আঢ্য—

"সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়" নামক বঙ্গভাষার অতি প্রাচীন সংবাদপত্রের সম্পাদক; এতদ্ব্যতীত তিনি, ইংরাজী বাঙ্গালা 'অভিধান', 'শব্দাম্বুধি', নূতন অভিধান প্রভৃতি সঙ্কলন এবং ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ ও শাস্ত্র সমূহ সম্পাদন ও প্রচার করিয়াছিলেন।

জন্ম—অনুমান, ১৮২১ খ্রীঃ।

মৃত্যু—১৮৫৬ খ্রীঃ মার্চ্চ মাসে কলিকাতার বাটীতে, মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে, বিসূচিকা রোগে।

উদয়চন্দ্র, অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; পিতা, গোলকচন্দ্র আঢ্য।

('অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য' দেখ)

উদয়চন্দ্র, একজন সিনিয়র স্কলার ছিলেন। প্রথমতঃ তিনি মাসিক এক শত টাকা বেতনে কলিকাতা ট্রেজরীতে কর্ম্ম করিতেন। তদনন্তর লবণ বিভাগে কিছুদিন কার্য্য করিলে পর, আড়াই শত টাকা বেতনে আবগারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হন। এই কর্ম্মোপলক্ষে তাঁহাকে ঢাকা, বরিশাল, প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। যেদিন তিনি গভর্ণমেণ্ট হইতে ডেপুটীর পদ প্রাপ্ত হন, সেই দিনই তিনি কলিকাতার বাটীতে বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

উদয়চন্দ্র, মৃত্যুকালে এক বৎসরের একটি শিশুসন্তান রাখিয়া যান, নাম কার্ত্তিকচন্দ্র আঢ্য। গতবর্ষে তিনিও দেহত্যাগ করিয়াছেন।

উদয়চন্দ্রের বিধবা পত্নী এখনও বর্ত্তমান আছেন।

কলিকাতা আঢ্য পরিবার কর্ত্তৃক ১৮৩৫ খ্রীঃ হইতে বঙ্গভাষার অতি প্রাচীন সংবাদপত্র, "সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়" প্রকাশিত হয়। বাবু হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সর্ব্ব প্রথম সম্পাদক। তিনি কার্য্যান্তরে গমন করিলে, উদয়চন্দ্র আঢ্য মহাশয় এই পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। তৎপরে তিনি আবগারী বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়া স্থানান্তরে গমন করিলে, এই পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার পরিত্যাগ করেন।

('হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়' দেখ)

উদয়চন্দ্র, অতিশয় অধ্যয়নশীল, মিষ্টভাষী ও উচ্চমনা পুরুষ ছিলেন। বড় লোক হইয়াও তিনি বাহ্যাড়ম্বরে একান্ত আস্থাশূন্য ছিলেন।

(উদয়চন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র, সচিত্র শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকাশক, শ্রীযুক্ত বাবু গোষ্ঠবিহারী আঢ্য মহাশয় কর্ত্তৃক "সাহিত্য সেবকের" নিমিত্ত বিশেষভাবে সঙ্কলিত বিবরণী, পরিষৎ পত্রিকা ৪—১১৩)

উদ্বব দাস—

বৈষ্ণব পদকর্ত্তা।

উদ্ধব দাস, পদকল্পতরু সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব দাসের (গোকুলানন্দ সেন) বন্ধু ছিলেন এবং উক্ত সুবিখ্যাত পদাবলীসংগ্রহ গ্রন্থের সঙ্কলন বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন।

ইহঁার প্রকৃত নাম, কৃষ্ণকান্ত মজুমদার। জাতি, বৈদ্য; নিবাস, মুর্শীদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দী মহকুমার অধীন বৈঞা নামক গ্রাম।

উদ্ধব দাস, পদামৃত সমুদ্র সঙ্কলয়িতা শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুর মহাশয়ের মন্ত্র শিষ্য ছিলেন। ইনি, বঙ্গীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে বর্ত্তমান ছিলেন।

(পারিষৎ পত্রিকা ৬-২৯৮, গৌরপদ তরঙ্গিণী, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

উদ্ধবদাস বা উধোযোগী—

কবি-সংগীত রচয়িতা।

উদ্ধব সামন্ত—

যাত্রার পালা রচয়িতা।

উদ্ধবানন্দ—

"রাধিকামঙ্গল" রচয়িতা।

(পরিষৎ পত্রিকা)

উপেন্দ্রনাথ দাস—

"সুরেন্দ্র-বিনোদিনী," "শরৎ-সরোজিনী," "দাদা ও আমি" প্রভৃতি নাটকাবলী রচয়িতা।

জন্ম—১২৫৫ সাল, কলিকাতা।

মৃত্যু—১৩০২ সাল ২২শে শ্রাবণ, ৪৭ বৎসর বয়সে।

পরিচয়—উপেন্দ্রনাথ কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত উকীল কায়স্থ-

কুলোদ্ভব শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইঁহার অপরাপর ভ্রাতৃগণ প্রায় সকলেই সুশিক্ষিত—(১)শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম-এ, সুবিখ্যাত "সময়" পত্রের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী, (২) শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ দাস, কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী (৩) মিঃ ডি, এন্ দাস বিলাতে শিক্ষিত অধ্যাপক এবং গ্রন্থ-রচয়িতা (৪) সর্ব্ব কনিষ্ট ভ্রাতা, পিতার জমীদারীর তত্ত্বাবধারণ করেন।

শৈশব—উপেন্দ্রনাথ, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন এবং প্রায় সকল পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কারও স্কলার্সিপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎকালীন প্রথামত দ্বাদশ বৎসর বয়সে উপেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় যথাকালে উপেন্দ্রনাথ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই উপেন্দ্রনাথের মস্তিস্কে এক বিদ্রোহভাব অঙ্কুরিত হইয়াছিল; এখন যাহা প্রকাশ পাইল—তিনি পিতৃদ্রোহী হইয়া নানাস্থানে পলায়ন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পর কিছুদিন মাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যালয়ের সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন। ফলে, আর কোন পরীক্ষাই দেওয়া হইল না। কিন্তু তিনি ইংরাজী ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

স্বাধীন জীবন, স্বেচ্ছাচারিতা—উপেন্দ্রবাবু, আমূল সমাজ-সংস্কার বিষয়ে একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এতৎসম্বন্ধে তিনি সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মোহিত করিতেন। বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনে তাঁহার বড়ই আগ্রহ ছিল। ১২৭৪ সালে তাঁহার প্রথমা পত্নী পরলোকগত হইলে, উগ্রক্ষত্রিয় জাতীয়া এক বিধবার পাণিগ্রহণ করেন। তদবধি স্বীয় পরিবারবর্গের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

এই সময় তিনি ঝটিকা-তাড়িত কাণ্ডারী-হীন তরির ন্যায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কখন বা স্কুল স্থাপন করেন, কখন বা ইংরাজী সংবাদ পত্র প্রকাশিত করেন; কিন্তু কিছুতেই তিনি মনঃসংযোগ করিয়া ভাবী স্কুলের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতে পারিলেন না। এদিকে কিন্তু বহু অর্থনাশ করিয়া অতি মাত্রায় ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িলেন। তদনন্তর ১২৮১ সালে থিয়েটরে যোগদান করেন। এই সময় হইতে তাঁহার নাটক রচনার সুত্রপাত হইল। ক্রমশঃ

শ্রীশিবরতন মিত্র।

অর্চ্চনা।

(প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী)

সম্পাদক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত প্রখ্যাতনামা লেখকবৃন্দ অর্চ্চনায় লিখিয়া থাকেন। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্‌, বেঙ্গলী, আনন্দবাজার, বঙ্গবাসী, বসুমতী, প্রভৃতি বিখ্যাত সংবাদ পত্র সমূহে বিশেষ প্রশংসিত। ১৩১১ সালের ফাল্গুন মাস হইতে দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইল। অগ্রিম বর্ষিক মূল্য রাজসংস্করণ ২৲ দুই টাকা মাত্র, সুলভ সংস্করণ ১।০ পাঁচসিকা মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র—সহকারী সম্পাদক।

অর্চ্চনা কার্য্যালয়, ২৯ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন,
কলিকাতা।

বীরভূমি সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। বীরভূমির আকার ডিমাই আটপেজী পাঁচ ফর্ম্মার কম হইবে না।

২। বীরভূমি প্রতিমাসের প্রথম দশদিনের মধ্যে প্রকাশিত হইবে। মাসের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে আমাদের পত্র লিখিবেন।

৩। বীরভূমির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা মাত্র। এক খণ্ডের মূল্য ৵১০। নমুনা পাইতে হইলে ৵১০ টিকিট পাঠাইতে হয়।

৪। বিজ্ঞাপনের হার,

মলাটে ১ পৃষ্ঠা মাসিক	৩৲
„ ½ „ „	২৲
বিজ্ঞাপনীর ভিতর ১ „ „	২॥০
„ ½ „ „	১॥০

প্রতি লাইনে ⁄১০।

বহু দিনের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে আমরা স্বতন্ত্র যুক্তি করিয়া থাকি। বিজ্ঞাপনের টাকা অগ্রিম দেয়।

শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য্য বি, এ,
ম্যানেজার।
কীর্ণহার, জেলা বীরভূম।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

৫ম খণ্ড বীরভূমির ৫ সংখ্যা গ্রাহকগণের নিকট প্রেরিত হইল। এখনও বহু গ্রাহক মূল্য দেন নাই। গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন অনতিবিলম্বে আপন আপন দেয় মূল্য পাঠাইয়া দেন। অথবা যদি আপত্তি না থাকে, তবে আমরা ভিঃ পিঃ ডাকে কাগজ পাঠাইয়া মূল্য আদায় করিব। যাঁহাদের আপত্তি আছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সত্বর জানাইবেন। ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না। পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ ও জীবন গ্রাহকগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে। ইহা স্মরণ করিয়া গ্রাহকমহোদয়গণ কার্য্য করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য্য, বি, এ,
ম্যানেজার।
কীর্ণহার পোঃ জেলা বীরভূম।

কলিকাতা, ৩০/৫ মদনমিত্রের লেন, নব্যভারত-প্রেসে,
শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত। ১৩১১ সাল।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা

৫ম খণ্ড] জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ [৬ষ্ঠ সংখ্যা ।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ,
সম্পাদিত।

সূচী।

কীর্ণহারের সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশহিতৈষী জমিদার শ্রীযুক্ত
বাবু সৌরেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের সম্পূর্ণ
ব্যয়ে বীরভূম জেলার অন্তর্গত
কীর্ণহার গ্রাম হইতে
শ্রীদেবিদাস ভট্টাচর্য্য বি, এ,
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
২৫শে বৈশাখ—১৩১২।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ১॥০। এই সংখ্যার মূল্য ৶১০।

৫ম খণ্ড।] জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক।

রচিত নাটকাদি—তদানীন্তন প্রচলিত প্রথানুসারে পৌরাণিক ঘটনা-বলম্বনে নাটক রচনা না করিয়া উপেন্দ্রনাথ, বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন এবং দেশের রাজনৈতিক অবস্থা অবলম্বন করিয়া "শরৎ-সরোজিনী" নামক নাটক রচনা করিলেন। ইহার কিছু দিন পর, "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নামক আর একখানি নাটক রচনা করেন। তৎকালে "বঙ্গীয় রঙ্গভূমিতে" এই দুই নাটক এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়া দর্শকবৃন্দের মন সমধিক উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই পুস্তকদ্বয়ে অন্যায়ভাবে রাজপুরুষদিগের অত্যাচার ও অবিচার-কাহিনী বর্ণিত থাকায়, উপেন্দ্র বাবুর এক মাস কারাদণ্ডাজ্ঞা হয়। পরে তিনি হাইকোর্টে আপীল করিয়া এই দণ্ডাজ্ঞা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

বিলাত গমন, ইত্যাদি—ইহার পর তিনি স্নেহপ্রবণ পিতার পুনরায় স্নেহ লাভে সমর্থ হইয়া ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত গমন করেন। তথায় অধ্যয়নের প্রতি আদৌ মনঃসংযোগ না করিয়া কেবল মাত্র বক্তৃতা ও অন্যান্য বৃথা কার্য্যে সময় নষ্ট করতঃ দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ কাল বিলাতে পিতার বহু অর্থ নাশের পর, ১২৯৩ সালে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর অনেক কার্য্যের সুযোগ পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং এক থিয়েটর খুলিলেন। পুনরায় ঋণগ্রস্ত হইলে তাঁহাকে এ কল্পনা আপাততঃ পরিত্যাগ করিতে হইল। বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইবার

কয়েক মাস পরই, পূর্ব্বোক্ত দুই নাটক হইতে বিভিন্ন প্রকারের, বিলাত প্রবাস কালে রচিত, "দাদা ও আমি" নামক নাটক প্রকাশ করেন। এই নাটকে উপেন্দ্রনাথের অভিনব সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শেষ—নিজ অর্থবলে গঠিত থিয়েটরের শোচনীয় পরিণাম দর্শনে, উপেন্দ্র-বাবু সাধারণের অর্থ সাহায্যে এক প্রকাণ্ড থিয়েটর গঠনের জন্য সচেষ্ট হইলেন এবং এতদুদ্দেশে দেশে দেশে অর্থ সংগ্রহের জন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া যশোহর জেলায় ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া ১৩০২সালের ২২শে শ্রাবণ তারিখে স্বীয় পিতৃভবনে প্রাণ-ত্যাগ করেন। অকালে, ৪৭ বৎসর মাত্র বয়সে, উচ্ছৃঙ্খল জীবনের এইরূপ অবসান হইল।

পূর্ব্বোক্ত নাটকত্রয় ব্যতীত, উপেন্দ্রনাথের কয়েকটি অপ্রকাশিত রচনাও আছে।

(উপেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা "সময়" সম্পাদক, শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক কৃপা পূর্ব্বক "সাহিত্য-সেবকের" নিমিত্ত বিশেষ ভাবে সংগৃহীত বিবরণী হইতে সঙ্কলিত)

উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়—

বৃহৎকুর্ম্মপুরাণ হইতে সংগৃহীত আখ্যায়িকা অবলম্বনে "দণ্ডীপর্ব্ব" নামক গ্রন্থ রচয়িতা।

এই গ্রন্থে শুকদেব রম্ভা এবং পরীক্ষিৎ শ্রেষ্ঠ [illegible] রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

(বঙ্গভাষার লেখক---২৩২ পৃঃ)

উমাচরণ মিত্র—

"গোলেব কায়লী" নামক পারস্য গ্রন্থের অনুবাদক।

উমেশচন্দ্র বটব্যাল, এম,এ, বিদ্যালঙ্কার—

"সাংখ্যদর্শন" ও "বেদ-প্রকাশিকা" রচয়িতা এবং বিবিধ সাময়িক পত্রিকায় বৈদিক প্রবন্ধাবলী ও "গৌরাঙ্গচরিত" (অসম্পূর্ণ) প্রভৃতির লেখক।

জন্ম—হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুলের সন্নিকট রামনগর নামক গ্রামে, স্বীয় পৈত্রিক ভবনে ১২৫৯ সালের ১৬ই ভাদ্র (১৮৫২ খ্রী, ৩০শে আগষ্ট) সোমবার, বেলা দুই প্রহরের সময়।

মৃত্যু—১৩০৫ সালে, ১লা শ্রাবণ (১৮৯৮ খ্রীঃ, ১৬ই জুলাই) ম্যালেরিয়া জ্বরে কলিকাতার বাটীতে।

বংশ তালিকা—৯ কুমুদানন্দ বা রামমোহন বটব্যাল, ৮ ধর্ম্মদাস, ৭ যাদবেন্দু, ৬ দয়ারাম, ৫ রামকানাই, ৪ কাশীনাথ, ৩ রাজচন্দ্র, ২ শ্রীদুর্গা-চরণ বটব্যাল, ১ উমেশচন্দ্র বটব্যাল, ২ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বটব্যাল প্রভৃতি ছয় পুত্র। মাতা—প্রসন্নময়ী দেবী।

বংশ পরিচয়—এই বটব্যাল বংশীয়গণ, শাণ্ডিল্য গোত্রজ রাঢীশ্রেণী শুদ্ধ শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব ভট্টনারায়ণ সন্তান। কুমুদানন্দ বা রামমোহন বটব্যাল, থানাকুলের মুখুটী বংশীয়দিগের বাটীতে বিবাহ করিয়া এই স্থানে বাস করেন। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মদাস ও যাদবেন্দু সমাজে সম্ভ্রম লাভ করিয়া গোষ্ঠীপতি শ্রোত্রীয় বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। যাদবেন্দু, পারিবারিক আরাধ্য দেবতা মদনগোপল দেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন; অদ্যাবধি তাঁহার পূজা যথাবিধি সুসম্পন্ন হইতেছে। দয়ারাম, বর্দ্ধমান রাজ সরকারে চাকুরী করিয়া এবং বর্দ্ধমান রাজের অধীন অনেক জমীদারী মহালও ইজারা গ্রহণ করিয়া এই বটব্যাল পরিবারকে বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। বৃহৎ পরিবারের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায়, দয়ারামই থানাকুল হইতে আপন ইজারা-ভুক্ত মহাল মধ্যে অদূরবর্ত্তী রামনগর নামক গ্রামে আসিয়া বাটী নির্ম্মাণ করেন। দয়ারাম, গভর্ণর জেনেরেল হেষ্টিংস সাহেবের সময় বর্ত্তমান ছিলেন। বর্দ্ধমানের তদানীন্তন কালেক্টর গ্রেহেম সাহেবের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণাপরাধের জন্য কৌন্সিলে বিচার কালীন আবশ্যকীয় খাতা পত্র দয়ারামের হস্তাক্ষরে লিখিত থাকায় তাঁহাকে সাক্ষ্য দান করিতে হইয়াছিল। ১১৭৬ সালের দারুণ দুর্ভিক্ষের বৎসর (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর), সঞ্চিত ধান্য বিক্রয় করিয়া তিনি অতিমাত্রায় লাভবান হন। দয়ারামের মধ্যম পুত্র রামকানাই, তান্ত্রিক মতের পক্ষপাতী ছিলেন—"জগদীশ্বরী" নামক যন্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতেই স্বয়ং ইষ্টদেবতার অর্চ্চনা করিতেন। এই যন্ত্রে ইষ্টদেবতার অর্চ্চনা করা এক্ষণ পারিবারিক প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রামকানাই, স্বর্গীয় মহাত্মা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক ব্যক্তি। রামকানাইয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কাশীনাথ, তেলেনীপাড়ার জমীদারদিগের নিকট কিছু ভূসম্পত্তি ইজারা গ্রহণ করিয়া যথেষ্ট লাভবান হইয়াছিলেন। ইহাঁর একমাত্র পুত্র রাজচন্দ্র, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ ও অভয়চরণ নামক দুই পুত্র রাখিয়া

৪৬ বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করেন। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বটব্যাল মহাশয়, স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের জনক। ইনি এখনও অনন্ত শোকের বোঝা বহন করিয়া জীবিত রহিয়াছেন।

শৈশব, শিক্ষা—পঞ্চমবর্ষ পর্য্যন্ত গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ করিয়া খানাকুল বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। এখানে ২য় শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করিলে পর, পিতা দুর্গাচরণ, স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রতিষ্ঠিত 'খানাকুল কৃষ্ণনগর ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যালয়ে' (Khanakul Krishnanagur Anglo Sanskrit School) অনেক উপরোধের পর বালক উমেশচন্দ্রকে ভর্ত্তী করিতে সমর্থ হন। এই স্কুল হইতে ১৮৬৮ খ্রীঃ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া উমেশচন্দ্র, মাসিক ১৪৲ টাকা বৃত্তি পাইলে সংস্কৃত কলেজে এফ, এ, পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৭০ খ্রীঃ এফ, এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ প্রথম বিভাগে বি, এ এবং তাহার পর বৎসর ১৮৭৪ খৃঃ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করায় সংস্কৃত কলেজ হইতে "বিদ্যালঙ্কার" উপাধিতে ভূষিত হইলেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৬ খ্রীঃ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়া মৌয়াট্ পদক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করিলেন।

উপধি ও রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিলাভ—মৌয়াট্ মেডল।

প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় প্রথমতঃ বালক উমেশচন্দ্রকে অতি শিশু ভাবিয়া, স্বগ্রামে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিতে আপত্তি করিয়াছিলেন; এখন সেই উমেশচন্দ্রই, তাঁহার অধীনে সংস্কৃত কলেজ হইতে সর্ব্ব প্রথম উপরোক্ত বৃত্তি লাভ করিয়া তাঁহাকে সমধিক গৌরবান্বিত করিলেন। উমেশচন্দ্র, প্রসন্নকুমারের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন—আমরা প্রায়ই তাঁহার নিকট প্রসন্নকুমারের সসম্ভ্রম নামোল্লেখ করিতে শুনিতে পাইতাম।

কর্ম্মক্ষেত্র—এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার অব্যবহিত পরই বটব্যাল মহাশয় নড়াইল ইংরাজী বিদ্যালয়ে মাসিক একশত টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন; তজ্জন্য বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বেই তাহা

পরিত্যাগ করেন। তদনন্তর কিছু দিন সংস্কৃত ও প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষকতা করিলে পর ১৮৬৭ খ্রীঃ ১৪ই আগষ্ট তারিখে তিনি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটর পদে নিযুক্ত হইয়া আলিপুরে কার্য্য করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। তমলুক, মানভূম, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে দশবৎসরকাল কার্য্য করিলে পর, প্রতিযোগীতা পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া Statutory Civil Serviceএর জন্য মনোনীত হইয়া ১৮৮৮ খ্রীঃ ৯ই জুন তারিখে Assistant Magistrate এর পদে নিযুক্ত হইলেন। ১৮৯১ খ্রীঃ হইতে অস্থায়িভাবে মাজিষ্ট্রেটর ও কালেক্টর স্বরূপ বীরভূম, বাঁকুড়া, মালদহ, হাওড়া, বগুড়া প্রভৃতি স্থানে কার্য্য করিলে পর, ১৮৯৬ খ্রীঃ ১লা এপ্রেল তারিখে স্থায়িভাবে মাজিষ্টর ও কালেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন।

গবর্ণমেণ্টের নিকট তিনি সমধিক প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কোন কোন আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট অনেক সময়ে তাঁহার মতামত গ্রহণ করিতেন। উমেশ-চন্দ্র যখন বীরভূমে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন তৎকালীন ছোটলাট সাহেব বাহাদুর (Sir Charles Elliot) উক্ত জেলা পরিদর্শন করিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথনে ও তাঁহার কার্য্যতৎপরতা দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলে পর, তাঁহাকে জেলার মাজিষ্ট্রে পদে অস্থায়িভাবে নিযুক্ত করেন। মালদহ জেলায় অবস্থান কালে, তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া ছোটলাট সাহেব বাহাদুর, স্বহস্তে পত্র লিখিয়া আপন সন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে মালদহ হইতে বগুড়ায় স্থানান্তরিত করিবার সময়, তৎকালীন বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের চিফ সেক্রেটারী, শ্রীযুক্ত কটন সাহেব বাহাদুর তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কতকাংশ এই স্থলে উদ্ধৃত হইল—

" * * * Sir Charles Elliot is pleased to have heard a very favourable account of your work at Maldah and I am to say that one of the reasons you are selected for Bogra is that it is necessary to find an officer for that District who will not only stay there for some time but will be able to raise the standard of administration which has unfortunately been much neglected. You well find that all departments there require to be well worked after. * * *

সাহিত্য-সেবা—বটব্যাল মহাশয়ের বৈদিক প্রবন্ধাবলী সাধারণ পাঠক-বর্গের মধ্যে তাদৃশ সমাদর লাভে অসমর্থ হইলেও, তৎসমুদয়ে যে বঙ্গভাষার প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি স্বাধীন ভাবে, পাশ্চাত্য পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া, এই প্রবন্ধ সমূহে, বৈদিক কালের আর্য্য সমাজের চিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তৎসমুদয়ে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গভীর গবেষণা শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বটব্যাল মহাশয় গুরুতর সরকারী কর্ত্তব্য কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াও যে সাহিত্য-সেবায় প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছিলেন, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা।

বেদান্ত শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার অতিশয় অনুরাগ ছিল। দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে সাংখ্যদর্শন তাঁহার প্রিয় ছিল এবং তিনি এই দর্শনশাস্ত্রের সূত্র ও কারিকাবলম্বনে স্বাধীনভাবে যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার সাংখ্যদর্শন ব্যাখ্যায় তাহাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ব্যাখ্যা সকল স্থলে প্রচলিত মতানুযায়ী না হইলেও, ইহাতে তাঁহার গভীর দার্শনিক গবেষণা শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মালদহ জেলায় অবস্থান কালে, তিনি ধর্ম্মপাল প্রদত্ত একখানি অতি প্রাচীন, সংস্কৃত ভাষার পালী অক্ষরে লিখিত, তাম্রশাসন আবিষ্কার করেন। এই তাম্রশাসন খানির পাঠোদ্ধার করিয়া,তিনি ইংরাজীতে Asiatic Society's Journal এবং বাঙ্গালার "সাধনা"নামক সাময়িক পত্রিকায় টীকা টিপ্পনী সহ প্রকাশিত করেন। আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চব্রাহ্মণ এতদ্দেশে আনয়ন করেন, তাঁহাদের মধ্যে শাণ্ডিল্যগোত্রজ ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্ব পুরুষ ভট্টনারায়ণকে, রাজা ধর্ম্মপাল যে চারিখানি গ্রাম প্রদান করেন, এই তাম্র-শাসন খানি তাহারই সনন্দ। ইহাতে তৎকালীন রাজকীয় প্রথার অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; এই নিমিত্ত ইহা প্রত্নতত্ত্বজ্ঞদিগের অতি আদরের বস্তু স্বরূপ পরিগণিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম মহা অনর্থের মূল, এইরূপ একটা উৎকট ধারণা কিরূপে তাঁহার মনোমধ্যে স্থান পাইয়াছিল। এই নিমিত্ত তিনি প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া, সাহিত্য পত্রিকায় "গৌরাঙ্গচরিত" নামক প্রবন্ধে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের চরিতালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া ইতিপূর্ব্বে তিনি সাধারণের নিকট যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রাপ্ত হইতেছিলেন, তাহা হইতে এক প্রকারে বঞ্চিত হইলেন।

বটব্যাল মহাশয় রচিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে কতকগুলি, তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর, সম্প্রতি তদীয় পুত্রগণ কর্তৃক "সাংখ্যদর্শন" ও "বেদপ্রকাশিকা" নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত বহুতর অসম্পূর্ণ রচনাবলী, এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে এবং কতকগুলি তাঁহার মৃত্যুর পর 'সাহিত্য-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

মতামত—উমেশচন্দ্র, সাংখ্য মতানুবর্ত্তী দ্বৈতবাদী ছিলেন; কিন্তু শেষ বয়সে ঈশ্বরবাদে আস্থাবান হইয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষার গুণে তিনি প্রচলিত উপাসনা ও পৌত্তলিকতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু জীবনের শেষাংশে পারিবারিক প্রথানুযায়ী যন্ত্রযোগে উপাসনার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। 'সমাজধর্ম্ম পালনে, তিনি চাতুর্ব্বর্ণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বেদ-মূলক ব্রাহ্মণ নিয়ন্ত্রিত সামাজিক ব্যবহারে অনুরাগী ছিলেন'।

বিবিধ—বটব্যাল মহাশয়ের স্বভাব অতিশয় নম্র ছিল; এই নিমিত্ত তিনি সমাজে সকলের প্রিয় হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি কোনরূপ দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতেন না; বাহ্যাড়ম্বর তিনি ভালবাসিতেন না। বৈদেশিক পরিচ্ছদের প্রতি তিনি অনুরক্ত ছিলেন না—উপরিতন কর্ম্মচারীগণ এই নিমিত্ত তাঁহাকে অনেক সময় প্রশংসা করিতেন।

শেষ—১৮৯৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে বগুড়া জেলায় মফঃস্বল পরিভ্রমণ কালে তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন। চিকিৎসা বা স্থান পরিবর্ত্তনে কোন ফলোদয় হইল না। অবশেষে ১৮৯৮ খ্রীঃ ১৬ই জুলাই তারিখে (১৩০৫ সাল ১লা শ্রাবণ) বৃদ্ধ পিতামাতা এবং অনেকগুলি শিশু সন্তান রাখিয়া অকালে ৪৬ বৎসর মাত্র বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার অকাল মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বোল্টন সাহেব বাহাদুর (Hon'ble Mr. C. W. Bolton C. S. I.) তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বটব্যাল মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত হইল।

" I heard yesterday with deep regret the sad death of your father. The Lieutenant Governor, to whom I re-communicated the news today is extremely sorry. His Honor has directed me to communicate to you and all the members of your family his deep sympathy. My own sym-

pathy is within your great affliction. The Government has lost in your father a most excellent officer whose work, wherever he was placed, was marked by conscientiousness, ability and vigour. The Public service has distinctly suffered by his untimely removal at an age when many years of active life appeared to be yet before him."

(স্বর্গীয় বটব্যাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ বটব্যাল কর্তৃক "সাহিত্য-সেবকের" নিমিত্ত বিশেষ ভাবে সংগৃহীত জীবনী; সাহিত্য ১৩০৫; প্রদীপ)

শ্রীশিবরতন মিত্র।

বৈজ্ঞানিকের ভুল নহে।

অজ্ঞতা ও অপূর্ণতা।

দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক বালক শ্বেতকেতুকে তদীয় পিতা আরুণি অধ্যয়নার্থ গুরুগৃহে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্বেতকেতু গুরুগৃহে দ্বাদশ বৎসর অবস্থান করিয়া ষড়ঙ্গ সহিত সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। আরুণি পুত্রকে উদ্ধত ও পণ্ডিতম্মন্য অবলোকন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন—অজ্ঞতা ও অপূর্ণতাই ঔদ্ধত্যের ও অজ্ঞতার কারণ। তখন তিনি শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বৎস! তুমি কি গুরুর নিকট সেই বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ, যাহা শিক্ষা করিলে যাবতীয় অজ্ঞাত জ্ঞাত হওয়া যায়, অশ্রুত শ্রুত হওয়া যায়? যেমন মৃত্তিকা জানিলে সমস্ত মৃণ্ময় পদার্থ জানা যায়, সুবর্ণ-জানিলে সুবর্ণ-নির্ম্মিত সমস্ত অলঙ্কারাদি জানা যায়, সেইরূপ এই বিশ্বে একমাত্র সত্য পদার্থ আছেন, তাঁহাকে জানিলে বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ জানা যায়।" শ্বেতকেতু এই বিদ্যা গুরুর নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন না, আরুণি তাঁহাকে শিক্ষা প্রদান করেন। এই বিদ্যার নাক ব্রহ্মবিদ্যা। (১)

বিজ্ঞানই বলুন, দর্শনশাস্ত্রই বলুন, সকলেই এ কথা স্বীকার করেন যে, একটী মহাশক্তি হইতে এই বিশ্ব প্রসূত হইয়াছে। মহাত্মা হার্ব্বার্ট স্পেন্-সারও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—"There is an everlasting energy

(১) ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

from which everything proceeds," কিন্তু তিনি তাঁহার "First Principles" নামক গ্রন্থে সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার সর্ব্বমতের প্রতি দোষারোপ করিয়া ইহাকে অজ্ঞেয় (The unknowable) সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। অজ্ঞেয় কেন? মানবের জ্ঞানেন্দ্রিয় যতদূর বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে মানবের এই বিষয় জানিবার অধিকার জন্মে নাই। এই স্থানেই বৈজ্ঞানিকের অজ্ঞতা ও অপূর্ণতা। অজ্ঞতা কেন? মানবের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের রাজা মন সর্ব্বপ্রধান ইন্দ্রিয়। তদতিরিক্ত মানবের বুদ্ধি, অহঙ্কার ও জীবাত্মা আছেন। মনও এই সকলকে বিকাশিত করিলে অজ্ঞেয় জ্ঞেয় হয়েন কিনা, তাহা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অন্ধ হওয়া জ্ঞানের কার্য্য নহে, গোঁড়ামি। তৎপর প্রশ্ন, এই অপূর্ণতা কেন? সমস্ত জড়পদার্থকে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও আকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায়। এই পাঁচটী স্থূল জড় পদার্থ। এই পাঁচটীর প্রত্যেকের এক একটি সূক্ষ্ম বা তন্মাত্র অবস্থা আছে। জড় আকাশেরও সূক্ষ্মাবস্থা আছে। আকাশকে যদি বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইথার (Ether) সংজ্ঞা দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইথারও প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের আছে, তাহার প্রথমটি হইতে তৎপরপরটি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও আকাশ সমন্বিত জগতে যত পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইতেছে বা হইতে পারে, তৎসমস্তের অবিকল এক একটি সূক্ষ্ম ইথার-নির্ম্মিত নকল আকার আছে। বিজ্ঞান এখনও শৈশব অবস্থায় আছেন। অল্প দিন হইল অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু প্রথম স্তরের জড় ইথারের কিছু কিছু গুণ আবিষ্কার করিয়াছেন, এখন পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম ইথারের বিষয় চিন্তাগম্য হয় নাই।

মহাত্মা হার্ব্বার্ট স্পেন্সার যে যে কারণে "অজ্ঞেয় মতে" উপনীত হইলেন, প্রায় সেই সেই কারণ ও যুক্তি খণ্ডন করিয়া ভারতীয় ব্রহ্মর্ষিগণ "ব্রহ্ম জ্ঞেয়, ব্রহ্ম হইতে প্রসূত যাবতীয় পদার্থ জ্ঞেয়" এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন। একদা মহর্ষিগণ ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানের জন্য সমবেত হইয়া পরস্পর মধ্যে এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিলেন—"ব্রহ্মই কি এই বিশ্বসৃষ্টির কারণ? না কারণ ব্যতিরেকেই এই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে? আমরা কোথা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং কেনইবা জীবিত রহিয়াছি? মহাপ্রলয় সময়ে এই বিশ্বের জীবসঙ্ঘ কোথায় অবস্থান করিয়াছিল এবং কোথায়ইবা অবস্থান করিবে? কি জন্য ও কাহার কর্ত্তৃক আমরা সুখ দুঃখে আবদ্ধ হইয়া কালাতিপাত

করিতেছি? ব্রহ্মই কি এই সমুদয় ব্যাপারের কারণ, না আপনা আপনি এই বিশ্ব সৃষ্ট ও পালিত হইতেছে? কালই কি এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের হেতু, অথবা পদার্থের প্রতিনিয়ত-শক্তি-স্বভাব হেতু, অথবা কোন কারণ ব্যতীত অকস্মাৎ এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, অথবা ক্ষিত্যপ্‌তেজো-মরুদ্ব্যোম এই বিশ্বের কারণ, অথবা বিজ্ঞানময় আত্মাই এই জগদুৎপত্তির কারণ।" (১) মহর্ষিগণ বহু তর্কবিতর্কের পর নির্ণয় করিলেন যে—"একো-দেব সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" এক সৎপদার্থ সমস্ত ভূতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করিতে-ছেন, তাঁহার সত্তাতেই সকলে সত্তাবান্‌। প্লেটো ও তাঁহার শিষ্যের কথোপ-কথনে, অথবা শ্রীশঙ্করাচার্য্যের হস্তামলক পাঠে জানা যায়—মানুষকে চিন্তা করিতে হইলে, হস্ত আমার, পদ আমার, মস্তক আমার ইত্যাদি প্রক্রম কিন্তু "আমি" কে? অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম পদার্থ। এইরূপ কোন জড়পদার্থকে, যেমন একখানা পুস্তককে, চিন্তা করিতে হইলে তাহার দৈর্ঘ্য, বিস্তৃতি, বর্ণ প্রভৃতি গুণমাত্র চিন্তা করা যায়, কিন্তু প্রকৃত বস্তু সূক্ষ্ম। এই সূক্ষ্ম পদার্থই আত্মা। সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া জড় পদার্থ (Matter) সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন (ensouls matter)। জড় পদার্থের সম্যক্‌ জ্ঞান, প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সূক্ষ্ম ইথারের জ্ঞান আবশ্যক, অথবা একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারি-লেই ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত সমস্ত পদার্থের জ্ঞান অনায়াসেই লভ্য হয়। এই জন্যই সমস্ত উপনিষৎ মাথার দিব্য দিয়া অনুরোধ করিয়াছেন—"ব্রহ্ম বিদ্যা লাভ কর, তাহা হইলেই তুমি পূর্ণজ্ঞানী হইবে ও মুক্ত হইবে।" ব্রহ্ম বিদ্যা দ্বারা জীব মুক্ত হয় কেন। এই যে যত আকৃতি বিশিষ্ট জীব বা জড়পদার্থ দেখিতেছেন, আকারই প্রকৃত জীবাত্মার ও প্রকৃত সূক্ষ্ম জড়পার্থের পৃথক্‌ অস্তিত্বের কারণ, আকারই ইহাদের কারাগার। এই আকারের নাম মায়া—অর্থাৎ পরমাত্মা নিয়মিত বা পরিমিত হইতেছেন (মীয়তে ব্রহ্ম অনয়া ইতি)। আকার ধ্বংস কর, দেহরূপ কারাগারের দ্বার অজ্ঞানতা রূপ অর্গল দ্বারা বদ্ধ আছে, তাহা খুলিতে চেষ্টা কর, এই দ্বার খুলিতে সক্ষম হইলেই আকারের অর্থাৎ মায়ার নাশ হইবে, সুতরাং মুক্তি। কিন্তু মুখে বলিলেই সেই দ্বার খোলা যায় না। Knock, knock incessantly

(১) শ্বেতশ্বতরোপনিষৎ।

and it shall be opened unto you" ক্রমাগত, অবিশ্রান্ত আঘাত কর, তাহা হইলেই দ্বার খুলিবে।

For all that happens down here is but the reflection in gross matter of the happenings on higher planes. As above, so below. The physical is the reflections of the spiritual. (A study in Consciousness).

বিজ্ঞান অপূর্ণ হইলেও উন্নতিমার্গে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। একত্বে উপনীত হওয়াই সর্ব্বজ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য। অগস্ত কোমৎ সমস্ত বিজ্ঞানকে এক সূত্রে গ্রথিত করিবার যত্ন পাইয়াছিলেন। বিদ্যুৎ, ম্যাগ্নেটিজম, আলো তাপ প্রভৃতি সমস্ত শক্তি এক শক্তিতে পরিণত ও নীত হইয়াছে। এই সমস্ত শক্তিকে ঈশ্বরের বা আকাশের শক্তির অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিলে, আকাশের শক্তির সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, জড়-বিজ্ঞান পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে। তৎপর জড়পদার্থ (matter) ও আত্মা (soul) একই পরমাত্মার বিকাশ, এই জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, জীব পূর্ণজ্ঞাণী হইয়া কারাগারের দ্বার ভগ্ন করিয়া ব্রহ্ম হইতে পারেন, কারণ ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। তাহা হইলে বলিতে পারেন, "এবার বাঘ ভেঙ্গেছে খাঁচা।"

It is the self-conditioned (স্বেচ্ছায় মায়ারূপ সীমাবদ্ধ) Logos (পরম ব্রহ্ম) inseperate at every point with the matter, He has appropriated for his universe,ere He draws Himself a little apart from it in the second manifestation.

As a workman chooses out the material he is going to shape into his product, so does the Logos choose the material and the place for His Universe. (A Study in Consciousness).

কিন্তু এ কথা যেন কেহ মনে না করেন যে, এই পরিদৃশ্যমান্ সৃষ্ট বিশ্বই ব্রহ্ম। প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। ব্রহ্ম স্বতন্ত্র বস্তু।

But He will not be merged in His work. That marvellous Individuality (অচিন্ত্য ভেদ বা ব্যক্তিত্ব) is not lost, and only a portion thereof suffices for the life of a Kosmos. The

Logos, the Oversoul remains the God of His Universe. (Do)

প্রকৃতির অসীম ও অনন্ত শক্তির সম্যক্ জ্ঞান, সান্ত ও সীমাবদ্ধ মানব, মায়াবদ্ধ জীব, লাভ করিতে পারে না। প্রকৃতির গতি, শক্তি ও নিয়ম যে মানব অধিক পরিমাণে জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই অধিক বিজ্ঞ, সুতরাং বিজ্ঞতা একটী আপেক্ষিক শব্দ। মহাত্মা নিউটন বলিয়াছিলেন যে, তিনি বালকের ন্যায় বেলাভূমিতে উপল খণ্ড সংগ্রহ করিতেছেন মাত্র, কিন্তু জ্ঞান-মহার্ণবের পুরোভাগ অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। বাষ্প, গ্যাস্, বিদ্যুৎ ও ইথারের সামান্য শক্তি মাত্র আবিষ্কৃত হইয়া জগতে অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইতেছে। অল্প দিন মাত্র (অনন্ত কাল ও অনন্ত জ্ঞানের তুলনায়) মানবচিত্তের বোধোদয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এখনও জ্ঞান মহার্ণবের পুরোভাগ অনাবিষ্কৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে।

A force in Nature which is referred to in Sanskrit writing as *Akas* (আকাশ). Western science has done much in discovering some of the properties and powers of electricity....... *Akas*, be it then understood, is a force for which we have no name, and in reference to which we have no experience to guide us to a conception of its nature. One can only grasp at the idea required by conceiving that it is as much more potent, subtle, and extra-ordinary an agent than electricity, as electricity is superior in subtlety and variegated efficiency to steam. (A. P. Sinnett).

যদি অদ্য কেহ ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া এক শত বৎসর পরে জাগরিত হন, তাহা হইলে তিনি যে কি অত্যদ্ভুত বিস্ময়কর কাণ্ড দেখিবেন, তাহা কল্পনাও করা যায় না। কবি টেনিসন্ বলিয়াছেন—

"—Sleep through terms of mighty wars,
And wake on science grown to more,
On secrets of the brain, the stars,
As wild as aught of fairy lore."

জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও ধর্ম্মবিজ্ঞান পরস্পরের মধ্যে অবিশ্রান্ত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ পর্য্যন্ত কোন সন্ধি স্থাপন হয় নাই, কিন্তু সন্ধি করিয়া

শান্তি আনয়নের চেষ্টা চলিতেছে। বোধ হয়, বিংশ শতাব্দীর মধ্যেই সেই আনন্দের দিন আসিবে।

Theologies opposed to Theologies ; Philosophies opposed to Philosophies, and Theology and Philosophy at war with each other. Such is the anarchy in the higher regions.

In France and Germany at least, great opposition between Theology and Philosophy openly pronounced.

In the sciences there is less dissidence, but there is the same absence of any general doctrine, each science is on a firm basis, and rapidly improves, but a Philos[illegible] f Science was nowhere to be found...........Men of s[illegible] bility saw clearly enough that however exact each science might be in itself, it could only form a part of Philosophy. (History of Philosophy)

উল্লিখিত তিন বিজ্ঞান পরস্পরের আবিষ্ক্রিয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া উন্নত হইবার চেষ্টা না করিলে সকলেই সীমাবদ্ধ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন। এই তিন বিজ্ঞান যে স্বীকার্য্য ও স্বতঃসিদ্ধ স্থাপন করিয়া উন্নত হইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীন চিন্তা ও অনুসন্ধান বলে যে যে মত ও প্রতিজ্ঞা সপ্রমাণিত ও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, বাস্তবিক তাহা ভুল নহে, অভ্রান্ত সত্য, কিন্তু অসম্পূর্ণ ও আংশিক সত্য। পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে হইলে তিন বিজ্ঞানকেই একত্র হইয়া পরস্পরের সাহায্যে উন্নত হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। যখন এই তিন বিজ্ঞান এক মূলজ্ঞানে পরিণত হইবেন, তিন তত্ত্ব (Trinity) এক তত্ত্বে উপনীত হইবেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এক মহাবিষ্ণুর বা ভগবানের অংশভূত থাকা সাব্যস্ত হইবেন, (ভাগবত ও চণ্ডী দ্রষ্টব্য), পিতা (Father) পুত্র (Son) ও পবিত্র আত্মা (Holy spirit) একই ঈশ্বর নির্ণীত হইবেন, সত্ত্ব রজ তম তিন গুণের গুণ-বৈষম্য নষ্ট হইবে, তখন তিন এক হইয়া যাইবেন, তাহাই পূর্ণাবস্থা, তখন বহুত্ব একত্বে পরিণত হইবেন।

প্রমাণ তিন প্রকার, প্রত্যক্ষ, অনুমান, ও ভ্রমপ্রমাদশূন্য আপ্তবচন (বিশ্বাসী সাক্ষীর বাক্য)। কোন বিষয়ের প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিতে হইলে

এই তিন প্রকার প্রমাণেরই সাহায্য অবলম্বন করিতে হয়। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, এক পরমাত্মা হইতেই জড় পদার্থ (matter) বিকাশিত হইয়াছে, এবং পরমাত্মা জড়পদার্থে অণুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন (ensouled)। অনন্তকাল, অনন্ত শূন্য, অসীম আকাশ বা সূক্ষ্ম ইথার, জড় ইথার, বায়ুমণ্ডল (Firmament), আত্মা বা আত্মিক বিকাশ, সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর, কারণ শরীর প্রভৃতি নরচক্ষুর অগোচর হইলেও তাহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা অথবা অস্তিত্বে সন্দিহান হওয়া পাণ্ডিত্যের কার্য্য নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদে একটী দৃষ্টান্ত আছে। আরুণি তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুকে একটী বটবৃক্ষের ফল আনয়ন করিতে বলিলেন। ফল আনীত হইলে আরুণি পুত্রকে ঐ ফল ভঙ্গ করিতে বলিলেন। শ্বেতকেতু ঐ ফল ভঙ্গ করিলে আরুণি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি দেখিতে পাইতেছ? শ্বেতকেতু বলিলেন "সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীজের মত"। তৎপর আরুণি শ্বেতকেতুকে পুনরায় একটী সূক্ষ্ম বীজ ভঙ্গ করিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন"এখন কি দেখিতেছ?"শ্বেতকেতু বলিলেন "ভগবন্! কিছুই নহে।" তখন আরুণি বলিতে লাগিলেন "তুমি বট বীজের যে অণিমা দেখিতে পাইতেছ না, তাহা হইতে শাখাস্কন্ধ ফল সমন্বিত বৃহৎ বটবৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে। বৎস! আমার কথা সত্য বলিয়া শ্রদ্ধা কর। এই বট বীজ হইতে বটবৃক্ষের ন্যায়, অতি সূক্ষ্ম পরমাত্মা হইতে নামরূপ আকার বিশিষ্ট বিচিত্র বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। এইজন্য সেই আত্মায় জগৎ আত্মময়। তিনি পরমার্থ সত্যবস্তু।"

প্রকৃতির ক্রিয়া ও গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, স্থূল ক্ষিতি, স্থূলঅপ, স্থূল তেজ, স্থূল মরুৎ ও স্থূল ইথারের কার্য্য ও গতি শক্তি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, জড় পদার্থ (matter) এবং জড়পদার্থের উপর স্পন্দন শক্তির কার্য্য (Vibrations) ও গতিশক্তি বা বল (motion, energy) প্রভৃতির স্বভাব ও কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রকৃতিবিজ্ঞান যে সমস্ত নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা কখনই ভুল নহে। কিন্তু বিজ্ঞান এখনও শৈশব অবস্থায় আছেন। সূক্ষ্ম ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোমের ও সূক্ষ্ম ইথার বা অকাশের শক্তির বিষয়ে এবং অতি সূক্ষ্ম আত্মার ইচ্ছাশক্তির অসীম ক্ষমতার বিষয়ে বিজ্ঞান সম্পূর্ণ অন্ধ ও অজ্ঞই আছেন।

সর্ব্বোত্তম জ্ঞান কি? ডেল্‌ফিক দৈববাণী বলিয়াছেন"Know thyself." আত্মা, আকার (form) ও বর্ণ (Colour) রহিত। কিন্তু আত্মার

চিন্তাশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি আছে। এই ইচ্ছাশক্তি বা চিন্তাশক্তি বাহ্যবস্তুর দ্বারা সংস্পৃষ্ট না হইয়া ইথার বা আকাশের উপর কার্য্য করিয়া একত্রীভূত, ঘনীভূত ও জননশক্তি সম্পন্ন (magnetised) হইলে প্রকৃতির জড় শক্তিকে পরাভব করিতে পারে; সময় ও দূরত্বের ব্যবধান, স্থূলত্বের আবরণ ও বস্তুর ভারত্ব প্রভৃতি সমস্তই জয় করিতে পারে এবং সূক্ষ্মতম পরমাণুকে দর্শনীয় আকারে পরিণত করিতে পারে। এই বিশ্বের সমস্ত শক্তি এক ইচ্ছা শক্তি বা চিন্তা শক্তির অন্তর্ভূত। যেমন আলো, তাপ, ম্যাগ্‌নেটিজম্, তড়িৎ প্রভৃতি সমস্ত বল (energy) কে এক গতি শক্তিতে (motion,vibrations,) পরিণত করিবার চেষ্টা হইতেছে, সেইরূপ সমস্ত শক্তিকে ইথারের বা আকাশের শক্তিতে ও তৎপর আত্মার ইচ্ছা বা চিন্তা শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারিবে। ইহার কিছু কিছু আভাস এখনই পাওয়া যাইতেছে।

প্রকৃতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও ধর্ম্ম বিজ্ঞানকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া এক মহা বিজ্ঞানে পরিণত করিতে হইবে। তাহা কিরূপে করা যাইতে পারে? প্রকৃতিবিজ্ঞানকে মূলভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহার চেষ্টা করিতে হইবে, কারণ প্রকৃতিবিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্য অভ্রান্ত। (How is this to be effected? Obviously by taking Science as the basis ;" History of Philosophy)। দর্শন শাস্ত্র বা মনোবিজ্ঞানকে ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করিলে সেই উন্নতি মার্গে উপনীত হওয়া সুকঠিন।

The incompetence of Metaphysics has been clearly exhibited in this history (History of Philosophy). Nothing therefore but Science remains. Nevertheless, science only furnishes the basis. It must be transformed into a Philosophy before it can satisfy the higher needs. Even the encyclopœdic knowledge of a Hunboldt was powerless, because it was scientific knowledge, not Philosophy, even as scientific knowledge it had the fatal defect of incompleteness,it embraced cosmical knowledge only.)

মানব এই জগতীতলে ক্রিয়াশীল শক্তি সমূহের ক্রীড়নক মাত্র। সৃষ্টির আদিম অবস্থায় অশিক্ষিত মানব তাহা অপেক্ষা প্রবলতর শক্তিকে ব্যক্তিরূপে

কল্পনা করিয়া ভীতি বা প্রীতি বশতঃ তাহার নিকট যে যে বস্তু উপাদেয় প্রতীতি হইত, তদ্বারা তাহাকে পূজা করিত, তাহার দৃষ্টিতে যে যে অলঙ্কার ও যেরূপ বেশ মনোরম বোধ হইত, তদ্দ্বারা বিভূষিত করিত। কাল সহকারে বহু দর্শন, পর্য্যবেক্ষণ, ও সিদ্ধান্ত বলে মানব বুঝিতে পারিল যে, তাহা অপেক্ষা প্রবলতর শক্তি এই জগতে কার্য্য করিতেছেন বটে, কিন্তু সেই শক্তি বহু নহে, এক মহাশক্তিরই বিভিন্ন বিকাশ, এবং সেই শক্তি এক শক্তি মাত্র, শক্তি ও শক্তিমানে কোন পার্থক্য নাই। বুদ্ধিমান্ মানব আরও জানিতে পারিল যে, সে নিজেই সর্ব্ব শক্তির সংক্ষিপ্ত সার। তাহার নিজকে নিজে পূর্ণ উন্নতি-পদবীতে আরূঢ় করাইতে পারিলে সে স্বয়ংই সেই শক্তিমানের সমান হইতে পারে। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হইতে পারেন। অজ্ঞ অশিক্ষিত মানবকে উচ্চতম সত্য শিক্ষা দিবার জন্য ভগবান্ অবতার রূপে, শিক্ষকরূপে অথবা স্বয়ং অবতারীরূপে জগতে অবতীর্ণ হইতে পারেন। সমস্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্রকে এক পর্য্যায়ে নিবদ্ধ করিতে হইলে ইহাই এক মাত্র উপায় বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। সেই মহাশক্তি ও শক্তিমানের প্রকৃতি অবগত হওয়া, তাঁহাকে উপাসনা করা ও তাঁহার সমীপে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবার চেষ্টা করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য।

জড়বিজ্ঞান প্রত্যেক পদার্থের ও গতি শক্তির উৎপত্তি ও ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বস্তুতত্ত্বের গূঢ় রহস্য আবিষ্কার করেন। মনোবিজ্ঞান মনের ক্রিয়ার, জীবন মৃত্যুর ও জগতের অস্তিত্বের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করিতে যত্ন করেন। জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্রকে একই বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি না, এই বিষয় মনীষী বুধগণের চিন্তাকে অধিকার করিয়াছে। সর্ব্ব প্রথমে বিভিন্ন জড় বিজ্ঞানের নিয়ম এক বৈজ্ঞানিক নিয়মে, তৎপর দর্শন শাস্ত্রে ও তৎপর ধর্ম্মশাস্ত্রে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইতেছে। সে প্রণালী এইরূপ।

Religious belief, philosophy, science, the fine arts, the industrial arts, commerce, navigation, government, all are in close mutual dependence on one another, in as much as that when any considerable change takes place in one, we may know that a parallel change in all the others has preceded or will follow it.

All bodies whatever present the elementary facts of Number, Form and Movement, ; they present other facts besides these, but these can be considered apart, and from them arise Algebra, Geometry and Mechanics. Physics is the abstract Science of Weight, Temperature, Luminousness &c. besides Number, Form, and Movement. Further, bodies present facts of combination and decomposition, and Chemistry results. Finally, we find certain bodies presenting facts of growth, reproduction and sensation, and these facts we abstract in Biology.

The truths of Number are the most general truths of all. A Science of Number, that is, Arithmetic and Algebra, may thus be studied without reference to any other Science. Next comes Geometry, Science of Form besides Number. Next comes Mechanics, Science of motion, besides number and form. In addition to these Astronomy is a science of gravitation. Physics succeeds. Then comes Chemistry, then Biology, then Sociology,

Whst is a law ? What is an elementary fact of existence ? It is the invariable relation between two distinct phenomena, according to which one depends on the other; the relation being invariable, the only variation which is possible is in the intensity of the phenomena or their direction. Here therefore we have two distinct aspects of Nature : one which is inaccessible to human intervention, uncontrolled by human skill, a Fatality which must be accepted ; and another which is accessible to human intervention, a Modifiability which enables us to convert the Fatality into a power for our benefit. The Laws of Nature are immutable. But owing to this, the resultant phenomena are so modifiable that their direction

may be adapted to our service. (A plan of the positive Philosophy by Auguste Compte).

পদার্থ (matter) এবং গতিশক্তি (motion, energy, force) অবিনশ্বর। প্রত্যেক পদার্থের আকার পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার এক পরমাণুও বিনষ্ট হয় না। এইরূপ গতিশক্তিও নষ্ট হয় না, একশক্তি অন্য আকারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। ইহা পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্য। এই পদার্থ ও গতিশক্তি একত্র বাস করে, পৃথকভাবে অবস্থান করে না। সমস্ত প্রকারের বৈজ্ঞানিক শক্তিকে এক গতিশক্তিতে পরিণত করা যায়। সমস্ত পদার্থকেও এক মৌলিক পদার্থে পরিণত করা যায়। যদিও বিজ্ঞানে বহু প্রকার মৌলিক পদার্থের কথা শ্রুত হওয়া যায়, তথাপি প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান্‌বিদ্‌গণ মনে করিতেছেন, পদার্থের অন্তর্গত অণু পরমাণুর বিভিন্ন প্রকারের স্পন্দন ও কম্পন দ্বারা পদার্থের আকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়, ও ভিন্ন ভিন্ন আকারের বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হয়। কিন্তু বাস্তবিক মৌলিক পরমাণু একই, বিভিন্ন নহে। এই মত অনুসারে ইতর ধাতুকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত করা যায় ও এক বস্তুকে অন্য বস্তুতে পরিবর্ত্তিত করা যায়।

Sir William Crookes put forward, some years ago, his belief that in all probability there is *only one* fundamental substance, which is called *protyle*, and that the differences in the elements are due simply to the various ways in which the atoms of this substance are built into molecules(Miss Lilian Edger).

অনেক বৈজ্ঞানিক এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন যে, তাঁহারা বলেন, পদার্থ ও গতিশক্তি পৃথক নহে, পরমাণুর পৃথক্ কোন অস্তিত্ব নাই, পরমাণু শক্তি কেন্দ্র মাত্র। (Atom has no existence same as a centre of force). যদি শক্তিই পদার্থের জনয়িত্রী হয়, তাহা হইলে দেখিতে হইবে, শক্তি কি? দর্শন বলেন, শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ। পদার্থ ও শক্তি এক অবিজ্ঞাত সৎপদার্থের বিকাশ মাত্র। ইহাই ধর্ম্মতত্ব। কোন কোন মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত ইহাও বলেন যে, মনই এক মাত্র সৎবস্তু, দর্শনকারীর মনের বাহিরে জড় পদার্থের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। সে যাহা হউক, মহাত্মা হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলেনঃ—

I have repeatedly and emphatically asserted that our con-

ceptions of matter and motions are but symbols of an unknowable Reality; that this Reality can not be that which we symbolise it to be, and that as manifested beyond consciousness, under the forms of matter and motion, it is the same as that which, in consciousness, is manifested as Feeling and Thought. I recognise no forces within the organism or without the organism, but the variously conditioned modes of the Universal immanent force, and the whole process of organic evolution is everywhere attributed by me to the cooperation of its variously conditioned modes, internal and external.

জড় বিজ্ঞান, পদার্থ ও গতিশক্তি এই দুই তত্ত্ব দ্বারা সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করেন। মনোবিজ্ঞান মন ও জড়, চিৎ ও অচিৎ, এই দুই তত্ত্ব (duality) দ্বারা সৃষ্টির মর্ম্ম বুঝাইতে চেষ্টা করেন। ধর্ম্মবিজ্ঞান পরমব্রহ্মের চিন্তা বা সঙ্কল্প বা ইচ্ছা(Divine Thought or Divine Will) এবং অসীম শূন্য (Primordial homogeneous Substance) যাহার উপর সেই চিন্তা কর্ম্ম করেন, এই দুই তত্ত্ব (duality) দ্বারা সৃষ্টির রহস্য বুঝাইতে চেষ্টা করেন। গতি শক্তি বিভিন্ন প্রকারের স্পন্দন বা বিকম্পন মাত্র, (vibrations)। চিন্তা (thought) দ্বারা স্পন্দন (vibration) সঞ্জাত হয়। পদার্থের অতি সূক্ষ্মাবস্থাই অসীম শূন্য। মননকারী আত্মাই চিন্তা করেন এবং জড়ই আত্মার বাহিরে অচিৎ পদার্থ। সুতরাং সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং ধর্ম্ম বিজ্ঞানের আপাতপ্রতীয়মান ভেদমত অচিন্ত্যরূপে অভেদ মতে পরিণত করা যাইতে পারে। কিন্তু যে নিয়মে এই একতা বা সামঞ্জস্য সংসাধন করিতে হইবে, তাহা বৈজ্ঞানিক নিয়ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে এবং বিজ্ঞান যতই উন্নত হইবে, ততই আমরা একত্বের অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিব।

মানব রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, এই পঞ্চ বিষয়ের যেটীর চিন্তা ও উপভোগ সুখকর মনে করে, তাহারই ধ্যান করিলে তাহার মনে কাম বা বাসনা সঞ্জাত হয়। সুতরাং মানবকে কতকগুলি বাসনাসমষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানবের যেরূপ বাসনা জন্মে, তাহার ইচ্ছাও তদনুরূপ

হয়। ইচ্ছা জন্মিলেই ইচ্ছানুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। কর্ম্ম করিলেই কর্ম্মের শুভাশুভ ফলগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। (১) পরমাত্মা সম্পূর্ণ; জীবাত্মা মায়াবদ্ধ, সুতরাং খণ্ড। ভগবানের ইচ্ছাশক্তি অসীম; মানবের ইচ্ছাশক্তি পরিমিত। প্রলয়কালে ব্রহ্ম অসীম শূন্যে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় শয়ান থাকেন। তাঁহার বিকাশ প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা হইলে তিনি বর্দ্ধিত হয়েন। (He awakes, and becomes conscious of a desire for renewed activity and manifestation)। উপনিষদের—"তৎ ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়"—ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন বা সঙ্কল্প করিলেন, আমি বহু হইয়া জন্মগ্রহণ করি, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। (That willed I shall multiply and be born and the many arise in the One by that act of Will.) ইহাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলিবার কারণ এই যে, চিন্তা (thought) যে শক্তিশালিনী, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আমরা যে কোন চিন্তা করি, তাহা আকাশ-পটে অঙ্কিত হইয়া থাকে, চিন্তা দ্বারা সূক্ষ্ম আকার উৎপন্ন হয়। ইচ্ছা শক্তির ক্রিয়াবলও প্রত্যক্ষ সত্য। (But beyond registering images we are told that the astral fluid registers every thought of man, so that it forms, as it were, the book of Nature, the Soul of the Cosmos, the Universal mind, a history of the world and all its sciences and schools of thought, from the day when the Para-Brahmic (পরব্রহ্মের)breath went forth and the eternal Logos awoke into activity.

(Psychometry).

শ্রীমদ্ভাগবতেও রূপকাকারে আছে, নামরূপহীন ব্রহ্ম অনন্ত শয্যায় অসীম শূন্যে শয়ান হইয়া সৃষ্টিসঙ্কল্প করিলে অসীম শূন্য বিক্ষুব্ধ হইল, শূন্য রূপ সমুদ্র বারি মথিত হইয়া জীবনরূপী পদ্ম হইতে নামরূপধারী ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা এক শত বৎসর নিদ্রা ও সমাধিপরায়ণ হইয়া শক্তিলাভ করতঃ চিন্তাবলে নামরূপধারী লোক সমূহ সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার প্রথম সৃষ্টি আকাশ বা সূক্ষ্ম ইথার, তৎপর জড় ইথার, তৎপর মরুৎ (বায়ুমণ্ডল, firmament), তৎপর তড়িদগ্নি প্রভৃতি তেজ, তৎপর জলীয় পদার্থ (অপ) ও তৎপর স্থূল পদার্থ (ক্ষিতি) ইত্যাদি।

শ্রী...... শাস্ত্রী।

---

(১) বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

লালাবাবু।

(সংসার-জীবনী)

প্রাণকৃষ্ণ সিংহ কিঞ্চিৎ ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন। শুনা যায়, সেই কারণ পুত্রের সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃর্গত বহরান নিবাসী বল্লভীকাণ্ড দাস নামক এক ব্যক্তি প্রাণকৃষ্ণের এষ্টেটের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। একদা তিনি লালা বাবুর ভৃত্যকে এক খণ্ড ক্ষুদ্র পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করেন। সেই বস্ত্র লাভে ভৃত্য বিশেষ অসন্তুষ্ট হয়। এই দুঃখ সে কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া সেই বস্ত্র পরিধান করে এবং স্বীয় প্রভুর নিকট বস্ত্রের ক্ষুদ্রত্বাতিশয়তা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত পরিহিত বস্ত্রের সহিত কতকটা রজ্জু সংযোগ করিয়া তাহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিল। রজ্জুর সাহায্যে দীর্ঘাকৃত বস্ত্র ভৃত্যকে ব্যবহার করিতে দেখিয়া একদিন লালা বাবু ভৃত্যের নিকট এবিষয়ের তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলে, সে সকল কথাই তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিল। অতঃপর লালা বাবু বল্লভীকান্তকে তাঁহার ভৃত্যের জন্য একখানি উপযুক্ত বস্ত্র প্রদান করিতে বলেন। প্রাণকৃষ্ণের নিকট বল্ল[illegible] এ বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলে তিনি পুত্রের প্রতি বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন "পুত্র উপযুক্ত হইয়াছেন, সুতরাং আবশ্যক হইলে তিনি স্বয়ং উপার্জ্জন করিয়া পুনরায় ভৃত্যকে দীর্ঘবস্ত্র প্রদান করিতে পারেন।" পিতার কথায় পুত্রের মনে বিশেষ ব্যথা জন্মিয়াছিল। তিনি পিতৃমুখ নিঃসৃত অপ্রিয় বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া ঘৃণা ও লজ্জায় অধোবদন এবং গৃহত্যাগে কৃত-সংকল্প হন। স্ত্রীর অলঙ্কারের বিনিময়ে লালাবাবু তৎক্ষণাৎ অশীতি মুদ্রা সংগ্রহ করতঃ ভৃত্যকে উপযুক্ত বস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত বাটীর বাহির হন। বলা বাহুল্য যে, এই সময়ের ক্রোধই কৃষ্ণচন্দ্রের ভবিষ্যৎ অদৃষ্টাকাশে আর্থিক পূর্ণচন্দ্রোদয়ের একমাত্র কারণ। সংসারে এইরূপ ক্রোধ ও অধ্যবসায়ের বশবর্ত্তী হইয়া কত দুরদৃষ্ট ব্যক্তি লক্ষ্মীদেবীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছে, কত অলস কার্য্যতৎপরতা শিক্ষা করিয়াছে, কত শুষ্ক হৃদয়-মরুভূমি সজলা ও মনপ্রাণতোষিণী চিরবসন্তময়ী প্রকৃতিদেবীর আবাসস্থানে পরিণত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য।

যাহা হউক, লালাবাবু ১১১৯ সালে সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে প্রথমতঃ বর্দ্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টর ও জজসাহেব বাহাদুরের আফিসে সেরেস্তা-

দারের কার্য্যে নিয়োজিত হন। তৎকালে বর্ত্তমানের ন্যায় বংশনির্ব্বিশেষে উক্তপদ প্রদত্ত হইত না। রাজা, জমীদার বা উচ্চবংশীয়েরা উক্ত পদের উপযুক্ত হইলেই অধিকারী হইতে পারিতেন। লালবাবু বিদ্বান ও সম্ভ্রান্ত-বংশীয়, বিশেষতঃ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা গভর্ণমেণ্টের বিশেষ পরিচিত; সেই কারণ অচিরে লালাবাবুর অর্থোপার্জ্জনের পথ পরিস্কৃত হইয়াছিল। এই স্থানে কার্য্য করিতে করিতে লালাবাবু বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত লাটবিশা-লাক্ষীপুর জমীদারী ক্রয় করেন। লালাবাবু যদিও অপ্রাপ্তবয়স্ক, তথাপি স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভাবে অচিরে স্বীয় কার্য্যে যেরূপ যোগ্যতা ও রাজনীতি-জ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা কেবল প্রবীণ এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি-গণের নিকট হইতেই আশা করা যায়। এই সকল গুণেই লালাবাবুকে দীর্ঘকাল যাবৎ বর্দ্ধমানে সেরেস্তাদারের কার্য্য করিতে হয় নাই। গভর্ণমেণ্ট ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহার বিশ্বস্ততা ও উপযোগিতার পরিচয় পাইয়া উড়িষ্যার বন্দোবস্তের সময় (১৮০৩ খ্রীঃ) তথাকার রাজস্ব বিভাগের বন্দোবস্ত কার্য্যের ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। উড়িষ্যায় কার্য্য করিতে করিতে লালাবাবু পরগণা রাহাং, সায়ার ও চাবিসকুদ ক্রয় করেন। এ সকল সম্পত্তির অধিকার লাভ করিতে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কীর্ত্তিমান লালাবাবু যেস্থানে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়াছেন, সেই স্থানেই এক একটি অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পুরীধামে ৺জগন্নাথ দেবের সেবার জন্য তিনি দৈনিক ১০৲ দশ টাকা খরচের বরাদ্দ করিয়া যান। ১২১৫ সালে সহসা একদিন তাঁহার পিতার রোগ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া লালাবাবু কান্দীর আবাসে প্রত্যাগমন করেন। দুঃখের বিষয়, সুদূর উড়িষ্যা প্রদেশ হইতে বাটী পৌঁছিতে পৌঁছিতেই তাঁহার পিতৃদেবের জ্ঞান ও বাক্‌শক্তি লুপ্ত হইয়া যায়। তাঁহার মৃত্যুর পর লালাবাবু গভর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় হইতেই লালাবাবু মনুষ্যের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করেন। শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত তিনি সময়ে সময়ে কলিকাতায় অবস্থান করিতেন এবং সর্ব্বদাই বহুসংখ্যক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নিকটে রাখিতেন।

শোভাবাজার রাজবংশীয় ও জোড়াসাঁকোর সিংহবংশীয় ব্যতীত কলি-কাতার আর কাহারও সহিত তিনি ঘনিষ্ঠতা করিতেন না, কারণ তিনি কলিকাতা সমাজের অনেক অধিনায়কের অসচ্চরিত্র দর্শনে তাঁহাদিগের প্রতি

অন্তরে ঘৃণাপোষণ করিতেন। রাজা রাজকৃষ্ণের জননীকে লালাবাবু যথেষ্ট ভক্তি করিতেন, তিনিও লালাবাবুকে পুত্রবৎ দর্শন করিতেন। কথিত আছে, লালাবাবুর নীতিশিক্ষাদানপ্রভাবেই রাজা রাজকৃষ্ণের (১) চরিত্র বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। লালাবাবু রাজা রাজকৃষ্ণকে সোদরবৎ দর্শন করিতেন।

লালাবাবু নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও দিনেকের জন্য ঈশ্বর চিন্তা বিস্মৃত হইতেন না। দিনমানের প্রায় অর্দ্ধাংশ সময় আহ্নিক, পূজা, হরিনাম, শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ প্রভৃতি হিন্দুর দৈনিক অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে অতিবাহিত করিতেন। লালাবাবু তাঁহার কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺রাধাবল্লভ জিউর নিত্য সেবার যথেষ্ট উন্নতি বিধান করেন।* দেবসেবা, অতিথিসেবা ও সদাব্রত প্রভৃতি সৎকার্য্য যাহাতে সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহিত হয়, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। রিপু সংযমের নিমিত্ত তিনি অনেক দিন হইতেই সতর্কতার সহিত আহারাদি করিতেন। নিরামিষ ও সামান্য উপাদানে প্রস্তুত (মসলা-বিহীন) শাক সবজী তাঁহার আহার্য্য ছিল। চাকরী হইতে অবসর গ্রহণের

(১) ইনি শোভাবাজার রাজবাটীর রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পিতা।

* কান্দীর রাধাবল্লভের নিত্যসেবা যেরূপ সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে, অন্য কোন রাজধানীর দেবসেবার সেরূপ বন্দোবস্ত আছে কিনা জানি না। যদিও পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমানে সেবার ব্যয়ের কিঞ্চিৎ খর্ব্বতা হইয়াছে, তথাপি এখনও রাধাবল্লভের ভোগের যেরূপ বন্দোবস্ত আছে, তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যিনি একবার এ ভোগ দর্শন করিয়াছেন বা যিনি দিনেকের জন্যও রাধাবল্লভের প্রসাদ লাভ করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে, কান্দীর রাজবাটীর দেবসেবার কি সুন্দর বিধিব্যবস্থা। রাধাবল্লভের ভোগে নিতাই এক অন্ন পঞ্চাশব্যঞ্জন, নানাবিধ রাজভোগ্য চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় উপাদান। যে ঋতুতে যেরূপ আহার উপযোগী, সেই ঋতুর জন্য সেইরূপ ভোগেরই বন্দোবস্ত নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

বাবু ভোলানাথ চন্দ্র তাঁহার Travels of a Hindu নামক পুস্তকে কান্দীর ঠাকুর বাড়ী দর্শনে রাধাবল্লভের সেবার সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল। ইহা হইতেই পাঠক রাধাবল্লভের কিরূপ ঐশ্বর্য্য এবং সেবার কিরূপ পরিচর্য্যা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।—

"Of all the shrines, the one at Kandi is maintained with the greatest liberality. The god here seems to live in the style of the Great Mogul. His *musnud* and pillows are of the best velvets and damask richly embroidered. Before him are placed gold and silver salvors, cups, tumblers, *Pawn duns* and jugs, all of various size and pattern. He is fed every morning with fifty kinds of curries and ten kinds of pudding. His breakfast over, gold *Hookas* are brought to him to smoke the most aromatic

পর তিনি অধিক দিন বাটীতে বাস করেন নাই। সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত করিয়া বৃন্দাবন বাসের নিমিত্ত তিনি বিশেষ উৎসুক হইয়াছিলেন। সেই কারণ অল্পকাল মধ্যেই লালাবাবু তাঁহার একমাত্র শিশু পুত্রের শিক্ষাদানের এবং বাটীর তত্ত্বাবধান ও কর্তৃত্বের বিশেষ রূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তিনি চোরবাগানের (কলিকাতার) নীলমণি বসু মহাশয়কে আইন ও জমীদারী সংক্রান্ত বিষয়ের সুবন্দোবস্তের নিমিত্ত নিযুক্ত করেন। অতঃপর কান্দীর বাটীতে কিছু দিন অবস্থিতি করিতে করিতে কোন বিশেষ কারণে তাঁহার অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের সঞ্চার হওয়ায়, তিনি তাঁহার প্রভূত ঐশ্বর্য্য,প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম একমাত্র শিশুপুত্র ও প্রিয়তমা ভার্য্যা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বৃন্দাবন ধামে গমন করেন। লালাবাবুর অন্তঃকরণে সহসা এরূপ সংসারের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিবার কারণ সম্বন্ধে যে কয়টী জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে কয়েকটী নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) একদিন বৈকালে জনৈক ধীবরপত্নী কান্দীর রাজবাটীতে মৎস্য দিয়া তাহার মূল্যের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বলিয়াছিল যে, সন্ধ্যা হ'ল! কখনই বা পার হব?" লালাবাবু ধীবরপত্নীর মুখ-নিঃসৃত সন্ধ্যা হ'ল, কখনই বা পার হ'ব, এই কথায় বুঝিয়াছিলেন যে, আমারও জীবন-সন্ধ্যা সমাগত, কখনই বা এই দুস্তর ভব-সমুদ্র পার হব? এরূপ চিন্তাস্রোতঃ তাঁহার মনোমধ্যে প্রবাহিত হওয়ায় তিনি ঐশ্বর্য্য সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সংসার-ত্যাগী হন।

(২) একদা এক রজক তাহার পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল, "সন্ধ্যা হ'ল এখনও বাসনায় আগুন দিস নাই?"রজকের এই কথা লালাবাবুর কর্ণে প্রবেশ করিয়া এমনি তাঁহার মর্ম্মে আঘাত করিল যে, তিনি ভাবিলেন, তাঁহার জীবনের সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, এখনও বাসনায় আগুন দিতে পারি-

tobacco. He then retires to his noonday *Siesta.* In the afternoon he tiffs and lunches and at night sups up on the choicest and richest viands with new names in the vocabulary at Hindu confectionery. The daily expense at this shrine is said to be 500 Rupees inclusive of alms and charity to the poor. In Kandi the *Ras jattra* was at its height and illumina tion, fire-work, nautches, songs, and frolic were the order of the day, and followed upon each other. (The *Travels of a Hindu.* Vol. I, P. 66.)

লেন না অর্থাৎ এখনও ভোগবাসনা দগ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। এখন হইতেই তিনি সংসারে অনাসক্ত ও বৈরাগ্য-পথে ধাবিত হন।

৩। লালাবাবু এক সময়ে দুগ্ধফেননিভ শয্যা বিমণ্ডিত পালঙ্কোপরি শয়ন করিয়াছেন, এমন সময়ে একটী পথিক সহসা বলিয়াছিল যে, "পালং পরচুকা" ইহাতেই লালাবাবুর অন্তঃকরণে তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হয়, তিনি তৎক্ষণাৎ এই ভাবিয়াছিলেন যে, আর কতকাল পালঙ্কে শয়ন করিয়া অমূল্য ক্ষণস্থায়ী মানব জীবন অতিবাহিত করিবেন। পথিকের সরল কথায় জ্ঞান লাভ করিয়া লালা বাবু সংসারের অসার মায়া মমতায় বিসর্জ্জন দিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন।

(৪) লালা বাবুর জনৈক কর্ম্মচারী এক ব্রাহ্মণের কিঞ্চিৎ দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলে সেই ব্রাহ্মণ কান্দীতে লালা বাবুর নিকট বিচার-প্রার্থী হন। লালা বাবু সে বিষয়ের বিচার করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া দিন স্থির করিয়া দিলে ব্রাহ্মণ পুনরায় নির্দ্ধারিত দিবসে লালা বাবুর বাটীতে উপস্থিত হন। কিন্তু দৈবাৎ সে দিন লালা বাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ না হওয়ায়, ব্রাহ্মণ লালা বাবুর চরিত্রে সন্দেহ করিয়া ও সম্পত্তির উদ্ধার সাধনে হতাশ হইয়া রজনীযোগে রাজধানীর নিকটবর্ত্তী একটী চম্পক বৃক্ষে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। অতি প্রত্যূষে এই ব্যাপার লালা বাবুর দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি সেই পূর্ব্বপরিচিত বিচারপ্রার্থী ব্রাহ্মণের মৃত দেহ সন্দর্শনে অতীব ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতেই যে ব্রাহ্মণ অকালে এইরূপ অসদুপায়ে নিজের জীবন নিজেই নষ্ট করিয়াছে, ইহাও তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সংসারে তুচ্ছ ধন সম্পত্তির নিমিত্ত মানুষকে এরূপ পাপেরও ভার বহন করিতে হয় এই আক্ষেপ সর্ব্বদা মনে মনে উদিত হওয়ায় লালা বাবু তাঁহার প্রচুর সম্পত্তি সুখ সম্পদ প্রভৃতি সমস্তই বিস্মৃত হইয়া বাটীর বাহির হন এবং পাঁচিশ লক্ষ টাকা গ্রহণ করিয়া হিন্দুর পবিত্র তীর্থ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৈষ্ণবমণ্ডলীর অশ্রয়স্থান রমণীয় ধাম বৃন্দাবনে গমন করেন।　　ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিদায়।

কেমনে বাঁধিয়া রাখিবে আমারে
আর যে সময় নাই।
কম্পিত ক্ষীণ দীপশিখাপ্রায়
জগতের আলো বুঝি নিবে যায়,
মোহ আঁখিধারা বিদায় বিদায়
আমি যাই, তবে যাই।

কত বিনিদ্র দীর্ঘ রজনী
বিজন প্রভাত সাঁঝ
কাটায়েছ বসি শিয়রে আমার
ক্লান্ত-মলিন দেহ সুকুমার;
শ্রান্ত হৃদয়ে আশা নিরাশার
দ্বন্দ্ব থামুক আজ।

একি সঙ্গীত কোন্ দূর হতে
আসিয়া পশিছে কাণে,
কে আমারে যেন ডাকে—"আয়, আয়,
অকূল শান্তি মিলিবে হেথায়।"
একি আশ্বাস নবীন আভায়
জাগিয়া উঠিছে প্রাণে।
ক্ষণিক ক্ষুদ্র আবাস ছাড়িয়া
আমি যাই,—যাই তবে।
দুদিনের এই বিচ্ছেদ শেষে
উজ্জ্বল পূত নির্ম্মল বেশে
চির দিন তরে পুনঃ নরদেশে
নবীন মিলন হবে।

নন্দন ফুলে তোমার লাগিয়া
গাঁথিয়া রাখিব মালা,

একদা সে হার স্বর্ণতোরণে
কণ্ঠে তোমার পরাব যতনে
সে মধু মিলন মুগ্ধ নয়নে
দেখিবে স্বরগ বালা।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ, বি, এল।

সংবাদ পত্র।

সুশাসিত সভ্যদেশে সংবাদ পত্র চতুর্থ রাজশক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রাজা প্রথম রাজশক্তি, অভিজাতদিগের সভা দ্বিতীয় রাজশক্তি, সাধারণ অধিবাসীগণের প্রতিনিধি সভা তৃতীয় রাজশক্তি এবং সংবাদ পত্র চতুর্থ রাজশক্তি। এই চতুর্থ রাজশক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজশক্তি, এই শক্তির নিকট অপর তিন রাজশক্তি মস্তক অবনত করিতে বাধ্য, অপর তিন রাজশক্তি এই প্রধান শক্তির উপদেশ ও অভিপ্রায় অনুসারে শাসনকার্য্য পরিচালন করিয়া ধন্য হয়। এই চতুর্থ রাজশক্তির এত বল, এত প্রভাব কোথা হইতে জন্মিল! ইহা কি আইনের বল? না। ইহা কি পাশব বল? না। তবে কিসের বল? এই বল বিবেকবুদ্ধির বল, জ্ঞানের বল, নিরপেক্ষভাবে স্বাধীনভাবে ঘটনার বাহিরে দণ্ডায়মান হইয়া ঘটনাচক্রের প্রকৃত গতি সম্যক্‌রূপে দর্শনের বল। প্রথম তিন রাজশক্তির বিবেকবুদ্ধি, জ্ঞান ও দর্শনশক্তি চতুর্থ রাজশক্তি অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন না হইলেও, ব্যক্তিগত, সমাজগত ও স্বীয় স্বীয় পক্ষগত স্বার্থ ও কুসংস্কার নিবন্ধন তাঁহাদের জ্ঞান আচ্ছন্ন ও দর্শনশক্তি সঙ্কীর্ণ হওয়ায় তাঁহারা প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত সংবাদপত্রের অন্য একটি অসাধারণ বল আছে। সুশিক্ষিত সভ্যতাভিমানী শাসনকর্ত্তৃগণ জানেন, এই বিশ্ব অরাজক নহে, একজন ভগবান্ আছেন। এই পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী আধিপত্য ফুরাইলেই সৎকার্য্যের, সুশাসনের, সততার, সত্যের পুরস্কার আছে, এবং পক্ষপাতিতা ও অন্যায় দোষে দুষ্ট শাসনের জন্য দণ্ডও আছে। রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত অত্যাচারিত কার্য্যকারকগণ নানা কারণে যে সমস্ত অন্যায় কার্য্য ও অন্যায় বিধিব্যবস্থা প্রকাশ করিতে সাহসী হন না, স্বার্থশূন্য নিরপেক্ষ সংবাদ পত্র তাহা অনায়াসে সর্ব্বসাধারণের ও সর্ব্বদেশের গোচরীভূত করিয়া সমগ্র মানব সমাজের

ও ভগবানের অভিসম্পাত, অন্যায়কারীর মস্তকে আনিতে সক্ষম হন। ইহা সামান্য বল নহে। অনেকে গোপনে অনেক পাপাচরণ করিতে পারেন, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে কোন মতেই তাহা করিতে সাহসী হন না, এবং সাহসী হইলেও ত্বরায় দণ্ডভাগী হন।

আমাদের দেশে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাজশক্তি নাই; একমাত্র রাজ্যেশ্বর রাজাই আপাতদৃষ্টিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাজশক্তির স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং কতিপয় বৎসর যাবৎ সংবাদ পত্র এক রাজশক্তিরূপে উত্থিত হইয়া স্বীয় ন্যায্য অধিকার করায়ত্ত করিতে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। রাজ্যেশ্বর রাজাই আমাদের একমাত্র রাজশক্তি বটে, কিন্তু তিনি কে? তিনি কি এক ব্যক্তি না সমষ্টি? আমরা রাজা দেখি না, রাজ্ঞী দেখি না, রাজ-পুত্রও দেখি না, দেখি এক জন বড়লাট সাহেব। ইনি রাজ-পরিবার-ভুক্ত কোন ব্যক্তি নহেন, ইনি রাজার দেশবাসী অভিজাত বংশীয় কোনও ব্যক্তিও হইতে পারেন, অথবা সাধারণ বংশে জন্মগ্রহণ করিলে আভিজাত্য উপাধিভূষিতও হইতে পারেন। ইনিই কি আমাদের রাজা? না। কোন কোন আইনজ্ঞ বলেন রাজা তাঁহার রাজশক্তি বড়লাট সাহেবের উপর অর্পণ করিয়াছেন (delegated)। সুতরাং তিনি রাজ-প্রতিনিধি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তিনি একজন উচ্চ বেতনের কর্ম্মচারী মাত্র। মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত সেক্রেটারী সাহেবের আদেশানুসারে ও পরামর্শানুসারে বড়লাট সাহেবকে শাসনকার্য্য পরিচালন করিতে হয় এবং তিনি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার নিকট, আবশ্যক হইলে, তাঁহার কার্য্যের নিকাশ দিতে দায়ী।

তবে আমাদের রাজা কে, আমরা কাহার নিকট আমাদের মর্ম্মের কথা সুখ দুঃখের কথা জানাইব এবং কেই বা বুঝিবে? আমাদের প্রকৃত ব্যথায় ব্যথিত কে? তাঁহাকে দেখিতে পাইলে তাঁহার নিকট আমাদের হৃদয় খুলিয়া সমস্ত দুঃখ দেখাইয়া শান্তিলাভ করিতে পারিতাম তিনি আমাদের প্রার্থনায়, কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিলেও আমাদের কোন দুঃখের কারণ হইত না। কারণ কবি বলিয়াছেন—"যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।"

ইংলণ্ডের রাজা আমাদের এক চতুর্থ রাজশক্তি। ইংলণ্ডের রাজা ও ইংলণ্ডের অভিজাতদিগের সভা, সাধারণ অধিবাসীগণের প্রতিনিধি সভা

ইংরেজ-প্রচারিত সংবাদ পত্র, সকলে একত্রীভূত হইয়া আমাদিগকে শাসন করিতেছেন। আমাদের নিজ দেশের শাসন কার্য্যে আমরা মৃত। আমাদের শাসন কার্য্য সম্বন্ধে ও অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে কোন বিষয় রাজশক্তির গোচরে আনিতে ইচ্ছা করিলে সর্ব্বাগ্রে ইংরেজী সংবাদ পত্রে, তদ্দ্বারা পার্লিয়ামেণ্ট মহা সভায় ও সর্ব্বশেষে ইংলণ্ডের রাজার কর্ণগোচরে আনিতে হয়। উক্ত চারি রাজশক্তির স্বীয় স্বীয় স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখিয়া যদি আমাদের সম্বন্ধে কিছু করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে আমাদের শাসন কর্ত্তারা অম্লানবদনে তাহা আমাদের জন্য করিয়া থাকেন। আমাদের বড়লাট সাহেব এই চারি রাজশক্তির অধীনস্থ কর্ম্মচারী হইলেও, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় যখন যে পক্ষ অধিক ক্ষমতাশালী থাকেন, তখন সেই পক্ষ কর্ত্তৃক মনোনীত ও নিযুক্ত হন, এবং সেই পক্ষের মনোমত শাসন সংরক্ষণ করেন, সুতরাং সেই পক্ষের প্রচলিত শাসন কার্য্য আমাদের অনভিমত বা অসঙ্গত বোধ হইলেও, বড়লাট সাহেবকে তজ্জন্য কোন জবাব দেহী করিতে হয় না, কারণ তিনি স্বীয় প্রভুর মনোভীষ্ট পূরণ করিলেই নির্দ্দোষী হন। এই জন্যই ব্যারিষ্টার প্রবর Mr. W. C. Bonnerjee ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে মহম্মদের কফিনের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ মহম্মদের কফিনের ন্যায় ভারত গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব কোথাও অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না।

সভ্য দেশে শিক্ষিত অধিবাসিগণের ধর্ম্মসঙ্গত, ন্যায়ানুমোদিত ও সুযুক্তিপূর্ণ মতের দ্বারা দেশ শাসিত হয়। সংবাদ পত্রই সর্ব্ব শ্রেণীর স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিবার ও সমালোচনার দ্বারা উচিত ও যথার্থ মত নির্ণয় করিবার প্রধান উপায়। সংবাদ পত্র সুযুক্তি দ্বারা ভ্রম প্রমাদ সংশোধন করিয়া দেয়। কর্ত্তব্য পথ দেখাইয়া দেয় এবং ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা, অকর্ম্মণ্যতা, ভীরুতা ও অন্যায় অধর্ম্মাচরণ জন সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়, সভ্যদেশে শিক্ষিত লোকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত দেশের শাসন সংরক্ষণের ও উন্নতি অবনতির দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন। যে দেশ পূর্ণমাত্রায় স্বাধীন, সে দেশের সমগ্র অধিবাসিগণ শিক্ষিত এবং দেশের শাসন কার্য্যে ও হিতজনক কার্য্যে সহায়তাকারী। ইহার নামই রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইহার নামই স্বায়ত্ত শাসন।

আমাদের দেশে রাম রাজার রাজত্ব কালে যথেচ্ছাচার শাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল। তখন দেশে কোন সংবাদ পত্র প্রচলিত ছিল না। রাজা

গুপ্তচর বা ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের গণনার সাহায্যে লোকের অভাব ও দুস্কৃতি সুকৃতি জানিতে পারিতেন এবং তদনুসারে দণ্ড ও পুরস্কার বিধান করিতেন; সাধারণ লোকে তখন রাজনীতির,সমাজ নীতির, শাসন কার্য্যের ও দেশহিতকর কার্য্যের ধার ধারিত না, নিজের গ্রাসাচ্ছাদন অর্জ্জন, পুত্রকলত্রাদির ভরণ পোষণ, মানব ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রতিপালন ও রাজার অনুশাসন প্রতিপালন করিয়া সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এই জন্যই দেখা যায়, প্রাচীন কালের লোকেরা ন্যায় বিচারের সাহায্যার্থে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাক্ষ্য দেওয়া দূরে থাকুক, সাক্ষ্য দিবার দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য "শমন পাই নাই," "পরোয়ানা জারী হয় নাই" প্রভৃতি অলীক কথা কহিতে কুণ্ঠিত হয় না। তখন মুনি ঋষি ব্যতীত সাধারণ অধিবাসিগণ 'ঘরের খাইয়া বনের ম[illegible] তাড়াইতে' প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু চিরকাল ভগবানের অবতার, ত্রিকালজ্ঞ গণনাভিজ্ঞ রাজা পাওয়া যায় না, মানব রাজার শাসন সময়ে অধিবাসিগণের মূক ও বধিরের ন্যায়, পুতুলের ন্যায় আচরণ করিলে চলিবে না।

অতি পূর্ব্বকালে গুপ্তচরের সাহায্যে বহুব্যয়ে রাজাদিগের সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইত। রাজা রামচন্দ্রের গুপ্তচরের নাম ছিল দুর্ম্মুখ। বাস্তবিক ত দুর্ম্মুখ ভিন্ন উচিত সংবাদ কেহ প্রচার করিতে পারে না। এই জন্য এবং আরও অনেক কারণ বশতঃ সংবাদ পত্রের লেখকগণের নাম জনসমাজে প্রায়ই অপ্রকাশিত থাকে।

সর্ব্বপ্রথম "সাপ্তাহিক সংবাদ" (The Weekly News) নামধেয় এক পত্রিকা ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে নাথানিয়াল্ বাটলার (Nathaniel Butler) সাহেব বিলাতে প্রচারিত করেন। এই সময়ে পুস্তিকার সাহায্যে রাজনীতির সমর চলিত, উভয় পক্ষের প্রধান প্রধান বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ও মন্ত্রীসমাজ পুস্তিকা লিখিয়া স্বীয় স্বীয় মত প্রচার, বিপক্ষের মত খণ্ডন ও স্বপক্ষ সমর্থন করিতেন। ১৬৪০ হইতে ১৬৭০ সালের মধ্যে ৩০ সহস্র পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছিল। রাজা প্রথম চার্লস্ ও তাঁহার পার্লিয়ামেণ্টের মধ্যে বিবাদের সময় রাজার পক্ষ সমর্থন জন্য পিটার হেলিন্ Peter Haylin এক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র বাহির করেন, এবং তাঁহার দেখাদেখি পার্লিয়ামেণ্টের পক্ষ সমর্থন জন্য ম্যাথিউ নীডহাম (Mathew Needham) Mercurius Britannicus নামক এক সংবাদ পত্র প্রচার করেন। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে Public Intelligencer বাহির হয়, ইহা পরে London Gazette (লণ্ডন গেজেটের) সহিত মিশিয়া যায়।

ব্ল্যাকী সাহেব (Mr. Blakey) বলেন রাজা দ্বিতীয় চার্লস্‌এর রাজত্বকালে সংবাদ পত্রের সংখ্যা ৭০ হইয়াছিল। রাজা উইলিয়মের রাজত্বকালে মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা সংস্থাপিত হয় এবং অনেক সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হয়। কিন্তু রাণী য়্যানের (Anne) সময়ই সংবাদ পত্র বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয়, এবং এই সময়ে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণের বক্তৃতা ছাপা হইতে আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে মন্ত্রিগণ ও প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবকগণ সংবাদ পত্রের সহিত সংস্পৃষ্ট হইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। Swift, Addison, Steel, Bolingbroke প্রভৃতি সকলেই সংবাদ পত্রের সহিত সংস্পৃষ্ট ছিলেন। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জুনিয়াসের পত্র বাহির হইতে আরম্ভ হয় এবং তদ্দ্বারা সংবাদ পত্র বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয়।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজ বিপ্লবের সময় Orange Intelliegencer প্রচারিত হয়, এবং তাহার ঠিক এক শত বৎসর পরে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সংবাদ পত্রের রাজা জগতের সুপ্রসিদ্ধ টাইম্‌স্‌ (Times) নামক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রচারিত হয়। তখন ইহার চারি পৃষ্ঠা ছিল, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় চারিস্তম্ভ (Column) ছিল। বর্ত্তমান Globe ও Standard পত্রিকা অপেক্ষা কিছু ক্ষুদ্র কলেবর ছিল। ইহাতে ৬৩টী বিজ্ঞাপন ছিল। ইহাতে কবিতা, জাহাজের খবর, গল্প গুজব, দেশীয় ও বিদেশীয় সংবাদ ছাপা হইয়াছিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এই Times (টাইম্‌স্‌) পত্রিকায় ৯৬ স্তম্ভ ছাপা হইতে আরম্ভ হয়। পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানের সঠিক ও বিশেষ বিবরণ বাহির হয়। প্রত্যেক বিষয়ে অতি পারদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের লেখা দৃষ্ট হয়। সাহিত্য সম্বন্ধেও অতি উচ্চ অঙ্গের সমালোচনা বাহির হয়। পার্লিয়ামেণ্টের সমস্ত প্রকারের তর্ক বিতর্ক ও কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হয়। এবং দৈনিক দুই হাজারের অধিক বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। বর্ত্তমান রুষ-জাপান যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ জন্ত "টাইম্‌সের" তারহীন টেলিগ্রাফ ও যুদ্ধ জাহাজ আছে।

সংবাদ পত্রের এইরূপ একাধিপত্য লাভ করিতে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। আজ কাল প্রতি দিনের প্রত্যেক কাগজে যেরূপ ভাষা প্রয়োগ হয় সেইরূপ কথা লিখিবার অপরাধে লেইঠন্‌ (Leighton) সাহেবকে বেত্রাঘাত করা হয়, নাক কাটিয়া দেওয়া হয়, গালে কাল দাগ করিয়া দেওয়া হয়, চির জীবন জাহাজের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় এবং দেড় লক্ষ

টাকা জরীমানা করা হয়। গোপনে হল্যাণ্ডে এক পুস্তিকা ছাপা করার অপরাধে লীল্‌বরণকে (Lilburnc) পাঁচ শত বেত্রাঘাত করা হয়। বার্টন্, ব্যাষ্টউইক্ ও প্রীন্ প্রত্যেককে ৭৫ হাজার টাকা দণ্ড করা হয়, কর্ণ কাটিয়া দেওয়া হয়, গালে কাল দাগ দিয়া দেওয়া হয় ও চিরকালের জন্য জেলে আবদ্ধ রাখা হয়। সামুয়েল্ জন্‌সন্ (ডাক্তার জন্‌সন্ নামে লেখক) এক ব্যক্তিকে ঘোড়ার গাড়ীর ঘোড়ার লেজের সহিত বাঁধিয়া নিউগেট্ টীবার্ণ পর্য্যন্ত টানিয়া লওয়া ও কশাঘাত করা হয়। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে টাইন্ নামক এক ব্যক্তিকে রাজদ্রোহের অপরাধের শাস্তি দেওয়া হয়। তৎপরবর্ত্তী শতাব্দীতে ১৭০২ সালে ডিফোকে দুই শত মার্ক জরীমানা দিতে হয়, তিনবার অপমানসূচক পরিচ্ছদে সাধারণে প্রদর্শিত হইতে হয় এবং সাত বৎসরের জন্য জামীন দিতে হয়। তাহার পরেও সংবাদ পত্রের বিরুদ্ধে নানারূপ মোকর্দ্দমা স্থাপন ও লেখকগণের অনেক প্রকার শাস্তি হইয়াছে। অবশেষে সংবাদপত্র বর্ত্তমান একাধিপত্য লাভ করিয়াছে। আত্মরক্ত বলিদান না দিলে শক্তিদেবী প্রসন্না হন না ও শক্তিলাভ হয় না। হালাম সাহেবের পুস্তকে আছে (Hallam's Literature of Europe) সর্ব্বপ্রথমে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মেন্‌জের আর্কবিশপের আদেশক্রমে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আইন প্রচারিত হয়। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ফক্স (Fox) সাহেবের কৃত মানহানির আইনের দ্বারা মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে আরও অনেক সময় লাগিয়াছে। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়ার নামক পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালকগণকে নিম্নলিখিত কথা লিখিবার জন্য জরীমানা করা হয় ও জেলে দেওয়া হয়:—"রুষিয়ার সম্রাট তাঁহার প্রজাদিগকে পীড়ন করেন এবং ইয়ুরোপের মধ্যে হাস্যাস্পদ ব্যক্তি"। ১৮০৮ সাল হইতে ১৮২১ সালের মধ্যে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ১০১টী মোকর্দ্দমা হয় ও সর্ব্বসমেত ১৭১ বৎসরের কারাদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে মোকর্দ্দমার যে সংখ্যা গৃহীত হয় তাহাতে জানা যায় যে রাজা তৃতীয় জর্জ্জ ও চতুর্থ জর্জ্জের সময়ে সংবাদ পত্রের বিরুদ্ধে মোট ২৫টী মকর্দ্দমা হয়। কিন্তু আজ কাল সংবাদপত্রের অসীম স্বাধীনতা পরিলক্ষিত হয় এবং সংবাদ পত্র সমূহ ও এমন সুন্দর ভাবে পরিচালিত হয় যে কদাচ সেই স্বাধীনতা অপব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখন আমাদের এই দেশের সংবাদ পত্র সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। এদেশের সংবাদ পত্র ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময়

হইতে লর্ড ওয়েলেস্‌লীর সময় পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। এই শেষোক্ত গভর্ণর জেনারেল ও লর্ড মিণ্টোর সময়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্রমশঃ খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। লর্ড হেষ্টিংসের শাসন সময় তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। তিনি মিষ্টার জন্ আডামের হাতে শাসনভার ন্যস্ত করেন। জন্ আডাম্ সামান্য কারণে কলিকাতা জার্ণালের (Calcutta Journal) স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদককে নির্ব্বাসিত করেন এবং সংবাদ পত্রের বিরুদ্ধে কঠোর আইন বিধিবদ্ধ করেন। লর্ড আমহার্ষ্ট্ ক্রমশঃ উক্ত আইনের কঠোরতা শিথিল করিতে যত্নবান্ হন এবং লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সময়ে ঐ আইন অব্যবহার্য্য ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকে। লর্ড বেণ্টিঙ্ক বলিতেন যে সংবাদপত্রে যে গালাগালি দেয়, তজ্জন্য তিনি অনুমাত্র দুঃখিত নহেন। কিন্তু তথাপি তিনি সংবাদপত্রকে বন্ধুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন ও সুশাসনের সহায় বলিয়া মনে করিতেন। তিনি ভারতবর্ষে আসিবার কয়েক বৎসর পরে বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিবার পর সংবাদপত্র হইতে শাসন সম্বন্ধে যত সংবাদ পাইয়াছেন, তত সংবাদ আর কোন উপায়ে প্রাপ্ত হন নাই, সুতরাং এরূপ শাসনকর্ত্তার অধীনে সংবাদপত্রের আইন কঠোর হইলেও প্রকারান্তরে সংবাদপত্র একেবারে স্বাধীন ছিল।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের ডাইরেক্টর-সভা সমর-বিভাগের উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের একটী আয় কমাইয়া দেন, তাহাতে এদেশে সংবাদপত্রে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। লর্ড বেণ্টিক ডাইরেক্টর সভায় মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে সংবাদ পত্র সম্বন্ধীয় কঠোর বিধি পুনরুজ্জীবিত করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মন্ত্রীসভার প্রধান সভ্য মেটকাফ্ (Sir Charles Metcalfe) এক মন্তব্য লিখিয়া ঘোর প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, "এ যাবৎ এই বিষয়ে আন্দোলন ও তর্ক করিবার অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। এখন তাহা বন্ধ করিবার কোনই কারণ নাই। আমি অবগত হইয়াছি যে, হাফ বাট্টা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন স্বাধীন আলোচনায় সুফল প্রসব করিয়াছে। জনসাধারণের অপ্রীতিকর বিধানের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে আলোচনা হইলে সাধারণের মতামত পাওয়া যায় এবং যাহারা অনিষ্টের আশঙ্কা করে, তাহারাও জানিতে পারে যে, তাহাদের আবেদন অভিযোগ গভর্ণমেন্টের শ্রুতিগোচর হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্ট তৎসম্বন্ধে উচিত বিবেচনা

করিবেন। আমি সর্ব্বদাই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করিয়াছি, এবং আমার বিশ্বাস এই, স্বাধীনতাতে অনিষ্ট অপেক্ষা উপকারের ভাগই বেশী হইয়া থাকে। যদি এই স্বাধীনতা বন্ধ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সময় সময় গভর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারিতা অপেক্ষা কোন নির্দ্দিষ্ট ও নিশ্চিত বিধি প্রণয়ন করা আবশ্যক। বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট যে সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগের সহিত পত্র লেখালেখি করেন, তাহা অতি হাস্যজনক। এবং ইহাতে দেখা যায় যে, সংবাদপত্রের সম্পাদককে যে সময় সময় শাস্তি দেওয়া হয়, তাহাও একটা প্রহসনের ন্যায় হইয়া দাঁড়ায়, প্রকৃত অপরাধী শীঘ্রই অন্য পরিচ্ছদে আবির্ভূত হয়, এবং স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য, সাধুকার্য্যের জন্য শাস্তিভোগ করিয়াছে, এইরূপ অলীক মাল্যে বিভূষিত হয়। সাধারণের স্বীয় স্বীয় মনোগত ভাব প্রকাশ করিবার জন্য সংবাদপত্রই সুবিধাজনক উপায়, তাহাতে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।"

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বের গভর্ণর্ লর্ড ক্লেয়ার্ কলিকাতার এক সংবাদ-পত্রের লাইসেন্স (সনদ) প্রত্যাহার করিবার জন্য ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টকে লিখিলে মেট্‌কাফ্ সাহেব পুনরায় এক মন্তব্য লেখেন। কার্ডিনাল্ গ্রান্‌ভিল্ সংবাদপত্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, এই মন্তব্যও প্রায় সেইরূপ ভাব ছিল। তিনি গম্ভীর ভাবে বলিয়াছিলেন, "আমার নিকট মানহানির কথা উঠাইও না। আমার বিরুদ্ধে ফ্লাণ্ডার্সে যাহা খেলা হইয়াছে, তাহা দেখ, জার্ম্মেনীতে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা পাঠ কর, মার্কুইস্ আল্‌বার্টের জন্য এবং অন্যান্য কারণে আমার বিরুদ্ধে ল্যাণ্ডগ্রেভে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহাও পড়। আমি সমস্তই দুগ্ধের ন্যায় গলাধঃকরণ করিয়াছি। কাগজে অনায়াসেই লেখা যায়! এক কথায় বলিতে গেলে, লেখনী তরবারি নহে।" (After all, a pen is not a poniard)।

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতাবাসিগণ, মুদ্রাযন্ত্রের বিরুদ্ধে যে নিয়মাবলী ছিল, তাহা রহিত করিবার জন্য লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্কের নিকট আবেদন করেন, এবং আশাপ্রদ উত্তর প্রাপ্ত হন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সার্ চার্লস্ মেট্‌কাফ্ অস্থায়ী গভর্ণর্ জেনারেল্ হইয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া আইন প্রণয়ন করেন। এই জন্য তিনি বিলাতের ডাইরেক্টর সভার বিরাগভাজন হন। ডাইরেক্টর সভা মনে করিলেন যে, সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা দেওয়ায় তাঁহাদের ভারতবর্ষের রাজত্ব বুঝি যায় যায় হইল। কিন্তু

বহুদার্শতার দ্বারা দেখা যাইতেছে, সংবাদ-পত্রের দ্বারা শাসনকর্ত্তাদিগের ও শাসিতদিগের বহু বহু উপকার সংসাধিত হইয়াছে, দেশের শিক্ষার ও সভ্যতার বিস্তার হইয়াছে, অনেক অন্যায় কার্য্যেরও ভ্রম প্রমাদের প্রতিবিধান হইয়াছে এবং সংবাদ-পত্র দেশের সুশাসনের এক প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইহার বহুদিন পরে লর্ড লীটনের শাসনকালে সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা খর্ব্ব করা হয়। মহাত্মা লর্ড রিপণের সময়ে পুনরায় অবাধ স্বাধীনতা প্রদত্ত হয়। লর্ড ডাফ্‌রিণের শাসন সময়ে দেশীয় সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা বিলোপ করিবার চেষ্টা করা হয় এবং কতিপয় সংখ্যক মকর্দ্দমাও গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে আনীত হয়। কিন্তু সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা লোপ করিবার আইন জারী না করিয়া ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ধারা সংশোধন করা হয়। বর্ত্তমান কালে লর্ড কার্জ্জন পুনরায় State Secrets বিল আইনরূপে পাশ করিয়াছেন, কিন্তু এই আইন অনুসারে এ পর্য্যন্ত কোন মকর্দ্দমা স্থাপিত হয় নাই। সুতরাং এই আইন দেশীয় সংবাদপত্রকে কি ইংরেজী সংবাদ পত্রকে ভয় প্রদর্শনার্থ বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা এখন পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। বড়লাট্ সাহেব আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন যে "এই আইন প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হইবে না।" যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সংবাদপত্রের শিরোপরি (Damocle's sword) তরবারি ঝুলাইয়া রাখিয়া স্বাধীন চিন্তার ও উচিতবক্তার মুখ বন্ধ করা কেন?

যাঁহারা মনে করেন, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়া ও দেশবাসীদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা না দিয়া চিরকাল এই দেশে রাজত্ব করা যাইতে পারে, তাঁহাদের জন্য লর্ড মেট্‌কাফের মিনিট্ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"The world is governed by an irresistible power, which giveth and taketh away dominion, and vain would be the impotent prudence of men against the operations of its Almighty influence. All that rulers can do is to merit dominion by promoting the happiness of those under them. If we perform our duty in this respect, the gratitude of India and the admiration of the world will accompany our name throughout all ages, whatever may be the revolutions of futurity; but if we withhold

blessings from our subjects, from a selfish apprehension of possible danger at a remote period, we shall merit that reverse which time has possibly in store for us, and shall fall with the mingled hatred and contempt, the hisses and execrations, of mankind.

Whatever be the will of Almighty Providence respecting the future government of India. it is clearly our duty, as long as the charge be confided to our hands, to execute the trust to the best of our ability, for the good of the people. The promotion of knowledge (of which the liberty of the Press is one of the most efficient instruments), is manifestly an essential part of that duty. It can not be that we are permitted by Divine Authority to be here merely to collect the revenues of the country, have the establishment necessary to keep possession, and get into debt to supply the deficiency.

শ্রীঃ—বাচস্পতি।

বঙ্গভাষাব্যবচ্ছেদ প্রস্তাব প্রসঙ্গ।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহা লইয়া আমাদের দেশীয় সংবাদপত্রে নানাপ্রকার আন্দোলন হইতেছে। আমরাও বঙ্গভাষা, সাহিত্য এবং শিক্ষার পক্ষ হইতে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির অনুরূপ কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রয়াসী হইলাম।

সরকারী রিপোর্ট হইতে বুঝা যায় যে, দেশীয় কৃষককুলের শিক্ষার সৌকর্য্য সাধন উদ্দেশ্যেই এইরূপ বিধি ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হইয়াছে যে, বঙ্গদেশকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগে তত্তৎদেশীয় কথিত ভাষায় প্রণীত পুস্তক অধ্যাপনা করার আয়োজন করিতে হইবে। নতুবা কৃষক কুমারগণ কঠিন ভাষার পুস্তক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। আপাত-দৃষ্টিতে সরকার বাহাদুরের যুক্তি কলাপ বেশ মনোরম বলিয়া বোধ হইতে পারে বটে; কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে আর যুক্তিগুলি তেমন

সসার বলিয়া বোধ হয় না। আর মনে মনে একটা বিস্ময়ের উদ্রেক হয় যে, মহামনস্বীব্যক্তিবর্গগঠিত সভায় এইরূপ সব প্রস্তাব কিরূপে বিধিবদ্ধ হইতে পারে। সরকার বাহাদুর যাহা ইচ্ছা করেন করিতে পারেন, সে বিষয়ে তাঁহাদের পন্থা নিষ্কণ্টক ; কিন্তু যাহাই করিতে যাওয়া হউক, কোনও এক প্রকার যুক্তি দ্বারা তাহাকে দাঁড় করাইয়া করার কি প্রয়োজন, তাহাই আমাদের উপলব্ধি হয় না।

সরকার বাহাদুর অবশ্য সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই এ সব করিতেছেন, কি আমাদের কর্ম্মক্রমে ফল বিপরীত হইতেছে। বর্ত্তমান প্রাথমিক শিক্ষা বিধির বিপর্য্যয় প্রস্তাবেও যে ফল বড় ভাল হইবে, সে প্রত্যাশা আমরা করিতে পারিতেছি না।

প্রথমতঃ পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন বিষয়িনী নীতিই দোষান্বিতা। বাঙ্গালী বালকদিগের পাঠের জন্য বঙ্গ ভাষায় যে পুস্তক রচিত হইবে, তাহা প্রথমে ইংরাজি ভাষায় রচনা করিবার আবশ্যকতা কি, তাহা আমরা মোটেই বুঝিতে পারি না। ইংরাজি হইতে অনূদিত বাঙ্গলা পুস্তক না পড়াইয়া বঙ্গ ভাষায় রচিত পুস্তক পঠিত হইলে কি অপকারের সম্ভাবনা, তাহা সরকার বাহাদুর খুলিয়া বলেন নাই ; আমাদেরও স্থূল মস্তিষ্কে সে সূক্ষ্ম তত্ত্বের ধারণা হয় না। সরকার বাহাদুর একবার বিবেচনা করিয়া বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার স্বদেশীয় বালকগণের জন্য রচিত পুস্তক যদি প্রথমে বাঙ্গলায় রচিত হইয়া তৎপর ইংরাজিতে অনুবাদ করা হয়, তাহা হইলে তাহা কতদূর রুচিপ্রদ হইবে !

ইংরাজিতে রচিত হইবার আবশ্যকতা যদি এই হয় যে, ডিরেক্টর বাহাদুর প্রভৃতি উচ্চ পদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক ঐ পুস্তক পরীক্ষিত হইতে পারিবে ; তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, সরকার বাহাদুরের অসংখ্য বঙ্গীয় কর্ম্মচারীগণের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি কি এতই অল্প যে, ঐ সব পুস্তক তাঁহাদের দ্বারা পরীক্ষিত হইতে পারে না ? এ কথা বোধ হয় সরকার বাহাদুর স্বীকার করিবেন না। আর যদি রাজকীয় প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য সাধনোদ্দেশ্যে ইংরাজ কর্ম্মচারীগণের দ্বারাই ঐ সব পাঠ্য পুস্তক পরীক্ষিত হওয়া একান্তই আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব যে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে ঐ সব ইংরাজ কর্ম্মচারীগণকে বঙ্গ ভাষা শিখিয়া লইতে হইবে। তাঁহারা প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য লাটীন, হিব্রু, প্রভৃতি শতশত ভাষা

শিক্ষা করিতেছেন, প্রজাকুলের মঙ্গলের জন্য বঙ্গ ভাষা, হিন্দী প্রভৃতিও শিক্ষা করিয়া লউন। নতুবা জন কতক ব্যক্তির সুবিধার উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির অসুবিধা করা কোন ক্রমেই সঙ্গত বোধ হয় না। বাঙ্গালা ভাব ইংরাজীতে প্রকাশ করিয়া আবার তাহাকে বাঙ্গালার ছাঁচে ঢালিয়া ছাত্র-গণের হাতে দিলে তাহা প্রকৃত বাঙ্গালা হইবে কিনা সে বিষয়ে একান্তই সন্দেহ। খ্রীষ্টান বাঙ্গলা পুস্তক বিশ্ব বিদ্যালয়ের অনুবাদের প্রশ্ন পত্র প্রভৃতির আলোচনা করিলেই সে সন্দেহ নিরাকৃত হইবে। কি বিভক্তি কি কর্ত্তৃকর্ম্ম সংস্থান প্রত্যেক বিষয়েরই উভয় ভাষার প্রকৃতি ও গঠন বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ পুস্তক প্রণয়নের আদেশ প্রচার করা একটা খামখেয়ালির রূপান্তর ব্যতীত আমরা আর কিছু বলিতে পারি না। ইহাতে উন্নতিশালিনী বঙ্গ ভাষার তেজঃ খর্ব্ব হইবে বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। যদি তাহাই সরকার বাহাদুরের অভিপ্রেত হয়,তবে সে উদ্দেশ্য এতদ্বারা সাধিত হইবে বলিয়া আমরা বলিতে পারি। এইরূপ ইংরাজি পুস্তক রচনার আদেশ প্রচারের উদ্দেশ্য কি সর-কার বাহাদুর তাহা খুলিয়া বলেন নাই, এ জন্যই আমরা অন্ধকারে পড়িয়া আছি।

তার পর পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ বঙ্গদেশের এই চারি বিভাগ ভেদে চারি প্রকার ভাষাভেদ করিয়া তদনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে, ইহাও বিশেষ চিন্তা-প্রসূত বলিয়া আমাদের ধারণা হয় না! লিখিত ও কথিত ভাষায় একটা পার্থক্য চিরদিনই সর্ব্বদেশে চলিয়া আসি-তেছে। কথিত ভাষাতে পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হওয়া বাঞ্ছণীয় কিনা, সে বিষয়ে বলবান সন্দেহ বর্ত্তমান। সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, কথিত ভাষার আকৃতি প্রতি যোজনেই পরিবর্ত্তিত হয়, কথিত ভাষার রূপ এক প্রকার কখনই থাকিতে পারে না। নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর জন সাধারণের মধ্যেও তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গিয়া থাকে। পাশ্চাত্য শব্দ শাস্ত্রও কথিত ভাষার এই পরিবর্ত্তনশীলতা স্বীকার করেন। পাশ্চাত্য ভাষাতেও যে সমস্ত পাঠ্য পুস্তক রচিত হয়, তাহা কথিত ভাষায় কি লিখিত ভাষায়, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারেন। বিশেষতঃ সরকার বাহাদুরের তাহা অজ্ঞাত থাকিবার কোনও কারণ নাই। কথিত ভাষা প্রাদেশিকতা দুষ্ট বলিয়াই গ্রন্থাদি প্রণয়নে পরিত্যাজ্য হইয়াছে। কোন নাটকাদি দৃশ্যকাব্য

ও তথাবৎ গ্রন্থে প্রাদেশিকতা পূর্ণ গ্রাম্য ভাষার প্রসর আছে। এরূপস্থলে প্রাথমিক শিক্ষার পুস্তকাবলী প্রাদেশিক ভাষায় প্রণয়নের আদেশ প্রচার করা কতদূর সঙ্গত, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

সরকার বাহাদুর একবার প্রণিধান করিয়া বুঝিতে পারেন যে, ইংলণ্ডের নানা প্রদেশের জন্য যদি তত্তৎদেশীয় প্রাদেশিকতা-পূর্ণ গ্রাম্য ভাষায় পুস্তক রচিত হয়, তাহা হইলে সেটা কিরূপ প্রিয় হইবে? ইয়র্কসায়ারের কথার সঙ্গে মিডল্ সেক্সের কথায় যে বাক্যে, উচ্চারণে ও স্বরে অনেক বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা সকলেই জানেন। এইরূপ অন্যান্য প্রদেশেরও কথিত ভাষার সঙ্গে অনেকই পার্থক্য দেখা যাইবে। কিন্তু ইংলণ্ডাদি প্রদেশে শ্রমজীবিগণের জন্য রচিত পুস্তক সমূহে এই প্রাদেশিক ভাষা স্থান পাইয়াছে কি, লিখিত সাধারণ ভাষা স্থান পাইয়াছে, তাহা অভিজ্ঞেরা বলিতে পারেন। আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে এইরূপ ভাষা-বিভাগ দ্বারা উন্নতিশালিনী বঙ্গভাষার বিশেষরূপ অনিষ্ট সাধিত হইবে।

কিন্তু এতদ্বারা দেশীয়গণের কি কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহা আমরা ধারণা করিতে অক্ষম। সরকার বাহাদুর বলিতে চাহেন যে, বর্ত্তমান প্রণালীতে শিশু শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক এরূপ ভাষায় প্রণীত হয় যে, তাহা তাহাদের বোধগম্য হওয়া কঠিন! এ কথা কতকাংশে সত্য হইতে পারে, কিন্তু তন্নিবারণ কল্পে যে উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাতো আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। উপযুক্ত লোক দ্বারা প্রণীত হইলে এই লিখিত ভাষাতেই এরূপ সহজ পুস্তক লিখিত হইতে পারে যে তাহা অনায়াসে বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর হইতে ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সর্ব্ব জেলায় পঠিত হইতে পারে। মধ্যে মধ্যে বিষয়ানুরোধে যেখানে নিত্য আহার্য্য, অস্ত্র শস্ত্র বস্তুজাত প্রভৃতির উল্লেখ করিতে হয়, সেই সেই স্থলে পাদটীকায় ঐ সমস্ত শব্দের প্রাদেশিক নামগুলি লিখিত থাকিলে বর্ত্তমানের অসুবিধাটুকু অনায়াসেই দূরীভূত হইতে পারে। কৃষিকার্য্য, গৃহস্থালী, প্রভৃতিতে ব্যবহার্য্য বস্তুজাতের এবং এইরূপ আরও অনেক জিনিসের প্রদেশ ভেদে নানারূপ নাম আছে। সে গুলির ঐ সমস্ত বিভিন্ন নাম পুস্তকে প্রদত্ত না হইলে শিক্ষাসৌকর্য্যের অসুবিধা হয়, তাহা আমরা অভিজ্ঞতা হইতেই বুঝিতে পারি। বর্ত্তমান পাঠ্য পুস্তকে এমন অনেক শব্দ আছে, যাহা পল্লীর ছাত্রবর্গ দূরে থাকুক, শিক্ষকগণও বুঝিতে পারেন না; সেজন্য অনেক সময় 'কপিত্থ'

'কালকচু' এবং 'নারিকেল' লতা বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইবার ন্যায় অনেক আনুমানিক অর্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদি গ্রন্থকর্ত্তৃগণ গ্রন্থ প্রণয়ণের সময় এই বিষয় স্মরণ রাখিয়া প্রাদেশিক শব্দাবলীর বিভিন্ন নাম যুক্ত একটি তালিকা পুস্তকের সহিত সংলগ্ন করিয়া দেন, তাহা হইলে আমাদের বিবেচনায় এই অভাবের মোচন হয়। আর শিশুগণের পাঠের জন্য রচিত পুস্তক সকল লিখিত ভাষাতেই যে অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ করিয়া রচিত হইতে পারে, সে বিষয় আমরা সন্দেহ করি না; তবে যে সে ব্যক্তিই গ্রন্থকার হইলে তাহার আশা কম। বঙ্গ ভাষায় অধিকারী মনীষিগণ যদি এইরূপ পুস্তক রচনা করেন, তাহা হইলে অতি সহজ অথচ সুললিত বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হইয়া বঙ্গ ভাষার পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে শিশুগণের পাঠসৌকর্য্য উভয়ই সংসাধিত হইতে পারে। শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারী হইলেই যে তাঁহারা বঙ্গ ভাষায় অভিজ্ঞ হইবেন, এরূপ প্রত্যাশাও যেমন বৃথা, উক্ত উপাধিধারীগণের প্রত্যেকেরই বঙ্গ ভাষা প্রয়োগকুশল হওয়ার আশাও তেমনই অলীক। তৈল মর্দ্দনের ভয়ে অনেক সুশিক্ষিত বঙ্গ সাহিত্যসেবী বাল্যপাঠ পুস্তক রচনাতে হস্তক্ষেপ করিতে একান্তই বীতস্পৃহ। একখানি পুস্তক লিখিয়া তাহাকে পাস করাইবার জন্য যেরূপ তোষামোদ, লাঞ্ছনা এবং ব্যয় করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী অবগত আছেন। অনেকে যে এই কার্য্যে পশ্চাৎপদ, তাহা তাঁহাদিগের সঙ্গে আলাপে বুঝিতে পারা যায়। শুনা যায় যে, যাহাদের শ্যালক, কি শ্বশুর, কি পিতা, কি বন্ধু, কি অন্য কোন আত্মীয় অথবা আত্মীয়ের আত্মীয় তস্য আত্মীয় শিক্ষাবিভাগের কোন উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহারা অনায়াসেই সাহিত্য, ব্যাকরণ, গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি সকল বিষয়ের পাঠ্য পুস্তক লিখিয়া অর্থবান হইতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত, তাঁহাদের ভাগ্যে পুস্তকের মুদ্রণ ব্যয় দণ্ড দান ভিন্ন অন্য কোন লাভ কদাচিৎ দেখা যায়। এই কলঙ্ক দূর করিয়া যদি সরকার বাহাদুর অভিজ্ঞ লোকের প্রণীত পুস্তকের গুণানুগুণ বিচার করিয়া পাঠ্য নির্ব্বাচন করেন, তাহা হইলে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুস্তক প্রণীত হইবে, তাহাতে আমরা সন্দেহ করি না। ক্রমশঃ

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী, বি-এ।

অর্চ্চনা

প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী)

সম্পাদক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

সহকারী সম্পাদক—শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত প্রখ্যাতনমা লেখকবৃন্দ অর্চ্চনায় লিখিয়া থাকেন। ষ্টেট্স্ম্যান্, বেঙ্গলী, আনন্দবাজার, বঙ্গবাসী, বসুমতী, প্রভৃতি বিখ্যাত সংবাদ পত্র সমূহে বিশেষ প্রশংসিত। ১৩১১ সালের ফাল্গুন মাস হইতে দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইল। অগ্রিম বর্ষিক মূল্য রাজসংস্করণ ২৲ দুই টাকা মাত্র, সুলভ সংস্করণ ১।০ পাঁচসিকা মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র—সহকারী সম্পাদক।

অর্চ্চনা কার্য্যালয়, ২৯ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন,

কলিকাতা।

উষা—গীতিকাব্য।

সচিত্র।

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

বিলাতী কাগজে সিপিয়া কালিতে মুদ্রিত এবং জনৈক বিখ্যাত চিত্রকরের কয়েকখানি কল্পিত চিত্রে পরিশোভিত। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিলাতী ধরণের পুস্তক আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। দেশের শ্রেষ্ঠ লেখক বর্গ এক বাক্যে পুস্তকের প্রশংসা করিয়াছেন। এই অল্প দিনের মধ্যেই অধিকাংশ পুস্তক বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, গ্রাহকবর্গ সত্বর হউন। আমার নিকট অথবা গ্রন্থকারের নিকট হইতে যিনি একত্রে ১২ কাপি পুস্তক ক্রয় করিবেন, তাঁহাকে এক কপি পুস্তক উপহার প্রদত্ত হইবে এবং "বীরভূমির" গ্রাহক বর্গের ভিঃ পিঃ খরচ লাগিবে না।

উৎকৃষ্ট আর্টপেপারের কভার	১৲ টাকা।
রেশমী কাপড়ের বাঁধান ও সোণার জলে নাম লেখা	১৷৷৹ টাকা।

পুস্তক কলিকাতার গুরুদাস বাবুর দোকানে ও মজুমদার লাইব্রেরীতে এবং নিম্নলিখিত ঠিকানায় গ্রন্থকার ও আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

বহরমপুর,
জেলা মুর্শিদাবাদ।

প্রকাশক
শ্রীনিরঞ্জন কুমার সেন, বি, এ।

বীরভূমি সংক্রান্ত নিয়মাবলী

১। বীরভূমির আকার ডিমাই আটপেজী পাঁচ ফর্ম্মার কম হইবে না।

২। বীরভূমি প্রতিমাসের প্রথম দশদিনের মধ্যে প্রকাশিত হইবে। মাসের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে আমাদের পত্র লিখিবেন।

৩। বীরভূমির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা মাত্র। এক খণ্ডের মূল্য ৵১০। নমুনা পাইতে হইলে ৵১০ টিকিট পাঠাইতে হয়।

৪। বিজ্ঞাপনের হার,

মলাটে	১ পৃষ্ঠা মাসিক	৩৲
„	½ „ „	২৲
বিজ্ঞাপনীর ভিতর	১ „ „	২॥০
„	½ „ „	১॥০

প্রতি লাইনে ⁄১০।

বহু দিনের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে আমরা স্বতন্ত্র চুক্তি করিয়া থাকি। বিজ্ঞাপনের টাকা অগ্রিম দেয়।

শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য্য বি, এ,
ম্যানেজার।
কীর্ণহার, জেলা বীরভূম।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

৫ম খণ্ড বীরভূমির ৫ সংখ্যা গ্রাহকগণের নিকট প্রেরিত হইল। এখনও বহু গ্রাহক মূল্য দেন নাই। গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন অনতিবিলম্বে আপন আপন দেয় মূল্য পাঠাইয়া দেন। অথবা যদি আপত্তি না থাকে, তবে আমরা ভিঃ পিঃ ডাকে কাগজ পাঠাইয়া মূল্য আদায় করিব। যাঁহাদের আপত্তি আছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সত্বর জানাইবেন। ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না। পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ ও জীবন গ্রাহকগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে। ইহা স্মরণ করিয়া গ্রাহকমহোদয়গণ কার্য্য করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য্য, বি, এ,
ম্যানেজার।
কীর্ণহার, পোঃ জেলা বীরভূম।

জানেন কি

যে

নানা মাসিক পত্রের বিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ

চক্রবর্ত্তী বি, এ, প্রণীত

কয়েকখানি পত্র

শ্রীপাঠ্য কল্যাণকর উপদেশ-পূর্ণ পুস্তকের মধ্যে অতি উচ্চ স্থল অধিকার করিয়াছে? একজন পড়িলে আর দশজনকে পড়িতে বলিতেছেন; মহিলাগণ ইহাকে "কন্তার বিবাহে অমূল্য যৌতুক" বলিতেছেন, কিশোরীগণের, যুবতীগণের ও গৃহিণীগণের নিত্য সহচর হওয়ার উপযুক্ত বলিয়া ইহা দেশের বিখ্যাত সংবাদ পত্র ও মহানুভবগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে। ইহাতে স্ত্রীজীবন কিরূপে গঠিত হইলে সংসার সুখ শান্তিপূর্ণ হয়, স্ত্রীলোকের লেখাপড়া, সংসার ধর্ম্ম, লজ্জা, সহিষ্ণুতা, সতীত্ব, অলঙ্কার, পরিচ্ছদ ইত্যাদির বিষয় কার্য্যকর উপদেশ অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। বেঙ্গলী, বসুমতী, রঙ্গালয়, প্রদীপ, প্রবাসী, নব্যভারত, প্রভৃতি পত্রে প্রশংসিত এবং রায় রাধানাথ রায়বাহাদুর, নগেন্দ্রবালা সরস্বতী, যোগেন্দ্রনাথ সেন, পণ্ডিত অন্নদা চরণ তর্ক চূড়ামণি, প্রভৃতি বহু সুধীমণ্ডলী কর্ত্তৃক পরমাদৃত। চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর মহোদয় কর্ত্তৃক বালিকাগণের বিশেষ পারিতোষিক পুস্তক স্বরূপে অনুমোদিত ও প্রশংসিত। কত অর্থ কতরূপে ব্যয়িত হয়, স্বীয় ২ প্রিয়তমা পত্নী, স্নেহের দুহিতা ভগিনী প্রভৃতির জন্মে এসেন্স সাবান, নবেল নাটকে কত অর্থই সকলে ব্যয় করেন, একবার এই পরমোপকারী পুস্তক খানি তাঁহাদের হস্তে উপহার প্রদান করিয়া দেখুন—অর্থ জলে পড়িবে না, অর্থের বহুগুণ উপকার প্রাপ্ত হইবেন। বহু মহিলা ও শিক্ষিত মহোদয়গণের অনুরোধে মূল্য কাগজের মলাট ৷৵০ স্থলে ॥০ আট আনা এবং বাঁধাই ১৲ স্থলে ৷৵০ আনা করা গেল। পুস্তক বেশী নাই। ভিঃ পিঃ ও মাশুল স্বতন্ত্র।

এই পুস্তক বালিকাগণকে পারিতোষিক প্রদান করাতে অনেকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ইহার প্রশংসা করিয়া পত্র দিয়াছেন। সকলে একবার দেখুন, বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর ব্যতীত এ পুস্তকে এত আদর হওয়ার কারণ আছে কি না। কলিকাতা ২৫নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, জয়ন্তী প্রেসে, শ্রীবসন্ত কুমার চক্রবর্ত্তী প্রকাশকের নিকট এবং চাঁদপুর হাইস্কুলের রেক্টর গ্রন্থকারের নিকট চাঁদপুর পোঃ জেলা ত্রিপুরা ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

কলিকাতা, ৩০/৫ মদনমিত্রের লেন, নব্যভারত-প্রেসে,

শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত। ১৩১১ সাল।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী

৫ম খণ্ড] আষাঢ়, ১৩১২ [৭ম সংখ্যা।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ,

সম্পাদিত।

সূচী।

কীর্ণহারের সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশহিতৈষী জমিদার শ্রীযুক্ত
বাবু সৌরেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের সম্পূর্ণ
ব্যয়ে বীরভূম জেলার অন্তর্গত
কীর্ণহার গ্রাম হইতে
শ্রীদেবিদাস ভট্টাচর্য্য বি, এ
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
২৫শে জ্যৈষ্ঠ—১৩১২।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ১৸৹। এই সংখ্যার মূল্য ৶১০।

৫ম খণ্ড ।] আষাঢ়, ১৩১২ [৭ম সংখ্যা

বৈজ্ঞানিকের ভুল নহে।

অজ্ঞতা ও অপূর্ণতা।

(৩)

ধর্ম্মশাস্ত্র বলেন যে, আদিতে একমাত্র পরব্রহ্ম, অসীম আকাশ (space) ও অনন্তকাল (eternity) ব্যাপিয়া বিদ্যমান ছিলেন, আছেন, ও থাকিবেন। এই পরব্রহ্ম চিন্তাগম্য নহেন, তিনি অপার ও অগম্য। বেদান্তদর্শন আকাশকে ও মহাকালকে (অনন্তকালকে) তাঁহার অস্তিত্বের চিহ্নস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। "আকাশ স্তল্লিঙ্গত্বাৎ"। তিনি অপ্রকাশ, অবিকাশিত (Unmanifested) পরব্রহ্ম, তাঁহাকে মাত্র "তৎসৎ" (It is) বলা হইয়া থাকে। ইহামহাপ্রলয়ের অবস্থা। তিনি এক মাত্র সৎ, অনন্ত শূন্যে (আকাশে) বিরাজিত, অনন্ত গাঢ় অন্ধকার ঘন অন্ধকারে আবৃত, অর্থাৎ তখন নাম-রূপ-বিশিষ্ট (মায়া দ্বারা সীমাবদ্ধ) জগৎ ও ঈশ্বর অপ্রকাশিত ও অবিকাশিত (Unmanifested) থাকেন। তৎপর তিনি মায়ার (নাম রূপ এবং সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ) সাহায্যে প্রকটিত (manifested) হইবার ইচ্ছা (Will) বা চিন্তা (তৎ ঐক্ষত বহুস্যাং—Thought) করিয়া অনন্ত আকাশের এক অংশ গ্রহণ করিয়া ঈশ্বররূপে প্রকটিত হইলেন (manifested)। শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন মেকাংশেন স্থিতো জগৎ"—আমি এই সমুদয় বিশ্ব আমার এক অংশের দ্বারা ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি। পরমব্রহ্ম একাংশ দ্বারা প্রকটিত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, সত্ব (রক্ষণশীল), রজঃ (বর্দ্ধনশীল)

ও তমঃ (ধ্বংসশীল) এই তিন গুণ অবলম্বনে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কার্য্যে ব্রতী (active) হইলেন, এই কর্ম্ম তৎপরতার (activity) নামই প্রাণ। পরম ব্রহ্ম অসীম শূন্য বা অনন্ত আকাশের অংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া একাংশ দ্বারা তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া (ensouling) স্বকীয় ইচ্ছা বা চিন্তাবলে স্পন্দন বা তরঙ্গ (vibrations, waves) উৎপাদন করিয়া আদিভুবন, পরে অনুপাদক ভুবন, পরে ব্যোম-ভুবন (region), পরে মরুৎ-ভুবন, পরে তেজো-ভুবন, পরে অপ-ভুবন, ও পরে ক্ষিতি বা স্থূল-ভুবন প্রকটিত করিলেন। এই সপ্তভুবনের অনুরূপ সপ্তলোক যথা—ভূঃ বা পৃথ্বীলোক, ভুবঃলোক (সূক্ষ্ম), স্বর্লোক (সূক্ষ্মতম), মহঃ (অরূপ), জন (অরূপ), তপঃ (অরূপ) সত্য-লোক (অরূপ)। এই সপ্তভুবন বা সপ্তলোকের সর্ব্ব নিম্নের তিন লোক রূপ (having forms), তৎপরবর্ত্তী চারি লোক অরূপ (formless)। ক্ষিতি লোকের অধিবাসিগণ স্থূল ও প্রত্যক্ষ রূপধারী, ভুবর্লোক বা নক্ষত্র লোকের অধিবাসিগণ সূক্ষ্ম রূপধারী, স্বর্লোক বা স্বর্গলোকের অধিবাসিগণ তেজোময় সূক্ষ্মতম রূপধারী। ক্ষিতিলোকে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম (ইথার) স্থূল অবস্থায় (dense) আছে, ভুবর্লোকে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম সূক্ষ্মাবস্থায় (subtle) অবস্থায় আছে। তৎপরের কয়েক লোকেও ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম আছে, কিন্তু তাহা অতি অতি সূক্ষ্মাবস্থায় (very, very, subtlest), তাহাদিগকে অরূপই বলা হইয়া থাকে। এই সপ্তভুবন বা সপ্তলোক পরস্পর ওতঃপ্রোতোভাবে (interpenetrating or intermingling) বিরাজমান, একটি অপরটির বাহিরে নহে। তবে সমস্ত গুলির জ্ঞান হয় না কেন? কারণ জ্ঞান সীমাবদ্ধ, জ্ঞান জ্ঞাতার জ্ঞান। মানবের ইন্দ্রিয়বর্গ যে জ্ঞান লাভের উপ-যোগী, সেই জ্ঞান মাত্র লাভ হয়। বাহ্যবস্তুর সহিত মানবের ইন্দ্রিয়বর্গ সংস্পৃষ্ট হইলে অনুভূতি জন্মে। মানবের ইন্দ্রিয়বর্গ যে জ্ঞান আনয়ন করিতে পারে মাত্র, তাহাই মানব জানিতে পারে। যেমন সুন্দর দৃশ্যাবলি অন্ধের অদৃশ্য,মনোহর সংগীত বধিরের শ্রবণাশক্য। যেমন পরব্রহ্ম (unmanifested God) বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বর (manifested God বা Word বা Logos) হয়েন, সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব ঈশ্বরের বিকাশ, অভিনব সৃষ্টি নহে (Out of nothing, nothing is created)। শ্রীভগবান গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"নাসতো বিদ্যতেহভাবো নাভাবো বিদ্যতে

সতঃ"—অসৎ বস্তুর (যাহা নাই, nothing) সৃষ্টি বা উৎপত্তি সম্ভবে না, সৎ পদার্থের (যাহা আছে) একান্ত অভাব বা অত্যন্ত বিনাশ সম্ভবে না, রূপ বা আকারের পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। পঞ্চ মহাভূতের তৃতীয় তেজ বা তাপকে বায়ু বলা যায়, কারণ তাপ হইতে বায়ুর উৎপত্তি। মরুৎকে ১নং ইথার, ব্যোমকে ২নং ইথার, অনুপাদক স্তরকে ৩নং ইথার ও আদি ভুবন স্তরকে ৪নং ইথার বলা হইয়া থাকে, ইহারা জড়শক্তির বা প্রাণশক্তির বা ইচ্ছাশক্তির সঞ্চালক (medium)।

উপরে যে মত বলা হইল, ইহা তত্ত্ববাদিগণের ধর্ম্মমতের সার সংগ্রহ। দর্শনেরও প্রায় ইহাই মত, এবং এই মত বিজ্ঞানেরও অসম্মত নহে। এই সম্বন্ধে বিজ্ঞান কত দূর অগ্রসর হইয়াছেন,তাহার কিছু বিচার করা আবশ্যক: দর্শন আত্মা (spirit), বুদ্ধি (intelligence) ও দেহ বা আকৃতি (form), এই ত্রিমূর্ত্তিধারী (trinity) মনুষ্যের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে প্রয়াস পান। আকৃতি বা দেহ আবার তিন প্রকার—স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর (astral body) এবং অতি সূক্ষ্ম বা কারণ শরীর (casual body)। বিজ্ঞান মাত্র স্থূল শরীরের বিষয়ই আলোচনা করিয়া থাকেন। এই প্রত্যক্ষ দেহধারী মানব ভিন্ন অতিরিক্ত কোন আত্মা, বুদ্ধি, সূক্ষ্ম শরীর, কারণ শরীর প্রভৃতির অস্তিত্ব আছে কিনা, ও থাকিলে তাহারা জড় শক্তির অতিরিক্ত কোন পদার্থ কিনা, এই সম্বন্ধে বিজ্ঞান কিছু নির্ণয় করিতে অগ্রসর হন নাই; কারণ সমুদয় কার্য্য ও সৃষ্টিই যদি জড় শক্তির সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলে অতীন্দ্রিয় পদার্থের অনুমান করিবার আবশ্যকতা কি ?

বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে অণু, পরমাণু মহাণুতে বিশ্লেষণ করিলে পদার্থ (matter) এবং আদ্যাশক্তি (Energy) মাত্র পাওয়া যায়। পদার্থ ও শক্তি অবিনশ্বর এবং অনুৎপন্ন, অর্থাৎ তাহাদের বিনাশও নাই, অভিনব উৎপত্তিও নাই। (এই বিষয় পরে বিস্তৃত ভাবে বলা হইবে)। মূল পদার্থও একমেবাদ্বিতীয়: আদ্যাশক্তিও একমেবাদ্বিতীয়া। আদ্যাশক্তি (Everlasting energy) যে একমাত্র শক্তি, বহু শক্তি নহে, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। এবং ইহাও অনেক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের ধারণা যে পদার্থ (matter) স্বতন্ত্র কিছুই নহে, শক্তির (energy) প্রকম্পন, স্পন্দন, আন্দোলন বা সঞ্চালন (vibrations) মাত্র। আদ্যাশক্তিই একমাত্র সৃষ্টি-রচয়িত্রী অর্থাৎ সমস্ত জাগতিক কার্য্যের (রূপ

পরিবর্ত্তনের, উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশের) একমাত্র মূল কারণ। পদার্থ ও শক্তি পরস্পর সম্বন্ধ, তাহার একের বিহনে অপরের অস্তিত্বের কল্পনা সম্ভবে না।

এক অদ্বিতীয় মহাশক্তিই যে রূপান্তরিত হইয়া বিভিন্ন আকারে পরিণত হয়, ইহা বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য। এক প্রকারের ভৌতিক শক্তি (Physical force) অন্য প্রকার শক্তির আকার ধারণ করিতে পারে। গতি (Motion) তাপে (heat) পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। তাপ হইতে গতি, আলোক (Light), ও বিদ্যুৎ (electricity) উৎপন্ন হইতে পারে। গতি হইতে চুম্বকাকর্ষণী শক্তি (Magnetism) উৎপন্ন হইতে পারে। এইরূপ এক শক্তি অন্য শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। এই ভৌতিক শক্তি নিচয়ের মধ্যে যদি ইথার (ether) সঞ্চালকের মধ্য দিয়া তরঙ্গ বা স্পন্দন উৎপন্নকারী প্রাণ-শক্তিকে ভুক্ত করা যায়, তাহা হইলে এমন দিন আসিবে, যখন বিজ্ঞান প্রমাণ করিতে পারেন যে, সমস্ত ভৌতিক শক্তির মূলকারণ প্রাণ বা ইচ্ছা শক্তি। এই যে এক শক্তি অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে, ইহার কারণ কি? মনে করুন, গতি (Motion) এবং তাপ (heat); ইহারা কিরূপে উৎপন্ন হয়? পদার্থের পরমাণুর (moleccues) স্পন্দনের (vibrations) দ্বারা উৎপন্ন হয়। এইরূপ আলোক, বিদ্যুৎ প্রভৃতি শক্তি ও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণুর নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বিকম্পনের (vibrations) দ্বারা উৎপন্ন হয়। বিকম্পনের সংখ্যার বিভিন্নতাই শক্তির পার্থক্যের কারণ। এই যে স্পন্দন সঞ্জাত হয়, তাহা সঞ্চালক পদার্থের (medium) মধ্য দিয়া সঞ্চালিত হয়। সব পদার্থ সব শক্তির সঞ্চালক পদার্থ হইতে পারে না। শ্রবণশক্তি সম্পন্ন জীবের শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্যদিয়াই শব্দ (Sound) স্নায়ু মণ্ডলে কম্পন উৎপন্ন করিতে পারে। চুম্বুকাকর্ষণ-সম্পন্ন পদার্থ আকর্ষণোপযোগী সঞ্চালক পদার্থের মধ্য দিয়া আকর্ষণ করিতে পারে। নদী, সমুদ্র, বৃক্ষ, বনজঙ্গল, ইষ্টকালয়, কঠিন পর্ব্বত প্রভৃতির মধ্য দিয়াও ইথার সঞ্চালিত হইতে পারে। যদি এই মহাশক্তি (everlasting energy) অজ্ঞেয় পরব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি বা সঙ্কল্পের আন্দোলনে (vibrations) উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা প্রমাণ করা যায়, তাহা হইলে বিশ্ব-বিকাশের মূল কারণ—"তৎ ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়।" ইচ্ছাশক্তি যে একটী মহতী শক্তি এবং চিন্তার (Thoughts) দ্বারাও যে স্পন্দন (vibrations) ও রূপ (form) উৎপন্ন হইয়া চিত্তের বিনিময় হইতে পারে, ইহাও আজ কাল পরীক্ষিত হইতেছে। শব্দ (sound) দ্বারা স্পন্দ-

উৎপন্ন হইয়া আকার (sound form) জন্মে, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। চিন্তা দ্বারাও তদ্রূপ আকার (Thought-forms) জন্মিতে পারে, ইহার নাম চিন্তার বিনিময়—Telepathy. ইহাও এক প্রকার পরীক্ষিত সত্যই বলিতে হইবে। এই আকারের ফটোগ্রাফ্ লওয়া হইয়াছে। আত্মা অবিনশ্বর, পরমাণু অবিনশ্বর, ইহা স্বীকার্য্য সত্য, ও পরীক্ষিত সত্য। শক্তি (energy) যে নূতন উৎপন্ন হয় না ও বিনষ্টও হয় না, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য (Conservation of energy)। শক্তি (energy) দুই প্রকার অবস্থায় দৃষ্ট হয়, এক অপ্রকাশিত অবস্থায় (Latent state—potential energy) স্থিতিভাবাপন্ন, অপর প্রকাশিত অবস্থায় কার্য্যকরী গতিশীল (kinetic energy)। তাপ শক্তি পদার্থের ভিতর, যেমন কাষ্ঠের ভিতর অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে, কাষ্ঠ অন্য পদার্থের সহিত সংঘৃষ্ট হইলে তাপ প্রকাশিত হয়। কোন বস্তুকে আঘাত করিয়া ঊর্দ্ধ দিকে চালিত করিলে প্রকাশিত শক্তি ঐ বস্তুর ভিতরই অপ্রকাশিত অবস্থায় সঞ্চিত রহিল। সৎভাবাত্মক বিদ্যুৎ (Positive electricity) যখন অভাবাত্মক (negative electricity) বিদ্যুতের সহিত মিলিত হয়, তখন বৈদ্যুতিক আকর্ষণের কোন চিহ্নই থাকে না, উভয়েই বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক তাহা নহে, অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে, ইচ্ছা করিলে পৃথক করা যাইতে পারে। প্রত্যেক পদার্থে এবং আত্মাতে এই মহাশক্তি নিহিত আছেন—অপ্রকাশিত অবস্থায়। এই জন্যই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে শক্তির বিনাশ ও উৎপত্তি সম্ভবেনা। বিজ্ঞান উন্নত হইলে বলিতে পারিবেন, ইচ্ছাশক্তির বা চিন্তা শক্তির বা প্রাণ শক্তির একান্ত বিনাশ ও অভিনব উৎপত্তি সম্ভবেনা। সৃষ্টির আদিতে পরমব্রহ্ম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবার বা বিকাশিত হইবার ইচ্ছা বা সঙ্কল্প করিয়া যে শক্তি পরিচালিত করিলেন (Kinetic energy),তাহা আমাদিগের উপর সংক্রামিত হইয়াছে, আমাদের উপর কখনও কার্য্য করে (মিডিয়াম্ অনুসারে Kinetic হয়), কখনওবা প্রকাশিত অবস্থায় থাকে (বিকাশের উপযুক্ত মিডিয়াম্ অভাবে Potential হয়)। বায়ুমণ্ডলে তাড়িৎ-তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে; চুম্বক শক্তি দূরত্ব ও কঠিন পদার্থ ভেদ করিয়া এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তির চিত্তে সঞ্চালিত হইতেছে, ইহাও এক প্রকার স্বীকৃত।

এখন দেখা যাউক, জীবনী শক্তি (Vital energy) কি, এবং সেই তত্ত্ব নির্ণয় সম্বন্ধে বিজ্ঞান কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বিজ্ঞানের বর্ত্তমান জ্ঞান

অনুসারে বিজ্ঞান জড় পদার্থকে (কারণ জড়ের অতিরিক্ত আত্মাকে বিজ্ঞান স্বীকার করেন না,) দুই ভাগে বিভক্ত করেন, চেতন জড় পদার্থ ও অচেতন জড় পদার্থ। বাস্তবিক এই পার্থক্য হাস্যোদ্দীপক হইলেও অযৌক্তিক নহে। "চেতন" অর্থে এই বুঝিতে হইবে, যাহার উপর Kinetic energy কার্য্য করিতেছে, এবং "অচেতন" অর্থে এই বুঝিতে হইবে যাহার ভিতর শক্তি Potential অবস্থায় আছে, প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না। হিন্দু দর্শন মতে জড় পদার্থেরও জীবন আছে, জড় পদার্থের অভ্যন্তরে—মহাণুর অভ্যন্তরে—সূক্ষ্ম ইথার ওতঃপ্রোতোভাবে (interpenetrating, entermingling) বিরাজিত। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, ঈশ্বর আকাশের অভ্যন্তরে আত্মারূপে অনুপ্রবেশ (ensouled) করিয়াছেন। বৈদ্যুতিক শক্তি চালনা করিলে জড় পদার্থ জীবিতের কার্য্য করে। তত্ত্ববাদিগণ আত্মাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। এক প্রাণ (vital energy), অপর চৈতন্য (spirit)। আমাদের সৌর জগতের সূর্য্যমণ্ডলই প্রাণ শক্তির কেন্দ্র (centre)। সূর্য্যমণ্ডল হইতে জীবনী শক্তি সঞ্চালক ইথারের মধ্য দিয়া আগমন করে। যদি সমস্ত ভৌতিক শক্তিকে (Physical forces) এক বৈদ্যুতিক শক্তিতেও তদূর্দ্ধে জীবনী শক্তিতে পরিণত করা যায়, তাহা হইলে বিজ্ঞান বলিতে বাধ্য হইবেন, সূর্য্যমণ্ডল জীবনী শক্তি নামক নূতন শক্তির ও সর্ব্ব শক্তির আধার। এই সম্বন্ধে বিজ্ঞান কত দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা আলোচনা, করা যাউক।

বিজ্ঞানের মতে অচেতন জড় পদার্থের আদিম অবস্থা পরমাণু। (সাংখ্য দর্শন মতে সত্ব, রজ ও তম গুণ, যাহার সংযোগে বিয়োগে এই বিশ্ব রচিত হইয়াছে, তাহারাও মহাণু)। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের (Physiology) মতে চেতন জড় পদার্থের আদিম অবস্থা বা উপাদক প্রোটোপ্লাজম্ (Protoplasm) নামক জীবাণু। এই জীবাণু পরমাণু হইতে পৃথক। বিজ্ঞান উন্নত হইলে বলিবেন, জীবাণু ও পরমাণু একই পদার্থ। সে যাহা হউক, প্রোটোপ্লাজম্ পদার্থটা কি, তাহাই দেখা যাউক।

প্রোটোপ্লাজম্‌কে বৈজ্ঞানিক ভাষায় জীবাণু বলা সঙ্গত নহে, কারণ বৈজ্ঞানিকের মতে প্রোটোপ্লাজম্ জড়পদার্থ। কিন্তু জড়পদার্থের পরমাণু জীবনহীন জড়বস্তু, প্রাণিশরীরের (মনুষ্য, পশু পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ প্রভৃতি যাবতীয় জীবিত প্রাণীর) উপাদান প্রোটোপ্লাজম্ নামক জীবিত

জড়পদার্থ (Living substance)। বিজ্ঞান, আত্মা বা দশ প্রাণকে (প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান, ধনঞ্জয় প্রভৃতি বায়ুকে) জীবন বলে না। প্রাণ নামে স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নাই। তবে জীব কাহাকে বলা যায়? জীবের (প্রাণী বা উদ্ভিদ) বিভিন্ন ইন্দ্রিয় (organ) আছে, তদ্দ্বারা জীব আবশ্যকমত বর্দ্ধনের কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু জড়পদার্থ তাহা পারে না। ইন্দ্রিয় সমূহের কার্য্যসমষ্টির (activity) নাম প্রাণ (vital energy) প্রাণী ও উদ্ভিদের শরীর প্রোটোপ্লাজম্ দ্বারা গঠিত। প্রোটোপ্লাজম্ প্রতি মুহূর্ত্তে যুগপৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে ও বর্দ্ধিত হইতেছে। তজ্জন্য বলা যায়, প্রাণী প্রতি মুহূর্ত্তে মরিতেছে ও জন্মিতেছে। ইহার নাম সূক্ষ্ম জন্ম মৃত্যু। প্রোটোপ্লাজম্ জীবন হীন জড়পদার্থকে আত্মসাৎ করিয়া নিজের অংশীভূত করিয়া লইতে পারে, অর্থাৎ জীবনহীন জড়পদার্থকে সজীবে পরিণত করিতে পারে। যেমন প্রাণী নির্জ্জীব জড়পদার্থকে আহার করিয়া সজীবে পরিণত করিতে পারে। সাধারণ জড়পদার্থ ইহা পারে না। প্রোটোপ্লাজম্ এক প্রকার স্বচ্ছ, ঘন, তরল পদার্থ। ইহাকে যতদূর বিশ্লেষণ করা যায়, তাহাতে জানা যায় যে, ইহার মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ জলীয় পদার্থ, এবং অঙ্গার, যবক্ষার, লবণ ও তৈলাক্ত পদার্থ। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিলে দেখা যায়, কতকগুলি গোলাকার পরমাণু পরস্পর একত্রিত হইয়া একটী সূক্ষ্ম জাল প্রস্তুত করিয়া আছে, ঐ জালের ছিদ্রের মধ্যেও অপরাপর পদার্থ আছে। মরুতের ঊর্দ্ধদেশে তিন স্তরের ইথার আছে। প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে ইথার নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু বিজ্ঞান ইথার পৃথক করিতে পারেন নাই, ইথারের গুণ ও কার্য্য প্রণালী অবগত নহেন। এই জন্যই বোধ হয়—বিজ্ঞান রক্ত বিশ্লেষণ করিয়া পরিজ্ঞাত উপাদানরাজি বলিয়া দিতে পারেন, কিন্তু এক বিন্দু রক্তকণা সৃষ্টি করিতে পারেন না। সে যাহা হউক, প্রোটোপ্লাজম্ জলের সহিত মিশ্রিত হয় না, অধিক উত্তাপে ও অধিক শৈত্যে বিনষ্ট হয়। অনায়াসে জলশোষণ করিয়া বইতে পারে। শৈত্যাধিক্যে মৃতবৎ প্রোটোপ্লাজম্ উত্তাপ প্রয়োগে সজীব হয়, উত্তাপাধিক্যে মৃতবৎ প্রোটোপ্লাজম্ জল সিঞ্চনে জীবিত হয়। ইহা সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল ও কর্ম্মঠ। প্রাণিশরীরের ও উদ্ভিদের প্রোটোপ্লাজম্ একই পদার্থ, কিছু কার্য্যের কিছু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়।

প্রাণী সচল, উদ্ভিদ অচল। প্রাণীর প্রোটোপ্লাজম্ অতি শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত

হয়, উদ্ভিদের তাহা হয় না। প্রাণীর প্রাণ ধারণের জন্য যৌগিক পদার্থের (Compound substance) প্রয়োজন। উদ্ভিদ মৌলিক পদার্থ (elements) গ্রহণ করিয়া তাহা যৌগিক পদার্থে পরিণত করিয়া নিজ দেহাভ্যন্তরে সঞ্চিত করিয়া রাখে,প্রাণী তাহা আহার করিয়া পুষ্ট হয়। জীবগণ অন্য প্রাণীর রস কিম্বা উদ্ভিদের রস ব্যতীত জীবিত থাকিতে পারে না, কিন্তু উদ্ভিদ্ মৃত্তিকার রস দ্বারাই জীবিত থাকিতে পারে।

সূর্য্যমণ্ডলকে যে প্রাণ শক্তির উৎস বলা হইয়া থাকে, ইহার কারণ কি? সূর্য্য হইতে যে রশ্মিজাল অবতরণ করে, তাহা গতিভাবাপন্ন শক্তি (kinetic-energy)। এই সূর্য্যরশ্মি উদ্ভিদ্ শরীরের সবুজবর্ণ কণার (Chlorophyl) মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্থিতিভাবাপন্ন হয়। সূর্য্যরশ্মি উদ্ভিদের সবুজবর্ণকণার মধ্য দিয়া গমন করিলে ঐ কণা সূর্য্যমণ্ডলের নীল লোহিত প্রভৃতি রশ্মিজালের কতকগুলি বিশেষ রশ্মি শোষণ করিয়া আত্মভূত করিয়া লয়, তদ্দ্বারা ঐ কণা সমূহের এক অদ্ভুত শক্তি জন্মে। ঐ কণা সমূহ প্রোটোপ্লাজম্ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সূর্য্যমণ্ডলের রশ্মিবিশেষকে শোষণ করিয়া লওয়ায় তাহাদের এই ক্ষমতা জন্মে যে দূষিত অঙ্গারজ বায়ু (carbon dioxide gas) হইতে তাহারা অঙ্গার অংশ পৃথক করিয়া লইয়া উদ্ভিদের পুষ্টি সাধন করে,এবং অক্সিজনের অংশ পৃথক করিয়া দেওয়ায় প্রাণিগণ তাহা প্রশ্বাসের দ্বারা দেহাভ্যন্তরে লইয়া তদ্দ্বারা রক্ত শোধনাদি কার্য্য করায় এবং পুনরায় দূষিত অঙ্গারজ বায়ুতে পরিণত করিয়া তাহা নিঃশ্বাসের সহিত পরিত্যাগ করে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়ই জীবিত থাকে। প্রোটোপ্লাজম্ আবিষ্কৃত হওয়া অবধি বিজ্ঞান-জগতে নানাপ্রকার নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত বিজ্ঞান তিমিরেই আছেন, আলোক হইতে অন্ধকারে যাওয়ার ন্যায় প্রাণতত্ত্ব অধিক তমসাচ্ছন্ন বোধ হইতেছে, এবং বিজ্ঞান নিজের অজ্ঞতা ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাই বলিয়া, প্রোটোপ্লাজমের আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও অন্যান্য সমস্ত বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তত্ত্ব সমূহ কদাচ ভুল নহে, এবং তাহাদিগকে ভুল কল্পনা করাই মহাভুল। হিন্দুদর্শন এক অজ্ঞেয়, দুরবগাহ্য পরব্রহ্মকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার ক্রমবিকাশ বা জগদ্রূপে পরিণতির বিষয় চিন্তা করিয়াছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সে পন্থা ত্যাগ করিয়া জ্ঞাত হইতে জ্ঞাততে এবং জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাততে উপনীত হইবার চেষ্টা

করিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান মানব জাতির ত্রিনেত্র নাই (তত্ত্ববাদিগণের মনুষ্যত্বের বিকাশ প্রণালী চিন্তনীয়), সুতরাং সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ শরীর দেখিবার শক্তিও নাই। প্রত্যেক স্থূল পদার্থের (অর্থাৎ এই পৃথ্বীলোকের) বা মনুষ্য উদ্ভিদ্ প্রভৃতি জীবগণের স্থূল অবয়বের অবিকল একটী সূক্ষ্ম অবয়ব (etheric double) আছে। সেই ভুবর্লোক বা স্বর্গলোকবাসী সূক্ষ্মশরীরীদিগের দর্শন শক্তি স্থূলদেহধারী ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্র শক্তি অপেক্ষা অনেক অধিক উন্নত। তাঁহারা এক কালীন ঘন কঠিন পদার্থের অন্তর বাহির দেখিতে পারেন, তাঁহাদের জ্ঞান শক্তি ও চিন্তাশক্তি স্থূল আবরণ দ্বারা কারাবদ্ধ নহে। তাঁহাদের মন বুদ্ধি অনেক উন্নত। বর্ত্তমান মানব জাতিও জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন সেই সূক্ষ্ম দেহ এই পৃথ্বীলোকেই স্থূল দেহ হইতে (শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ন্যায়) পৃথক্ করিতে পারিবেন, তখন এ যুগের অজ্ঞেয় বিষয় অন্য যুগের হস্তস্থিত আমলকীবৎ সুজ্ঞাত হইবে। আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছি, এক লম্ফে পরব্রহ্মের সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য) লাভ করিতে পারিলাম না বলিয়া বৃথা রোদন ও বিলাপ করা কর্ত্তব্য নহে। একবার স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখ—ভুল বলিয়া বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত তত্ত্ব, প্রমাণ, যুক্তি, স্বীকার্য্য ও স্বতঃসিদ্ধ পরিত্যাগ করিলে তোমার "গতি কি হবে?"

ক্রমশঃ।

শ্রী—শাস্ত্রী।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক।

উমেশচন্দ্র মিত্র----

"বিধবা বিবাহ" নাটক রচয়িতা।

এ

এণ্টুণী ফিরিঙ্গী—

কবি সঙ্গীত রচয়িতা।

পর্ত্তুগীজ জাতীয় বণিক এণ্টুণী ফিরিঙ্গী, ব্যবসায় উপলক্ষে বঙ্গদেশে আসিয়া ফরাসডাঙ্গায় বাস স্থাপন করেন। ইঁহার ভ্রাতা কেলী সাহেব তৎকালে একজন অর্থশালী ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

এন্টুণী, যৌবনের প্রারম্ভে ফরাসডাঙ্গার কয়েকটী নীচপ্রকৃতিবিশিষ্ট গঞ্জিকাসেবীদিগের কুসংসর্গে পড়িয়া নষ্টচরিত্র হন এবং পরিশেষে এক ব্রাহ্মণ যুবতীর প্রেমাস্পদ হইলে বাণিজ্য ব্যবসায়ে জলাঞ্জলী দিয়া ফরাসডাঙ্গার সন্নিকট গরিটীর বাগান বাটীতে তাহার সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ-রমণীর সংসর্গে এন্টুণী বঙ্গভাষায় প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া অনেকটা হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-কন্যা জাতিভ্রষ্টা হইলেও হিন্দুধর্ম্মে আস্থা-শূন্য হয় নাই, বাটীতে যথারীতি দোল দুর্গোৎসবাদি হইত এবং এতদুপলক্ষে তৎকালীন প্রথামত কবি সঙ্গীত, ও কবির লড়াই হইত। এন্টুণী ক্রমে এই সকল গানের মর্ম্ম বেশ করিয়া বুঝিতে লাগিলেন এবং উত্তরোত্তর এ বিষয়ে তাঁহার একটা ঔৎসুক্য বাড়িতে লাগিল। তিনি নষ্টাবশেষ যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চিত ধন লইয়া একটী সখের কবির দল সংগঠন করিলেন। অর্থাভাবে এই সখের দল "পেশাদারী" দলে পরিণত হইল। এই দল এক সময় বিলক্ষণ পসার প্রতিপত্তি লাভ করিয়া এন্টুণীর অর্থের অসচ্ছলতা অনেক পরিমাণে বিদূরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

গোরক্ষনাথ ঠাকুর নামক এক ব্যক্তি এই দলের জন্য প্রথমতঃ গান রচনা করিয়া দিতেন। পরে এন্টুণী স্বয়ং গীত রচনা করিতে আরম্ভ করেন। বাঙ্গালীর ন্যায় ধুতী চাদর পরিধান করিয়া এন্টুণী আসরে দলমধ্যে গান করিতেন। তিনি তৎকালীন আক্রমণকারী প্রতিপক্ষ কবিওয়ালাদিগের প্রতিযোগিতা করিতে কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হইতেন না। বলা বাহুল্য, এই নিমিত্ত তিনি সর্ব্বস্থলে শ্লীলতার সম্মান রক্ষা করিতে পারিতেন না।

এন্টুণীর দুর্গাবিষয়ক একটী গানের আরম্ভ যথা—

জয়া, যোগেন্দ্র জায়া, মহামায়া মহিমা অসীম তোমার।
একবার দুর্গা দুর্গা বোলে, যে ডাকে মা তোমায়
তুমি কর তায় ভবসিন্ধু পার॥ ইত্যাদি

এবাদোল্লা—

শ্রীকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পদ রচয়িতা।

নিবাস—অনুমান, চট্টগ্রাম।

এর্সাদোল্লা—

পরমার্থ বিষয়ক সঙ্গীত রচয়িতা।

এর্সাদোল্লা, 'জ্ঞানসাগর', 'সিরাজকুলুপ' প্রভৃতি গ্রন্থ-রচয়িতা আলি-রাজার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ সন্তান।

"আলিরাজা" দেখুন।

নিবাস—চট্টগ্রাম অধীন বংশখালী থানার অন্তর্গত ওশখাইন নামক গ্রাম।

ক

কবিকঙ্কণ—

"বলরাম কবিকঙ্কণ" ও 'মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী' দেখুন।

কবিকর্ণপূর— মনসার গীতি-লেখক।

কবিকর্ণপূর—পদকর্ত্তা।

"পরমানন্দ সেন" ও "পুরীদাস" দেখুন।

কবিচন্দ্র—বিবিধ ব্যঙ্গ কবিতা রচয়িতা।

ইহাঁর প্রকৃত নাম সম্ভবতঃ রামচন্দ্র (পণ্ডিত) ছিল। অনুমান, শত বর্ষ পূর্ব্বে, যশোহর জেলার অন্তর্গত বারুইখালি গ্রামে কবিচন্দ্র বর্ত্তমান ছিলেন। মৌখিক কবিতা রচনা ও সমস্যা পূরণে খ্যাতিলাভ করিলে, রামচন্দ্র পণ্ডিত সাধারণ্যে "কবিচন্দ্র" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

টোলে অল্পদিন মাত্র সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করা ভিন্ন ইনি পাঠশালায় অন্য কোনরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই। কবিচন্দ্রের কবিতাগুলির ভাষা প্রধানতঃ সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষা মিশ্রিত; বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায়ও কবিচন্দ্র অনেক গুলি রহস্যাত্মক শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন।

কবিচন্দ্র—

"শিবায়ণ" রচয়িতা।

"রামকৃষ্ণ দাস কবিচন্দ্র" দেখুন।

কবিচন্দ্র—

'গঙ্গারবন্দনা', 'গুরুদক্ষিণা', 'সত্যনারায়ণ' কথা প্রভৃতি রচয়িতা।

ইহাঁর প্রকৃত নাম অযোধ্যারাম (কিম্বা নিধিরাম) মিশ্র (রায়, চক্রবর্ত্তী)।

পিতা—হৃদয়মিশ্র (গুণরাজ) ; চণ্ডীকাব্য রচয়িতা, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, কবিচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী দেখুন।

কবিচন্দ্র, অনুমান খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য বা শেষ ভাগে (বঙ্গীয় দশম শতাব্দীর শেষ অথবা একাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে) বর্ত্তমান ছিলেন।

কবিচন্দ্র—

মহাভারত, ভাগবত, ও রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থাবলম্বনে কবিতাকারে বহুসংখ্যক উপাখ্যান রচয়িতা।

সম্ভবতঃ, কবিচন্দ্র এই তিনখানি গ্রন্থের সমগ্র অথবা অধিকাংশই বঙ্গ ভাষায় পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। সাধারণে সমগ্র বৃহৎ গ্রন্থের প্রতিলিপি করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া আপনাপন পছন্দ মত এক একটী উপাখ্যান নকল করিয়া থাকিবেন। এইরূপে তৎসমুদয় এক একটী পৃথক পুস্তকরূপে পরিগণিত হইয়াছে, নিম্নে কতকগুলি উপাখ্যানের তালিকা প্রদত্ত হইল—

(১) অক্রূর আগমন (২) অজামিলের উপাখ্যান (৩) অর্জ্জুনের দর্পচূর্ণ (৪) অর্জ্জুনের বান্ধবান্ধা পালা (৫) আধ্যাত্ম্য রামায়ণ (৬) অঙ্গদ রায়বার (৭) উঞ্ছবৃত্তি পালা (৮) উদ্ধব সংবাদ (৯) একাদশী ব্রতপালা (১০) কংশবধ (১১) কন্বমুনির পারণ (১২) কপিলা মঙ্গল (১৩) কুন্তীর শিবপূজা (১৪) কুম্ভকর্ণের রায়বার (১৫) কৃষ্ণের স্বর্গারোহণ (১৬) কোকিল সংবাদ (১৭) গেড়ুচুরি (১৮) চিত্রকেতুর উপাখ্যান (১৯) দশম পুরাণ (২০) দাতাকর্ণ (২১) দিবাবাস (২২) দুর্ব্বাসার পারণ (২৩) দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ (২৪) দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ (২৫) দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর (২৬) ধ্রুব চরিত্র (২৭) নন্দবিদায় (২৮) পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ (২৯) পারিজাত হরণ (৩০) প্রহ্লাদ চরিত্র (৩১) ভারত উপাখ্যান (৩২) মহাভারত, বনপর্ব্ব (৩৩) ঐ, উদ্যোগ পর্ব্ব (৩৪) ঐ, ভীষ্মপর্ব্ব (৩৫) ঐ, দ্রোণপর্ব্ব (৩৬) ঐ, কর্ণপর্ব্ব (৩৭) ঐ, শল্যপর্ব্ব (৩৮) ঐ, গদাপর্ব্ব (৩৯) রাধিকামঙ্গল (৪০) রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড (৪১) ঐ, রাবণ বধ (৪২) রুক্মিণীহরণ (৪৩) শিবরামের যুদ্ধ (৪৪) শিবি উপাখ্যান (৪৫) সীতাহরণ (৪৬) হরিশ্চন্দ্রের পালা প্রভৃতি।

পিতা—মুনিরাম চক্রবর্ত্তী ; নিবাস পাণ্ডরা (পাণ্ড্রা)।

কবিচন্দ্রের শঙ্কর (দ্বিজ) নামক একজন বন্ধু ছিলেন ; দুই বন্ধু একত্র কয়েকখানি গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন।

[কবিচন্দ্রের গ্রন্থাবলী মধ্যে তাঁহার আত্মপরিচয়সূচক এইরূপ কয়েকটী ভণিতা দৃষ্ট হয়।

(১) চক্রবর্ত্তী মুণিরাম অশেষ গুণের ধাম
তস্য সুত কবিচন্দ্র গায়॥

(২) কবিচন্দ্র দ্বিজভাবে ভাবি রমাপতি।
মেত্রের দক্ষিণে ঘর পাণ্ড্রায় বসতি॥

(৩) শ্রীযুক্ত গোপাল সিংহ নৃপতি আদেশে।
সংক্ষেপে ভারত কথা কবিচন্দ্র ভাসে॥

ইহা হইতে সংক্ষেপে বুঝা যাইতেছে যে, কবিচন্দ্র মুনিরাম চক্রবর্ত্তীর পুত্র; তাঁহার নিবাস পাণ্ডরা (পাণ্ড্রা) এবং তিনি গোপাল সিংহ নৃপতির আদেশে সংক্ষিপ্ত ভারত কথা রচনা করিয়াছিলেন।

পণ্ড্রা (পাণ্ডরা, পাঁড়রা বা পাঁড়া) নামক একটী গণ্ডগ্রাম (ইহার অপর নাম পোদ্দার ডিহি) বর্ত্তমান মানভূম জেলা মধ্যে অবস্থিত আছে। এই গ্রাম পূর্ব্বে বীরভূম জেলার অন্তর্গত ছিল; পরে ১৮১৫ খ্রীঃ বাঁকুড়া জেলার অন্তর্নিবিষ্ট হয় এবং ১৮৩৯ খ্রীঃ মানভূম জেলার অধীনে আইসে। এই গ্রামে একটি প্রাচীন জমীদার বংশের বাসস্থান; ইঁহারা এখনও জনসাধারণ কর্ত্তৃক "রাজা" বলিয়া আখ্যাত হইয়া আসিতেছেন। এই রাজবংশে গোপাল সিংহ নামক এক রাজভ্রাতা (নৃপতি), অনুমান বঙ্গীয় দশম শতাব্দীর শেষ বা একাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে বর্ত্তমান ছিলেন। (এই রাজবংশাবলীর বিস্তারিত বিবরণ, বংশ তালিকা, প্রভৃতি "বীরভূমি" ২য় খণ্ডে বর্ত্তমান লেখক-রচিত "প্রাচীন জমীদার বংশাবলীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" নামক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য)।

যদি কবিচন্দ্র, এই পাঁড়্রা গ্রামে গোপাল সিংহ নৃপতির আদেশে "ভারত কথা" রচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত সময়ে অবশ্যই বর্ত্তমান ছিলেন। এ দিকে, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতা কবিচন্দ্রও, অনুমান এই সময়েই বর্ত্তমান ছিলেন। উভয় কবিচন্দ্রই, চক্রবর্ত্তী উপাধিধারী ব্রাহ্মণ। কিন্তু ইঁহাদের পিতার নাম ও বাসস্থান পৃথক্ বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে. সুতরাং "চক্রবর্ত্তী কবিচন্দ্র" উপাধিধারী দুই জন কবি, বিভিন্ন স্থানে একই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, এইরূপ অনুমান করা আপাততঃ অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না।]

কবিচন্দ্র পতি—

মনসার গীতি লেখক।

কবিবল্লভ—মনসার গীতি লেখক।

কবিবল্লভ ও বংশীদাস (দ্বিজ) নামক দুই জন কবি, নারায়ণ দেব রচিত পদ্মপুরাণ গ্রন্থ মধ্যে এত বহুল পরিমাণে নিজ নিজ রচনা অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন যে প্রায় উহা একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

কবিবল্লভ—

"রসকদম্ব" রচয়িতা।

এই গ্রন্থখানি ২২ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ লীলা বর্ণনা ছলে এক একটী 'রস', লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে,যথা ভৈরব রস, হাস্য-রস, প্রেমরস, অদ্ভুতরস, বীভৎস রস, বীররস, স্তুতিরস ইত্যাদি। এই গ্রন্থে এক সহস্র শ্লোক আছে।

বনমালি দাস, রূপসনাতনের নিকট রসতত্ত্ব অবগত হইয়া কবিবল্লভকে তদ্বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন। এই শিক্ষা লাভ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা ও পুরাণ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া কবিবল্লভ, নরহরি দাসের শিষ্য মুকুট রায় নামক এক ব্রাহ্মণ বন্ধুর অনুরোধে ১৫২০ শকাব্দে (২০ শে ফাল্গুন) 'রসকদম্ব' গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন।

কবিবল্লভের পিতার নাম, রাজবল্লভ এবং মাতার নাম বৈষ্ণবী। গুরু—উদ্ধব দাস।

বগুড়া জেলার অন্তর্গত করতোয়া নদীতীরস্থিত মহাস্থানের সন্নিকট আরোঢ়া নামক গ্রামে কবিবল্লভের আবাস ছিল।

"কবিবল্লভ," কবির উপাধি কি প্রকৃত নাম, তাহা জানিবার উপায় নাই।

কবিরঞ্জন—

বৈষ্ণব পদকর্ত্তা।

কবিরঞ্জন—

"রাম প্রসাদ সেন কবিরঞ্জন" দেখুন।

কবিশেখর—

বৈষ্ণব পদকর্ত্তা এবং "গোপাল বিজয়' নামক সুবৃহৎ কাব্য গ্রন্থ রচয়িতা।

কবিশেখর অনেকগুলি পদ রচনা করিয়াছেন। ইঁহার রচিত "গোপাল বিজয়" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থখানি এখনও অপ্রকাশিত।

[বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে 'গোপাল বিজয়' গ্রন্থের একখানি হস্তলিখিত প্রতিলিপি আছে, লেখার তারিখ ১৭০১ শকাব্দা। লেখকের 'রতন' লাইব্রেরীতেও এই গ্রন্থের একটি প্রতিলিপি রক্ষিত আছে। (রতন) লাইব্রেরীর হস্তলিখিত পুঁথি তালিকা নং ৮৮। এই পুঁথিটির হস্ত-লিপির তারিখ ১৫৩৫ শকাব্দা প্রথমতঃ পত্র পাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি এই গ্রন্থের প্রতি একটু মনযোগী হইলে কৃতার্থ হইব।]

কবীন্দ্র, পরমেশ্বর—

"মহাভারত" (আদি হইতে অভিষেক পর্য্যন্ত) রচয়িতা। কবীন্দ্র পরমেশ্বর, গৌড়াধীপ হুসেন সাহের (১৪৯৪ খ্রীঃ হইতে ১৫২৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্বকাল) সেনাপতি, পরাগণ খাঁর আদেশে এই মহাভারত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা "পরাগলী মহাভারত" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই পুস্তকে অনুমান ১৭০০০ শ্লোক আছে।

সেনাপতি পরাগল খাঁ ও রাজকুমার নসরত সাহ, হুসেন সাহ কর্ত্তৃক চট্টগ্রাম হইতে আক্রমণকারী মগী সৈন্যদিগকে বিদূরিত করিবার নিমিত্ত তথায় প্রেরিত হন। পরাগল খাঁর ভগ্ন প্রাসাদাবলী, চট্টগ্রাম মধ্যে জোর-ওয়ারগঞ্জ থানার অধীন পরাগলপুরে ফেনী নদীর তীরে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। সেনাপতি পরাগল খাঁর পুত্র, সেনাপতি ছুটী খাঁ ও শ্রীকর নন্দী নামক একজন কবি দ্বারা মহাভারত অন্তর্গত অশ্বমেধ পর্ব্ব রচনা করাইয়া ছিলেন।

"শ্রীকর নন্দী" দেখুন।

কবীন্দ্র পরমেশ্বরের নিবাস অনুমান, চট্টগ্রাম।

কবীন্দ্র রচিত মহাভারত ও বিজয় পণ্ডিত রচিত মহাভারত গ্রন্থে প্রায় অনেক স্থলে বর্ণিত বিষয়ের ভাষায় ও শ্লোক রচনায় অপূর্ব্ব সৌসাদৃশ্য আছে। আবার, কবীন্দ্র স্থানে স্থানে সঞ্জয় রচিত মহাভারতেরও অনুসরণ করিয়াছেন।

কবীন্দ্র রচিত মহাভারতে মধ্যে মধ্যে ব্যাস-বিরচিত সংস্কৃত মহাভারতের মূলানুরূপ অনুবাদ রহিলেও, তিনি ইহার যথাযথ অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি জৈমিনি মুখে ভারত কথা আরম্ভ করিয়াছেন; এতদ্ব্যতীত স্বকপোল-কল্পিত অনেক কথাই স্বীয় গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

(পরিষদ্ গ্রন্থাবলী, বিজয় পণ্ডিত কৃত মহাভারত, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৩৬, ৪৪)

কমর আলি, পণ্ডিত—

'রাধার সংবাদ', 'ঋতুর বার মাস' এবং শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ রচয়িতা।

নিবাস—অনুমান, চট্টগ্রাম মধ্যে পটীয়া থানার অন্তর্গত কারুলডাঙ্গা নামক গ্রামে।

(বীরভূমি ৩।২৮০; পরিষদ পত্রিকা ১০ অতি, ১৮৮ পৃঃ)

কমল নয়ন—

মনসার গীতিলেখক।

কমলাকান্ত দত্ত—

'রাস রসকণিকা' 'গঙ্গার বন্দনা' এবং অন্যান্য কবিতা ও গীত রচয়িতা।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মঙ্গলকোট থানার অধীন চানক নামক গ্রামের সন্নিকট অজয় নদীর তীরে সিউড় (সিউড়-নাকুড়) নামক গ্রামে কায়স্থ কুলে কমলাকান্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনুমান শতবর্ষ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

(শ্রীযুক্ত বাবু রসময় মিত্র এম, এ, ও শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র লস্কর মহাশয়ের নিকট হইতে এই কবির বিবরণ সংগৃহীত হইল)।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য—

প্রসিদ্ধ শ্যামা বিষয়ক সঙ্গীত রচয়িতা।

শক্তি সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য পূর্ব্ব নিবাস অম্বিকা কালনা পরিত্যাগ করতঃ ১৮০০ খ্রীঃ বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী কোলহাট নামক গ্রামে বাস স্থাপন করেন।

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর কমলাকান্তকে প্রথমতঃ সভাপণ্ডিত রূপে নিযুক্ত করিয়া পরে তাঁহাকে স্বীয় গুরুপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজ তেজচন্দ্রই কোলহাটে কমলাকান্তের বসতবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই স্থানে, তিনি আপন গৃহে কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পঞ্চমূর্ত্তি আসনোপরি শক্তি সাধনা করিতেন।

কমলাকান্তের শ্যামা বিষয়ক পীযুষবর্ষী পদাবলী জনসাধারণে এখনও সমধিক প্রচলিত রহিয়াছে।

মহারাজ কুমার প্রতাপচন্দ্রও কমলাকান্তের শিষ্য হইয়াছিলেন।

(বঙ্গভাষার লেখক ২২২-৮, সঙ্গীত সার সংগ্রহ ২য়, ১৫৮।)

করিমল্লা—

"যামিনী বাহাল নামক গ্রন্থ রচয়িতা। এই গ্রন্থখানি ১৫৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। রচনা কাল, অনুমান ১২৫ বর্ষ পূর্ব্বে। কবি, সীতাকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থোক্ত নায়িকা মুখে, মুসলমান কবি, হিন্দু দেব দেবীর উপাসনা বর্ণনা করিয়াছেন। (পরিষদ পত্রিকা ১০। অতি ১২৬ পৃঃ)

ফয়েজন্নেসা চৌধুরাণী, নবাব—

"রূপজালাল" নামক বৃহৎ কাব্য রচয়িত্রী।

ইনি ত্রিপুরার জমীদার ছিলেন।

(পূর্ণিমা ১০।১৩৫ পৃঃ)

কাঙ্গাল ফিকির চাঁদ—

("হরিনাথ মজুমদার" দেখুন।)

কাণাদাস—

বৈষ্ণব পদকর্ত্তা।

কাণা হরিদত্ত—

"মনসার গীতি" লেখক।

হরিদত্তই পদ্মপুরাণ অবলম্বনে সর্ব্বপ্রথম মনসার গীতি বঙ্গভাষায় রচনা করেন।

রচনা কাল—খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমাংশ।

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৬৩ পৃঃ)

(ক্রমশঃ)

শ্রীশিবরতন মিত্র।

কৃপা ভিক্ষা।

হরি!

রাজা তুমি মোর আমি প্রজা তব
এ জীবনটুকু তোমার দান,
তোমার হাতের গড়া এ পুতুল
তোমা হ'তে সে তো পেয়েছে প্রাণ।

তোমার শকতি সারা হৃদিময়
শিরা ধমনীতে খেলিছে খেলা,
শয়নে স্বপনে আহারে বিহারে
সন্ধ্যা কি প্রথের সকাল বেলা।

তোমার ইচ্ছায় এ সৌর জগত—
আরো কোটি কোটি কেমন চলে,
এ ক্ষুদ্র নগণ্য এতটুকু আমি
চলিব কি কভু তোমার বলে?

কোথায় কিকাজ করিতে হইবে
কাহার কারণে কিসের তরে,
তব তাড়নায় পারিব কি প্রভো
সবটুকু দিতে হৃদয় ভ'রে?

তোমার সুখের এ জগত মাঝে
দুখ খুঁজি খুঁজি হারায়ে যাবো,
কাণা খোঁড়া আদি কাঙ্গালের সুখে
কভু কিগো পিতা বিরাম পাবো?

চির হাস্যময় ধন কোলাহলে
চিরদিন কিগো পরের লাগি,
শোণিতের পাশে তোমার কৃপায়
সহ অনুভূতি রহিবে জাগি?

পর দুঃখ স্রোতে নয়নের কোণে
বিষাদের লোর আসিবে ভাসি,
পর সুখ হেরি এ মুখ ভরিয়া
উঠিবে কি ফুটি সরল হাসি ?

অতি ছোট আমি কোন গুণ নাই
তুমি যদি দয়া নাহি কর নাথ,
কি ক্ষমতা আছে উঠিব অতটা
তুমি যদি বিভো না ধর হাত !

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শসমল।
লণ্ডন।

শূন্যহস্তে।

১

এ জীবনে সারাদিন পরিশ্রম পরে,
ধূলি ভার বোঝা বয়ে দীন অকিঞ্চন হয়ে,
শূন্য হস্তে শুষ্ক মুখে ফিরিয়াছি ঘরে।
অতৃপ্ত কামনাময়, এ জীবন মনে হয়,
পূরে নাই কোন আশা ক্ষণেকের তরে।
হে করুণাময় বিধি! অশ্রু প্রবাহে এ হৃদি,
ভাসিয়া গেছিল কোন দূর দূরান্তরে;
স্মরিয়া তোমারি কথা আজি গো অভাগা হেথা
ফিরিয়া আসিল পুন কাতর অন্তরে।

২

শূন্য হস্ত শুষ্ক মুখ, দিন অকিঞ্চন,
শুনিয়া তোমারি নাম— অনন্ত আরাম ধাম,
পরশ করিতে পিতা, তব শ্রীচরণ;
দূর দূরান্তর হ'তে আসিয়াছে কোন মতে;
দাও দরশন—দাও আশীষ-বচন।
এদানে হৃদয়ভরি— তব নাম লক্ষ্য করি,
যাই চলি তব কাছে অমর-ভবন।
ফিরিবে পাপীর মতি লভিব পুণ্যের জ্যোতি
তোমার প্রেমের বারি কর বিতরণ।
পাইয়া করুণা সুধা, মিটে যাক্ সব ক্ষুধা,
মিশে যাক্ তোমাতেই আমার জীবন।

শ্রীনগেন্দ্রবালা বসু।

র
কোন
গ্র
করিয়া

হিন্দু জ্যোতিষ।

আজকাল হিন্দু জ্যোতিষ সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা চলিতেছে। সভা-সমিতিও গঠিত হইয়াছে। প্রাচীন গণিতানুসারে গ্রহদিগের যে যে স্থান পাওয়া যায়, ও আধুনিক গণিত ও উৎকৃষ্ট যন্ত্রানুসারে যে যে স্থান পাওয়া যায়, তাহাদের অনেক অন্তর ঘটিয়াছে। এজন্য যথার্থরূপে হিন্দুধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাত জন্মিতেছে। শিক্ষিতসমাজ পঞ্জিকা সংস্কারের আবশ্যকতা বুঝিতে-ছেন, কিন্তু এখনও ঐকান্তিক উদ্যম হয় নাই। যতটা হইতেছে তাহাও শুভচিহ্ন বলিয়া বোধ হয়। এ বিষয়ের সমালোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বিষয়টী বড়ই জটিল, তর্কপূর্ণ, এবং সমাজের সহিত নানারূপে সংশ্লিষ্ট থাকায় বিপৎসঙ্কুল। ক্রমে ইহার সম্বন্ধে সবিশেষ তর্কবিতর্কের অবতারণা করা যাইবে। হিন্দু জ্যোতিষী সম্বন্ধে কোন বিচার সম্যকরূপে অবধারণা করিতে হইলে, অগ্রে প্রাচীন মনীষীদিগের মত জানা উচিত। এইজন্য আমরা প্রথমে প্রাচীন জ্যোতিষের চিত্র পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে প্রস্তুত হইলাম। অদ্য পৃথিবীর আকার ও অবস্থান এবং নক্ষত্রচক্রের গতির সম্বন্ধে প্রাচীন মত কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ভূমেঃ পিণ্ডঃ শশাঙ্ক জ্ঞ কবিরবি কুজেজ্যার্কি নক্ষত্রকক্ষা বৃত্তৈর্বৃতো বৃতঃ সন্ মৃদনিল সলিলব্যোম তেজোময়োঽয়ম। নান্যাধারঃ স্বশক্ত্যৈব বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্যপৃষ্ঠে নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ সদনুজমনুজাদিত্যদৈত্যং সমস্তাৎ॥

সর্ব্বতঃ পর্ব্বতারাম গ্রাম চৈত্যচয়ৈশ্চিতঃ।

কদম্ব-কুসুমগ্রন্থি-কেশর প্রসরৈরিব॥ ইতি ভাস্করঃ॥

সরলার্থঃ—ভূপিণ্ড গোলাকার, এবং চন্দ্র, বুধ (জ্ঞ), শুক্র (কবি) সূর্য্য, মঙ্গল (কুজ), বৃহস্পতি (ইজ্য), শনি (আর্কি) ও নক্ষত্রদিগের কক্ষগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহা পঞ্চভূতাত্মক (মৃদনিল সলিল ব্যোম তেজোময়), এবং নিরাধার হইয়াও স্বশক্তিতে শূন্যে সংস্থিত রহিয়াছে। যেরূপ কদম্ব পুষ্পের পৃষ্ঠে চতুর্দ্দিকে কেশরগুলি দণ্ডায়মান থাকে, সেইরূপ পৃথিবীর পৃষ্ঠে নানাবিধ প্রাণী, গ্রাম, পর্ব্বত ও বৃক্ষ সকল সতত অবস্থিতি করিতেছে।

এই শ্লোকে পৃথিবীর সহিত কদম্বপুষ্পের যে উপমা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর বোধ হয়। পৃথিবীর কোন ব্যাসের দুই প্রান্তস্থিত দুইজন লোক

পরস্পরের কোন দিকে থাকে, ইহা ছাত্রদিগকে বুঝাইতে বোধ হয় অনেক শিক্ষকই ভগ্নস্বর হন। কিন্তু কদম্বপুষ্পের সহিত সাদৃশ্যের উল্লেখ করিলে স্বল্পায়াসেই তাহা ছাত্রদের বোধগম্য হইবে। ভাস্করাচার্য্য প্রথমে কোন যুক্তির অবতারণা না করিয়াই পৃথিবীকে গোলাকার ও শূন্যস্থ বলিলেন, এবং সৌরজগতের কেন্দ্রীভূত করিলেন। এই সকল বিষয়ের পোষকতা করিয়া তিনি যে যুক্তি পরে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা জানা উচিত। অনেক বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের ও তর্কশাস্ত্রের চক্ষে ভাস্করের যুক্তিসকল কখন কখন অসম্পূর্ণ বা সংশয়াত্মক বলিয়া বোধ হইবে। আবার অনেকস্থলে প্রাচীন মনীষীদিগের দূরদর্শিতা, নিরপেক্ষতা ও জ্ঞানানুরাগ দেখিয়া নিরতিশয় আনন্দলাভ হইবে।

পুরাণে কথিত আছে যে পৃথিবীকে বাসুকী নাগ ফণার উপর ধরিয়া আছে। কিন্তু স্বাধীনচেতা ভাস্করাচার্য্য পুরাণমতকে অগ্রাহ্য করিলেন, এবং পৃথিবীকে নিরাধার ও শূন্যস্থ সপ্রমাণ করিবার জন্য যুক্তি দেখাইলেন।

মূর্ত্তো ধর্ত্তা চেদ্ ধরিত্র্যাস্ততোঽন্য
স্তস্যাপ্যন্যোঽ প্যৈবমত্রা ন বস্থা।
অন্ত্যে কল্প্যা চেৎ স্বশক্তিঃ কিমাদ্যে
কিং নো ভূমেঃ সাষ্টমূর্ত্তেশ্চ মূর্ত্তিঃ॥

সরলার্থঃ—যদি পৃথিবীর কোন সাকার ধারণকর্ত্তা থাকে, তবে ঐ ধারণকর্ত্তারও ধারণকর্ত্তা আবশ্যক, দ্বিতীয় ধারণকর্ত্তারও স্বতন্ত্র ধারণকর্ত্তা আবশ্যক; তদ্রূপ তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ইত্যাদি যাবতীয় ধারণকর্ত্তারও ধারণকর্ত্ত। থাকিবে। ধারণকর্ত্তার সংখ্যার শেষ কোথায়? যদি বল সর্ব্বশেষের ধারণকর্ত্তা নিরবলম্বন, তবে পৃথিবীকে নিরবলম্বন বলার দোষ কি? যদি বল এক ঈশ্বরই নিরবলম্বন হইতে পারেন, তদ্ভিন্ন কেহ আশ্রয়ানপেক্ষী হইতে পারে না, তবে মনে করা উচিত যে পৃথিবী অষ্টমূর্ত্তির (শিবের) মূর্ত্তি বিশেষ, সুতরাং ঐশীশক্তি সম্পন্ন।

এস্থলে ভাস্কর কেবল তর্কশাস্ত্রের কঠোরযুক্তি দেখাইয়া নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না, ধর্ম্ম বিশ্বাসেরও আশ্রয় লইয়া স্বমতপোষক যুক্তির প্রয়োগ করিলেন। ভাস্কর যে পুরাণের প্রধান বিশ্বাসের উপর কুঠারাঘাত করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, ইহা সামান্য দৃঢ়চিত্ততার কার্য্য নহে। তাঁহার সময়ে ধর্ম্মপাশ এখনকার মত শিথিল ছিল না। কত শত কদাচার আমাদের

সমাজকে পীড়িত, জীর্ণ শীর্ণ ও প্রাণহীন করিতেছে, তাহাদের সংখ্যা নাই। ঐ সকল দূরীকরণ করা যে কর্ত্তব্য, তাহা কেনা স্বীকার করেন? 'কিন্তু বিড়ালের গলায় কে ঘণ্টা দিবে' এই ভাবনায় কি সকলে অভিভূত নহেন? বীরহৃদয় জ্যোতিষিগণ সত্যের ও জ্ঞানের অনুরোধে নির্ভয়ে ভ্রমসঙ্কুল পৌরাণিক মতকে খণ্ডিত করিয়াছিলেন। পৃথিবী জলের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যে মত ছিল, তাহার বিরুদ্ধে লল্ল কি বলিতেছেন, শুনুন।

সলিলে বিলয়ো মৃদোভবেদিতি গোরপ্সু ন যুজ্যতে স্থিতিঃ।

সরলার্থ:—মৃত্তিকা জলে গলিয়া যায়, সুতরাং পৃথিবীর জলের উপর থাকা অসম্ভব।

যদিবাম্ভসি সংস্থিতা মহী সলিলং তদ্‌ যদপ্রতিষ্ঠিতম্।
গুরুণোঽম্ভসি চেৎস্থিতির্ভবেৎ ক্ষিতিগোলস্য নকিং বিহায়সি॥

বতি লল্লঃ॥

সরলার্থ:—যদি পৃথিবী জলের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ঐ জল শূন্যের ন্যায় অপ্রতিষ্ঠিত থাকে। গুরুবস্তুও যখন জলে ভাসে, পৃথিবী শূন্যে থাকিতে না পারে কেন?

পৃথিবী আপনা হইতেই শূন্যে কিরূপে থাকিতে সমর্থ, এই সংশয় অপনোদন করিবার উদ্দেশ্যে ভাস্কর যে শ্লোকদ্বয় রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দ্বিতীয়টী অতীব মূল্যবান্।

প্রথম শ্লোক:—যথোষ্ণতার্কানলয়োশ্চ শীততা
বিধৌ দ্রুতিঃ কে কঠিণত্ব মশ্মনি।
মরুচ্চলো ভূরচলা স্বভাবতো
যতো বিচিত্রা বত বস্তু শক্তয়ঃ॥

সরলার্থ:—যেরূপ সূর্য্য ও অগ্নিতে উষ্ণতা, (কিন্তু) চন্দ্রে শৈত্যগুণ, জলে (কে) দ্রবত্ব, কিন্তু প্রস্তরে কঠিনত্ব আছে, সেইরূপ বায়ুতে চঞ্চলতা ও পৃথিবীতে স্থৈর্য্যগুণ বর্ত্তমান। বস্তুশক্তি বিচিত্র।

এই শ্লোকে পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্র বলিয়া সূচিত হইল। কেহ সন্দেহ করিতে পারেন যে যখন শূন্যস্থ গুরুবস্তুকে পৃথিবীতে পড়িতে দেখা যায়, তখন পৃথিবীও নিশ্চয় নীচের দিকে পড়িয়া যাইতেছে। এই সন্দেহের নিরাকরণ করিয়া ভাস্করাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের পক্ষে বড়ই গৌরবের জিনিস।

আকৃষ্টি শক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ
খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি
সমে সমন্তাৎ ক্ক পতত্বিয়ং খে॥

সরলার্থ :—পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি আছে। এই শক্তি দ্বারা পৃথিবী শূন্যস্থ গুরুবস্তুকে নিজের দিকে টানিয়া আনে বলিয়াই উহা পড়িতেছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পৃথিবীর চারিদিকই সমান, অর্থাৎ সকল দিকেই গ্রহ নক্ষত্রাদি প্রায় সমভাবে বিরাজমান। তাহা হইলে পৃথিবী কোন্ দিকে পড়িবে ?

আমাদের অনেকেরই ধারণা আছে যে পৃথিবীর আকর্ষণের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার জন্য আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের নিকট সম্পূর্ণভাবে ঋণী। সাধারণ পাশ্চাত্য মত ও এই যে বিজ্ঞানের প্রকৃত সত্যগুলি ইউরোপ খণ্ডে প্রসূত, বিকশিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে। ইউরোপীয়েরা বিশ্বাস করিতে পারেন না যে প্রাচ্য ভূখণ্ড বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনুর্ব্বর নহে, যে জ্ঞানের জন্য বিদ্যোপার্জ্জন ঐস্থানে থাকিতে পারে, যে কেবল প্রতারণা, তোষামোদ, বর্ব্বরতা ও অন্ধ বিশ্বাসই প্রাচ্য হৃদয়কে অধিকার করিয়া থাকে নাই। সে দিন লর্ড কর্জ্জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণকালে যে অশ্রুতপূর্ব্ব কাহিনী সুল-লিত ভাষায় শ্রোতৃবর্গের কর্ণকুহরে অনুপম উপহারস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে এসিয়াখণ্ডের পিতৃশ্চারণ করিয়া স্বয়ং ধন্য হইয়াছেন। সত্যের প্রকৃত আদর্শ প্রাচ্যভূমিতে ছিল না, একথা বলার ন্যায় ধৃষ্টতা আর কিছুই হইতে পারে না। বড়লাটের মত লোকেরা মনে করেন যে গ্যালিলিওর রক্ত পাশ্চাত্য সত্যমন্ত্রে সংস্কৃত থাকাতেই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন 'তবুও পৃথিবী সচল'। কিন্তু ভাস্কর প্রভৃতি সুধীগণ যখন সত্যের অনুরোধে পৌরাণিক বাক্য ভ্রমাত্মক বলিয়া অসঙ্কোচে জনসাধারণে প্রকাশ করিয়া ছিলেন, তখন কি তাঁহারা গ্যালিলিও অপেক্ষা যথার্থই নিরাপদ ছিলেন ? যিনি সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ্যভাবে পুরাণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই নানা লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। মূলকথা এই যে আদর্শ ছিল, কিন্তু আমরা তাহা হইতে ঘটনাচক্রে অনেকদূরে অপনীত হইয়াছি। প্রাচীন ভারতবর্ষে যে প্রকৃত তথ্যের আবিষ্কার ও প্রচার হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জ্যোতিষ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ভূখণ্ড প্রাচ্যের নিকট ঋণী।

অনেকে বলেন যে গ্রীকদিগের নিকট হইতেই আরবীয়েরা জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষা করেন, এবং হিন্দুরা আরবীয়দিগের নিকট হইতে শিক্ষা পান। কিন্তু সুপণ্ডিত ব্রেনাণ্ড সাহেব অল্পদিন হইল হিন্দুজ্যোতিষ সম্বন্ধে যে গবেষণাপূর্ণ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে হিন্দুরা কাহারও নিকট হইতে জ্যোতিষ শাস্ত্র অপহরণ বা ভিক্ষা করিয়া লন নাই, পরন্তু তাঁহাদের প্রণালীর মৌলিকতা অস্বীকার করা যায় না। এই হেতু এবং অন্যান্য কারণে অনুমান করা যায় যে আরবীয়েরাই হিন্দুদিগের দ্বারা, এবং গ্রীকেরা আরবীয়দের দ্বারা উক্ত শাস্ত্রে দীক্ষিত হয়। এদেশেও পুরাকালে ধারণা ছিল যে পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি আছে। অবশ্য প্রাচীনকালের গ্রন্থে তথ্যগুলির আভাষ মাত্র পাওয়া যায়। অধুনা ইউরোপে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অতীব বিস্তৃত, পরিমার্জ্জিত ও উন্নতিশীল। বিশাল দীর্ঘিকার মধ্যে ভাসমান প্রস্ফুটিত শতদলের ন্যায় পাশ্চাত্য-দেশে বিজ্ঞান তথ্য সকল বিরাজ করিতেছে। এই প্রসঙ্গে আমাদেরও অযথা অভিমানশীলতা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। যখনই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে তুলনা হয়, তখনই আমরা গর্ব্বস্ফীত উন্নতগ্রীব হইয়া বলিয়া উঠি, আমাদের দ্রোণ ছিল, ভীষ্ম ছিল, ইত্যাদি; যখনই জ্যোতিষসম্বন্ধে কথা হয়, তখনই বলি, আমাদের বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীপতি, লল্ল, ভাস্কর প্রভৃতি উজ্জ্বল রত্নরাজি ছিল; যখনই বাষ্পীয় শকট ও ব্যোমযানের আলোচনা হয়, তখনই বলি আমাদেরও পুষ্পক রথ ছিল, যখনই আধুনিক বাণিজ্যপোত গুলি দেখি, তখনই শ্রীমন্ত সওদাগরের কথা মনে করিয়া আত্মাভিমানে শরীর ঢালিয়া দিই। ভাবিয়া দেখা উচিত যে সেকালের জিনিসে আর একালের জিনিসে তুলনা হইতেই পারে না। যদিও মনে করিতে পার যে ঐরূপ তুলনা যথার্থই সম্ভবে, যদিও আপনাদিগকে মহাপুরুষগণের বংশধর বলিয়া উল্লসিত হইতে পার, তথাপি একবার ভাবিয়া দেখ, তুমি আমি কি? ছোটমুখে বড়কথা শোভা পায় না। লর্ড কর্জ্জন অসতর্কভাবে যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ গ্রহণ করিলে, তদীয় বক্তৃতাটী অনেকস্থলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়।

বৌদ্ধদিগের মতে পৃথিবী আধারশূন্য বটে, কিন্তু অধোগামী।

ভবাঞ্জরস্ত ভ্রমণাবলোকাদাধারশূন্যা কুরিতি প্রতীতিঃ।

খস্থং ন দৃষ্টঞ্চ গুরু ক্ষমাতঃ খেঽধঃ প্রয়াতীতি বদন্তি বৌদ্ধাঃ। ইতি ভাস্করঃ॥

সরলার্থঃ—বৌদ্ধেরা বলেন যে যেহেতু নক্ষত্রগণ পৃথিবাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করে, সেই হেতু পৃথিবী আধারশূন্য, কিন্তু যেহেতু কোন গুরু-বস্তুকে শূন্যে স্থির থাকিতে দেখা যায় না, সেইহেতু পৃথিবীও নীচে পড়িয়া যাইতেছে।

ভাস্করাচার্য্য পৃথিবীর অধঃপতন সম্বন্ধে পূর্ব্বে এক যুক্তি দিয়াছেন। তাহার উল্লেখও করা হইয়াছে। বৌদ্ধমতের ছেদনকালে তিনি নূতন যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন।

ভূঃ খেঽধঃ খলু যাতীতি বুদ্ধিবৌদ্ধ মুধা কথম্।
জাতা যাতন্তু দৃষ্ট্বাপি খে যৎক্ষিপ্তং গুরুক্ষিতিম্॥

সরলার্থঃ—হে বৌদ্ধ, পৃথিবী শূন্যে নীচের দিকে যাইতেছে তোমার এরূপ বুদ্ধি কেন হইল? তুমিই দেখিতেছ যে শূন্যে নিক্ষিপ্ত গুরুবস্তু পৃথিবীতে পতিত হয়।

এই শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য ভাস্করাচার্য্যের সংস্কৃত ব্যাখ্যায় স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। তিনি বৌদ্ধদিগকে বলিতেছেন "তোমরাই বলিতেছ যে শূন্যস্থ গুরুবস্তু মাত্রেই পৃথিবীতে পতিত হয়। ইহাতেই সপ্রমাণ হয় যে পৃথিবী অধোগামী হইতে পারে না। কারণ মনে কর, একটী শর ধনুক হইতে উৎক্ষিপ্ত হইল। কিছুদূর উঠিয়াই শরটী অধোগামী হইল। কিন্তু পৃথিবীও অধোগামী হইলে, শরটী পৃথিবীতে পৌঁছিতে পারে না। যদি বল যে পৃথিবীর অধোগতি অপেক্ষা শরের অধোগতি শীঘ্রতর, তাহা নহে, কারণ লঘু বস্তুর অপেক্ষা গুরুবস্তুর পতন অধিক দ্রুত। শরটী লঘু, পৃথিবী গুরু, সুতরাং পৃথিবীর অধোবেগই অধিক প্রবল"।

এস্থলে বিবেচ্যবিষয় অনেক আছে। যে সকল শ্লোকে পৃথিবীর আকর্ষণের উল্লেখ আছে, তাহার কোনটিতেই ভাস্করাচার্য্য বলেন নাই যে পৃথিবী শূন্যস্থ গুরু বস্তুকে আকর্ষণ করে, এবং ঐ বস্তুও পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। হয়ত, তাঁহার সময়ে বস্তু সকল পরস্পরকে আকর্ষণ করে, এরূপ মত গঠিত হয় নাই; নয়ত, সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ মত তখনও প্রচলিত ছিল, কিন্তু উল্লিখিত যুক্তিতে ভাস্কর তাহাকে সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। ইহার মীমাংসা অপরাপর প্রাচীন গ্রন্থ হইতে হওয়া উচিত। তবে প্রথম অনুমানটীই অধিক সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। আর একটী বিষয় দেখিবার আছে। ভাস্কর বলিয়াছেন যে লঘুবস্তু অপেক্ষা গুরুবস্তুর অধোগতি

দ্রুততর। এখানে অবশ্যই আপেক্ষিক গুরুত্ব বুঝিতে হইবে। ভাস্করের শ্লোকের মর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক মনে উদয় হয়। কিন্তু সে সকলের আলোচনা করিতে হইলে প্রবন্ধটী সুদীর্ঘ হইয়া পড়ে। পাঠকের বিবেচনার জন্য আধুনিক মত অতি সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে, যথাঃ—

সকল বস্তুই পরস্পরকে সমান বলে আকর্ষণ করে। দুইটী বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বল সমান হইলেও তাহারা সাধারণতঃ সমান বেগে পরস্পরের দিকে ধাবিত হয় না। যেটী যত গুরু, সেটি তত মন্দগামী, পৃথিবী শূন্যস্থ বস্তুকে যে বলে আকর্ষণ করে, পৃথিবীও তাদৃশবলে ঐ বস্তুর দ্বারা আকৃষ্ট হয়। কিন্তু পৃথিবী সাতিশয় গুরুবস্তু, সুতরাং পৃথিবীর উর্দ্ধগতি অগ্রাহ্য; উৎক্ষিপ্ত বস্তুটী অপেক্ষাকৃত সাতিশয় লঘু, সুতরাং তাহারই গতি দৃষ্ট হয়। নির্ব্বাত স্থানে সকল বস্তুরই অধোগতি সমান। কিন্তু ভূপৃষ্ঠে বায়ুর প্রতিঘাতে গতির বৈষম্য ঘটে।

পৌরাণিকেরা বলেন যে, পৃথিবী দর্পণের ন্যায় সমান। মধ্যস্থলে মেরু-পর্ব্বত বিদ্যমান। ইহার চতুর্দ্দিকে লক্ষ যোজন ব্যাস বিশিষ্ট জম্বুদ্বীপ। তাহার লক্ষ যোজন প্রমাণ ক্ষীর সমুদ্র। তাহার পর একটী দ্বীপ। তৎপর একটী সমুদ্র, ইত্যাদি। পুষ্কর নামক সপ্তম দ্বীপে মানসোত্তর নামে এক পর্ব্বত আছে। উহা বলয়াকারে বিস্তৃত, এবং উহারই মস্তকোপরি সূর্য্যের রথচক্র ভ্রমণ করে। সূর্য্য মেরুর পশ্চাদ্ভাগে যাইলেই রাত্রি হয়।

জ্যোতিষীগণ এই মতের নিকট মস্তক অবনত না করিয়াই অকুতোভয়ে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। পুরাণের প্রবল শাসনকে তাঁহারা উপেক্ষা করিয়াছিলেন। মনে রাখুন যে যে বিশ্বাস রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি দ্বারা সকল শ্রেণীর লোকের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়া অতি দৃঢ়ভাবে সমাজের সর্ব্বাঙ্গে মূল প্রোথিত করিয়াছিল, প্রাচীন বিদ্যোৎসাহী মনীষিগণ সেই বিশ্বাসকে যুক্তিবলে উৎপাটিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এরূপ সাহসিকতার উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে। একবার নয়, দুইবার নয়, যতবার আবশ্যক হইয়াছে, ততবারই জ্ঞানবীরেরা নিঃশঙ্কে অটলভাবে স্পষ্টস্বরে যুক্তিপূর্ণ ভাষায় বিদ্রূপ ও উপহাসে অবিচলিত থাকিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন।

হায় রে আধুনিক বঙ্গসমাজ! কর্ত্তব্যের ধারও কখন ধারিলে না। নিস্পন্দ, প্রাণহীন, জ্ঞানবর্জ্জিত অথচ জ্ঞানাভিমানী, স্বার্থান্ধ, স্বদেশদ্রোহী

উদরসর্ব্বস্ব, উচ্চলক্ষ্যবিহীন হইয়া পৃথিবীর অঙ্গে দিন দিন পূর্য্যমান বিস্ফোটকের ন্যায় আর কতদিন থাকিবে? শেষের দিন যে ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে। এখন ভাস্করের প্রতিবাদ শুনুন।

যদি সমা মুকুরোদরসন্নিভা ভগবতী ধরণী তরণীঃ ক্ষিতেঃ।
উপরি দূরগতোঽপি পরিভ্রমন্ কিন নরৈরমরৈরিব মেক্ষ্যতে॥
যদি নিশাজনকঃ কনকাচলঃ কিমু তদন্তরগঃ সন দৃশ্যতে।
উদগয়ং ননুমেরুরথাংশুমান্ কথমদেতি চ দক্ষিণ ভাগকে॥

সরলার্থঃ—যদি পৃথিবী দর্পণের ন্যায় সমতল হয়, তবে তদুপরি সুদূরস্থিত সূর্য্যকে অমরেরা যেরূপ সর্ব্ব সময়ে দেখিতে পান, আমরাও বা কেন সেরূপ দেখিতে পাই না? যদি মেরুর দ্বারাই রাত্রি সংঘটিত হয়, তবে মধ্যস্থ মেরু কেন দেখা যায় না? মেরু উত্তরদিকে অবস্থিত; তবে সূর্য্য (পূর্ব্বচিহ্নের) দক্ষিণ দিকে কিরূপে (শীতকালে) উদিত হন? এ সম্বন্ধে অপর জ্যোতিষীরাও একই মত প্রকাশ করিয়াছেন, যথাঃ—

সমতা যদি বিদ্যতে বভুস্তরবস্তালনিভা বহুচ্ছ্রয়াঃ।
কথমেবন দৃষ্টিগোচরং নুরহোযান্তি সুদূর সংস্থিতাঃ॥

সরলার্থঃ—যদি পৃথিবী সমতল হয়, তবে তাল প্রভৃতি অত্যুচ্চ বৃক্ষ সকল অধিক দূরবর্ত্তী হইলে কেন মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হয় না?

যদি পৃথিবী গোলাকার হয়, তবে সমতল দেখায় কেন, এই আশঙ্কার নিরাকরণ করিতে ভাস্করাচার্য্য বিস্মৃত হন নাই।

সমো যতঃস্যাৎ পরিধেঃ শতাংশঃ পৃথ্বী চ পৃথ্বী নিতরাং তনীয়ান্।
নরশ্চ তৎপৃষ্ঠনতস্য কৃৎস্না সমেব তস্য প্রতি ভাত্যতঃসা॥

সরলার্থঃ—বৃত্তপরিধির শতাংশ ঋজু বলিয়াই বোধ হয়। পৃথিবী অতি বৃহৎ, আর তৎপৃষ্ঠস্থ মানুষ অতীব ক্ষুদ্র। (সুতরাং ভূপরিধির যৎসামান্য অংশই মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হয়।) অতএব ভূপৃষ্ঠ সমতল দেখায়।

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টরাজ এম, এ।

মারাঠা রাজ্যশাসন প্রণালী।

দুঃখ মানুষের চির অবাঞ্ছিত। দুঃখের নামে মানুষ শিহরিয়া উঠে—মানুষ দুঃখকে কালসর্পবৎ পরিত্যাগ করে। দুঃখকষ্টদায়ক ও সুখ সুবিধার হানিকারক বটে, কিন্তু মানবের শত্রু নহে। চির সুখিজনের উন্নতি সীমাবদ্ধ। যে কখনও উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়া দুঃখ ভোগ করে নাই, তাহার সুখ অনিশ্চিত। ব্যক্তিগত জীবনে ও জাতীয় জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত আমরা সচরাচর দেখিতে পাই। রোম পরপদদলিত হইয়া অশেষ পরিমাণে দুঃখভোগ করিয়াছিল বলিয়াই এক দিন সুখের নাগাল পাইয়াছিল। এবং ভারতের মোগল সম্রাটগণ চিরসুখে ভাসিয়াছিলেন বলিয়াই, আজ কালগর্ভে নিমজ্জিত।

সোণার ভারতে আবার দুঃখের কালিমা পড়িয়াছে। চারিদিকেই দুঃখের হাহাকার। কিন্তু এই দুঃখের আতিশয্যেই ভারত আপনাকে চিনিতে শিখিয়াছে। যে ভারতে পূর্ব্বে হিংসাই মূল মন্ত্র ছিল, সেই ভারত হইতে একতার মধুর ধ্বনি আবার উঠিতেছে। ভারতবাসী জাতিবিদ্বেষ ও স্বার্থপরতা ভুলিয়া পরস্পরকে ভাই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে শিখিতেছে। ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি ও অন্যান্য সম্মিলনী, ইহার প্রত্যক্ষ আলেখ্য এবং দুঃখেরই শুভ ফল।

জীবনী শক্তি যদি একেবারে লোপ হইয়া না যায়, তবে দুঃখ মানুষকে অধঃপতিত করে না; বরং উপরের দিকেই ঠেলিয়া তুলে। ঔরঙ্গজেবের দুর্ব্বিসহ অত্যাচারের ফলেই মারহাট্টা জাতি একদিন স্বাধীনতার উচ্চ শিখরে সমাসীন হইয়াছিল। তৎকালীন অত্যাচার ও দুঃখরাশিই যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মহারাষ্ট্রের মহাশক্তি শিবাজীরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। রুগ্ন পথিকের শিথিল-মুষ্টিচ্যুত যষ্টির ন্যায় যখন মোগল হস্ত হইতে ভারত সাম্রাজ্য খসিয়া পড়িল, তখন তরুণবয়স্ক বলদৃপ্ত মারহাট্টা তাহা সাদরে কুড়াইয়া লইল। সেই গৃহীত যষ্টি যে মারহাট্টার নবীন হস্তে নিতান্ত অশোভনীয় হয় নাই, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ভারত, মোগল স্মৃতিতে পূর্ণ; কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত মারহাট্টাময়। ভারতের অষ্টাদশ শতাব্দীর আলেখ্য

আঁকিতে গেলেই মারহাট্টাচিত্র আসিয়া পড়ে। ব্রিটিশ সিংহ মোগলের নিকট হইতে ভারত গ্রহণ করেন নাই, যে প্রকারেই হউক হিন্দুর নিকট হইতেই হিন্দুর ভারত গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রিটিশ আগমনের প্রাক্কালে মোগল হতবল, তখন মোগলের মূর্ত্তি ছিল মাত্র, কিন্তু প্রাণ ছিল না। পাঞ্জাবে শিখ ও দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র শক্তিই তখন বলবান। *

ঔরঙ্গজেবের পর আরও পাঁচ জন সম্রাট কোন প্রকারে সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। ষষ্ঠ ব্যক্তি ১৭৫৯ সালে কোন আততায়ীর হস্তে প্রাণত্যাগ করিলে পর, তদীয় পুত্র শাহ আলম পৈতৃক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু ইঁহার যোগ্যতা অতি অল্পই ছিল। স্বপ্নাতীত ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও তিনি তাহা পরিচালন করিতে পারিলেন না। আপনার শক্তি সামর্থ্য থাকিতেও পর দ্বারে ভিক্ষার্থী হইলেন। ইংরাজের সাহায্য পাইয়া আপনাকে পরম ধন্য বোধ করিলেন। নামে তিনি সম্রাট রহিলেন বটে কিন্তু কার্য্যতঃ সম্রাটত্বের কিছুই তাঁহার হস্তে রহিল না।

অপর পক্ষে, মারাঠারা বলদৃপ্ত সিংহের ন্যায় ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। যমুনা হইতে কৃষ্ণা পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার না করিয়া তাহারা কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না। এই সময়ে শিবাজীর বংশধরগণ হীনবল হইয়া পড়িলেও পেশওয়া নামধেয় ব্রাহ্মণ বংশ মহারাষ্ট্রের প্রাণবৎ মন্ত্রিরূপে রাজ্য পরিচালনা করিতেছিলেন।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর একাদশ বৎসর পর (১৭১৮ খৃঃ অব্দ) বালাজী পেশওয়া (১ম) সসৈন্যে দিল্লী যাত্রা করেন এবং তৎকালীন মোগল সম্রাটের নিকট হইতে তিনটী ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। এবং ইহা হইতেই মারহাট্টা রাজ্যের পত্তন-ভূমি দৃঢ়ীকৃত হয়।

(১ম) চৌথ অর্থাৎ হায়দরাবাদ, মহীশূর, তাঞ্জোর, কর্ণাট এবং দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যে রাজস্ব উৎপন্ন হইবে, তাহার এক চতুর্থাংশ মারহাট্টা সম্রাট প্রাপ্ত হইবেন।

* The British won India, not from the Mughals, but from the Hindus. Before we appeared as conquerors, the Mughal Empire had broken up. Our conclusive wars were neither with the Delhi king nor with the revolted governors, but with two Hindu confederacies, the Marathas and the Sikhs.

Sir W. W. Hunter's Indian Empire (1893) P 375.

(২য়) সর্দ্দেশমুখী—অর্থাৎ উল্লিখিত চৌথের উপর আরও এক দশমাংশ রাজস্ব প্রাপ্ত হইবেন।

(৩) স্ব-রাজ্য—অর্থাৎ পুণা এবং তন্নিকটবর্ত্তী পোনেরটী জেলার উপর তাঁহাদেরই সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ও আধিপত্য থাকিবে।

১৭২০ খৃঃ অব্দে, বাজী রাও পেশওয়া পদে অধিষ্ঠিত হন। উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় ইনি আপন পিতাকেও অতিক্রম করিলেন। বাজীরাও শুধু দক্ষিণ ভারতবর্ষ লইয়া সন্তুষ্ট রহিলেন না, উত্তর দিকেও ইঁহার চক্ষু পড়িল। মোগল রাজত্বের ফুল ফলেই এত দিন মারাঠারা সন্তুষ্ট ছিলেন, ইনি তাহার বিশুষ্ক শিকড়টীও উপড়াইয়া তুলিতে ইচ্ছুক হইলেন। বাজীরাও গুজরাটের রাজস্বের এক অংশ গ্রহণ করিলেন এবং অনতিকাল মধ্যে মালব ও বুন্দেলখণ্ড অধিকার করিয়া ১৭৩৯ সালে পর্ত্তুগিজদের নিকট হইতে বেসিন প্রদেশও কাড়িয়া লইলেন।

বাজী রাওয়ের পুত্র বালাজী রাও ১৭৪০ সালে পেশওয়া পদে অধিষ্ঠিত হন। এই সময়ে রাজ্যলোলুপ মারহাট্টাদিগের দৃষ্টি সমৃদ্ধিশালিনী বঙ্গভূমির উপর পতিত হইল। নাগপুরের ভোঁসলা নামধেয় জনৈক মারহাট্টাপ্রধান বঙ্গদেশে আসিয়া ক্রমাগত উৎপাত করিতে লাগিলেন এবং তাহার ফলে ১৭৫১ সালে উড়িষ্যা জয় করিয়া বাঙ্গলার নবাবের নিকট হইতে বাঙ্গলা ও বিহারের চৌথ আদায় করিয়া লইলেন। বলা বাহুল্য, উত্তর ভারতও ইহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল না।

এই প্রকার উল্লিখিত তিন জন পেশওয়ার সাহায্যে মারাঠাশক্তি শক্তিসম্পন্ন হইল। পুণা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে তাঁহাদের বিজয়পতাকা সগর্ব্বে উড্ডীন হইল। সত্যের অনুরোধে বলা আবশ্যক, রাজ্যলোলুপতাই ইঁহাদের কাল হইল। ইঁহারা যুদ্ধ বিগ্রহের সময় সর্ব্বদা ন্যায় ও ধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতেন না। সময় সময় আততায়ীর ন্যায় দুর্ব্বল ও অসহায়ের উপর অত্যাচার করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। ইঁহাদের নিপীড়নে দেশের লোক এতই ভীত হইয়া পড়িয়াছিল যে, দুরন্ত রোরুদ্যমান বাঙ্গালী শিশুও মারাঠা-বর্গীর নামে চুপ করিয়া যাইত।

"খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়াল
বর্গী এল দেশে
বুলবুলীতে ধান খেয়েছে
খাজনা দিব কিসে ?"

প্রভৃতি প্রাচীন ছেলে ভুলানো ছড়া তাহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু "নিয়তি কেন বাধ্যতে" কর্ম্মফল ক্রমেই ফলিতে আরম্ভ হইল।

১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দে পলাসীর যুদ্ধে (?) জয় লাভ করিয়া ব্রিটিসসিংহ বঙ্গদেশে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ১৭৬৫ সালে দেওয়ানীপদ প্রাপ্ত হইয়া দেশের সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। ১৭৬১ সালে ফরাসীদিগকে পরাজিত করিয়া ইঁহারা কর্ণাট প্রাপ্ত হন। প্রায় এই সময়ে সুবিখ্যাত হায়দর আলি অপ্রতিহত প্রভাবে মহীশূরে আপন ক্ষমতা বিস্তার করিতেছিলেন। মোগল রাজত্বের পতনের সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যা ও হায়দরাবাদের ভূপালগণ স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। ১৭৬১ সালে কাবুলের আহম্মদশাহ ভারত আক্রমণ করেন এবং পাণিপথের যুদ্ধে মারাঠাদিগকে পরাজিত করেন। এই সঙ্গে সঙ্গে শিখগণ ধর্ম্মোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া উঠেন এবং ১৭৬৩ সালে সিরহিন্দ যুদ্ধে আহম্মদ শাহকে পরাজিত করিয়া সমগ্র পঞ্চনদ প্রদেশের আধিপত্য লাভ করেন।

আমরা উপরে যাহা লিখিলাম, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, মোগলের পর মারাঠারাই ভারতে আধিপত্য লাভ করেন। এবং দশ বৎসরের মধ্যেই বঙ্গদেশে ও কর্ণাটে ইংরেজ, মহীশূর ও উত্তর ভারতে মুসলমান এবং পঞ্চনদ প্রদেশে ধর্ম্মোন্মত্ত শিখগণ মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইল। দশটী বৎসর যাইতে না যাইতেই মারাঠার শত্রু চারিদিকে জাগ্রত হইয়া উঠিল।

১৭৬১ সালে তৃতীয় পেশওয়ার মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র মাধব রাও, পেশওয়া পদে অধিষ্ঠিত হন। এই সময়ে হায়দর আলীর সহিত মারাঠাদের কলহ বাধিয়া উঠে। মারাঠাদের সহিত দুইটী যুদ্ধে হায়দর আলী পরাভূত হন এবং তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য স্থান ছাড়িয়া দিয়া ও করদানে স্বীকৃত হইয়া শান্তি স্থাপন করেন। ক্রমে উত্তর ভারতবর্ষেও মারাঠারা জাগ্রত হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে প্রাতঃস্মরণীয়া হোল্কার মহিষী অহল্যা অতি দক্ষতার সহিত ইন্দোর রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। তাঁহার অমিত প্রতিভাবলে প্রভূত পরিমাণে ইন্দোরের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, এবং রাজ্যের যাবতীয় কার্য্য-প্রণালী অতীব সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হইতে থাকে। তিনি রাজ্য-শাসনে যেরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা অনেক নৃপতির পক্ষেও ঈপ্সিত।

১৭৬১ সাল হইতে ১৭৭২ সাল পর্য্যন্ত, মাধবরাও পেশওয়ার শাসনকালে, উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্র বিজয়পতাকা অপ্রতিহতরূপে উড্ডীন ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এই সুবিশাল রাজ্য ইহারা কি প্রণালীকে শাসন করিতেন, জানিবার জন্য স্বতঃই আগ্রহের উদ্রেক হইয়া থাকে। আমরা কাপ্তান গ্রাণ্ট ডফের 'মহারাষ্ট্র ইতিহাস' নামক (History of the Marathas by Captain Grant Duff) গ্রন্থ হইতে তাহার সার-সংগ্রহ লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম।

রাজস্ব-আদায়-প্রণালী।

বার্ষিক রাজস্ব আদায় করিবার জন্য প্রতিবর্ষে একজন করিয়া মামলৎদার নিযুক্ত হইতেন। অবশ্য মামলৎদার নির্দ্দোষরূপে কার্য্য করিতে পারিলে এতদধিক সময়ের জন্য থাকিতে পারিতেন। মামলৎদারেরা সংগৃহীত রাজস্বের উপর শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে কমিশন পাইতেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার কোন নির্দ্ধারিত বেতন ছিল না। নিযুক্তির সময়ে মামলৎদারদিগকে রাজসরকারে কতক টাকা অগ্রিম জমা দিতে হইত। রাজস্ব আদায় হইয়া গেলে ঐ টাকা তিনি পরে কর্ত্তন করিয়া লইতেন। কিন্তু অগ্রিম প্রদত্ত টাকার জন্য,রাজস্ব সম্পূর্ণরূপে আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত শতকরা দুই টাকা হিসাবে তিনি রাজসরকার হইতে সুদ পাইতেন। একখানি হাতচিঠা থাকিত, তাহাতে মামলৎদারের নিযুক্তি বিবরণ ও যখন যে টাকা রাজসরকারে জমা দিতেন, তাহা লিপিবদ্ধ হইত। কোন মামলৎদারকেই পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক রাজস্ব আদায় করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইত না। অনেক সাউখার বা মহাজন রাজস্ব কার্য্যের ইজারা লইতেন। সিপাহি ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের বেতন প্রভৃতি দিবার ভারও মামলৎদারের উপর ন্যস্ত হইত। আদায়ের মর্ম্ম শেষ হইলে জেলার ফড়নবীশ আসিয়া মামলৎদারের নিকট হইতে সমস্ত হিসাব পত্র লইয়া রাজধানীতে যাইত। এবং তাহা মঞ্জুর করিবার পূর্ব্বে বিশেষরূপে পরীক্ষা করা হইত।

পুলিস।

পুলিস, বিচার ও শাসন কার্য্যের বন্দোবস্তের ভার অনেকটা মামলৎদারের হস্তেই থাকিত। দেশের প্রধানগণ এবং মামলৎদার ফৌজদারী বিচার করিতেন; কিন্তু কোথাও স্থায়ী কাছারী থাকিলে সার-সুবাদারেরাই

বিচারক হইতেন। দেশমুখ ও দেশ পাণ্ডাদের দ্বারা সময় সময় সালিসী কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। কার্য্য না থাকিলেও ইঁহারা আপন আপন প্রাপ্য মুদ্রা প্রাপ্ত হইতেন। দেশমুখ ও দেশ পাণ্ডাদের অধিকার বংশানুক্রমিক ছিল।

পুণা ভিন্ন অন্যান্য স্থানের পুলিসের কার্য্যশৃঙ্খলা ভাল ছিল না। পুলিস ও শাসন-প্রণালীর বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও প্রজাবর্গের ধন ও জীবন বহু পরিমাণে নিরাপদ ছিল। যাহারা পূর্ব্বে নগর লুণ্ঠন ও অত্যাচারে নিষ্ঠুরতার একশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছে, তাহাদের অধিকৃত রাজ্যে মানুষের ধন প্রাণ এরূপ নিরাপদ থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি? এই প্রকার নিরাপদ থাকিবার একটি প্রধান কারণও ছিল। প্রত্যেক গ্রামের সামাজিকগণের প্রাধান্য এত অধিক ছিল যে, কোন লোক নীতি-বিগর্হিত কার্য্য করিয়া তাহাদের নিকট নিস্তার পাইত না। তাহাকে স্ব-সমাজে ও স্বজনবর্গের নিকট যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইতে হইত। এমন কি, অতি আপনার জনও তাহার বিপক্ষে উঠিয়া দাঁড়াইত। সুতরাং কোন লোকই নীতিবিগর্হিত কার্য্য করিতে সাহসী হইত না। এতদ্ব্যতীত কোন আকস্মিক বিপদ ঘটিলে গ্রামের লোক মাত্রেই একত্র হইয়া বিপক্ষের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত। ইহাতেই গ্রামের সুশৃঙ্খলা বহুল পরিমাণে রক্ষা পাইত। যাহারা দেশরক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দিত, পেসওয়া তাহাদিগকে উচ্চতর পদে নিযুক্ত করিয়া পুরস্কৃত করিতেন। ইহাতে জনসাধারণের দেশানুরাগ বর্দ্ধিত হইত এবং রাজ্যের সুশৃঙ্খলাও অটুট থাকিত।

দণ্ডবিধি।

কোন লোক কঠিন অপরাধে অপরাধী হইলে, সর-সুবাদারেরা তাহাকে প্রাণদণ্ডেও দণ্ডিত করিতে পারিতেন। কিন্তু মামলৎদারের পক্ষে এই সব স্থলে পেশওয়ার অনুমতি লইতে হইত। প্রধান প্রধান জায়গীরদারেরা আপন আপন অধিকৃত স্থানের অধিবাসীর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা অবধ্য ছিলেন; কিন্তু রাজবন্দীদিগকে বিষাক্ত ভক্ষ্য দ্রব্যের দ্বারা হত্যা করা হইত। স্ত্রীলোক অপরাধিনী হইলে, তাহাদের কোন প্রধান অঙ্গ কর্ত্তন করিয়া ফেলা হইত। কদাচিৎ কাহাকেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত। বিচারের কোন নির্দ্ধারিত প্রণালী ছিল না। সচরাচর

যাতনা দিয়া আসামীদিগের নিকট হইতে কবুল জবাব লওয়া হইত। বলা বাহুল্য, যাহারা অপরাধ স্বীকার করিত, মৃত্যু দণ্ড ভিন্ন তাহাদের অব্যাহতি ছিল না। সন্দেহজনক ঘটনায় বিচারপতি আপন কর্ম্মচারীদের মতামত লইয়া কার্য্য করিতেন। সাতারা অঞ্চলের কোন কোন মামলৎদার পঞ্চায়েৎ নিযুক্ত করিয়া বিচার কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন।

দেওয়ানী।

সাধারণতঃ পঞ্চায়েৎদিগের দ্বারাই দেওয়ানী কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। রামস্বামীর * প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে এই পঞ্চায়েৎ প্রথার বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। যে স্থানে রামস্বামীর প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে কার্য্য হইত না, সেখানে অনেক সময় বিচার কার্য্যে ব্যভিচার ঘটিত। যাহা হউক, পঞ্চায়েৎগণ সাধারণপ্রিয় ছিলেন।

আয়।

মাধব রাওয়ের মৃত্যুর প্রাক্কালে নিজ মারাঠা রাজ্যের রাজস্ব দশকোটী টাকা ছিল। কিন্তু হোলকার, সিন্ধিয়া, জানোজী ভোঁসলে এবং দম্মোজি গাইকোয়ারের জায়গীরের কর, জরিমানা ও অন্যান্য দস্তুরীর আয় শুদ্ধ ৭২,০০০,০০০ সাতকোটী বিশ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয় ছিল। এতদ্ব্যতীত মাধব রাওয়ের ব্যক্তিগত তালুকের তিন লক্ষ টাকা বার্ষিক আয় ছিল। মাধব রাওয়ের ২৪ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত অপর সম্পত্তিও ছিল; তাহা তিনি মৃত্যুকালে রাজসম্পত্তির সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া যান।

সৈন্যবল।

ভোঁসলে, গায়কোয়ার, সিন্ধিয়া এবং হোলকারের সৈন্য ব্যতীত পেশওয়ার পঞ্চাশ হাজার উত্তম অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। কিন্তু পদাতিক ও গুলন্দাজ সৈন্যের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল না। মাধবরাও পেশওয়ার সময়ে দশ হাজার পদাতিক ছিল বটে, কিন্তু তাহার এক তৃতীয়াংশ আরব ও অবশিষ্ট অন্যান্য জাতীয় মুসলমান ছিল। পরিশেষে যে সব দেশীয় পদাতিক ছিল, তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হইলেই আপন আপন গৃহে চলিয়া যাইত।

* ইনি শিবাজীর গুরু ছিলেন, এবং ইঁহারই মন্ত্রণায় শিবাজী হিন্দু-সাম্রাজ্য স্থাপনে মনোনিবেশ করেন।

কঙ্কণ-পদাতিকেরা বিশেষ প্রশংসার্হ ছিল। আবশ্যক হইলে ভোঁসলে ও গায়কোয়ার দশ হাজার হইতে পনর হাজার এবং হোলকার, সিন্ধিয়া ও ধারের রাজা তেত্রিশ হাজার পর্য্যন্ত সৈন্য সরবরাহ করিতেন। সুতরাং পেশওয়া ইচ্ছা করিলে অনায়াসে এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য যে কোন সময়ে চালনা করিতে পারিতেন।

* * * * *

আমরা এই পর্য্যন্ত কাপ্তান গ্রাণ্ট ডফের ইতিহাস হইতে মারাঠাদিগের রাজ্যশাসন প্রণালী উল্লেখ করিলাম। কিন্তু গ্রাণ্টডফের পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর মারাঠাদের সম্বন্ধে আরও অনেক নূতন তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। পেশওয়ারা বিবিধ জ্ঞাতব্য কথায় পূর্ণ যে সব রোজনাম্চা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা রায় বাহাদুর বাদ (wad) ও জষ্টিস রাণাড়ের কৃপায় সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৭০৮ সাল হইতে ১৮১৬ সাল পর্য্যন্ত মারাঠা-জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা উল্লিখিত গ্রন্থে প্রচুররূপে বর্ণিত হইয়াছে। আগামী সংখ্যা বীরভূমিতে ঐ সকল কৌতুকাবহ ও চিত্তাকর্ষক বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া পাঠক পাঠিকাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিব।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস।

লালাবাবু।

(৫) "কথিত আছে, একদিন লালাবাবু বিষয় কর্ম্মে সাতিশয় ব্যস্ত ছিলেন। বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়াছিল, তথাপি স্নান আহার করিতে যাইলেন না। বাটীর ভিতর হইতে কয়েকবার তাঁহাকে ডাকিতে লোক আসিল, তবুও তিনি উঠিলেন না। অবশেষে তাঁহার কন্যা * আসিয়া বলিল "বাবা! বেলা গেল যে।" বেলা গেল এই দুইটী কথায় লালাবাবুর হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। সেই মুহূর্ত্ত হইতে সংসারের প্রতি তাঁহার বৈরাগ্য জন্মিল।" (বঙ্গবাসী ১৩০৭। ২৫শে ফাল্গুন)

* লালাবাবুর কন্যা ছিল না, শ্রীনারায়ণ সিংহই তাঁহার একমাত্র পুত্র ছিলেন।

৬। তিনি (লালাবাবু) মানে, রূপে † গুণে, কুলে শীলে সর্ব্ব বিষয়ে প্রধান। একদা মহারাজ আহারান্তে সুখের শয্যায় নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিতেছিলেন। দিবাবসান হয় দেখিয়া দ্বারবান ডাকিল, মহারাজ! উঠিয়ে, দিন আখের হুয়া। শব্দ "কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল তার প্রাণ।" মহারাজ জাগ্রত হইয়াও ক্ষণকাল নিমীলিত নেত্রে শয্যায় রহিলেন, যেন কি ভাবিলেন। তারপর উঠিয়াই খিড়কীর পথে বাহির হইয়া ভিক্ষা-সম্বল সন্ন্যাসীর বেশে একেবারে বৃন্দাবনে উপস্থিত। মহারাজ দ্বারবানের কথায় বুঝিয়াছিলেন, দ্বারবানের মুখে ভগবান্ তাঁহাকে ডাকিতেছেন। দ্বারবানের ডাক ওটা কেবল কাকতালীয়। মহারাজ কথা শুনিলেন, বুঝিলেন,—বুঝিলেন যে সত্যই তাঁহার দিন আখের হইয়াছে। ‡ (পূর্ণিমা, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা)

(বৃন্দাবন-জীবনী)

লালাবাবুর বাল্য ও সাংসারিক জীবন এবং বৈরাগ্যের কথা ইতঃ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এইবার আমরা তাঁহার বৃন্দাবনের অনুষ্ঠিত ক্রিয়া কলাপ বর্ণন করিতে অগ্রসর হইব।

তিনি বৃন্দাবন ধামে গমন করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রিমার মন্দির নির্ম্মাণ ও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত কিয়ৎকাল অতিবাহিত করতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গোবর্দ্ধনে অবস্থিতি করেন এবং অবশেষে অকালে অপমৃত্যুর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া পবিত্র জীবনের লীলা শেষ করিতে বাধ্য হন। লালাবাবু ন্যূনাধিক ত্রয়োদশ বর্ষকাল ব্রজধামে জীবন যাপন করেন। এই অনতিদীর্ঘ সময়ের

† লালাবাবু রূপে প্রধান ছিলেন না।

মুর্শিদাবাদ জেলায় ও অন্যান্য অনেক স্থানে লালাবাবুর বৈরাগ্য সম্বন্ধে অসংখ্য জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। বলা বাহুল্য যে, ৪র্থ জনশ্রুতি ভিন্ন আর সমস্তই অসার। সংসারে থাকিতে থাকিতে লালাবাবুর অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় সত্য, কিন্তু তিনি বৈরাগ্যের উদয় হইবামাত্র বৃন্দাবন যাত্রা করেন নাই। বৈরাগ্য সঞ্চারের পর সংসারের সুব্যবস্থা করিয়া পরে বৃন্দাবন গমন করেন।

[পাঁচথুপী গ্রামের ঘোষ ও মৌলিক বংশীয় কায়স্থগণের সহিত বহুকাল হইতে কান্দীরাজ বংশের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। রাণী কাত্যায়ণীর (লালাবাবুর স্ত্রীর) অধীনে পাঁচথুপীর কয়েকজন কায়স্থ সন্তান কার্য্য করিয়াছিলেন। লেখক তাঁহাদের সাহায্যে লালাবাবুর জীবনী সংগ্রহ করিয়াছেন।]

‡ এই পর্য্যন্ত লালাবাবুর সংসার জীবনী 'সুধার' ৩য় খণ্ড ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ+পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতাকারে পুনঃ প্রকাশিত হইল।

মধ্যে তিনি তথায় যে সকল সৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনির্ব্বচনীয়।

লালাবাবু বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াই প্রথমতঃ ভরতপুরের মহারাজার অধিকৃত একটী বৃহৎ প্রাসাদে বাস করিতে আরম্ভ করেন। মানুষ একেবারে সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারে না। বলা বাহুল্য যে, তৎকাল পর্য্যন্ত লালাবাবু সম্পূর্ণ রূপে স্বার্থত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই। স্বার্থত্যাগ মহামন্ত্র অভ্যাস করিতে ছিলেন মাত্র। লালাবাবু কে? এবং কি জন্যই বা তিনি ব্রজধামে আগমন করিয়াছেন, এসংবাদ প্রথমতঃ কোন ব্রজবাসীই অবগত ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার অসাধারণ দানশীলতা অচিরেই তাঁহাকে বৃন্দাবনের প্রত্যেক অধিবাসীর নিকট পরিচিত করিয়াছিল। তাঁহার অর্থাধিক্যের সংবাদ শ্রবণে স্থানীয় দস্যু তস্কর বৃন্দেরও লালসা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে সহসা একদিন তাঁহার বাস গৃহের বহুসংখ্যক দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠিত ও তিন লক্ষ টাকা অপহৃত হইয়া যায়।

অতঃপর, ১৮২০ খৃঃ লালাবাবু উত্তর ভারত পরিদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত মনোযোগ প্রদান করেন।

বৃন্দাবনের যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীগণসহ ক্রীড়ারস সম্ভোগ করিতেন, যমুনার সেই সুপবিত্র ও মনোহর পুলিন প্রদেশে তিনি সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে শিলাময় কৃষ্ণচান্দ্রমার একটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে কৃত-সংকল্প হ'ন।

প্রথমতঃ দেবমন্দিরের প্রধান উপকরণ সংগ্রহার্থ লালাবাবু রাজস্থানের জনৈক রাজার নিকট আবেদন করেন। উক্ত রাজা লালাবাবুর সদুদ্দেশ্য অবগত হইয়া তাঁহার রাজ্য হইতে বিনা মূল্যে আবশ্যকমত প্রস্তর ও মার্ব্বল বহন করাইয়া লইয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। তদনুসারে লালাবাবুও মন্দির নির্ম্মাণের প্রধান উপকরণ সমুহ বৃন্দাবনে আনয়ন করাইয়া-ছিলেন। রাণা ও মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে লালাবাবুকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া-ছিলেন। এই সূত্রে রাণার সহিত লালাবাবুর ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় লালাবাবুকে এক ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

তৎকালে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করাইবার নিমিত্ত রাণাকে আহ্বান করেন; কিন্তু রাণা তদ্বিষয়ে দ্বিধা প্রদর্শন করায় তাহার কারণ অনুসন্ধানার্থ তদন্ত আরম্ভ হয়, সেই সময় সার চার্লস মেটকাফ

(বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কেহ দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহার বিচারার্থ কমিশনারের ন্যায় সম্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হইয়া) দিল্লীর দরবারে রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত ছিলেন। তিনি এই সংবাদ অবগত হন যে রাণার দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্রের (লালা বাবুর) কুমন্ত্রণায় রাণা সন্ধিপত্রে নাম স্বাক্ষর করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। এই জনরব কোথা হইতে উদ্ভূত হইল, তাহার কোন তথ্যই অনুসন্ধান না করিয়া একবারে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধে অভিযুক্ত করতঃ মেটকাফ সাহেব লালাবাবুকে অবিলম্বে ধৃত করিবার অনুমতি বাহির করিয়া দেন। মথুরার বিচারকের (Magistrate) নিকট এই আদেশ পঁহুছিলে সমস্ত মথুরাবাসী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরস্পর এই জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করে যে "এরূপ উপচিকীর্ষ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি এতাদৃশ গুরুতর দোষে কিরূপে লিপ্ত হইতে পারে," তাহারা বলিয়াছিল যে "নিশ্চয় কতকগুলি ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি সাধুচরিত্র লালাবাবুর নামে এই কুৎসা রটনা করিয়া কমিশনারের কাণ ভারি করিয়াছে। যাহা হউক, আমরা লালাবাবুর অনুগমন করিয়া বিচারফল সন্দর্শন করিব।" এই বলিয়া প্রায় দশ সহস্র মনুষ্য লালাবাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়। অনুগমনকারীদের অধিকাংশই মেওতিজ, জাট ও গুজার জাতীয়। তাহারা দিল্লীতে লালাবাবুর চতুর্দ্দিকে শরীররক্ষক-স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছিল এবং তাঁহার প্রতিকূলে কোন কিছু ঘটিলে সকলেই তাঁহার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছিল। যতই তাহারা দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল, ততই তাহাদের দল পরিপুষ্ট হইয়াছিল, এমন কি, অবশেষে তাহাদের সংখ্যা বিংশতি সহস্রে পরিণত হয়। তৎকালে দিল্লী এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ বর্ত্তমানের ন্যায় ছিল না।

মেটকাফ দিল্লীর রাজপথে এতাদৃশ জনতা সন্দর্শনে অতীব ভীত হইয়াছিলেন, এবং উক্ত ষড়যন্ত্র-লিপ্ত দোষী ব্যক্তি (লালাবাবু) কিরূপে এতাধিক সংখ্যক মানবেরও অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা সহজে বিবেচনা করিতে অক্ষম হইয়া এই স্থির করেন যে, প্রথমতঃ লালাবাবুর চরিত্র এবং অতীত ক্রিয়া কলাপ সম্বন্ধে গোপনভাবে তদন্ত করিয়া, আবশ্যক বোধ করিলে অবশেষে তাঁহাকে বিচারার্থ আনয়ন করা যাইবে। সেই সময় শান্তিপুর-নিবাসী দেবীপ্রসাদ রায় নামক পারস্য ভাষাভিজ্ঞ জনৈক বঙ্গবাসী মেটকাফের অধীনে কার্য্য করিতেন। তাঁহার নিকট হইতে ও অন্যান্য উপায়ে মেটকাফ

লালাবাবুর ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বিবরণ এবং তিনি স্বয়ং ও তাঁহার পিতৃ পিতামহাদি সকলেই পূর্ব্ব হইতে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের কিরূপ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন, তৎসমুদয় বিশেষরূপে অবগত হন। অতঃপর তিনি লালা বাবুকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী বুঝিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন এবং তাঁহাকে নিজ সম্মুখে আহ্বান পূর্ব্বক পর্য্যঙ্কিকায় উপবেশন করান।

উপবেশনান্তর লালাবাবু তাঁহার পবিত্র আত্মা ও অন্তঃকরণের উপযুক্ত স্বরে মেটকাফকে বলিয়াছিলেন "যখন আমি এ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিরই অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হই নাই, তখন আমি যাহার অন্নে প্রতিপালিত, সেই কোম্পানী বাহাদুরের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া নিমকহারামীর পরিচয় দিব, একথা সম্পূর্ণ অসঙ্গত"। অবশেষে লালাবাবু রাণার সহিত তাঁহার যে সকল ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল ও কোম্পানি বাহাদুরের সদভিপ্রায় লাভের নিমিত্ত তিনি রাণাকে যে সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও মেটকাফের নিকট বর্ণনা করেন এবং রাণার দেওয়ানী সম্বন্ধীয় জনরবের কথা উত্থাপিত হইলে বলেন, আমি মানব জীবনের যথেষ্ট চাকরি করিয়াছি। এক্ষণে জগদীশ্বরের নির্দ্ধারিত কার্য্য আমার দ্বারা কিরূপে সম্পাদিত হইবে, তাহার উপায় অনুসন্ধানই আমার মুখ্য চাকরি।"

পরদিন মিঃ মেটকাফ লালাবাবুকে দিল্লীশ্বরের দরবারে লইয়া যান এবং তাঁহার সহিত সম্রাটের পরিচয় করিয়া দেন। মেটকাফ লালাবাবুর অনুকূলে সম্রাট সকাশে এই কথা প্রকাশ করেন যে, ইঁহারা পুরুষানুক্রমে কোম্পানী বাহাদুরের দায়িত্বপূর্ণ পদ প্রাপ্ত হইয়া উল্লেখযোগ্য বহুকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। মেটকাফের অনুরোধে তাৎকালিক উপাধিদাতা দিল্লীশ্বর লালাবাবুকে "মহারাজা" উপাধি প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলে সংসার-বিমুগ্ধ লালাবাবু সবিনয়ে উক্ত উপাধি গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রায় একমাস পরে লালাবাবু দিল্লী হইতে বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করেন। দর্শনমাত্র তৎকালে ব্রজবাসীবৃন্দ তাঁহার মুক্তিতে আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক "জয় লালাবাবুর জয়" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়াছিল।

বহু যত্ন, অধ্যবসায় ও ব্যয় স্বীকার করিয়া লালাবাবু যমুনার পুলিন প্রদেশে কৃষ্ণচন্দ্রিমাজীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। জগন্নাথ দেবের মন্দিরের অনুকরণে এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। মন্দিরটী অতি উচ্চ এবং একটী মাত্র চূড়া বিশিষ্ট। ইহার নাট্য মন্দিরটী অতি মনোহর ও আড়ম্বর

পূর্ণ এবং প্রাচীন ভারতের স্থপতি-বিদ্যার পরিচায়ক। ইটালির শিল্পনৈপুণ্য জগদ্বিখ্যাত, কিন্তু এই নাট্য মন্দিরের কারুকার্য্য সন্দর্শন করিয়া ইটালীবাসী স্থপতিগণকেও অধোবদন হইতে হয়।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃর্গত দাঁইহাট-নিবাসী বিখ্যাত কৃষ্ণচন্দ্র ভাস্কর কৃষ্ণচন্দ্রিমার পবিত্র মূর্ত্তির নির্ম্মাতা। অধুনাপি ব্রজধামে মন্দিরের মধ্যস্থলে সেই সুন্দর প্রস্তরময় দেব দেবীর নব যৌবনাবস্থার মূর্ত্তি মার্ব্বল প্রস্তর নির্ম্মিত পাদ পদ্মাসনের উপর সুশোভিত রহিয়াছে। আহা! মূর্ত্তিদ্বয় কিবা মনোহর! এমন সুন্দর গঠন পারিপাট্য অতি দুর্লভ। ভক্ত যখনই সেই মূর্ত্তি সন্দর্শন করে, তখনই প্রেমে বিভোর হইয়া উঠে। একে সুপবিত্র ব্রজধাম, তথায় রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি, তাহার উপর আবার বিগ্রহের কমনীয় ও লোচনলোভন এবং ভক্তি-রসোদ্দীপক শক্তি, সুতরাং ভাবুক ভক্তবৃন্দ সেই দিব্য মূর্ত্তির দিকে নেত্র সঞ্চালন করিয়াই যে অবিরল ধারায় অশ্রুবির্জ্জন করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?"

কৃষ্ণচন্দ্রিমার মন্দির এবং মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া লালাবাবু উক্ত বিগ্রহের সেবার চিরস্থায়ী সুবন্দোবস্তে মনোযোগ প্রদান করেন। তিনি বুলন্দসহর, আলিগড় ও মথুরার অন্তর্গত অনেকগুলি সম্পত্তি (চল্লিশ হাজার টাকার সম্পত্তি) এবং রাজা সের সিংহ বংশীয়দের নিকট হইতে বিস্তৃত জমিদারী পরগণা অনুপসহর ক্রয় করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রিমার নামে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রিমার ভোগের বরাদ্দ দৈনিক একশত টাকা এবং তাঁহার প্রত্যহ পাঁচ শত লোক যাহাতে প্রসাদ পায়, লালাবাবু তাহারও সুবন্দোবস্ত করিয়া যান। পক্ষাধিক কাল এক জনকে প্রসাদ বিতরণের নিয়ম নাই। শুনা যায়, তিনি এরূপ নিয়মও করিয়া গিয়াছিলেন যে "আমার বংশীয় কেহই একদিনের অধিক কাল বিনামূল্যে প্রসাদ লাভ করিতে পাইবে না *।"

* লালাবাবুর দেবভক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। ৺ কৃষ্ণচন্দ্রিমার উপর তাঁহার এতাদৃশ অনুরাগ ছিল যে, কৃষ্ণচন্দ্রিমা কখন কখন তাঁহাকে স্বপ্নাদেশ করেন। এ সম্বন্ধে গয়ার প্রসিদ্ধ উকীল শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশ চন্দ্র সিংহ বি-এল অনুগ্রহ পূর্ব্বক লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল।

"এক দিন রাত্রিতে তিনি (লালাবাবু) এই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে ৺ কৃষ্ণচন্দ্রিমা তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া যেন বলিতেছেন, যে "আজ আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, খাদ্য দ্রব্যে কেশ থাকায় আমি উহা খাইতে পারি নাই। অমনি নিদ্রা ভঙ্গ হইবামাত্র লালাবাবু তখনই গোবর্দ্ধন হইতে পদব্রজে ৬ ক্রোশ পথ চলিয়া গিয়া প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই বৃন্দাবন পৌঁছিয়া

লালাবাবুর দ্বিতীয় কীর্ত্তি রাধাকুণ্ডের সংস্কার এবং প্রস্তর দ্বারা মণ্ডিত করণ। এই কার্য্যে লালাবাবুকে ন্যূনাধিক লক্ষমুদ্রা ব্যয় করিতে হইয়াছিল।

বৃন্দাবনের সম্পত্তি ক্রয় সম্বন্ধে অনেকের মুখে লালাবাবুর পবিত্র চরিত্রে কিঞ্চিৎ কলঙ্কের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি অল্প মূল্যে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন, তজ্জন্য অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, লালাবাবু চর্ব্ব্য চোষ্য, লেহ্য, পেয়, নানা উপাদানে সরলমতি ব্রজবাসী জমিদারগণের রসনার তৃপ্তি সাধন করিয়া প্রতারণা পূর্ব্বক সামান্য মূল্যে তাঁহাদের জমিদারী আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।

লালাবাবুর চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ ধারণা তাহাতে এই জনশ্রুতির উপর কিছুতেই আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না। যিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক স্বদেশের আধিপত্য রাজ সম্মান, বিষয়-ভোগ-স্পৃহা প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, যিনি সংসারের সাররত্ন প্রিয়তম শিশুপুত্রের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ন্যূনাধিক ত্রয়োদশ বর্ষকাল অনায়াসে বিদেশে জীবন যাপন করিয়াছিলেন, যিনি স্বীয় আহার্য্য অপরের উদর জ্বালা নিবারণ জন্য প্রদান করতঃ স্বয়ং পরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। সেই দেবোপম সাধু সন্ন্যাসীর চরিত্রের উপর এরূপ ভয়ানক দোষারোপ ঈর্ষাপরবশ ব্যক্তিবর্গের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। যদিও বৃন্দাবনে গমন করিয়া প্রথমতঃ লালাবাবু সম্পূর্ণরূপে সংসারত্যাগীর পরিচয় সাধারণ্যে প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, তথাপি তথায় সর্ব্বদাই যে তিনি সংসারে বীতস্পৃহ ছিলেন, এবং অবিরত মনে মনে বৈরাগ্য ভাব পোষণ করিতেন, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

এক সময়ে আলোয়ারের অধিপতি লালাবাবুর দ্বারা সবিশেষ উপকার লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্ত বহু সংখ্যক উৎকৃষ্ট ও বহুমূল্য দ্রব্যনিচয়, পরোপকারপরায়ণ ভক্ত লালাবাবুর নিকট উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেন। দ্রব্য সমূহ সন্দর্শন করিয়া লালাবাবু প্রথমতঃ সমস্তই ফেরত পাঠাইতে মনস্থ করেন, কিন্তু অবশেষে বহু চিন্তার পর পাছে আলোয়ারাধিপতি দুঃখিত হন ভাবিয়া তাঁহার সম্মান রক্ষার্থ প্রেরিত উপহারের মধ্য হইতে নিজের ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রখণ্ড এবং হীরকাঙ্গুরীয় গ্রহণ করতঃ অবশিষ্ট সমস্ত দ্রব্যই ফেরত পাঠাইয়া দেন। ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মন্দিরের বহির্দ্বারে আঘাত করিয়া দ্বাররক্ষকদিগকে জাগ্রত করিলে তাহারা ব্যস্ত সমস্তভাবে দ্বার খুলিয়া দিলে তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া একেবারে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাত্রির ভোগ যাহা বিতরিত হইয়া অবশিষ্ট ছিল, সেই সমস্ত বাহিরে আনাইয়া দেখেন যে, তাহাতে অনেকগুলি চুল। যাহাদের হাতে ভোগ প্রস্তুতের ভার ছিল তাহাদিগকে অন্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের পরিবর্ত্তে অন্যলোক রাখিয়া পুনরায় গোবর্দ্ধন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।"

কলিকাতা, ৩০/৫ মদনমিত্রের লেন, নবাভারত-প্রেসে,
শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত। ১৩১১ সাল।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৫ম খণ্ড]　　শ্রাবণ, ১৩১২　　[৮ম সংখ্যা।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ,

সম্পাদিত।

সূচী।

কীর্ণহারের সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশ হিতৈষী জমিদার শ্রীযুক্ত
বাবু সৌরেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের সম্পূর্ণ
ব্যয়ে বীরভূম জেলার অন্তর্গত
কীর্ণহার গ্রাম হইতে
শ্রীদেবিদাস ভট্টাচর্য্য বি, এ
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
২৯শে আষাঢ়—১৩১২।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ১॥০।　　এই সংখ্যার মূল্য ৵১০।

৫ম খণ্ড।] শ্রাবণ, ১৩১২ [৮ম সংখ্যা

ভারতবর্ষের প্রধানতম শত্রু কে?

'শীর্ণ শান্ত, সাধু তব পুত্রদের ধ'রে,
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে।'

রবীন্দ্রনাথ—

প্রায় এক বৎসর অতিক্রম হইল আমি ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করিয়া একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সময়ে তাহা দেশের কোনও খবরের কাগজের সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তাহা তিনি নানা কারণে প্রকাশ করিতে অসম্মত হওয়ায়, তাহা আজো আমার নিকট বর্ত্তমান রহিয়াছে। আজো আমি আমার সে সকল মতের জন্য এতটুকু ভীত বা বিচলিত হই নাই। আজো আমার বিশ্বাস আমি তাহাতে যাহা যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার সকলি সত্য।

কিন্তু এই এক বৎসরে আমার বিপুল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এখন যদিও আমি স্বীকার করি যে, ইংরাজগণকে আমাদিগের জাতীয় উন্নতির জন্য ভগবানের নিকট একদিন করযোড়ে দণ্ডায়মান হইতে হইবে, এখন যদিও আমি স্বীকার করি যে, ইংরাজগণ আমাদিগকে এক হিসাবে আমাদিগের ব্যক্তিগত শান্তি প্রদান করিয়া অন্যদিকে আমাদিগের জাতীয় শান্তি মহা নিষ্ঠুর ভাবে বিলুণ্ঠন করিতেছেন, আমি কিন্তু এখন বলি যে ভারতবাসী যদি ইংলণ্ডের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইত এবং ইংলণ্ডবাসী যদি ভারতবাসীদিগের মত স্বীয় স্বীয় দাসত্ব শৃঙ্খল স্বীয় স্বীয় আপাদ মস্তকে অনুভব করিতে না

জানিত, তবে ইংলণ্ড আমাদিগের যাহা না করিয়াছে, ভারতবাসী ইংলণ্ডের তাহার চতুর্গুণ করিত।

ইহা অতি সত্য কথা যে, ইংরাজগণ সোণার 'সভারেণের' মূল্য দশ টাকা হইতে পনর টাকায় উঠাইয়া দেওয়ায় আমাদের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। ইহা অতি সত্য কথা যে, আমাদের প্রচলিত মুদ্রা আবার নিকেলে পরিণত হইলে আমাদের অনেক ক্ষতি হইবে। ইহা অতি সত্য কথা যে, আমরা বিনা কারণে ইংলণ্ডকে প্রতি বৎসর প্রায় ১৫ মিলিয়েন পাউণ্ড দান করিয়া থাকি। ইহা অতি সত্য কথা যে, লর্ড ক্লাইব হইতে লর্ড কার্জ্জন পর্য্যন্ত সকলেই আমাদের ধন দৌলতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আসিতেছেন। ইহা অতি সত্য কথা যে, আমাদিগের জন্য ইংলণ্ডের যাহা করা উচিত ছিল, ইংলণ্ড তাহা করে নাই। কিন্তু ইহাও কি সত্য কথা নহে যে, শিক্ষিত ভারতবাসিগণের যাহা একান্ত কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে তাঁহারা এই পঞ্চাশ বৎসরের পাশ্চাত্য শিক্ষার পরেও সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন? কিন্তু ইহাও কি সত্য কথা নহে যে, কাঙ্গালিনী ভারতজননী যাঁহাদের নিকট অধিক কামনা করেন, তাঁহারাই তাঁহাকে বিবস্ত্র করিয়া বিধবার বেশে জগতের প্রমোদ কাননে কাঁদিয়া বেড়াইতে ছাড়িয়া দিয়াছেন? সকলের সিংহাসন আছে—সকলের জয়ঢাক গর্জ্জন করিতে জানে—সকলের সন্তান সন্ততি হাসিয়া আহ্লাদে আটখানা, কিন্তু আমাদের মা ভারত জননীর ৩০ কোটি পুত্র কলত্র সত্ত্বেও মা আমাদের তাঁহার পিণ্ডের জন্যও আশা রাখেন না!

বলিতে দুঃখ হয়, ভারতবর্ষে এখন সমাজ-সংস্কারক হওয়া অপেক্ষা রাজনীতি বিশারদ হওয়া সহজসাধ্য। ভারতবর্ষের এমনি দুর্দ্দশা যে, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগরের মত মহাপ্রাণকে কাঁদিয়া মরিয়া যাইতে হইয়াছে। ভারতবর্ষের এমনি দুর্দ্দশা যে, মহামতি মহাদেও গোবিন্দ রাণাডে সমগ্র জীবনে কিছুই করিতে পারেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষের এমনি দুর্দ্দশা যে, রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শ সকল ধীরে ধীরে এক এক ধাপ নামিয়া আসিয়া এখন সেই অগাধ তিমিরাচ্ছন্ন, গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় প্রায়। ভারতবর্ষের এমনি দুর্দ্দশা যে, যখনি কেহ মহাপুরুষ আসিয়া আমাদিগের অজ্ঞান অন্ধকারের সুদৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তখনি পশ্চাৎ হইতে এক দলকে ভূতের সহিত বর্ত্তমানের সমন্বয় সম্পাদনে ব্যতিব্যস্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

আমি ভারতবর্ষকে কাহারো সম্মুখে হীন বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা পাইতেছি না। কিন্তু ইহা সত্য যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ, ইতিহাস ও রাজনীতি অর্থে আমরা বর্ত্তমানে যাহা বুঝিয়া থাকি, কখনো তাহার কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। হইলেও হইতে পারে যে, তাঁহারা এই দুই জিনিষকে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিবন্ধক স্বরূপ অবধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু এই দুই জিনিষ এখন এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সম্যকরূপে হৃদয় ও আত্মগত না করিতে পারিলে এ পৃথিবীতে কোনও জাতির কেবল বাহ্যিক বর্ত্তমানতা সম্বন্ধেও আমার সন্দেহ হয়। পাশ্চাত্য জগৎ বহুদিন হইতে প্রতীচ্যের এই সংসারের প্রতি বীতরাগ—এই ব্যক্তিগত মুক্ত্যন্বেষণ, এই জড়বাদের প্রতি ঘৃণার লাভাংশটুকু অনায়াসে সুসম্ভোগ করিতেছে। পাশ্চাত্যকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্বাগ্রে না পরাজিত করিলে, পাশ্চাত্য জগৎ প্রতীচ্যের কোনও আধ্যাত্মিকতা কখনো শুনিবে না। যদি প্রতীচ্যের আধ্যাত্মিকতা সত্য, অথবা তুলনায় উৎকৃষ্ট হয় এবং যদি প্রতীচ্য তাহা নিশ্চিতরূপে অনুভব করিয়া থাকে, তবে জগতের মঙ্গলের জন্য প্রতীচ্যকে মহা সমারোহে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে আমি অনুরোধ করি।

এই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য কেবল ভারতের কেন, সমগ্র এসিয়া খণ্ডের রাজনীতি সংস্কারের পূর্ব্বে কিম্বা সঙ্গে সঙ্গে সমাজনীতি সংস্কারে হস্তক্ষেপ করা উচিত। সে হস্তক্ষেপে অধিক উত্তেজনা, অধিক আন্তরিকতা ও অধিক স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন। যে সকল দেশে এখনো মাতা ঠাকুরাণীগণ সন্তানকে বিদেশে পাঠাইয়া দিতে হইলে জগতে অন্ধকার দেখেন, যে সকল দেশে এখনো ধর্ম্মের নামে দেবমন্দিরে বেশ্যাবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন চলিতেছে, (আমেরিকার দক্ষিণাত্যের Temple girls এবং উড়িষ্যার সেবাদাসীর কথা আমি প্রথম শুনিতে পাই), যে সকল দেশে এখনো বাল্য বিবাহের স্রোত গঙ্গা যমুনার ন্যায় খরস্রোতে প্রবাহিত, সে সকল দেশে বিশ বৎসর কেন এক শত বৎসর কংগ্রেস হইলেও তাহাদের কোন আশা নাই। কংগ্রেস সে সকল দেশের উপকার করিতে পারে, কিন্তু যে উপকারে আমার মতে তাহাদের পরমার্থ লাভ, সে উপকার কংগ্রেসের বক্তৃতায় পাওয়া যাইতে পারে না। সে উপকার হৃদয়গত, মাতৃগত ও বিভিন্ন ব্যাপ্তির উচ্চাশাগত। যে সকল দেশে উচ্চাশা কেবল সুযশঃ ও সুনাম, সে সকল দেশের উন্নতি হইতে এখনো অনেক বাকী।

আমাদের কংগ্রেস আমাদের কি করিয়াছে? অনেক। কিন্তু ভারতবর্ষে এই মুহূর্ত্তেই কংগ্রেস অপেক্ষাও বৃহৎ আকারের (যদি সম্ভব হয়) একটী সমাজ সংস্কারের সমিতি থাকা একান্ত বিধেয়। মহারাজা গাইকোয়ার ও মাইসোরের মহারাজা ভারতবর্ষে এই কার্য্যে সর্ব্বাগ্রে হস্তক্ষেপ করিলে ভারতবাসী তাঁহাদের নিকট চিরঋণী থাকিবে। দুই জনেই স্বীয় স্বীয় রাজ্যে সামাজিক রীতি নীতির স্রোত যেরূপ ভাবে অল্প সময়ের মধ্যে পরিবর্ত্তিত করিতে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন, দুই জনেই যেরূপ ভাবে দেশের মঙ্গলের জন্য জীবন দান করিতে প্রস্তুত, তাহাতে মনে হয়, তাঁহারা দুই এক জন কর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি পাইলেই এ কার্য্যে কখনই পরাঙ্মুখ হইবেন না। কংগ্রেসে অনেকে কর্ম্মবীর ও ভারতের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি রহিয়াছেন, তাঁহা যে আজো কেন এ কার্য্যে নিজ নিজ হৃদয় মন উৎসর্গ করেন নাই, তাহা তাঁহারাই জানেন।

পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সময়ে ভারতবর্ষে সমাজ-সংস্কারে যে সকল প্রতিবন্ধক পর্ব্বতাকারে তাঁহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এখন সে সকল প্রতিবন্ধকের অনেকগুলিই আপনা হইতে সরিয়া পড়িয়াছে। শুধু তাহাই নহে, রুষ জাপানের যুদ্ধ ভারতবাসীর মনে অলক্ষ্যে অনেক সু-কার্য্য সুসম্পাদন করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। পৃথিবীও এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এক মহাসমুদ্রের তীরে আসিয়া দণ্ডায়মান। যাঁহারা সমগ্র পৃথি-বীতে রাজনৈতিক শান্তি স্থাপনের জন্য এত দিন চেষ্টা করিয়া আসিতে-ছিলেন, তাঁহারা আজ কোথায়? মনুষ্যসৌভাগ্যে এমন শুভদিন পূর্ব্বে আর কখনো উপস্থিত হয় নাই।

আজো যদি তাঁহারা প্রত্যেক বিভিন্ন পর্ব্বতের ধর্ম্ম ও সমাজগত কুব্জপৃষ্ঠ গুলি খসাইয়া একটু সমান না করিয়া দেন, আজো যদি প্রতীচ্য পাশ্চাত্যকে আলিঙ্গন করিতে অর্দ্ধ পথ না অগ্রসর হইয়া আসে, আজো যদি পাশ্চাত্য প্রতীচ্যকে প্রাণ খুলিয়া এক মানবজাতিসম্ভূত ভ্রাতা ভগিনী বলিয়া না সম্বোধন করে, তবে এ জগতে যে রাজনৈতিক শান্তি স্থাপনের এক দূরাগত বংশী ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা অচিরে মনুষ্যজাতির গর্ব্ব, অদূরদর্শিতা ও হিংসায় চির-বিলুপ্ত হইবে। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে রাজনৈতিক শান্তি স্থাপন কেবল তখনি সম্ভব, যখন এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক বিভিন্ন জাতি তাহাদের ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ যাহা প্রাপ্য, তাহা প্রাপ্ত হইবে। যতদিন

তাহাদিগকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য দেওয়া না হইতেছে, ততদিন তাহারা তাহা কাড়িয়া লইতে ইচ্ছা করিবে। এবং কাড়িয়া লইবার জন্য একটা জাতিকে প্রস্তুত করাইলে, তাহাদিগকে তোমাকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যেই ভারতের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমার মতে লর্ড কার্জ্জনের মত আরো তিন চারি জন বড় লাটকে আর ১৫।১৬ বৎসরের মত ভারতবর্ষ শাসন করিতে পাঠাইয়া দেওয়া হইলে ভারতবর্ষের দীনতার অবসান, আমরা আমাদের জীবনেই দেখিতে পাইব। কংগ্রেস যতই করুক, আমার বিশ্বাস ইংলণ্ড ভারতবর্ষের উপর কৃপাদৃষ্টি না নিক্ষেপ করিয়া ক্রমে রক্তচক্ষু কটাক্ষপাতই করিবে। ক্যানেডা আমেরিকার আধিপত্যে, যেমন গাছ হইতে ফল পাকিলে খসিয়া পড়ে, শীঘ্রই ঠিক সেইরূপ হইবে। অষ্ট্রেলিয়ার অদূরেও আমেরিকার আবির্ভাব কিছুদিন পূর্ব্বে দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়রগণ ওলন্দাজ জাতি। ইংলণ্ডেও বহুদিনের বড় লোকীতে আর সে নম্রতা, সরলতা পরিলক্ষিত হয় না। শুধু তাহাই নহে, এ জগতে গত এক শতাব্দীতে অনেকগুলি মহাপ্রাণকে অকারণে বিনষ্ট করা হইয়াছে। কোরিয়ার সম্রাট, ব্যাভেরিয়ার রাজা ও রাণী, রুষের জার, ফ্রান্সের সভাপতি ও মার্কিনের প্রেসিডেণ্টদ্বয় বিনা কারণে অকালে জীবনলীলা সম্বরণ করেন। বিনা কারণেই বা বলি কেন, পাশ্চাত্য জগতে এক নূতন আদর্শের প্রভাব চারিদিকে ইতিমধ্যেই পরিলক্ষিত হইতেছে। অন্য দিকে সুয়েজ ক্যানেল ভারতবর্ষকে পাশ্চাত্যের বুকের উপর টানিয়া আনিয়াছে। জাপান মাত্র ৫০ বৎসরে তাহার চন্দন-চর্চ্চিত গৌরবান্বিত মস্তক উত্তোলন করায় ভারতবাসীর পক্ষে কম সৌভাগ্যের বিষয় সংঘটিত হয় নাই। মার্কুইস্ ইটো যখন টকিয়োতে প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সংস্থাপন করেন, তখন তিনি তাহা সকল প্রতীচ্য জাতির জন্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার লিখিত প্রবন্ধসমূহে তাহা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিতে কখনও এতটুকুও দ্বিধা বোধ করেন না। আমেরিকাও তাহার উন্নত প্রাঞ্জল রাজনীতি লইয়া ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে বর্ত্তমান। ভারত গবর্ণমেণ্টও নিজ কার্য্য সমাধান মানসে ভারতবর্ষ হইতে আফ্গানিস্থানে একটী রেলওয়ে সংস্থাপন করিতে যত্নবান হইয়াছেন। ইংলণ্ডও ইতিমধ্যে রুষ জাপানের যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই ভারতবর্ষে যুদ্ধ জাহাজ

প্রস্তুতের জন্য ডকইয়ার্ড নির্ম্মাণ আবশ্যক মনে করিতেছে। কেবল তাহাই নহে, এখানে কাহারো কাহারো মত এই যে, ভারতবাসীকে যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দেওয়া হউক।

তাই বলিতেছিলাম, আমাদের সুপ্রভাত সন্নিকট। এই সুপ্রভাতের জন্য যেমন জাপান চিরদিন পাশ্চাত্যের নিকট চিরঋণী থাকিবে, সেইরূপ আমরাও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ইংলণ্ডের নিকট চিরবাধ্য রহিতে কখনো ভুলিব না। আমরা এখন যাহাই কেন বলি না, পৃথিবীর ঐতিহাসিকগণ আমাদের এই অভিনব পরিবর্ত্তনের মূল কারণ কি, তাহা তলাইয়া দেখিবে। এই সময় আমাদের যে সকল সামাজিক ও ধর্ম্ম কঠিনতা এখনো বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার সংস্কার মানসে প্রত্যেক শিক্ষিত জয়মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর মনোনিবেশ করা একান্ত কর্ত্তব্য। নহিলে আমার এক বন্ধু যেমন একদিন বলিয়াছিলেন, I would rather be a traitor to my country than to see humanity disgraced in this way, অনেকেই তাহাই বলিবে।

ইংরাজ ভারতবর্ষের প্রধান শত্রু নহে এবং তাঁহারা কখনো ভারতবর্ষের শত্রুও ছিলেন না। ভারতবর্ষ তাঁহারা কখনো জয় করেন নাই, আমরাই আমাদের ভারতবর্ষকে তাঁহাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছি। ভারতবর্ষ শাসনের জন্য ইংরাজ অধীনে যত দিন ভারত সৈন্য মিলিবে, তদ্দিন ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আর্থিক উন্নতি কেবল কল্পনার বস্তু। সত্য কথা বলিতে গেলে ইংরাজ ভারতের অনেক করিয়াছেন। আজ আমি যে এই সকল কথা লিখিতেছি, ইহা ইংরাজগণের কৃপায়। রাজা রামমোহন রায়ের মত যে মহাত্মাপুরুষ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও ইংরাজগণের লুক্কাইত হস্ত দৃষ্টিগোচর হয়। আমরা, আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজই আমাদের প্রধানতম শত্রু। যতদিন দেশের গ্রামে গ্রামে সমাজ সংস্কারের জন্য সভা-সমিতি না বসিয়াছে—যতদিন দেশের প্রত্যেক বিভিন্ন গ্রাম হইতে সমাজ-সংস্কারের জন্য কোনও বড় মহাসমিতিতে প্রতিনিধি প্রেরণ করা না হই-তেছে, ততদিন ভারতবর্ষের কোনও কথা যেন কেহ আমাকে না বলেন! যতদিন ভারতবাসী সমাজসংস্কার তাহার, সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য কর্ম্ম, একথা বুঝিয়াও নির্ব্বিঘ্নে সে কথা ভুলিয়া থাকিতে পারিবে—যতদিন বালিকা পত্নীর সহিত পুতুলের মত দিন যাপন করিয়া কেবল অদৃষ্টকে দোষ দিবে—যতদিন ভারবাসী তাহার দর্শন শাস্ত্র কথায় কথায় আওড়াইবে 'তুমিও ঠিক

নহে আমিও ঠিক নহি,' ততদিন অদৃষ্ট—অদৃষ্টবা বলি কেন, আমাদের কর্ম্ম-ভোগ পরাধীনতা, দারিদ্র্য, কাপুরুষতা, লাম্পট্য সমভাবে বর্ত্তমান থাকিবে।

ভারতবর্ষের হিন্দুধর্ম্মসমষ্টির সারাংশটুকু ইংরাজী একটী কথায় প্রকাশিত হয়। সে কথাটী 'Self-effacement' তুমি তোমার অস্তিত্বকে এ জগতের চক্ষে একবারে মুছিয়া ফেল—ভগবানপ্রদত্ত তোমার ইন্দ্রিয় সমূহকে তুমি নগ্ন, পঙ্গু হইয়া যাইতে দাও—তুমি তোমার প্রবৃত্তিগুলিকে অষাড় কাষ্ঠবৎ করিতে চেষ্টা কর, ইহাই আমাদের ধর্ম্ম। কে এ ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিল, জানি না, কিন্তু বাল্যকাল হইতেই 'এটা করিওনা' 'ওটা করিওনা' এইরূপে শিক্ষিত হইয়াছি। মানুষ মানুষ,সে তাহার নিজের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থের জন্য ভালমন্দ আপনিই স্থির করিয়া লইবে। তাহাকে তোমার নিগূঢ় বন্ধনে একটা কায়াময় কিন্তু ব্যক্তিত্বশূন্য প্রাণীমাত্রে পরিণত কর কেন? যদি সে পড়িয়া যায় যাউক, যে কখনো না পড়িয়াছে সে কখনো উঠিতে জানে না।

'Self-effacement' যদি সমগ্র জগতের ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে আজ স্থলচর মানুষ শুধু উভচর নহে, ব্রহ্মাণ্ডচর হইয়া ঈশ্বর মহিমার গুণকীর্ত্তন করিতনা। আজ যে এই জলে জাহাজ চলিতেছে এবং শূন্যে বেলুন উঠিতেছে, তাহার অস্তিত্ব আমাদের কল্পনায়ও উপলব্ধি করা অসম্ভব হইত। মানুষ ভগবানপ্রদত্ত ইন্দ্রিয় সমূহের উন্নতি সাধনে যত্নবান হওয়ায় মানুষ এতদূর গিয়াছে যে,তাহারা হয় তো একদিন বিলাতে বসিয়া ভারতবাসী চলিয়া বেড়াইতেছে দেখিতে পাইবে। শুধু তাহাই নহে, বিজ্ঞান এতদূর গিয়াছে যে, একদিন লণ্ডন সহরে বসিয়া ভারতস্থিত বন্ধুর করমর্দ্দন সম্ভব হইতে পারে। কণ্ঠস্বর তো ইতিমধ্যে শত শত মাইল পরিভ্রমণ করিতেছে। যদি হ[illegible]ত তাহার ম[illegible]ল [illegible] [illegible]কে মুছিয়া ফেলিত, তবে জগতের এই উন্নতি হইত কেমন করিয়া?

তুমি যদি তো[illegible]কেই মুছিয়া ফেলিলে, তবে তুমি তোমার কোন্ মাপ-কাটী দিয়া অন্যকে বুঝি[illegible]? যদি নিজে কখনো নির্জন গৃহে বুকে হাত দিয়া উদ্ধনেত্রে নয়[illegible]শ্রু নিপাত করিতে পারিয়াছ, তবে তুমি অন্যের ক্রন্দন মোল উপলব্ধি করিতে পার। যদি নারী জাতির প্রতি তোমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মিয়া থাকে, ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, একজন নারীর অতুলনীয় চরিত্র তোমাকে সমগ্র নারী জাতিকে শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা দিয়াছে,

ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, তুমি কেবল একজন মাতার দ্বারা ভগবানের মাতৃত্ব অনুভব করিতে পার। তবে এ আত্মোচ্ছেদ কেন?

প্রকৃতি দেবীর ব্যক্তিত্ব যদি আজ কোনও প্রকারে নির্ম্মূল করিয়া দিতে পারা যাইত, তাহা হইলে এ পৃথিবীতে আজ আর কোন গাছ থাকিত না। তাহা হইলে জগতের বিভিন্ন কাননে আর কখনো কোন কোকিল কোন গান গাহিত না, এ জগতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, গৌরব, মধুরিমা সকলি বিনষ্ট হইয়া এ জগত্ এক মহা মরুভূমিতে পরিণত হইত। যেমন গোলাপ বাগানে গোলাপ গাছ বাড়িলে বাগানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়—যেমন একটা ঘোড়া বড় হইয়া বেশ মোটা যোটা হইলে আমাদের চক্ষু পরিতৃপ্তি লাভ করে, ঠিক সেইরূপ মানুষ যদি তাহার ব্যক্তিত্ব না মুছিয়া তাহার উৎকট সাধনে যত্নবান হয়, তবে সে ভগবানের প্রিয় পুত্র। তাই বলি, 'Self-effacement' প্রকৃত ধর্ম্ম নহে, 'Self-fulfilment' প্রকৃত ধর্ম্ম। 'Self-effacement এর সহিত 'Self-denial' এর আকাশ পাতাল প্রভেদ, এবং 'Self-denial' বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের ধর্ম্ম নহে।

মনে পড়ে, অনেক দিন পূর্ব্বে একবার কেম্ব্রিজে যেন কোন বন্ধু ভারতবর্ষের এই ধর্ম্মের একটা মীমাংসা হওয়া আবশ্যক বলিয়া মত প্রদান করিয়াছিলেন। সত্যই ভারতের ধর্ম্ম ও সমাজ পদ্ধতির শীঘ্রই একটা মীমাংসা না হইলে ভারতের ভবিষ্যত ভয়ানক অন্ধকারে পরিপূর্ণ। ভগবান করুণ শিক্ষিত ভারতবাসীর শীঘ্রই মতিগতি ফিরিবে—দেশাচার ও লোকাচারের ভয় কাটিবে এবং তাঁহারা নিজ-স্বার্থ ভুলিয়া অথবা নিজ-স্বার্থ ভাল করিয়া বুঝিয়া এ জগতে আপনাদের দেশের এবং আপনাদের একটা চিরস্থায়ী কিছু করিয়া যাইতে চেষ্টা পাইবেন। ভারতের প্রধানতম শত্রু ভারতের সমাজ ও ধর্ম্ম, এ কথা এখনো স্বীকার না করিলে আমাদের উদ্ধার নাই। British honestyতে আমি কখনো বিশ্বাস করিয়াছিলাম বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু British politics এ আমি বিশ্বাস করি। এ পৃথিবীতে এখনো সে সময় উপস্থিত হয় নাই, যখন Politics অর্থে লোকে Honesty বুঝিবে। আমরা যদি প্রাণ দিয়া আমাদের দেশের মঙ্গল সাধন করিতে প্রস্তুত হই, ইংরাজগণ এখনি আমাদিগের কথা না শুনিয়া থাকিতে পারিবে না। *

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমল। লণ্ডন

* এ প্রবন্ধ সম্বন্ধে যদি কাহারও কিছু বক্তব্য থাকে, আমরা সাদরে তাহা প্রকাশ করিব। দেশহিতকর বিষয়ের যত আলোচনা হয়, ততই ভাল। বীরভূমি-সম্পাদক।

ইংরাজ রাজত্বে ভারতীয় মহাত্মাদিগের বিষয়। (১)

রাজা সার টাঞ্জোর মাধবরাও, কে, সি, এস, আই।

ষোড়শ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের কর্তৃক টাঞ্জোর অধিকৃত হইলে, কতিপয় মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ পরিবার তথায় আসিয়া বাস করেন। সার টাঞ্জোর মাধবরাও উক্ত ব্রাহ্মণ পরিবারদিগের এক জনের বংশসম্ভূত। তিনি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে কুম্ভকোনম্ নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আর, রঙ্গরাও এবং তদ্ভ্রাতা আর,ভেঙ্কটরাও বহুকাল ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তত্রস্থ প্রেসিডেন্সী হাই স্কুলের মিঃ ই, বি, পাউয়েলের অধীনে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করেন। তিনি শ্রেণীমধ্যে একজন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম শ্রেণীর উপযুক্ত ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হয়েন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি ঐ স্কুলেই অস্থায়ী-ভাবে অধ্যাপক পাউয়েলের পদে গণিত এবং প্রাকৃতিক দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এ সম্মান বড় কম নহে।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের আপিসে প্রবেশ করেন এবং ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাস পর্য্যন্ত তথায় কার্য্য করিয়াছিলেন। ত্রিবাঙ্কুরাধিপতি তাঁহার ভ্রাতৃষ্পুত্রদিগকে বিদ্যা শিখাইবার জন্য মাধবরাওকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মাধবরাও উক্ত শিক্ষকতা কার্য্য এরূপ দক্ষতা ও ক্ষমতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন যে, ত্রিবাঙ্কুরাধিপতি সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে স্বীয় রাজ্যের সরকারী কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে সামান্য পেস্কারের কার্য্য হইতে দেওয়ানের পদে উন্নীত হয়েন এবং বিশেষ যোগ্যতার সহিত চৌদ্দ বৎসর কাল ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য প্রকৃত প্রস্তাবে সার মাধবরাওয়ের হস্তে ছিল। তিনি তৎকালে রাজ্যমধ্যে যে সমস্ত সংস্কার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহাকে একজন বিশেষ পারদর্শী এবং কৃতকর্ম্মা রাজকর্ম্মচারী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনি রপ্তানি ও আম-

দানি দ্রব্যের উপর উচ্চ শুল্ক হ্রাস করিয়া ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সাধারণ বাণিজ্যা-বস্থা অনেক পরিমাণে সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। সরকারী কর সম্বন্ধে সুনিয়ম করিয়া তিনি বিলক্ষণ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। চিরন্তন দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারপ্রথা সংশোধিত করিয়াছিলেন। তিনি সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার উৎকৃষ্ট প্রণালী প্রচলিত করিয়াছিলেন; পীড়িত প্রজাদিগের ঔষধের অভাব দূরীকরণ জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; এবং পূর্ত্তবিভাগে অনেক নূতন নূতন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। যদিও উপরোক্ত কার্য্য সকল রাজ্যের ব্যয় বর্দ্ধিত করিয়াছিল, তথাপি রাজ্যের বাৎসরিক আয় হইতে খরচ খরচা বাদ অনেক টাকা উদ্বৃত্ত হইত। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রেল তারিখে দেওয়ান মাধব-রাওকে ইন্‌সিগ্‌নীয়া অব এ নাইট কম্যাণ্ডার অব্ দি মোষ্ট একজল্‌টেড্ অর্ডার অব্ দি ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সার মাধবরাও মাসিক ৫০০্ পাঁচ শত টাকা পেন্‌সনে ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ানের পদ পরিত্যাগ করিয়া অবসর লয়েন। সেই বৎসরের মার্চ্চ মাসে যখন মান্দ্রাজ-শাসনকর্ত্তা লর্ড নেপিয়র অস্থায়িভাবে রাজপ্রতি-নিধির পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন তিনি সার মাধবরাওকে তাঁহার ব্যবস্থাপক সভায় আসন গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। মান্দ্রা-জের গবর্ণর সার এ, জে, আরবথনট ও তাঁহাকে এই সম্বন্ধে বিস্তর অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কোন বিশেষ গূঢ় কারণ প্রযুক্ত উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই।

সার মাধবরাওয়ের নাম ও সুখ্যাতি ভারতের সর্ব্বত্র এতদূর প্রচারিত হইয়াছিল যে, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার উচ্চ চরিত্রবল এবং অসাধারণ ক্ষমতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। ইন্দোরের মহারাজার প্রধান মন্ত্রীর পদ শূন্য হইলে, গবর্ণমেণ্ট সার মাধবরাওকে উহা গ্রহণ করিবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করেন। যুবক সার মাধবরাও উচ্চাভিলাষী এবং উদ্যমশীল থাকায় ঐ পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ইন্দোরে তিন বৎসরকাল অব-স্থিতি করিয়াছিলেন। রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে তাঁহার সংস্কারক কর-চিহ্ন স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। সেই সময়ে রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধে গায়কোয়ারকে রাজ্যচ্যুত করা হইয়াছিল। লর্ড নর্থব্রুক বর্ত্তমান শাসন-কর্ত্তাকে তাঁহার পদে অভিষিক্ত করিয়া একজন উপযুক্ত দেশীয় রাজনীতিজ্ঞ

পুরুষের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এমন সময়ে সার টি মাধবরাও তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িলেন। লর্ড নর্থব্রুক তাঁহাকে বরদার শাসনভার গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বরদা-রাজ্য মাধবরাওয়ের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে ছিল। এই আট বৎসরের মধ্যে তিনি তাঁহার উদ্ভাবনশীল ক্ষমতা, স্বাধীনতা, মনের তেজস্বিতা এবং কার্য্যপটুতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। এমন কি, ভারতে বৃটীশ রাজ্যের সংস্থাপন হইতে আজ পর্য্যন্ত এরূপ ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞ দৃষ্টিগোচর হয় নাই, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

মাধরাও বরদারাজ্যের কত দূর উন্নতি ও মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন, তাহা তিনি যে অবস্থায় বরদা রাজ্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে অবস্থায় উহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এই উভয় অবস্থার তুলনা করিলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে এরূপ সংস্কার কার্য্য-প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল যে, ঐ সকল বিভাগ যেন নূতন সংগঠিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। গায়কোয়ার এবং তাঁহার অধীনস্থ প্রধানদিগের মধ্যে যে সমস্ত জটিল বিবাদ থাকিয়া রাজ্যের সুশৃঙ্খলতা এবং শান্তি নষ্ট করিতেছিল, মাধবরাও ঐ সমস্ত বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছিলেন। এই অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি ক্রমান্বয়ে ত্রিবাঙ্কুর, ইন্দোর, এবং বরদারাজ্যের কর্ণধার হইয়া প্রবল ঝটিকাময় এবং অন্ধকারপূর্ণ দুর্দ্দিনের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে চালাইয়াছেন—ইহা বড় কম ক্ষমতার কথা নহে। উপরোক্ত তিনটী রাজ্যে তিনি তাঁহার জীবনের উৎকৃষ্ট ২৫ বৎসর কাল ব্যয় করিয়াছিলেন। ইংরাজ ব্যবস্থা এবং ইংরাজ রাজ্য প্রণালীর পক্ষপাতী থাকিয়া ভারতে কিরূপে সংস্কার কার্য্য প্রবর্ত্তিত করিলে উহার মঙ্গল হইবে, তাহা তিনি উত্তম-রূপে জানিতেন ও বুঝিতেন। তিনি বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিয়া রাজস্ব বিভাগের এরূপ মঙ্গল করিয়াছিলেন যে ইংলণ্ডবাসী মহাত্মা ফসেট সাহেব তাঁহাকে ভারতীয় টরগট্ (Torgot of India) নামে অভিহিত করিয়া-ছিলেন। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে অত্যুচ্চ সম্মানের দ্বারা ভূষিত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তিনি বরদারাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত মান্দ্রাজে অবাস্থিতি করিয়াছিলেন।

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

বৈজ্ঞানিকের ভুল নহে

অজ্ঞতা ও অপূর্ণতা।

প্রাণ কি পদার্থ, এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কোন সঠিক তত্ত্বে উপনীত হইতে পারেন নাই। ক্রমশঃই জড়বিজ্ঞান অগ্রসর হইয়া অগ্রগামী হিন্দু-দর্শনের সহিত সম্মিলিত হইতে চেষ্টা করিতেছেন। এ চেষ্টা ইচ্ছাপূর্ব্বক নহে। বিজ্ঞান হতাশ হইয়া নিজের দুর্ব্বলতা ঘোষণা করিতেছেন। হিন্দু-দর্শন (যেমন বেদান্তদর্শন) প্রাণ-তত্ত্বের ও প্রকৃতি-তত্ত্বের অন্তরালে নিহিত গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য যে দিব্যচক্ষু প্রদান করিয়াছেন, তাহা পূর্ণপ্রজ্ঞ বলিয়াই বিশ্বাস হয়।

টীণ্ডাল সাহেব (Tyndall) একদিন ঘোষণা করিয়াছিলেন—"In matter he saw the promise and potency of every form of life —তিনি জড় পদার্থের অভ্যন্তরেই প্রত্যেক বিধ জীবনের উদ্ভবনের সম্ভাবনা ও শক্তি অবলোকন করিয়াছেন।" অর্থাৎ তাঁহার মতে জড়পদার্থই আদি, তাহা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে। সার্ ক্রুক্‌স্ (Sir William Crookes) টীণ্ডাল সাহেবেরই পরবর্ত্তী, তিনি অনেক চিন্তা ও গবেষণার পর বলিতে বাধ্য হইলেন—In life I see the promise and potency of all form of matter—আমি প্রাণ-তত্ত্বের মধ্যেই সর্ব্ব প্রকার জড়পদার্থের জনকত্ব শক্তি দেখিতে পাইতেছি।

বেইন্ সাহেবের মনোবিজ্ঞান কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি, এ, ও এম, এ, পরীক্ষার্থীদিগের পাঠ্য ছিল। তাঁহার মতে—Thought is produced by the brain—মস্তিষ্ক হইতে চিন্তা প্রসূত হয়। মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আঘাত করিলে হাস্য, ক্রন্দন প্রভৃতি বিভিন্ন অনুভূতির কার্য্য প্রকাশিত হয়। মস্তিষ্ক না থাকিলে কোন চিন্তা জন্মিতে পারে না।

কিন্তু এখন অধিকাংশ বিজ্ঞানবিদের মতই এই যে—Brain has been formed under the vibrations of intelligence, because it is a fundamental principle that always the organ comes after the

function, and through the organ the function expresses itself more and perfectly. অগ্রে দর্শন শক্তি, ঘ্রাণ গ্রহণের শক্তি, চিন্তা শক্তি জীবের সঞ্জাত হয়, তৎপরে সেই সেই কার্য্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিবার উপযুক্ত ইন্দ্রিয়বর্গ, যথা, চক্ষু, কর্ণ, মস্তিষ্ক বিকাশিত হয়। যে জন্তুর যে শক্তি নাই, তাহার সেই শক্তি গ্রহণের বা পরিচালনের ইন্দ্রিয়ও নাই। অথবা ইন্দ্রিয় কর্ম্মক্ষম নাই।

সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে (Encyclopædia Britannica) একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ প্রাণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—A mass of living protoplasm is simply a molecular machine of great complexity, the total results of the working of which, or its vital phenomena, depend, on the one hand, upon its construction, and on the other, upon the energy supplied to it; and to speak of vitality as any thing but the name of a series of operations is as if any one should talk of the 'horologity' of a clock.

এক পুঞ্জ জীবিত প্রোটোপ্লাজম্, কেবল একটি অতি ক্ষুদ্র, অতি জটিল যন্ত্র বিশেষ। এই যন্ত্রের কার্য্য সমষ্টি, অথবা, ইহার প্রাণ ক্রিয়া, একদিকে ইহার নির্ম্মাণ কৌশলের উপর, অন্য দিকে বাহির হইতে প্রাপ্ত শক্তির উপর নির্ভর করে। প্রাণ শক্তিকে কতকগুলি ক্রমিক কার্য্য সমষ্টির অতিরিক্ত কিছু বলাও যে কথা, আর, একটি ঘটিকা যন্ত্রকে সময় নিরূপক বিজ্ঞান বিশেষ বলাও সেই কথা, অর্থাৎ উভয়ই তুল্য মূর্খতা।

উল্লিখিত উক্তির ভাবার্থ এইরূপ :—কোন ঘটিকা যন্ত্রকে দেখিয়া তুমি যদি এই যন্ত্রের চলন শক্তিকে, ইহার সর্ব্ব অবয়বের নির্ম্মাণ ও কার্য্যের অতিরিক্ত কিছু মনে কর, তাহা হইলে তোমার অজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে। প্রাণ শক্তি ও অন্য কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব ও পদার্থ নহে। ইহা জড়পদার্থরূপী একটী কল বা যন্ত্র বিশেষ; ইহাতে একটির পর একটি করিয়া অনবরত ঐ কলের কার্য্য চলিতেছে মাত্র। প্রোটোপ্লাজমের ক্রমিক পরিবর্ত্তনেই (আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে প্রোটোপ্লাজম্ যুগপৎ বৃদ্ধিশীল ও ক্ষয়শীল) এই জীবন ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। জীবন ব্যাপার একটি যন্ত্রের যান্ত্রিক কার্য্যমাত্র।

উক্ত মত বিঘোষিত হইবার পর ডাক্তার জাপ (Dr. Japp, President of the Chemical Section of British Association) বলিয়াছেন :— "The operator exercises a guiding power which is akin, in its results, to that of the living organism. Every purely mechanical explanation of the phenomenon must necessarily fail. I see no escape from the conclusion that at the moment when life first arose a directive force came into play a force precisely of the same character as that which enables the intelligent operation, by the exercise of his will, to select one crystallised enantiomorph and reject its asymmetric opposite."

ডাক্তার জাপ্ নানা প্রকার পরীক্ষা দ্বারা দেখাইলেন যে জীবন শক্তির কার্য্য ও কোন কর্ম্মীর কার্য্য একই রূপ। কর্ম্মীকে কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে, সেই কার্য্য সম্পাদনের অভিসন্ধি, জ্ঞান, ও নির্দ্দিষ্ট ফল লাভের ইচ্ছা লইয়া কার্য্য করিতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জীবন উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই পরিচালক বুদ্ধি ও জ্ঞান উদ্ভূত হইতেছে, অন্ধ শক্তির কার্য্য দ্বারা এইরূপ অভিসন্ধি মূলক, জ্ঞানমূলক, ইচ্ছামূলক কার্য্য সম্ভবে না। বুদ্ধিমান্ কর্ম্মী বা শিল্পী যেমন এক উপকরণ অগ্রাহ্য করিয়া তৎস্থলে অন্য উপকরণ দ্বারা স্বকর্ম্ম সাধন করে, জীবন ব্যাপারে, প্রাণ ক্রিয়াতেও তাহাই দৃষ্ট হয়।

বেদান্ত দর্শনও এই কথাই বলেন। আদিতে এক মাত্র সৎ (অস্তিত্ব বা প্রাণ) ছিলেন, একমাত্র চিৎ (বুদ্ধি) ছিলেন, একমাত্র আনন্দ (সুখ দুঃখ অনুভবের শক্তি) ছিলেন, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় পুরুষ ছিলেন। তাঁহার অসীম প্রাণ বিকাশিত হইয়াই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডকে প্রাণিত করিয়াছেন। সেই প্রাণ বুদ্ধিশক্তি (intelligence) ও আনন্দ (Bliss) সম্পন্ন। সৃষ্টি প্রক্রিয়াতে আনন্দ শক্তিরও কার্য্য আছে। মিলন (Harmony) ও অমিল (discordance) না হইলে "ভাঙ্গা গড়া" চলে না।

ডারবিন্ (Darwin) সাহেবের মত এই যে ইতর প্রাণী, যেমন, এক প্রকার অর্দ্ধেক বানর ও অর্দ্ধেক মানবাকৃতি পশু হইতে মনুষ্য ক্রমবিকাশ

প্রণালীর নিয়ম অনুসারে সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তিনি বানর ও মনুষ্যের মধ্যের 'গাঁত হারাইয়া' ফেলিয়াছেন, তিনি Missing link আক্কারা (আবিষ্কার) করিতে পারেন নাই। মহাত্মা হার্ব্বাট স্পেন্সার সাহেবও বলিয়াছেন—ক্রমবিকাশ প্রণালীই জীবন তত্ত্বের মূলভিত্তি। ঈশ্বর প্রতি মুহূর্ত্তে জননীর উদরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া জীবের কর্ণ ও নাসিকারন্ধ্রের ভিতর ফুৎকার দিয়া প্রাণ সঞ্চালন করিতেছেন, এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে। অনেক নব্যশিক্ষিত হিন্দু যুবকও বলিয়া থাকেন, যখন ব্রহ্মাণ্ড জলমগ্ন ছিল তখন ভগবান্ মৎস্যাবতার; যখন কর্দ্দমময় ছিল তখন কূর্ম্মাবতার, পরে বরাহবতার, পরে অর্দ্ধেক পশু ও অর্দ্ধেক মানুষ নরসিংহ অবতার, তৎপর সম্পূর্ণ মনুষ্যাবতার হইয়াছিলেন, অতএব অন্যান্য সৃষ্টির পর মানব সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং ক্রমবিকাশের প্রণালী অনুসারে ইতর প্রাণী হইতে মানব জন্মিয়াছে।

উল্লিখিত সমস্ত উক্তির মধ্যেই আংশিক সত্য গূঢ়াকারে নিবদ্ধ আছে। বাস্তবিকও মানব জীব সৃষ্টির বহু পরে সৃষ্ট হইয়াছে, এবং ক্রমবিকাশের নিয়ম অনুসারেই সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সেই ক্রমবিকাশ ইতরপ্রাণীর ক্রমবিকাশ নহে। ইতর প্রাণীর দেহ যে জড় পদার্থের দ্বারা গঠিত হইয়াছে, সেই জড় পদার্থের ক্রমোন্নতি ও বিকাশের দ্বারা মানব দেহ গঠনের উপযোগী সম্পূর্ণ নূতন পদার্থ বিকাশিত হইয়া মানবদেহ গঠিত হইয়াছে। ইহার নাম (Evolution of forms) ইতর প্রাণীর দেহাভ্যন্তরে যে প্রাণ কার্য্য করিতেছে, সেই প্রাণের উৎস যিনি, যাঁহাকে ঈশ্বর বলা যায়, তাঁহার ক্রমপরিণতি দ্বারা মানব প্রাণ গঠিত হইয়াছে। ইতর প্রাণীর ও মানব প্রাণের পার্থক্য এই যে, মানবে সৎ চিৎ আনন্দের অংশ আছে, ভগবানের আকৃতির অনুরূপ প্রতিকৃতি বা প্রতিবিম্ব মানব। মানবের দেহ স্থূলজগতে, পৃথ্বীলোকে, জড় পদার্থের পূর্ণ বিকাশ এবং মানবের জীবন পৃথ্বীলোকে ঈশ্বরের প্রাণ শক্তির প্রায় পূর্ণ বিকাশ। আমি প্রায় পূর্ণ বিকাশ বলিলাম, ইহার কারণ এই যে, তত্ত্ববাদিগণের মতে পৃথ্বীলোকে সপ্ত প্রকার মনুষ্যজাতি (seven races) ও এক এক জাতির অধীন সপ্ত প্রকার উপজাতি (sub-race) বিকাশ প্রাপ্ত হইলেই মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হইবে, তাহা হইলে পৃথ্বীলোকের যাবতীয় পদার্থ সূক্ষ্ম মহাভূতে পরিণত হইয়া (disintegrate) স্থূল জগতের বা ভূর্লোকের ধ্বংস সাধিত হইয়া তদূর্দ্ধে ভুবর্লোকের, অপঃ

প্রধান লোকের (যে লোকের ক্ষিতিই অপ্, অর্থাৎ অপ তুল্য সূক্ষ্ম, অপ তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর, তেজ তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর, মরুৎ তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর, ব্যোম তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর) নিম্নস্তর হইতে নূতন জীবের বিকাশ আরম্ভ হইবে, তদনন্তর উর্দ্ধোর্দ্ধলোকে উন্নতোন্নত লোকের জীবের বিকাশ হইবে। আমরা এক্ষণে পঞ্চম জাতীয় মনুষ্যের মধ্যে পঞ্চম উপজাতীয়। ইহার পরে ষষ্ঠ উপজাতি মনুষ্য উত্তর আমেরিকায় এবং সপ্তম উপজাতি মনুষ্য দক্ষিণ আমেরিকায় প্রাদুর্ভূত হইবে। আমরা সপ্ত ভুবনের মধ্যে স্থূল মস্তিষ্ক লইয়া ও স্থূল পদার্থের জ্ঞানলাভসমর্থ ইন্দ্রিয়বর্গ লইয়া স্থূল ভুবন পৃথ্বীলোকে বিরাজ করিতেছি। ইহার উর্দ্ধে আরও ছয়টি ভুবন আছে—অবশ্য ওতঃপ্রোতভাবে (interpenetrating and intermingling) আছে, কিন্তু তাহা আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। কারণ, সূক্ষ্ম না হইলে কে সূক্ষ্মকে জানিতে পারে? ঈশ্বর না হইয়া কে ঈশ্বরকে জানিতে পারে? No man could be wise until he was pure, for how should impure eyes behold the Pure?" বেদান্ত দর্শনের প্রথমেই আছে "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" এস্থানে "অথ" শব্দের অর্থও ঈশ্বর তুল্য পবিত্র হওয়া। (যুগধর্ম্ম ৪১ পৃষ্ঠা)। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের ন্যায় স্থূলবুদ্ধি লোকের আবিষ্কৃত স্থূল পদার্থের তত্ত্ব প্রতিপদে অপূর্ণতা ও অজ্ঞতা পরিপূর্ণ হইবেই হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা যেন কেহ মনে না করেন যে, বিজ্ঞানের অনুসন্ধান প্রণালী বা আবিষ্ক্রিয়া ভুল।

উপরে শরীর ও প্রাণের কথা বলা হইতেছিল। সব প্রকারের শরীর বা পদার্থ সব প্রকার প্রাণশক্তি ধারণ করিতে পারে না, শক্তি অত্যধিক হইলে আকার ভগ্ন ও ধ্বংশ হয়। বাহিরের শক্তি তরঙ্গ বা স্পন্দন (vibrations.) গ্রহণ করিলে বোধ হয় ও অনুভূতি জন্মে। সমস্ত প্রকারের পদার্থ নির্ম্মিত ত্বক্, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সর্ব্ব প্রকারের স্পন্দন গ্রহণ করিতে পারে না। মনুষ্যের মধ্যেও দেখা যায়, সকলের কর্ণ (musical ear) নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্ সমান শক্তিশালী নহে। মনুষ্য দেহ ও জড়পদার্থে গঠিত বটে, কিন্তু ইহা অত্যুচ্চ বিকাশ প্রাপ্ত জড়পদার্থ। মনুষ্য সব প্রকার জল বায়ুতে প্রাণ রক্ষা করিতে পারে, কিন্তু উদ্ভিদ্ বা ইতর প্রাণী তাহা পারে না। মনুষ্যদেহযন্ত্র অতীব জটিল ও কৌশলময়। মনুষ্যাপেক্ষা উচ্চতর জীবের "অপ্রাকৃত দেহ মন। মনুষ্য দেহ ধূলিময় বটে, কিন্তু সে

ধূলি "ব্রজের ধূলি।" যাঁহারা শরীরকে আত্মার যান বা বাহন বলিয়া তুচ্ছ করেন, তাঁহাদের মহা ভুল। দেহ উত্তমরূপে বিকাশ প্রাপ্ত না হইলে দেহের সারথী বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারেন না—"শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।" পরিচ্ছদ বা বাস অকিঞ্চিৎকর পদার্থ হইলেও রাজাকে রাজোচিত ও যোদ্ধাকে বীরোচিত পরিচ্ছদই ধারণ করিতে হয়; তাত্ত্বিক সভার সভ্যগণ এ সম্বন্ধে এই উদাহরণ দিয়া থাকেন;—এক খণ্ড কাচ বা কাচ-ল্যাম্পের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ইহাতে এক প্রকার সঙ্গীত আছে, যে সঙ্গীতে ইহা স্পন্দিত হইতে পারে। যদি ইহার সমীপে সেই সঙ্গীত গীত হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ঐ কাচখণ্ড হইতেও স্বতন্ত্রভাবে গীতধ্বনি উত্থিত হইতেছে, যেন ঐ কাচ খণ্ড নিজে গান করিতেছে। বাহিরে যে সঙ্গীত শব্দ হইতেছে, এই কাচখণ্ডও সেই গীতের অনুরূপ উত্তর (respond) প্রদান করিতেছে ও স্পন্দিত হইতেছে। কারণ ইহার ভিতর সেই স্পন্দনের শক্তি আছে, এবং এই জন্যই সঙ্গীত ধ্বনির উত্তর (corresponding answer) দিতেছে। যদি এখন বাহিরের সঙ্গীতের বল অধিক চড়ান যায়, এবং ঐ কাচখণ্ড যে পরিমাণ শব্দের উত্তর (respond) দিতে পারে, তদপেক্ষা অধিক দ্রুত শব্দ করা যায়, তাহা হইলে কাচখণ্ড ভগ্ন হইবে, কারণ কাচখণ্ড ইহার ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করিয়া বাহিরের শব্দের উত্তর (respond) দিতে চেষ্টা করিয়া ইহার ঘনত্ব হারাইবে।

(অনেক পরিব্রাজক বলেন, স্থানে স্থানে পাষাণও সঙ্গীতে দ্রব হয়)

এই জন্য মনুষ্যের প্রাণশক্তি ধারণের জন্য মনুষ্যদেহের প্রয়োজন হয়। ইতর জন্তুর দেহাদির জড় পদার্থ সম্যক্ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যদেহ নির্ম্মাণে পযোগী হইলে ঐ ইতর জন্তুর দেহ মহাণুতে পরিণত হইয়া (disintegrated হইয়া) পরে অভিনব আকার অর্থাৎ মনুষ্যাকার ধারণ করে। ইতর জন্তু উন্নত হইয়া মনুষ্য হইতে পারে না।

The true theory of evolution is different from the somewhat crude view that there is a regular succession of births from the animal into the man. The matter has been made plastic in the animal, but man in his form is the result of a higher working ; the germ of his life can never develop into the animal, but only into the human, because more has been

infolded into it, and that germ must unfold along a line which is that of direct human growth. .

Evolution of Form.

জ্যোতিষ শাস্ত্র পাঠ করিয়া অসীম আকাশে দিবস রজনী ভ্রাম্যমান গ্রহ উপগ্রহ এবং নেবুলা (Nebulae) প্রভৃতির পদার্থ ও প্রাণ-শক্তির বিষয় যত দূর অবগত হওয়া যায়, তাহাতেও জানা যায়, একই পদার্থ এবং একই প্রাণ ক্রমশঃ বিকসিত হইতেছে, এবং এক অচ্ছেদ্য প্রেম-রজ্জুতে সকলেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে, আবার সকলে সাধারণ ভাবে সূর্য্যমণ্ডলের প্রতি আকৃষ্ট রহিয়াছে। সূর্য্যমণ্ডলকে সৌর-জগতের সকল জীবনী শক্তির উৎস ও কেন্দ্র বলিয়া গ্রহণ করা যায়। Bode's Law অনুসারে সূর্য্যের নিকট অনাবিষ্কৃত গ্রহ Vulcan, তৎপর Mercury (বুধ), Venus (শুক্র), তৎপর পৃথিবী (Earth), Mars (মঙ্গল), Jupiter (বৃহস্পতি), Saturn (শনি), Uranus, নেপচুন (Neptune), তৎপর বহু দূরে দূরে অপর দুইটী অপরিজ্ঞাত গ্রহ আছে। ইহার মধ্যে বুধ ও মঙ্গল পৃথ্বীলোকের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত। শুক্রগ্রহের অধিবাসিগণ অনেক উপরে উঠিয়াছেন এবং বৃহস্পতির অধিবাসিগণ সর্ব্বোপরি উঠিবেন। এক সৌর-জগতের আয়ুঃকালে সপ্তবিকাশ পদ্ধতি (schemes of evolution), এক বিকাশকালে সপ্তমন্বন্তর, এক মন্বন্তরে সপ্ত পাক (rounds), এক পাকে সপ্ত ভুবনের আয়ুঃকাল (world period), এক ভুবনের আয়ুঃকালে সপ্ত মনুষ্যজাতি (Root-Race), এক জাতিতে সপ্ত উপজাতি (Sub-race) হয়। সপ্তভুবনের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত পৃথ্বীলোক disintegrated হইতে পারে নাই। এই সৌর-জগতের পরমায়ুঃকাল কত, তাহা পাঠকগণ কল্পনা করিয়া দেখিবেন। এই বিশ্বকে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, বটবৃক্ষের ফলের অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র বীজের মধ্যস্থ নিরাকার প্রাণশক্তি হইতে কালে (এক দিনে বা সহসা নহে) এক বৃহৎ বৃক্ষ স্থান (space) ব্যাপিয়া জন্মিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে নিরাকারে ও সাকারে পার্থক্য নাই। সূক্ষ্ম নিরাকার পদার্থ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, স্থূল সাকার পদার্থ স্থূল ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। ঈশ্বর কিম্বা তাঁহার অধীনস্থ দেবগণ বা উচ্চশ্রেণীস্থ প্রাণিগণ ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক ভুবনের প্রত্যেক প্রকার জড়পদার্থকে কেন্দ্রীভূত করিয়া magnetised করতঃ সূক্ষ্ম বা স্থূল আকার নির্ম্মাণ করতঃ তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট

হইতে পারেন। মহাশূন্যে (Space) পরব্রহ্ম নামরূপ বর্জ্জিত থাকেন, তিনি বর্দ্ধিত হইবার বা বহু রূপে জন্মিবার ইচ্ছা করিলে মায়ার সাহায্যে প্রকটিত হয়েন। মায়া দ্বারা তিনি সীমাবদ্ধ হয়েন, তাঁহার নানা নামরূপ হয়। এই বিশ্বরূপ অশ্বত্থবৃক্ষের মূল উর্দ্ধদিকে, শাখা প্রশাখা পল্লবাদি অধোদিকে (উর্দ্ধমূল অধঃশাখ), অর্থাৎ এক পরমব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া নানা রূপে ঈশ্বর বিকশিত ও পরিণমিত হইয়া পুনরায় নিম্নতম স্তর হইতে ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে উচ্চে উঠিতেছেন, অর্থাৎ পদার্থেরও প্রাণশক্তির ক্রমোন্নতি হইতেছে। দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র (যেমন বেদান্ত দর্শন) এক ব্রহ্ম হইতে পরিণাম বর্ণনা করেন, অর্থাৎ উর্দ্ধদেশস্থ মূল হইতে ক্রমে অবতরণ করিয়া শাখা পল্লবে উপনীত হয়েন। জড় বিজ্ঞান ধর্ম্মশাস্ত্রের গর্ব্বিত বচন অগ্রাহ্য করিয়া ঐ বৃক্ষের পল্লব পত্রাদি অবলম্বন করিয়া ক্রমে মূল প্রদেশে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। ভাগ্যক্রমে যদি দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত জড়বিজ্ঞানের মধ্যপথে দেখা সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে ভালই, উভয়েই অল্পকাল মধ্যে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইবেন, যদি দেখা নাও হয়, তাহা হইলেও কোন ক্ষতি নাই, উভয়েই শনৈঃ শনৈঃ এক দিন না এক দিন কূল পাইবেনই পাইবেন। কিন্তু বর্ত্তমান্ সময়ে দেখা যাইতেছে, উভয়েই অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছেন, এবং সময় সময় সংশয় বাত্যায় ও অজ্ঞান কুহেলিকার অগাধ সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন।

ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত বিজ্ঞানের শত্রুতা কেন জন্মিল? যদি ধর্ম্মশাস্ত্র উত্তর দিকে যাইতে বলে, বিজ্ঞান তাহা অগ্রাহ্য করিয়া বিপরীত দিকে গমন করে কেন? যখন ইস্লাম ধর্ম্ম বিজ্ঞান লইয়া স্পেইন দেশের দক্ষিণে বিজ্ঞান বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন খ্রীষ্টান ধর্ম্ম বলদর্পে গর্ব্বিত হইয়া শিশু-বিজ্ঞানের কত অনিষ্টই না করিয়াছেন! কোপারনিকাস্ (Copernicus) মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া তাঁহার বিজ্ঞান গ্রন্থের নিকট শেষ বিদায় লইয়াছিলেন। যখন গ্যালিলিও (Galileo) বধ্যভূমিতে নীত হইয়া অস্ফুট কম্পিত-স্বরে তাঁহার আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্য অস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যখন জীবিত মনুষ্যকে বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচারের জন্য অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইত বা কুঠারাঘাতে রাজ আজ্ঞায় ঘাতকের হস্তে প্রাণ দিতে হইত, সেই সকল দিনের কথা একবার স্মরণ করিয়া দেখুন! এখন বিজ্ঞান আর শিশু নহেন, বলিষ্ঠ যুবক হইয়াছেন, এবং বৃদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর প্রতিশোধ লইতে

ছেন। কিন্তু বেদান্ত দর্শন জড়-বিজ্ঞানের কোন অনিষ্ট করেন নাই, অধিকন্তু বেদান্ত, জড়পদার্থকে প্রাণরূপ মহামূল্যবান্ মণিদ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন। তজ্জন্যই মনে হইতেছে বেদান্ত ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অচিরে পরস্পর সাক্ষাৎ করিয়া কোলাকুলি করিবেন।

শ্রীজানকীনাথ পাল, বি, এল, শাস্ত্রী।

আলোকে আঁধার।

দয়াময়,

উষাটী আসিয়া যাইবে যদিগো
কেন তবে উষা আনিলে?
ফুলটী ফুটিয়া ঝরিবে যদিগো
কেন তবে ফুল ফুটালে?

গাহি পাখী গান থামিবে যদিগো
কেন তারে গান শেখালে?
আঁধারের মাঝে ঘুরাবে যদিগো
কেন তবে আলো দেখালে?

মলয় বহিয়া ফুরাবে যদিগো
কেন তবে তারে বহা'লে?
নিরাশ বেদনে লুটাবে যদিগো
কেন আশা-সুখে মাতালে?

হাসিয়ে চপলা লুকাবে যদিগো
কেন তবে তারে হাসালে?
ভালবাসি যারে না দিবে যদিগো
কেন তারে ভাল বাসালে?

চাঁদিমা নিয়ত না রবে যদিগো
কেন তবে চাঁদ দেখালে?
মিলন বিরহে ঢাকিবে যদিগো
মিলন কি কেন বুঝালে?

জীবনে মরণ গ্রাসিবে যদিগো
জীবন কেন বা গড়িলে?
না বুঝে কিছুই কেবলি কাঁদিগো
আলোকে আঁধার হেরিলে!!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

উদ্ধার।

(কাব্য)

প্রথম সর্গ।

সাগর সৈকতে।

নীল নভস্তল উর্দ্ধে অনন্ত বিস্তৃত,
অসীম বিস্তৃত নিম্নে সুনীল অর্ণব
নিরখিছে পরস্পরে; মিশাইছে সুখে
উভয়ের প্রতিবিম্ব উভয়ের বুকে।

গম্ভীর সায়াহ্নকাল, স্থির নীরবতা
দিকদিগন্ত ব্যাপিয়া, বায়ু মন্দগতি
জড় জগতের অঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া
কি ভীষণ নীরবতা! কি দৃশ্য মহান

নিশ্চল, নিস্তব্ধ, স্থির, গম্ভীর প্রকৃতি !
শ্বেত সৈকতের প্রান্তে অর্ণব বেলায়
ফেনিল তরঙ্গাঘাত ধীরে ধীরে ধীরে,
অস্ফুট আবার, ক্রমে যেতেছে মিশিয়া
সান্ধ্য সমীরণ সনে নীরবতা মাঝে।
মহাশূন্য ভীতিকর অনন্তে মিশিয়া,
মহান প্রকৃতি অঙ্ক দেখায় খুলিয়া।
কেবা তুমি কেবা আমি সে অসীম মাঝে !
তুমি আমি রেণুকণা, ক্ষুদ্র ততোধিক।
পশ্চিম গগন প্রান্তে স্তরে স্তরে স্তরে
অচঞ্চল বলাহক আহা কি সুন্দর!
নীল, লাল, পীত, শুভ্র কোথাও হরিৎ
স্বভাবের চারুচিত্র, নৈপুণ্য অপার !
অস্তাচলগামী ভানু সুগোল, বিশাল,
সুরক্তিম, শান্তদৃশ্য হীনপ্রভ এবে।
নীল বারিধির প্রান্তে সীমান্ত যেথায়
নীলাম্বর চুম্বিতেছে নীল অম্বুরাশি
ধীরে ধীরে প্রভাকর শ্রান্ত দিবাশ্রমে
মহাসিন্ধু গর্ভে যেন করিছে প্রবেশ।
রক্তিম ভানুর আভা পয়োধির বুকে
মরি কি সুন্দর ; আহা নয়নরঞ্জন !
কে যেন দিয়েছে মরি সিন্দুর ঢালিয়া
দুর্ব্বাদলসুশোভিত বিস্তীর্ণ ভূভাগে।
চারু নীলিমায় চারু সুবর্ণের আভা
বাসবের অঙ্কে যেন অমরার রাণী
নারায়ণ নীল বক্ষে যেন নারায়ণী !
বসিয়া যুবক এক পারাবার কূলে
বৃহৎ উপলখণ্ডে সস্মিত বদন,
অস্তমিত দীননাথে করে নিরীক্ষণ।
নিবিল চিত্তের আলো, ডুবিল তপন,
আইল গোধূলি ধীরে মলিন বসনা ;
ধূসর গগন তল—প্রতিচ্ছায়া তার
পড়িয়াছে সিন্ধু বক্ষে নীলতর এবে।
উঠিল প্রবল ঝড় ভীষণ গর্জ্জনে
হুঙ্কারিল পয়োনিধি, তরঙ্গে তরঙ্গে,
শ্বেত ফেনমালা বক্ষে, লাগিল নাচিতে ;
মত্ত যেন রণরঙ্গে তাণ্ডব নর্ত্তনে,
মহাকাল, গলে দোলে শ্বেত শাখ মালা।
ওই হের, মনস্তাপে প্রকৃতি সুন্দরী,
মলিন বসনে দেহ আবৃত করিয়া
করুণা নিধান পদে, আনত বদনে
করিছে করুণা ভিক্ষা, মাগিছে কল্যাণ,
করিতেছে শান্তি ভিক্ষা জগতের তরে
শান্তি প্রস্রবণ কাছে ; কহিছে কাতরে—
'ফুরাল' একটী দিন ফিরিবে না আর ;
বিহঙ্গের কণ্ঠে উঠি ভিক্ষা করুণার
মর্ম্মভেদী, মিশিতেছে সান্ধ্য সমীরণে,
সে ভিক্ষা অনন্তে মিশি কহিছে কাতরে—
'ফুরাল' একটী দিন আসিবে না আর !
সাবধান জীবগণ ! ফুরাবে এরূপে
দিনগুলি দিন দিন,—আসিবে তখন
মহানিশা—মিশাইবে মহা অন্ধকারে ;
কে জানে কোথায় হায় ! নিয়তির শেষ,
যে অনন্ত জ্যোতিঃকণা জীবে প্রকাশিত
মিশিবেকি পুনঃ সেই অনন্ত জ্যোতিতে ?
কিম্বা যথা বাহিরিয়া পর্ব্বত হইতে
অবিরত ধায় নদী সাগর উদ্দেশে,
না ফিরি আবার সেই পর্ব্বত শিখরে ;
ধাইছে কি জীব স্রোত হইতে বিলীন
মহাকাল সিন্ধুগর্ভে অনন্তের তরে ?
অথবা বাষ্পের ন্যায় ভিন্ন রূপ ধরি
আসে যায় বার বার ধরণী ভিতরে।
কে জানে কেমনে হয় নিয়তির শেষ !
পুণ্য গীত গাও, পাখি! মনের উল্লাসে,
জগতের জীবগণে শিখাও গাহিতে।
প্রকৃতির লেখা হেরি বিহ্বল মানসে
কহিতে লাগিল যুবা আপনার মনে—

"কেবা আমি? অতি ক্ষুদ্র অসীম মাঝারে,
সিন্ধু বুকে অণুবিন্দ—ক্ষুদ্র ততোধিক!
বসি এই শিলাখণ্ডে সাগর সৈকতে
বিশ্বব্যাপী ভয়াবহ এ অনন্ত মাঝে
দেখিতেছি আমি এ যে ক্ষুদ্র রেণু কণা!
এ মহিমা তবে আমি বুঝিব কেমনে?
বুঝিব কেমনে আমি, কি অব্যক্ত ভাষা
প্রকৃতির মুখে নিত্য উঠিছে ফুটিয়া।
বৃক্ষে, তৃণে, ফুলে, ফলে, পাতায়, পাতায়,
অনলে, অনিলে, জলে, গ্রহে, উপগ্রহে
হইতেছে, সঞ্চারিত কি শক্তি মহান্?
সকলেই মহাশক্তি করে সপ্রমাণ;
অনন্ত শক্তির মূল, সর্ব্বশক্তিমান,
কেমনে এ ক্ষুদ্র হৃদে দিব তাঁর স্থান?
নশ্বর মানব দেহ ধূলিতে গঠিত:
সৌন্দর্য্য, বীরত্ব, গর্ব্ব, ধন, কুল, মান,
উজ্জল চিরস্থিত বলি হয় অনুমান
ক্ষণতরে—কিন্তু সব মিশায় ধূলায়!
অলীক আলেয়া মত নশ্বর জীবন
জ্বলে ক্ষণে, নিভে যায়, মিশায় আঁধারে।
কাঞ্চন মণ্ডিত সেই নরপতি দেহ
গোরস্থান হতে যবে আনিল বাহিরে,
রেণুসম গেল ঝরে আলোক পরশে,
মিশাইল বায়ুসনে। কুরুকুল পতি
দুর্য্যোধন, সসাগরা ধরার নৃপতি
মহাদম্ভী, মহামানী, উন্নত মস্তক,
পরিণত চিতাভস্মে। শুষ্ক তৃণ যথা
ভাসিয়া ক্ষণেক মাত্র অর্ণব সলিলে
নিমজ্জিত হয় তলে তরঙ্গ আঘাতে,
কালের তরঙ্গাঘাতে নিঃসহায় জীব
ডুবিছে কালের গর্ভে। নশ্বর সকল!
কত শত মহাজ্ঞানী, বীর, সতী, মানী
মহাদম্ভে মহাতেজে মহিমা বিস্তারি
মিশায়েছে ধূলিসনে কে করে সন্ধান।
প্রহেলিকা এ জীবন ছায়াবাজী প্রায়!
মুহূর্ত্ত নীরব যুবা, স্থির, অচঞ্চল;
কি যেন ভাবিলা মনে, কহিলা আবার—
এই যে কালের চক্র ঘুরিছে নিয়ত
প্রবর্ত্তিত ক্ষণে ক্ষণে মুহূর্ত্তে নূতন।
দিনে, দিনে, পলে, পলে, নিমেষে, নিমেষে,
কত শত নূতনত্ব হতেছে বিকাশ,
এই আছে এই নাই জগতের গতি।
কেহ জন্মে, কেহ মরে,—ভাঙ্গা গড়া হায়
কালের কৌতুক নিত্য-রহস্য নিগুঢ়।
মরে নর, জন্মে নর, মরেনা মানব,
এক যায় আর আসে—সমগ্র জগৎ
নহে ক্ষতিগ্রস্ত তাহে, সাগরে যেমতি
একধারে বাষ্পাকারে শুকাইছে বারি,
অন্যধারে নদীধারা করিছে পূরণ।
এই বিশ্ব বিবর্ত্তন বিশ্ব নিয়ন্তার,
কালে অবহেলা করে হেন সাধ্য কার?
কিন্তু কর্ম্মরত জীবগণ—কর্ম্ম প্রয়োজন,
কর্ম্ম উন্নতির পথ—কর্ম্মে অবহেলা
মহাপাপ, মহাপাপ জড়ত্ব চেতনে,
অবশ্য করিব কর্ম্ম শিবজির তরে
করিব এ প্রাণপাত—তুচ্ছ ম্লেচ্ছরাজ?
ভ্রমিয়াছি বহুরাজ্য, করিয়াছি রণ
বহুকাল বীরদর্পে কাঁপায়ে বসুধা,
পার্থ যথা একেশ্বর গোগৃহের রণে,
একেশ্বর পরাজিনু সেই সিন্ধুতীরে
মহাবল নৃপগণে—ধূমপুঞ্জ যথা
বায়ুমুখে, উড়াইনু ফুৎকারে তেমতি—
মহাসৈন্য, মহাশূন্য করিয়া আঁধার
বরষিনু অস্ত্রজাল, ভীষণ গর্জ্জনে
দীপ্ত অসি করতলে পশি অরিমাঝে
সেনাপতি শির কাটি করিনু নিক্ষেপ

দূরশূন্যে, শত্রুবৃন্দ পলাইল ভয়ে।
করিয়াছি নিষ্পেষিত বনের শার্দ্দূলে
বাহুবলে, বাহুবলে পুনঃ রণস্থলে
বিমর্দ্দিব ম্লেচ্ছরাজে, যবন কেশরী।
উৎসাহে চঞ্চল যুবা ভ্রমিতে লাগিলা
ইতস্ততঃ ক্ষণপরে চাহি উর্দ্ধপানে
দেখিলা উদিছে ধীরে পূর্ণ শশধর,*
ধীরে ধীরে [illegible]লোক প্রস্ফুট হইয়া
পাপময় পৃথিবীর নাশিছে কলুষ। (ক্রমশঃ

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক।*

কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়, দেওয়ান (চক্রবর্ত্তী)।

'ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিত', 'আত্মজীবন চরিত', 'গীতমঞ্জরী', ও 'সঙ্গীত রচয়িতা'।

জন্ম—কৃষ্ণনগরে রাজাদিগের দেওয়ান বংশে ১২২৭ সালের কার্ত্তিক সংক্রান্তির দিন জন্মগ্রহণ করেন।

মৃত্যু—১৮৮৫ খ্রীঃ ২রা অক্টোবর, শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় মানবলীলা সম্বরণ করেন।

বংশ তালিকা—৬ষষ্ঠী দাস চক্রবর্ত্তী, ৫ রাম রাম চক্রবর্ত্তী, ৪ (ক) মদন গোপাল, ৩ (ক) রাধাকান্ত (রায়), ২ উমাকান্ত, ১ কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় ২ (ক) শ্রীজ্ঞানেন্দ্র লাল রায়, এম, এ, বি, এল (খ) শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র লাল রায় (গ) শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র লাল রায় B. L.

বংশ পরিচয়—এই দেওয়ান বংশীয়গণ বাৎস্য গোত্রজ বারেন্দ্র শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ, কুতব শাখা, পঞ্চ প্রবর, সঙ্গামণি গাঁঞী।

দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র 'আত্মজীবন চরিতে' লিখিয়াছেন—"ভবানন্দের প্রপৌত্র রাজা রুদ্রের সময় হইতে, রুদ্রের পৌত্র রাজা রঘুরামের সময় পর্য্যন্ত আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ষষ্ঠী দাস চক্রবর্ত্তী ও রাম রাম চক্রবর্ত্তী দেওয়ানী পদে নিযুক্ত ছিলেন, এইরূপ বোধ হয়। আমাদের কুল শাস্ত্রে যে যে স্থানে ষষ্ঠী দাস চক্রবর্ত্তী ও রাম রাম চক্রবর্ত্তীর নামের উল্লেখ আছে, তাঁহারা দেওয়ান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন"। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই চক্রবর্ত্তী বংশীয়গণ বহুকাল হইতেই কৃষ্ণনগর রাজ সংসারের সহিত বংশানুক্রমিক ঘনিষ্ঠভাবে সংস্পৃষ্ট রহিয়াছেন। কার্ত্তিকেয় চন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ-

---

* লেখক এখন কেবল মৃত গ্রন্থকারগণেরই জীবনী লিখিতেছেন। বিগত পৌষ মাসের "বীরভূমিতে" এ কথা স্পষ্ট বলা হইয়াছে। অনেকে ইহা না জানিয়া অনেক কথা বলিতেছেন।
বীঃ সঃ।

গণ সকলেই কৃষ্ণনগর রাজ সংসারে দেওয়ানী করিয়া আসিয়াছেন, কেবলমাত্র প্রপিতামহ মদন গোপাল চক্রবর্ত্তী 'রায় বখ্‌শী' পদাভিষিক্ত ছিলেন। তদনন্তর পিতামহ রাধাকান্ত দেওয়ান পদ প্রাপ্ত হইলে 'রায় দেওয়ান' উপাধি প্রাপ্ত হন। কার্ত্তিকেয় চন্দ্রের পিতৃব্য বংশীয়গণ এখনও চক্রবর্ত্তী উপাধিধারী।

যষ্ঠী দাস চক্রবর্ত্তী বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে কুলীনদের এক নূতন দল প্রতিষ্ঠিত করেন। এই নিমিত্ত ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণী মধ্যে 'মত কর্ত্তার' বংশ বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকেন।

শৈশব শিক্ষা—পঞ্চম বৎসর বয়সে কার্ত্তিকেয় চন্দ্র স্বীয় পিতৃদেবের নিকট বিদ্যারম্ভ করিয়া অষ্টম বৎসর বয়সে ওস্তাদের নিকট পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র বয়সে তাঁহার পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। বিবাহের কিছুদিন পর শিক্ষা লাভ করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণনগর জজ আদালতে প্রবিষ্ট হন। এই সময় হইতে আদালত সমূহে পারস্য ভাষার প্রচলন রহিত হইয়া যায়। কার্ত্তিকেয় চন্দ্র এখন হইতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত যত্নপর হইলেন; তদনন্তর তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়িবার জন্য ভর্ত্তি হন। কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁহাকে মেডিকেল কলেজ পরিত্যাগ করিতে হয়।

কার্য্যক্ষেত্র—রাজা শ্রীশ চন্দ্র কার্ত্তিকেয় চন্দ্রকে প্রথমতঃ 'খাস সেক্রেটারী' পদে নিযুক্ত করেন। কুমার সতীশ চন্দ্রের শিক্ষার ভারও ইঁহার উপর অর্পিত হয়; পরে ১৮৪৬ খ্রীঃ কৃষ্ণনগর কলেজ স্থাপিত হইলে কুমার বাহাদুর কলেজে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তদবধি, কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রাজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় মকদ্দমা তত্ত্বাবধারণের ভার গ্রহণ করেন। অতঃপর রাজা শ্রীশচন্দ্র গবর্ণমেণ্ট হইতে মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হইলে তিনি মাসিক ৫০্ টাকা বেতনে মহারাজার দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। বেতন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া ১২৮১ সালে ২৫০্ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল, শেষ সময়ে তিনি মাসিক ৩০০্ করিয়া বেতন প্রাপ্ত হইতেন।

কার্ত্তিকেয় চন্দ্র নবদ্বীপ রাজ সংসারে তিন পুরুষ দেওয়ানী করিয়াছিলেন। তিনি রাজার অন্যায় কার্য্যে সরলভাবে নির্ভীক হৃদয়ে প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ইঁহার চরিত্রবল অতিশয় দৃঢ় ছিল। রাজা অনুকূল হউন বা প্রতিকূল হউন, রাজার অনুগত অপরাপর কর্ম্মচারীগণ তাঁহার যথার্থই অনুগত হউন বা পরোক্ষভাবে শত্রুতা সাধন করুন, তিনি

কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অবিচলিতভাবে কঠোর কর্ত্তব্য সাধনে আদৌ পরাঙ্মুখ হইতেন না। অন্যায় কার্য্যে প্রশ্রয় দেওয়া অপেক্ষা তিনি নিজ কার্য্যভার পরিত্যাগ করা অতি সহজ জ্ঞান করিতেন। তাঁহার বিমল চরিত্র ও কার্য্যদক্ষতা গুণে সরকারী উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণও তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তদানীন্তন ছোট লাট টমসন্ সাহেব বাহাদুর যখন ১৮৮৫ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে কৃষ্ণনগর পরিদর্শনার্থ গমন করেন, তখন দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র শয্যাগত ছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি স্বয়ং তাঁহার নিকট আসিয়া সাক্ষাৎ করেন এবং উপস্থিত রাজকুমারকে বলেন 'দেখ তোমার জমিদারি এই দেওয়ানের হস্তে আছে, ইহা তোমার পরম সৌভাগ্য জানিবে। আমি ভরসা করি, ইনি যতদিন জীবিত থাকিবেন, তুমি তোমার পিতা এবং পিতামহের ন্যায় ইঁহাকে সম্মান করিবে'। ইহা কম সম্মানের বিষয় নহে।

বিপুল রাজ্যের ভার তাঁহার হস্তে ছিল, তিনি ইচ্ছা করিলে খুব বড় লোক হইতে পারিতেন। কিন্তু বৈষয়িক লোকদিগের মধ্যে দেওয়ানজীর তুল্য স্বার্থত্যাগ ও সাধুতা অতি দুর্ল্লভ। সুদীর্ঘ কার্য্যকালের মধ্যে কখনও অন্যায়রূপে কপর্দ্দক মাত্রও গ্রহণ করেন নাই। এতদ্ব্যতীত, তিনি কর্ত্তব্যবোধে অন্যত্র অধিকতর উচ্চ বেতন প্রাপ্তির প্রলোভনও অম্লানবদনে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

নদীয়া জেলার প্রায় সমস্ত লাখেরাজ ভূমি গবর্ণমেণ্টের বিচারে অসিদ্ধ সাব্যস্থ হইয়া তাহার উপর কর নির্দ্ধারিত হয়। লাখেরাজদারগণ ভূমির নির্দ্ধারিত বাৎসরিক খাজনার অর্দ্ধাংশ গবর্ণমেণ্টকে দিবেন এবং অর্দ্ধাংশ নিজেরা লইবেন, এইরূপ মর্ম্মে বন্দোবস্ত লন। কিন্তু ঐ সকল জমীর উপর গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এত অতিরিক্ত কর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য প্রদান করিয়া লাখেরাজদারগণ আর কিছুই পাইত না। দেওয়ানজী মহাশয় ইহার প্রতিবিধানার্থ প্রাণপণে উদ্যোগী হইয়া, গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পূর্ব্বগৃহীত কর প্রত্যর্পিত হইবার আদেশ প্রাপ্ত হন, ইহাতে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রায় চল্লিশ সহস্র টাকা ফেরত পাওয়া যায়। এই কার্য্যে রাজা বাহাদুরের বিপুল অর্থ ব্যয় হইয়াছিল সত্য, কিন্তু দেওয়ানজী মহাশয়ের উৎসাহ ও মন্ত্রণা গুণে এই কার্য্যে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রচিত গ্রন্থাদি—'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত' গ্রন্থে, কার্ত্তিকেয় চন্দ্র কৃষ্ণ-নগরের প্রাচীন রাজবংশের পূর্ণ ইতিহাস এবং বঙ্গদেশের আনুসঙ্গিক আংশিক ইতিহাস অতি দক্ষতার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার 'স্বরচিত জীবন চরিত' গ্রন্থে অর্দ্ধ শতাব্দীরও উর্দ্ধ কালের বঙ্গীয় সামাজিক অবস্থার একটী সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। দেওয়ানজী মহাশয়ের সহিত রাজ বংশের বংশানুক্রমিক কার্য্যসম্বন্ধ থাকায় এই গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে রাজবংশেরও ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বে বঙ্গ ভাষায় আত্মজীবনী লিখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু তাঁহার সমকালিক এই দেওয়ানজী 'আত্মজীবন চরিত' গ্রন্থে সরল ভাষায় যেরূপ উদারতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত সামাজিক রাজনৈতিক প্রভৃতি সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার লিপিকুশলতার ভূয়ো প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বলিতে কি, স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পুস্তক প্রকাশ করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন; ইহা হইতে এই পুস্তকের গুরুত্ব কতকটা উপলব্ধি হইবে।

বিবিধ—কার্ত্তিকেয় চন্দ্র, অতিশয় ধর্ম্মভীরু, পরোপকারী, সদালাপী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট ছিল, তিনি সুগায়ক ছিলেন। কার্ত্তিকেয় চন্দ্রের তিন পুত্রই উপযুক্ত সুশিক্ষিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত।

(আত্মজীবন চরিত, সাহিত্য ১৩০৩; প্রদীপ ৩।৩১০, ৭৩; বঙ্গভাষার লেখক)

কানাই দাস—

বৈষ্ণব পদকর্ত্তা।

কানাই যোগী—

কবি-সঙ্গীত রচয়িতা।

নিবাস—ত্রিপুরা জেলা।

('নব্যভারত' ৩১। ৩৬৬)

কালুদাস বা কালুরাম দাস—

বৈষ্ণব-পদ-কর্ত্তা।

কালুরাম দাস, শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ঠাকুরের প্রশিষ্য ছিলেন। ইনি নীলাচলে বাস করিতেন।

(গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা ১।২৯৬)

কালু ফকির—

'আলিরাজা' দেখুন।

কান্ত—

বৈষ্ণব পদকর্ত্তা।

কান্তি তেলী—

যাত্রার পালা রচয়িতা।

কামদেব—

বৈষ্ণব পদকর্ত্তা।

কাম্বেল—

ইনি ১৮৪০ খ্রীঃ বেনারসের কমিসনর টুকার সাহেব রচিত ইহুদীদিগের ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ রচনা করিয়াছিলেন।

পঃ (প ঃ২।২৪)

কালাচাঁদ পাল—

'কালীয় দমন' যাত্রার পালা রচয়িতা।

নিবাস—বিক্রমপুর।

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৬১২)

কালি দাস—

'কালিকা বিলাস' রচয়িতা।

(পঃ পঃ ৪।৩০৬)

কালিদাস—

'মনসা মঙ্গল' ও 'শশীর পাঁচালী' রচয়িতা।

উভয় গ্রন্থেই 'কবি কালিদাস' বলিয়া ভণিতা আছে।

রচনা কাল—১৬১৯ শক বা ১১০৪ সাল।

(পঃ পঃ ৮।৫৪, ৯ অতি ২২)

কালিদাস, দ্বিজ—

'সূর্য্যব্রত পাঁচালী' রচয়িতা।

(প ঃপঃ ১০।অতি ১৪২)

কালিদাস নাথ—

'নরোত্তম বিলাস', 'জগদানন্দ পদাবলী', 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' (বঙ্গবাসী)

'মহাভারত—কাশীদাস' (ঐ), 'চৈতন্য মঙ্গল—জয়ানন্দ' (পরিষদ গ্রন্থাবলী) প্রভৃতি নানাবিধ প্রাচীন গ্রন্থাবলী সম্পাদক।

এতদ্ব্যতীত তিনি বিবিধ বৈষ্ণব পত্রিকার সম্পাদক ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার লেখক ছিলেন।

মৃত্যু—১৩১০ সাল।

"৺ কালিদাস নাথ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে, বিশেষতঃ বৈষ্ণব সাহিত্যে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার দ্বারা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য উদ্ধারের বিশেষ সাহায্য হইত। কেবল পরিষদ্ নহে, বড় বাজার হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, গৌরাঙ্গ সমাজ প্রভৃতির সাহায্যেও তিনি প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্য প্রচারে জীবনের অধিকাংশ সময় নিযুক্ত ছিলেন। অবশেষে 'বঙ্গবাসীর' প্রকাশিত কাশীরাম দাসের মহাভারত সম্পাদন করিয়া কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। 'বঙ্গবাসীর প্রকাশিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীও তাঁহার সম্পাদিত। প্রাচীন পুঁথি লেখকগণের ভ্রম প্রমাদের মধ্য হইতে সুসঙ্গত প্রাচীন পাঠ উদ্ধারে নাথ মহাশয়ের বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। সংস্কৃতও প্রাকৃত ভাষায় তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ ব্যতীত নাথ মহাশয় অনেকগুলি বৈষ্ণব পত্রিকার সম্পাদক ও লেখক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষদ্ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পরিষদের প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত জয়ানন্দের "চৈতন্য মঙ্গল' সম্পাদনের ভার তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত ছিল। ইহার ভূমিকাদি তিনি লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। বঙ্গসাহিত্য নাথ মহাশয়ের মৃত্যুতে প্রাচীন সাহিত্যতত্ত্বজ্ঞ একজন সুবিজ্ঞ ব্যক্তিকে হারাইলেন। (পরিষদ কার্য্যবিবরণী ১৩১০ পৃঃ ৩)

কালিদাস মুখোপাধ্যায়—

সঙ্গীত রচয়িতা। কালিদাস রচিত শ্যামাবিষয়ক রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক, ধর্ম্ম-বিষয়ক, প্রণয়-বিষয়ক ও আধ্যাত্মিক সঙ্গীতগুলি অধুনা গ্রন্থাকারে ("গীত-লহরী") প্রকাশিত হইয়াছে।

কালিদাস, সাধারণতঃ "কালীমির্জ্জা" নামে খ্যাত। (মির্জ্জা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি) কালিদাস, হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তীপাড়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অনুমান, অশীতি বৎসর পূর্ব্বে তিনি বারাণসী ধামে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

শিক্ষা—কালিদাস, কিছুদিন গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিয়া টোলে পড়িতে আরম্ভ করেন। অনুমান, বিংশতি বৎসর বয়সে টোলের পাঠ সমাপ্ত করিয়া বেদান্ত দর্শন ও সঙ্গীত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত কাশী গমন করেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে অধিকতর পারদর্শিতা লাভের আশায় কাশী হইতে দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ নগরে কয়েক বৎসর অবস্থান করেন। দিল্লীতে অবস্থান

কালেই সম্ভবতঃ তিনি পারস্য ও উর্দ্দু ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। দশ বার বৎসর কাল এইরূপে সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া অনুমান ত্রিশ বৎসর বয়সে কালিদাস স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করিয়া পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

কালিদাস কিয়ৎকাল বর্দ্ধমানের যুবরাজ প্রতাপচন্দ্রের সভাসদ্ ছিলেন। তথায় যথোচিত অর্থপ্রাপ্তি না হওয়ায় স্থানান্তর গমনে বাধ্য হন। কালিদাস বর্দ্ধমান পরিত্যাগ করিয়া আসিলেও যুবরাজ প্রতাপচন্দ্রের নিকট তাঁহার অজ্ঞাতবাসের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত, মাসিক ১৫৲ করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। বর্দ্ধমান হইতে আসিয়া কালিদাস কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ জমীদার স্বর্গীয় গোপীনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ইহঁারই পুণ্যাশ্রয়ে অবস্থান করিয়া আমরণ কাল বহুপরিবারবিশিষ্ট সংসার সুখস্বচ্ছন্দে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন।

সঙ্গীত শাস্ত্রে কালিদাস মির্জ্জা মহাশয়ের অসাধারণ অধিকার জন্মিয়াছিল এবং সঙ্গীত বিদ্যাবিশারদ বলিয়া দেশময় তাঁহার সুখ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় মধ্যে মধ্যে কালিদাসের নিকট আসিয়া সঙ্গীত বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেন। মির্জ্জা মহাশয় অতিশয় বিনয়ী ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি দেব দেবীর পার্থক্য নির্দ্ধারণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি হিন্দুস্থানী বেশভূষা করিতেন এবং দীর্ঘকেশ ধারণ করিতেন।

কালিদাস, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ বাণেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন।

(শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত গীতলহরী। বঙ্গবাসী ২৯শে মাঘ। ১১ প পৃঃ ৩।১১৩)

কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী—

'অপূর্ব্ব কারাবাস', 'অপূর্ব্ব সহবাস', 'চিত্রশালা' প্রভৃতি উপন্যাস রচয়িতা।

সুপ্রসিদ্ধ 'অপূর্ব্ব কারাবাস' উপন্যাস খানি সর ওয়ালটার স্কটের লেডী অব দি লেকের ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার অতি অল্প বয়সে প্রাণত্যাগ করেন।

(নব্যভারত ৬।৪৮৮ পৃঃ)

কালীকিশোর—

পদকর্ত্তা।

কালীকৃষ্ণ দাস—

'কামিনীকুমার' নামক বাঙ্গলা পদ্য-গদ্য গ্রন্থ রচয়িতা এই গদ্য গ্রন্থের ভাষা তাদৃশ জটিল নহে—আলালী ভাষার সমতুল্য। গদ্য রচনার মধ্যেও ভণিতা দৃষ্ট হয়।

রচনা কাল—অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগ গ্রন্থ মধ্যে, বৈদ্যনাথ বাগরী ও মধুসূদন সরকার এই দুই ব্যক্তিরও ভণিতা দৃষ্ট হয়। তিনজনে একত্র গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন।

ব: সা ৬৩৩ ; বঙ্গদর্শন (নং) ৩৮ ; প পঃ ১০। অতি ১৬২।৬৩

কালীকৃষ্ণ মিত্র—

'বিধবা বিবাহ,' 'কৃষিবিদ্যা,' 'স্ত্রী-শিক্ষা,' 'মাদক নিবারণ' প্রভৃতি বিষয়াবলম্বনে বহু প্রবন্ধ রচয়িতা এবং হিতসাধক ও এডুকেশন গেজেটের নিয়মিত লেখক।

জন্ম—১৮২২ খ্রীঃ কলিকাতা সিমুলিয়ায় পিতৃভবনে দর্জ্জিপাড়ার প্রসিদ্ধ মিত্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

মৃত্যু—১৮৯১ খ্রীঃ ২রা আগষ্ট প্রাতঃকাল ৭০ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

শৈশব, শিক্ষা—পিতা, শিবনারায়ণ মিত্র, কলিকাতাবাসী স্বনামখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ জমীদার স্বর্গীয় আশুতোষ দেব মহাশয়ের নিকট আত্মীয় হইলেও তাঁহার সাংসারিক অবস্থা তত স্বচ্ছল ছিল না। এই নিমিত্ত কালীকৃষ্ণ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরদ্বয় কৃষ্ণধন মিত্র ও নবীনকৃষ্ণ মিত্রকে পাঠ্যাবস্থায় দারিদ্র্য দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছিল। কালীকৃষ্ণ হেয়ার সাহেবের স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হন এবং এক জন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া অচিরে খ্যাতিলাভ করেন। কলেজে অধ্যয়নকালে, তিনি বৃত্তিলব্ধ অর্থ হইতেই শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যয়ভার বহন করিতে সমর্থ হইতেন। কলেজে পাঠ সমাপন করিবার অব্যবহিত পরই তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। ইহার পর অনুমান ২০ বৎসর বয়স হইতে কালীকৃষ্ণ তদীয় অগ্রজ নবীনকৃষ্ণের সহিত সপরিবারে মাতুলাশ্রমে বারাসতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

জ্ঞানার্জ্জন প্রভৃতি—জ্যেষ্ঠ সহোদর সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ বাবু বিপুল অর্থোপর্জ্জন করিতেন ; এই নিমিত্ত কালীকৃষ্ণ বাবুকে অর্থোপার্জ্জনের জন্ম কখন কাহারও দাসত্ব স্বীকার করিতে হয় নাই। তিনি উদ্ভিদ ও কৃষি-

বিদ্যা, নিদানশাস্ত্র, ভৌতিক বা অতি প্রাকৃত বিদ্যা, যোগশাস্ত্র, এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। কৃষিবিদ্যা বিষয়ক ইউরোপীয় যন্ত্রাদি আনাইয়া তিনি কৃষক ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন—এতদর্থে লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ে বারাসতে একটী আদর্শ উদ্যান প্রস্তুত করিয়া কৃষিভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন। চিকিৎসা বিদ্যায়ও তিনি সমধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, শেষ বয়সে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রণালীর প্রতি অধিক অনুরক্ত হইয়াছিলেন।

অলৌকিক বিদ্যালোচনায় তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। অলৌকিক সাহিত্য (Occult Literature) বিষয়ক বহুপুস্তক তিনি সংগৃহীত করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টানদিগের যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে Indian Mirror (18 August, 1891) লিখিয়াছিলেন—

"He was at his death, we believe, one of the most up-to-date scholars of our country, keeping abreast of the latest contributions to human knowledge by an enthusiastic and unwearied application to books in more than one language."

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার কালীকৃষ্ণের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। প্যারীচরণ সরকারের মাদক নিবারণী সভার জন্য এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য কালীকৃষ্ণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের বারাসতে অবস্থানকালে তথায় স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন বিষয়ে কালীকৃষ্ণ বাবু তাঁহার প্রবল সহায় ছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় কালীকৃষ্ণ বাবুরও পরদুঃখনিবারণ জীবনের একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় কালীকৃষ্ণ বাবু সম্বন্ধে সুরধুনী-কাব্যে লিখিয়াছিলেন—

জ্ঞানসাগর কালীকৃষ্ণ স্বভাব বিনত
বারাসতে প্রাণ রক্ষা করে শত শত ॥

কালীকৃষ্ণ বাবু সাধারণ্যে ঋষিতুল্য ভক্তি ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬০ খ্রীঃ অগ্রজ নবীনকৃষ্ণ বাবুর লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে স্বর্গীয় বিদ্যা-

সাগর ও প্যারীচরণ সরকার মহাশয়দ্বয় সমভাগে কালীকৃষ্ণ বাবুর সম্পূর্ণরূপ অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। পরে নবীনকৃষ্ণ বাবুর সুযোগ্য জামাতা ৺কালী চরণ ঘোষ মহাশয় তাঁহাকে অর্থের ক্লেশ আদৌ অনুভব করিতে দেন নাই। শেষ সময়ে তিনি কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের কলিকাতা মীর্জ্জাপুরের বাটীতেই অবস্থান করিতেন, এবং এই স্থানেই তাঁহার মানবলীলার অবসান হয়। মৃত্যুকালে তিনি বর্ষীয়সী সহধর্ম্মিনী ও দুইটী বিবাহিতা কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

কালীকৃষ্ণ বাবু বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতি কল্পে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধাবলী ব্যতীত, তিনি হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে অনেকগুলি বিনামা পুস্তিকা রচনা করিয়া সাধারণে বিতরণ করিয়াছিলেন।

(প্রদীপ ৪।৩৮০, ৪১৩ ; পূর্ণিমা ১৩০৮)

কালীকৃষ্ণ, মহারাজা বাহাদুর, দেব—

বিশপ নর্টনের অনুরোধে ১৮৩৩ খ্রীঃ জনসন্ কৃত রাসেলাস এবং ১৮৩৬ খ্রীঃ গে-রচিত গল্পমালা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। শেষোক্ত অনুবাদের নিমিত্ত তিনি হলণ্ডের রাজার নিকট সুবর্ণ পদক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাসেলাসের ভাষা অশুদ্ধ না হইলেও শব্দালঙ্কার পূর্ণ ও জটিল।

(পরিষৎ পত্রিকা ২।৩৫৯-৬০,বিদ্যাসাগর-বিহারী লাল)

কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী—

"রশিনারা" নামক ইতিবৃত্তমূলক উপাখ্যান রচয়িতা। ১২৭৬ সালে এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর তদীয় জামাতা শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবন্ধু সান্ন্যাল মহাশয় ১২৯৪ সালে এই গ্রন্থের ২য় সংস্করণ প্রকাশিত করেন।

(নব্যভারত ১২৯৪।৫৮৫ পৃঃ)

কালী চরণ চৌধুরী (নাথ ?)—

১৮৪০ খ্রীঃ গীতমালা রচনা করেন, ইহাতে ৬০টী প্রণয়বিষয়ক গীত

১৮৪৭ খ্রীঃ রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ প্রকাশিত করেন। কালী চরণ বাবু রঙ্গ-পুরের একজন জমিদার ছিলেন।

(পরিষৎ পত্রিকা ২।৫০৬, নব্যভারত ২৩০৩ ৬৬)

কালীচরণ ভট্টাচার্য্য—

রাম বনবাস হইতে রাবণ বধ পর্য্যন্ত সংক্ষেপে কবিতাকারে শ্রীরামচরিত-রচয়িতা।

এই কবিতা ভাটদিগের জন্য লিখিত হইয়াছিল।

(পরিষৎপত্রিকা ১৩১০। অতি ১৫০-১)

কালীনাথ রায় মুন্সী—

বৈরাগ্যপূর্ণ সঙ্গীত রচয়িতা।

নিবাস—টাকী। কালীনাথ রায় মুন্সী মহাশয় স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক।

(পুণ্য ২।৬৮ পৃঃ)

কালীপদ মুখোপাধ্যায়—

'প্রহ্লাদ চরিত্র' নামক যাত্রার পালা রচয়িতা।

কালীপ্রসন্ন দত্ত—

'দলিত কুসুম' ও 'বুয়রযুদ্ধ' রচয়িতা এবং 'ভারত-সুহৃদ'ও 'ভারত-বণিক' নামক পত্রিকা প্রকাশক।

জন্ম—১২৬৬ সাল ২০শে আষাঢ় (বৃহস্পতিবার) তারিখে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত চাঁওচা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

মৃত্যু—কলিকাতায় ৪২ বৎসর বয়সে ১৩০৮ সাল ৮ই অগ্রহায়ণ (রবিবার) রাত্রে প্রাণত্যাগ করেন।

বংশপরিচয়—কালীপ্রসন্ন চাঁওচার সম্ভ্রান্ত দত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩ চণ্ডীপ্রসাদ দত্ত, ২ ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত—ইন্দুমতী, ১ কালীপ্রসন্ন দত্ত।

শৈশব, শিক্ষা—ঈশ্বরচন্দ্র দত্তের কয়েকটী সন্তান নষ্ট হইলে পর কোন এক সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদে কালীপ্রসন্ন দত্ত জন্ম গ্রহণ করিয়া অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ-জীবন লাভ করেন। ১৩ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই কালীপ্রসন্নের জনক জননী পরলোক গমন করেন। কিন্তু পরিবার মধ্যে তিনি একমাত্র সন্তান বলিয়া অতিশয় যত্ন ও স্নেহসহকারে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। পিতামহ চণ্ডী-প্রসাদ ও পিতৃব্যগণ বিষয় কার্য্যোপলক্ষে অধিকাংশ সময়ই বরিশালে অবস্থান করিতেন। এই বরিশাল স্কুল হইতেই ১৫ বৎসর বয়সে কালীপ্রসন্ন এণ্ট্রান্স

পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি লাভ করেন। ইহার দুই বৎসর পর কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ্‌ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। বি, এ পড়িবার সময় আমেরিকা যাইবার জন্য তিনি বড়ই আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন; এই নিমিত্ত, পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাঁহাকে বাটী প্রত্যাগমন করিবার জন্য কৌশল করিয়া অলীক টেলিগ্রাম করা হয়। তিনি বাটী আসিলেন—কিন্তু আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

কার্য্যক্ষেত্র, সাহিত্য-চর্চ্চা—তদনন্তর কালী সহ 'নব্য-ভারত' সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রভৃতি বন্ধুবর্গের সহযোগিতায় 'ভারত সুহৃদ্' নামক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। গবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরী করা অপেক্ষা সাহিত্য-সেবা ও বাণিজ্য ব্যবসায়ের প্রতি তিনি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন।

সাত আট বৎসর কাল ব্যবসা করিয়া তিনি বেশ উন্নতিও করিয়াছিলেন। এই সময়ে 'ভারত-বণিক' নামক একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশিত করেন। ইতিপূর্ব্বেই ১২৮৮ সালে তিনি দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। 'দলিত-কুসুম' নামক পুস্তক এই সময় প্রকাশিত হয়।

১২৯৩ সালে বিজনী ষ্টেটের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়া আসামে গমন করেন এবং তথায় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ১৫ বৎসর কাল অতীব দক্ষতা ও ন্যায়-পরতার সহিত কর্ত্তব্যকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। কার্য্যব্যপদেশে তিনি স্থানীয় জনসাধারণের ও রাজপুরুষদিগের সবিশেষ শ্রদ্ধালাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

১৩০৮ সালে 'নব্যভারত' পত্রে 'বুয়রযুদ্ধ' নামক সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ সমগ্র প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

১৯০০ খ্রীঃ গবর্ণমেণ্ট ও বিজনী ষ্টেটের মধ্যে গ্যারো পর্ব্বতের সীমা নির্দ্ধারণ করিবার সময় কালীপ্রসন্নকে দারুণ পরিশ্রম করিতে হয়; তখন হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হয়। ১৩০৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় চিকিৎসার্থ আগমন করেন; যথাসময়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেও আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু অগ্রহায়ণ মাসে বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

বিবিধ—নানাবিধ বিপদ ও অশান্তির মধ্যে অবস্থান করিয়াও কালী-প্রসন্ন বাবু অবিচলিতভাবে কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে কখনই পরাঙ্মুখ হন নাই। জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা তাঁহার চিরকালই বলবতী ছিল—তাঁহার পুস্তকাগার সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক বহু পুস্তকে পরিপূর্ণ ছিল। রন্ধন, সূচীকার্য্য, পশু পক্ষী পালন, বাগান প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্যেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। পর-দুঃখ নিবারণে তিনি উন্মুক্তপ্রাণ ও মুক্তহস্ত ছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও পরিবারবর্গের নিমিত্ত অর্থ সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই।

(নব্যভারত ১৩০৮।৫১২-১৮)

কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—

বিবিধ সঙ্গীত রচয়িতা।

জন্ম—বীরভূম জেলার অন্তর্গত সিউড়ীর সন্নিকট মঙ্গলডিহি নামক গ্রামে মাতামহাশ্রমে ১২৬২ সালে শ্রাবণ মাসে জন্ম গ্রহণ করেন।

মৃত্যু—১৩০২ সাল ১৭ই ফাল্গুন দোলপূর্ণিমার রাত্রি বীরভূম-সিউড়ীর সন্নিকট আড্ডা নামক গ্রামে নিজ ভবনে জলাতঙ্ক রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

বংশতালিকা—১১ দৈবকীনন্দন, ১০ লোকনাথ, ৯ বল্লভ ৮ শ্রীরাম, ৭ নগেন্দ্র, ৬ হরেকৃষ্ণ ৫ কৃষ্ণকান্ত, ৪ রামজয়, ৩ রামধন, ২ ক্ষেত্রনাথ, ১ কালীপ্রসন্ন।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কল্‌সা নামক গ্রামে পিতা ক্ষেত্রনাথের জন্ম-ভূমি। তিনি বীরভূম জেলার অন্তর্গত মঙ্গলডিহি নামক গ্রামে বিবাহ করেন। এই গ্রামে মাতামহাশ্রয়ে কালীপ্রসন্ন জন্ম গ্রহণ করেন। সূতিকা-গারেই তিনি মাতৃহীন হন, এই নিমিত্ত তিনি আশৈশব মাতামহী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। পিতা ক্ষেত্রনাথ, পুনরায় নিজ শ্যালিকার পাণি-গ্রহণ করেন।

কালীপ্রসন্নের মাতামহী সিউড়ীর নিকটবর্ত্তী আড্ডা নামক গ্রামে নিজ পিতৃভবনে কালীপ্রসন্নকে লইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। কালীপ্রসন্ন প্রত্যহ সিউড়ী যাতায়াত করিয়া ক্রমে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সিউড়ী বঙ্গবিদ্যালয়ে চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি সিউড়ী নিবাসী জমীদার স্বর্গীয় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত সুবৃহৎ শব্দাভিধান "শব্দজ্ঞানকল্পদ্রুম" সঙ্কলনে সহায়তা করিতেন।

সর্ব্বশেষে তিনি সিউড়ী মিউনিসিপাল আপিসে পঁচিশ টাকা বেতনে ট্যাক্স-দারগা ও খাজাঞ্চীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

('দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়' দেখুন)

কালীপ্রসন্ন কালীমন্ত্রের উপাসক ছিলেন—তিনি পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া ছিলেন।

গুরুতত্ত্ব, মানস-পূজা, বৈরাগ্য, ব্রহ্ম-সঙ্গীত, শিবসঙ্গীত, আগমনী, কৃষ্ণ-কালী, কালীকৃষ্ণ, কৃষ্ণ, দুর্গা, গঙ্গা, কালী, ষটচক্রভেদ প্রভৃতি বিষয়াবলম্বনে কালীপ্রসন্ন অতিসুন্দর ভাবপূর্ণ সুমিষ্ট বহুতর গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদী ও বাউল সুরের গান গুলি অতি সুন্দর। ইঁহার অধিকাংশ গান এখনও অপ্রকাশিত।

কালীপ্রসন্নের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল—তিনি সুন্দর চিত্রাঙ্কণ করিতে পারিতেন।

("রতন লাইব্রেরী পুথী",—বীরভূমি)

(ক্রমশঃ)

শ্রীশিবরতন মিত্র।

বায়ু সনে।

(গদ্য-পদ্য)

ভাই বাতাস, তুমি বড় দুষ্ট। সারা দিনের পরিশ্রমের পর আমার ভগ্ন কুটীরের খোলা পিড়াঁয় জ্যোছনাটি বুকে করে বেশ ঘুমায়ে পড়েছিলাম। তা' তোমার প্রাণে সহিল না। হটাৎ হু হু করে এসে উপস্থিত। জ্যোছনা লজ্জায় জড়সড় হয়ে মেঘের আড়ালে লুকা'য়ে গেল। মোটা মোটা ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির ছাট মেরে গা ও বিছানা ভিজিয়ে দিয়ে ঘুম ভাঙ্গালে। ধুর-মুরিয়ে উঠে কুটীরের মধ্যে ঢুকে দেখি বিছানা এমনি ভিজেছে যে তা'তে আর শোওয়া চলে না। মনে করিলাম রাত্রিটা জেগেই কাটাব। কিন্তু কৈ তা'পারি? যত রাজ্যের ঘুম আজ আমার চোখে এসেছে—কিছুতেই চোখ মেলতে পারছি না। কি করি মাটীতেই শুই। ঘুমের কাছে মাটী আর বিছানা?

আবার ঘুম টুকু বেশ ঘোর করে এসেছিল। কিন্তু তুমি এমনি লুকালে যে গরমের চোটে ঘুম ভেঙ্গে গেল। না, আজ তুমি আমায় ঘুমাতে দিবে না। এস, তোমার সঙ্গে গল্প করে রাত কাটাই।

আচ্ছা, বল দেখি ফুলের সৌরভ কেন তুমি হরণ কর? কি সুখ পাও? কি গৌরব তোমার বাড়ে? যখন তুমি তা'র সৌরভটুকু চুরি করে পালিয়ে যাও, তখন কি একবার ভাব যে সে তোমার ব্যবহারে কিরূপ মর্ম্মাহত? তোমায় পেয়ে সে আহ্লাদে তোমার কাছে হৃদয় খুলে দেয়, আর তুমি তা'র যথা-সর্ব্বস্ব লুটে নাও! ছি! এ কাজটা কি ভাল? কি তোমার উপযুক্ত? তুমি হয়ত বলিতে পার:—"যার সৌরভ আছে, সে কেন তাহা আপন হৃদয়াভ্যন্তরে লুক্কায়িত রাখিবে? কেন সে সারা সংসারকে বিলাইয়া লুটাইয়া সে সৌরভ সার্থক করিবে না? সে সৌরভ আমি চুরি করি সত্য, কিন্তু তাহা জগতের জন্য। তোমরা তাহাকে এত ভালবাসিতে কি যদি আমি অকাতরে তাহার সৌরভ তোমাদিগকে বিতরণ না করিতাম? আমি সৌরভ বহন করি বলিয়াই মধুলিহ মধুর সন্ধান পায়। আমার চৌর্য্য পরের জন্য। আমি সঞ্চয়ী নহি, যে সঞ্চয়ী সে বঞ্চক—আপনাকে বঞ্চনা না করিলে, জগতকে বঞ্চনা না করিলে, সঞ্চয় হয় না। বঞ্চককে বঞ্চনা করি তা'তে পাপ কি? স্বীকার করি সঞ্চয়ীর সঞ্চয়নাশে মনস্তাপ হয়। এক জনের দুঃখে যদি দশ জনের সুখ হয় তাহাতে দোষ কি? এ পৃথিবীতে দুঃখ-বিরহিত সুখ কোথায়? সুখ সৃজন করিতে গেলেই কোথাও না কোথাও দুঃখের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। তোমাদের রাজধানীর বার্ষিক বিবরণীতে দেখতে পাই, কত কত লক্ষ লক্ষ মুদ্রার সম্পত্তি প্রতিবর্ষে অপহৃত হইতেছে। যাহাদের সম্পত্তি চুরি যাইতেছে, তাহারা দিন দুই হায় হায় করে পরে যে কা সেই। বর্ষে বর্ষে যদি ঐ পরিমাণ সম্পত্তি তাহারা স্বেচ্ছায় সাধারণে বিতরণ করিত, বণ্টন করিত, তাহা হইলে কে কা'র চুরি করিতে চাহিত? যেখানে সঞ্চয়ের বাড়াবাড়ি, সেইখানে চৌর্য্যেরও বাড়াবাড়ি। ইহা বিধাতার সামঞ্জস্য নীতি নহে কি?"

ভাই বাতাস, তোমার ঐ সব কথা না হয় মানিলাম। কিন্তু এ গরীবের উপর তোমার এত অত্যাচার কোন সামঞ্জস্য নীতিমূলক?

এই নিদাঘ মধ্যাহ্নে যতই তোমার শীতল সংস্পর্শ কামনা করি,ততই তীব্র তাপ তোমার নিকট পাই। আবার শীতের সময়ে গায়ে যেন বরফ ঢালিতে

থাক, আবার থেকে থেকে রেগে কেঁপে উঠে ঝটকা মেরে আমার পর্ণ কুটীরের মটকা ভেঙ্গে দাও। এ সকল বাহ্যিক অত্যাচার আমার পক্ষে এক্ষণে সহিয়া গিয়াছে। কিন্তু তোমার আন্তরিক * অত্যাচার আমাকে ম্রিয়মাণ করিয়া তুলিয়াছে। আমার শৈশব প্রাঙ্গণটী কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল, কিছু মাত্র আবর্জ্জনা তথায় ছিল না। ভবের মোহমায়াদি ধূলিকঙ্করবালুকায় প্রাঙ্গণখানি এখন জঞ্জালে পরিপূর্ণ। সর্ব্বদাই ভাবি কিরূপে পূর্ব্ববৎ উহা নির্ম্মল সুন্দর হয়। সাধ্যের মধ্যে কোন উপায়ই পাই না।

মনে সাধ ছিল এ ক্ষুদ্র জীবনতরিখানি উজান বাহিয়া ধীরে ধীরে ঐ যে ওপারে যেখান হইতে ঐ শান্তির আলোক আসিতেছে, ঐখানে যাইয়া সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইব। কিন্তু পশ্চিমাকাশের মেঘের মত আমার ক্ষুদ্র আমিত্বটুকুকে ফেলাইয়া ফাঁপাইয়া এমন দিগন্তপ্রসারী অন্ধকারে পরিণত করিলে এবং প্রখর ঝঞ্ঝাবায়ুর সহিত শিলাবৃষ্টি বিভীষিকায় কোথায় ভাসাইয়া আনিলে আমি তাহা কিছুই এক্ষণে ঠিক করিতে পারিতেছি না। যে আলোকটি দেখিয়া জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়াছিলাম, তাহা সেই অন্ধকারে কোথায় অন্তর্হিত হইল।

সংসারের রীতিই এই—সমর্থ অসমর্থকে, সবল দুর্ব্বলকে নিগৃহীত করে। তুমি সমর্থ, সবল, আমি অসমর্থ, বলহীন, সুতরাং তোমা কর্ত্তৃক আমি পাঁচ রকমে † উৎপীড়িত হইতেছি, ইহাতে কিছুই নূতনত্ব নাই। কিন্তু আমি জানিতে চাই, আমাকে পীড়ন করিয়া তুমি কি সুখ পাও? যদি পাও তবে আমি তোমার পীড়ন সহ্য করিতে রাজি আছি; আর যদি না পাও তবে আমার সঙ্গে মিশিয়া স্থির, ধীর, শান্ত হও *।

তুমি হয়ত বলিবে "আমি বড় তুমি ছোট, আমি উচ্চ তুমি নীচ তোমার সহিত এক হইব কেন?

মানি তুমি বড়, তুমি উচ্চ। কিন্তু যাঁর শক্তির কণা পাইয়া তুমি আপনার এই গৌরব করিতেছ, তাঁর কাছে সেই অনন্ত দেবের নিকট, তুমিও যে বুদ্বুদ, আমিও সেই বুদ্বুদ। আমি আজ তোমাকে আশ্রয় করিতে চাহি-

* আন্তরিক অত্যাচার "বাই" সংঘটিত, এ কথা না বলিলেও চলে।

† প্রাণ, অপান প্রভৃতি পঞ্চ বায়ু।

* কুম্ভক হয় বায়ু স্থির হইলে। তখন আর বানরের চঞ্চলতা থাকে না। তখন মন মানুষের বশে আসে। এখন আমরা মনের বশ।

তেছি, আর তুমি আশ্রিতকে উপেক্ষা করিতেছ। কাল যদি তোমার আশ্রয় দাতা আকাশ তোমাকে ঐরূপ প্রত্যাখ্যান করে, তাহা হইলে তোমারও যে দশা আমারও সেই দশা। এ কথা ভাবিবার অবসর কি তোমার নাই? বাহিরে তুমি বড় আছ, বড় থাক, আমি ছোট আছি, ছোট থাকি; কিন্তু এস আমরা অন্তরে অন্তরে প্রাণে প্রাণে গোপনে মিশিয়া এক হইয়া থাকি। তোমার কাজ আর আমার কাজ উভয়ে উভয়ের অনুকূল হউক। না, তুমি আমার কোন কথাই শুনিলে না, সারা রাত জাগিয়া আমার বকাই সার হইল। প্রকৃতি যার চঞ্চল, তাঁকে হিত কথাও বলিতে নাই, বলিতে গেলে সে মিত্রকে শত্রু জ্ঞান করে রেগে ওঠে।

ওই ভোর হয়ে এল। কাক কোকিল ডাকিতে আরম্ভ করেছে। উষা পূর্ব্ব গগনে ধীরে ধীরে স্বীয় প্রভা বিস্তার করিতেছে। ভক্তগণ জেগে প্রভাতী ভজন ধরেছে। রাত্রিতে ঘুমতে পেলাম না দিনের বেলায় এমনি ঘুম আসবে যে অনেক কর্ত্তব্য কাজে অবহেলা, ত্রুটি হইবে। যাও ভাই বাতাস! তুমি নিজের কাজে যাও। করুণানিদান ভগবানের পুণ্যময় নাম স্মরণ করে আমিও আমার কাজে যাই। আজিকার মত বিদায়।

শ্রীস—ক।

লালাবাবু

অদৃষ্ট চক্রের আবর্ত্তনে পতিত হইয়া মানব এই সংসারে কখন সুখসমীরণ সেবনে পরমানন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, কখন বা দুঃখ-ঝটিকায় নিক্ষিপ্ত হইয়া সোণার সংসারকে বিষতুল্য নিরীক্ষণ করিতে বাধ্য হয়। সে সময় কখন তাহার ধনক্ষয় হয়—কখনও তাহার মানাপচয় হয়। এমন কি কখন তাহার অমূল্য জীবন নষ্ট হইবারও উপক্রম হয়। বৃন্দাবনে ঈশ্বরোপাসনার্থ সর্ব্বত্যাগী হইয়া বাস করিতে যাইয়াও লালাবাবুকে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে করিতে অনেক বার বিপদসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বে তাঁহার একটী বিপদের উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণ পুনরায় আর এক অভিনব বিপদের কথা প্রকাশ করিব।

এক সময় বৈষয়িক ব্যাপারে ভরতপুররাজ লালাবাবুর প্রতি বিশেষ ক্রুদ্ধ

হইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদনের অনুমতি প্রদান করেন। তদনুসারে কতকগুলি লোক বৃন্দাবনে লালাবাবুর আবাসে উপনীত হয়। লালাবাবু ভীত হইয়া প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত লুক্কায়িত হন। রসোড়া-নিবাসী রাধামোহন ঘোষ নামক এক ব্যক্তি বৃন্দাবন বাসের নিমিত্ত লালাবাবুর নিকট অবস্থিতি করিতেন। তিনি অতি সুপুরুষ ছিলেন, ভরতপুররাজের প্রেরিত পদাতিকবৃন্দ লালাবাবুর অবর্ত্তমানতায়—তাঁহাকেই লালাবাবু ভাবিয়া হত্যা করিয়া ফেলে এবং মস্তক ছেদন করিয়া লইয়া তাহাদের প্রভুর নিকট প্রদান করে। বলা বাহুল্য যে, ভরতপুররাজ শত্রুর নিপাতে বিশেষ আনন্দিত হন।

ইতিপূর্ব্বে লালাবাবু একবার বৃন্দাবনের জনৈক প্রধান ভক্ত কৃষ্ণদাস বাবাজীর নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে গমন করেন, কিন্তু লালাবাবু তখনও তাঁহার শিষ্যের উপযুক্ত গুণপণার অধিকারী হইতে পারেন নাই বলিয়া কৃষ্ণদাস লালাবাবুকে অনেক উপদেশ প্রদান করেন। অতঃপর তাঁহার অনুমতি ক্রমে লালাবাবু ভরতপুর রাজের নিকট (অরিপুরে) ভিক্ষার্থ গমন করেন, সেই সময় লালাবাবু ভরতপুর রাজকে আত্মপরিচয় প্রদান করিলে ভরতপুররাজ তাঁহার বহুবিধ সদগুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হন। এবং এরূপ সাধু-প্রকৃতির মনুষ্যকে তিনি একদা সামান্য কারণে বা অকারণে বিনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া ও তাঁহার অলীক মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হন। ভরতপুররাজ এই সময় লালাবাবুকে কৃষ্ণচন্দ্রিমার সেবার নিমিত্ত ভিক্ষা-স্বরূপ অনেকগুলি ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন।

দেব প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য সম্পাদনান্তে লালাবাবু বাল্যকাল হইতে যে উদ্দেশ্য মহৎ এবং প্রিয়তম ভাবিয়া আশৈশব হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, তৎসাধনার্থ কৃতসংকল্প হন।

এইবার আমরা লালাবাবুর বৃন্দাবনে শেষ জীবনের কঠোর ব্রত পালন এবং অসাধারণ ত্যাগ স্বীকারের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাঠকগণকে প্রদান করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বীরভূমি সংক্রান্ত নিয়মাবলী

১। বীরভূমির আকার ডিমাই আটপেজী পাঁচ ফর্ম্মার কম হইবে না।

২। বীরভূমি প্রতিমাসের প্রথম দশদিনের মধ্যে প্রকাশিত হইবে। মাসের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে আমাদের পত্র লিখিবেন।

৩। বীরভূমির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা মাত্র। এক খণ্ডের মূল্য ৵১০। নমুনা পাইতে হইলে ৵১০ টিকিট পাঠাইতে হয়।

৪। বিজ্ঞাপনের হার,

মলাটে	১ পৃষ্ঠা	মাসিক	৩৲
"	½ "	"	২৲
বিজ্ঞাপনের ভিতর	১ "	"	২॥৹
"	½ "	"	১॥৹

প্রতি লাইনে /১০।

বহু দিনের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে আমরা স্বতন্ত্র চুক্তি করিয়া থাকি। বিজ্ঞাপনের টাকা অগ্রিম দেয়।

শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য্য বি, এ,
ম্যানেজার।
কীর্ণহার, জেলা বীরভূম।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

৫ম খণ্ড বীরভূমির ৫ সংখ্যা গ্রাহকগণের নিকট প্রেরিত হইল। এখনও বহু গ্রাহক মূল্য দেন নাই। গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন অনতিবিলম্বে আপন আপন দেয় মূল্য পাঠাইয়া দেন। অথবা যদি আপত্তি না থাকে, তবে আমরা ভিঃ পিঃ ডাকে কাগজ পাঠাইয়া মূল্য আদায় করিব। যাঁহাদের আপত্তি আছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সত্বর জানাইবেন। ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না। পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ ও জীবন গ্রাহকগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে। ইহা স্মরণ করিয়া গ্রাহকমহোদয়গণ কার্য্য করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য্য, বি, এ,
ম্যানেজার।

কলিকাতা, ৩০/৫ মদনমিত্রের লেন, নব্যভারত-প্রেসে,

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৫ম খণ্ড] ভাদ্র, ১৩১২ [৯ম সংখ্যা।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ,

সম্পাদিত।

সূচী।

কীর্ণাহারের সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশহিতৈষী জমিদার শ্রীযুক্ত
বাবু সৌরেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের সম্পূর্ণ
ব্যয়ে বীরভূম জেলার অন্তর্গত
কীর্ণাহার গ্রাম হইতে
শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য্য বি, এ
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
২রা ভাদ্র—১৩১২।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ১৷৹। এই সংখ্যার মূল্য ৵১০।

৫ম খণ্ড] ভাদ্র, ১৩১২ [৯ম সংখ্যা।

বৈজ্ঞানিকের ভুল নহে

অপূর্ণতা ও অজ্ঞতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, অসীম অনন্ত পরব্রহ্ম বিকাশ প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করিয়া, এক হইতে বহুরূপে জন্মিবার ইচ্ছা করিয়া, ইচ্ছাশক্তি পরিচালন দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছেন, সান্ত ও সসীম (১) হইয়াছেন। সৃষ্টির আদিতে তিনি ইচ্ছা করিলেন, তিনি সঙ্কল্প করিলেন, "আমি বহু হইয়া জন্মি," তাহা হইতে এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড (২)। অসীম ও অনন্ত ব্রহ্ম অপ্রকাশিত অবস্থায় চিন্তার অগম্য, দর্শনের ও শ্রবণের অগম্য, তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়। পরমব্রহ্ম প্রকট হইবার ইচ্ছা বা সঙ্কল্প করামাত্র তিনি সীমাবদ্ধ হইলেন, প্রকাশিত হইলেন, মায়া (ব্রহ্ম যাহার দ্বারা পরিমিত বা সীমাবদ্ধ হয়েন, যথা নাম ও রূপ) দ্বারা আবদ্ধ হইলেন। তিনি তাঁহার অসীম ও অনন্ত অবস্থা হইতে একাংশমাত্র প্রকাশিত হইলেন। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—"আমি এই অখিল বিশ্ব আমার একাংশ দ্বারা ধারণ করিয়া আছি।" (৩) সুতরাং যদিও এই বিপুল বিশ্ব অপ্রকাশিত, অসীম, অনন্ত পরব্রহ্ম হইতেই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি তাঁহার ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় নাই, তিনি অপ্রাকৃত (প্রকৃতি বা সৃষ্টির অতীত) অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ

(১) অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্য স্যোক্তাঃ শরীরিণঃ। (গীতা ২।১৮)

(২) তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়। (উপনিষদ)

(৩) বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ। (গীতা ১০।৪২)

রূপে প্রাকৃত (সৃষ্ট) অবস্থার সহিত মিশিয়া যান নাই। (He is not merged in his works)। উপনিষদ্ এই বিষয় উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যেমন পিতা হইতে পুত্র জন্মে, মনুষ্য দেহে রোমাবলি জন্মে, পৃথিবীতে ঔষধি বৃক্ষাদি পর্ব্বত জন্মে, ঊর্ণনাভ স্বীয় দেহাভ্যন্তর হইতে তন্তু বাহির করিয়া জাল প্রস্তুত করে, কিন্তু পিতা, দেহ, পৃথিবী ও ঊর্ণনাভের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় না। পরমব্রহ্মের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে এই বিশেষত্ব যে তিনিই উপাদান কারণ (যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ) এবং তিনিই নিমিত্ত কারণ (যেমন কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত কারণ)।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধের শেষে বলিয়াছি যে, বেদান্ত ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এক সূত্রে গ্রথিত। এই বিষয় কিছু স্পষ্টীকৃত করিতে চেষ্টা করিতেছি। পাশ্চাত্য দার্শনিক প্লেটো বলেন, এক অপ্রত্যক্ষ, অতি সূক্ষ্ম, বিশ্বোপাদান জড়ের আদিম সত্তা হইতে ঐ বিশ্ব প্রসূত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন তাহাকে প্রকৃতি বা প্রধান বলেন। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার তাহাকে অনন্তকাল স্থায়িনী মহাশক্তি বলেন (Everlasting energy)। বেদান্ত একটু ঊর্দ্ধে গমন করিয়া বলেন, এই প্রকৃতি সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণময়ী অর্থাৎ তিনটী গুণ বা ব্রহ্মের বিশেষ শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ, অগ্নির চিন্তা করিতে হইলেই দাহিকা শক্তির এবং দাহিকা শক্তির চিন্তা করিতে হইলেই অগ্নির চিন্তা করিতে হয়। শক্তি স্বীকার করিলেই শক্তিমানের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। এই তিন গুণ বা শক্তি যখন ব্রহ্মে সাম্যাবস্থায় থাকে, অর্থাৎ একটী অপরটীকে পরাভূত করিয়া প্রবলতর হইতে পারে না, তখন ব্রহ্মেরও প্রকাশ হয় না, ব্রহ্মের বহু হইবার ইচ্ছা হইলেই এই গুণসাম্য ভঙ্গ হয় ও ব্রহ্ম প্রকাশিত হয়েন, অর্থাৎ শক্তির দ্বারা শক্তিমান্ প্রকাশিত হন। ইহা বিজ্ঞানসম্মত।

আলোকের ও অন্ধকারের জ্ঞান, উষ্ণতার ও শৈত্যের জ্ঞান পরস্পর সাপেক্ষ। যেখানে শুধু আলোক, সম্পূর্ণ আলোক, অসীম অনন্ত আলোক, সেখানে আলোক অপ্রকাশিত। এইরূপ সম্পূর্ণ অন্ধকার, সম্পূর্ণ উষ্ণতা, সম্পূর্ণ শৈত্য অপ্রকাশিত। যেমন Negative বিদ্যুৎ ও Positive বিদ্যুৎ একত্র থাকিলে তাহা প্রকাশিত হয় না, সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন আলোক ও অন্ধকার, নিরবচ্ছিন্ন উষ্ণতা ও শৈত্য একত্র অবস্থান করিলে, একটী অপরটী অপেক্ষা প্রবলতর না হইলে কেহই প্রকাশিত হইতে পারে না। পরব্রহ্মে

যখন মায়া বা প্রকৃতি লীন থাকেন, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তমগুণ সকলেই সম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে, তখন সকলেই অপ্রকাশিত, অচিন্তনীয়, অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়। ইহারই নাম পরব্রহ্ম, নিরাকার অর্থাৎ আকার অপ্রকাশিত। বাস্তবিক "আকার নাই" ইহা হইতে আকার জন্মিল, এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। বিজ্ঞান ও দর্শন সমস্বরে বলেন—"না সতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ," যাহা নাই তাহা হইতে কিছুই জন্মিতে পারে না, যাহা আছে তাহারাও একান্ত বিনাশ হইতে পারে না। আমরা সাধারণতঃ স্থূল দৃষ্টির অগোচর অতি সূক্ষ্মাকারকে নিরাকার বলিয়া থাকি, বাস্তবিক "নাই" কখনও "অস্তি" হয় না। এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, সাংখ্যাচার্য্যগণের মতে সত্ত্ব, রজ ও তমগুণ মহাণু পদার্থ।

এখন দেখা যাইতেছে যে, অসীম অনন্ত পরব্রহ্ম অপ্রকাশিত, তাঁহার কোন চিন্তা বা জ্ঞান সম্ভবে না। পরব্রহ্ম জ্ঞান ও চিন্তার বিষয়ীভূত হইলেই তিনি বিকাশিত, সীমাবদ্ধ, মায়াবদ্ধ হইলেন। যে মায়া দ্বারা তিনি পরিমিত বা সীমাবদ্ধ হন, তাহা কি? সে মায়া—নাম ও রূপ। আকাশ বা ইথার যাহাই বলুন তাহা মায়া। এই মায়া অর্থে অস্তিত্ব হীন ভাব বা চিন্তা নহে, মায়া বা প্রকৃতি ব্রহ্মের প্রকাশকারিণী শক্তি।

সত্ত্ব, রজ ও তম গুণকে প্রকৃতি বলে। আবার সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিন শক্তিকে সম্বিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী শক্তি বলে, এই শক্তির শক্তিমানই সচ্চিদানন্দময় পুরুষ। পরম পুরুষ বা পরমাত্মার এই তিন শক্তিই জগৎ প্রকাশিত করিয়া কার্য্য করিতেছেন। হিন্দুদিগের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ও পরম পুরুষ বা পরমাত্মার সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের বিকাশাবস্থা। এক পরমাত্মাই তাঁহার অংশ বিশেষ দ্বারা তিন আত্মা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর) রূপে বিরাজিত। এই তিন আত্মা একই পরমাত্মার তিন ভাব।

এখন একবার বিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। মনে করুন, একটী মানব দেহ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই দেহে ঐ তিনটী আত্মা বা পরমাত্মার তিন ভাবই কার্য্য করিতেছে। যাহাকে আমরা মানবাত্মা (জীবাত্মা) বলি, তাহা মন, বুদ্ধি অহঙ্কার দ্বারা গঠিত। ইহা ব্যতীত জড়াত্মা ও সর্ব্ব পদার্থের শৃঙ্খলাকারী আত্মা (organism) কার্য্য করিতেছেন। শরীরের কোন স্থান ছেদিত হইলে চতুর্দ্দিকে মাংস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সেই ভিন্ন স্থান পূর্ণ করে, ইহা জড়াত্মার কার্য্য। প্লীহা ও যকৃৎ, ও অন্যান্য শারীরিক যন্ত্রের

কার্য্য, শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় এবং মস্তিষ্কের ভিতর চিন্তা গ্রহণের শক্তির কার্য্য (প্যালী সাহেব যাহাকে ডিজাইন্ বলেন) শৃঙ্খলাকারী আত্মার দ্বারা সম্পাদিত হয়। কোন লতিকা গাছে উঠিবার জন্য তাহার অগ্রভাগ কোঁক্ড়াইয়া বড়শীর রকম করে, ইহাও আত্মার কার্য্য। এই তিন আত্মাই মহেশ্বর, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা। জড়বাদিগণের এই তিন আত্মার কোন না কোন একটীর মধ্যে আসিতেই হইবে।

পরম ব্রহ্ম বিকাশ প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করিয়া আকাশ বা সূক্ষ্ম ইথার তাঁহা হইতে প্রকটিত করিয়া আত্মারূপে তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। আকাশ হইতে মরুৎ, তাহা হইতে তেজ, তাহা হইতে অপ্ ও তাহা হইতে ক্ষিতি হইল। কিরূপে হইল? আকাশের গুণ শব্দ তন্মাত্র, অর্থাৎ শব্দ বা সূক্ষ্ম আকাশের গুণ হইতে আকাশ, এইরূপে অন্যান্য তন্মাত্র হইতে মরুৎ, তেজ, অপ্ ও ক্ষিতি হইল। ইহা সাংখ্য ও বেদান্তের সৃষ্টি প্রক্রিয়া। এই ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, এই কয়েকটীর মধ্যেই উক্ত তিন আত্মা বা পরমাত্মার ভাব আছে, তাহা না থাকিলে ইহাদের অস্তিত্বই সম্ভবে না। ইহারা বিকাশ প্রাপ্তই হইতে পারে না, এবং নিরবচ্ছিন্ন সত্ব-আত্মা, রজ-আত্মা, ও তম-আত্মা থাকিতেই পারে না।

পরব্রহ্ম হইতে ক্রমবিকাশের পদ্ধতি ক্রমে জড় জগতে স্থূল ক্ষিতি, স্থূল অপ, স্থূল তেজ, স্থূল মরুৎ ও স্থূল আকাশ বা ইথার হইল। ইহারা একই পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থামাত্র অথবা একই শক্তির বিভিন্ন স্পন্দনমাত্র। স্থূল পদার্থ ব্যতীত তদনুরূপ সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর, তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম ক্ষিতি অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম আছে। প্রাণশূন্য, অস্তিত্বশূন্য কিছুই নাই ও থাকিতেও পারে না। যাহাকে আমরা সাধারণতঃ প্রাণী বলিয়া থাকি, তাহার মধ্যে পর্ব্বত, খনিজ পদার্থ, উদ্ভিদ, কীট পতঙ্গ, মৎস্য, পক্ষী, পশু, মানব, প্রেত, গন্ধর্ব্ব, দেবতা, উচ্চ শ্রেণীস্থ দেব, অসুর প্রভৃতি আছেন। পরব্রহ্ম হইতে ক্রমে সমস্তই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া নিম্নে নামিয়াছে ও ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে, ইহাই সৃষ্টিরহস্য।

এখন মনুষ্য শরীর ও মনুষ্য আত্মা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। মানব দেহ একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, অথবা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সার সংগ্রহ। আবরণ বা কোষ ব্যতীত আত্মা বিকাশিত (Manifested) হইতে পারেন না। মনুষ্য তিনটী শরীর অথবা পাঁচটী কোষ যুক্ত জীবাত্মা। যাঁহারা বলেন, এই স্থূল

দেহই মানব, যাঁহারা বলেন সূক্ষ্ম দেহই মানব, যাঁহারা বলেন প্রাণই মানব, যাঁহারা বলেন মনই মানব, যাঁহারা বলেন বুদ্ধিই মানব, যাঁহারা বলেন বিশুদ্ধানন্দই মানব, তাঁহারা সকলেই আংশিক সত্যমাত্র প্রচার করেন। এই সমস্ত একত্র মিলিত হইয়া যে জীব গঠিত হয়, তাহাই মানব। হিন্দু-দিগের যোগ শাস্ত্র মনকে সর্ব্বতোভাবে বিশ্লেষণ করিয়া যাহা পাইয়াছেন, বিজ্ঞান তাহার ভ্রম প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

আত্মা ও Soul এক একা নহে। "The soul is the human intellect, the link between the divine spirit in man, and his lower personality. ক্রমোন্নতির দ্বারা মনুষ্যের নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটী অহং জ্ঞান জন্মে। ইতর প্রাণীর তাহা হয় না। এই অহঙ্কার ও মনুষ্যের বুদ্ধি ও পরমাত্মা যিনি মনুষ্যের মধ্যে বাস করেন, এই কয়েকটী মিলিয়া মনুষ্য সংজ্ঞায় অভিহিত হন। পরমাত্মা ও অহঙ্কারের মধ্যবর্ত্তী বুদ্ধিকে Soul বলে। সুতরাং সমস্ত প্রাণীরই জীবাত্মা আছে সত্য, কিন্তু মনুষ্যের নিম্নস্থ প্রাণিবর্গের Soul নাই ও অহঙ্কারও নাই। কিন্তু কতক কতক উত্তর প্রাণীর অহং জ্ঞান জন্মিতেছে (যেমন গৃহপালিত কুক্কুর, অশ্ব, হস্তী ইত্যাদি)। ইতর প্রাণীর, মনুষ্যের ন্যায় বুদ্ধি জন্মে নাই। স্মরণশক্তি, চিন্তাশক্তি, ভাল মন্দ বিচারের শক্তি প্রভৃতি একত্র মিলিত হইয়া বুদ্ধি শক্তি হয়। ইতর প্রাণীর সুখ ও দুঃখ ক্ষণস্থায়ী, কুক্কুরের অঙ্গবিশেষ ছেদন করিলে তৎপর ক্ষণেই আহার করে। জড় ও ইতর প্রাণীর মধ্যে জড়াত্মা অধিক কার্য্যক্ষম। এই জন্য দেখা যায়, ইতর প্রাণীর গাত্রে কিম্বা অসভ্যজাতীয় লোকের গাত্রে কোন আঘাত লাগিলে তাহা অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য হয়। বহুদর্শিতার দ্বারা বুদ্ধি জন্মে। ইতর প্রাণী অভ্যাসের উপর বেশী নির্ভর করে। সে যাহা হউক, এখন মানবাত্মা কি, তাহাই দেখা যাউক। মানবাত্মা কি, তাহা স্থির হইলে, মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি, তাহাও জানা যায়।

বৈদান্তিকেরা আত্মার পঞ্চকোষের (Sheaths) বিষয় উল্লেখ করেন। এই পঞ্চ আবরণের মধ্যে সর্ব্ববহিঃস্থ আবরণ স্থূল শরীর। ইহা পিতৃমাতৃ-ভুক্ত অন্নের বীর্য্য ও শোণিত দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং অন্নের দ্বারা পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়, এই জন্য ইহার নাম অন্নময় কোষ। তৎপরবর্ত্তী কোষ প্রাণময়, ইহা পঞ্চপ্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান) বায়ুদ্বারা ও পঞ্চ কার্য্যেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) দ্বারা গঠিত। তৎপরবর্ত্তী কোষ মনো-

ময়, ইহা মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক) দ্বারা গঠিত। তৎপরবর্ত্তী কোষ বিজ্ঞানময়, ইহা বুদ্ধি ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা গঠিত। তৎপরবর্ত্তী কোষ আনন্দময় কোষ। এই কোষ জ্ঞান বিজ্ঞানের অতীত বিশুদ্ধ প্রীতি, আমোদ আনন্দময়। অন্নময় ও প্রাণময় কোষদ্বারা মনুষ্যের স্থূলদেহ, প্রাণময় ও মনোময় কোষ দ্বারা সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর বা কাম শরীর (desire body)গঠিত হয় এবং মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষদ্বারা কারণ শরীর গঠিত হয়। আনন্দময় কোষ পরমাত্মা ও জীবাত্মার পার্থক্য রক্ষা করে মাত্র, ইহা অতীব সূক্ষ্ম। যাঁহারা জ্ঞানের উপাসক, তাঁহারা বিজ্ঞানময় কোষ ধ্বংস করিয়াই পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন। যাঁহারা ভক্তির বা পরমপ্রেমের উপাসক, তাঁহারা জ্ঞান অজ্ঞানের পরে শুধু আনন্দময় কোষে অবস্থান করিয়া পরমাত্মা ও জীবাত্মার দ্বৈত ভাব স্থির রাখেন, তাঁহারা দ্বৈতবাদী। মানব জীবনের উদ্দেশ্য এই পঞ্চকোষকে সম্পূর্ণ উন্নত করা। সর্ব্ব প্রথমে অন্নময় কোষকে উন্নত করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে বিশুদ্ধ আহার, বিহার ও কর্ম্ম করিতে হইবে। তৎপর প্রাণময় কোষকে রাজযোগের প্রাণায়াম দ্বারা উন্নত করিতে হইবে। তৎপর মনোময় কোষকে উন্নত করিতে হইলে বিশুদ্ধ চিন্তা ও শুদ্ধ কামনা বা পবিত্র বাসনা দ্বারা করিতে হইবে। তৎপর বিজ্ঞানময় কোষকে জ্ঞান চর্চ্চার দ্বারা ও চৌষট্টি কলা অভ্যাস দ্বারা উন্নত করিতে হইবে। আনন্দময় কোষকে উন্নত করিতে হইলে ভক্তিযোগ দ্বারা করিতে হইবে। ভক্তিযোগ কি ? উত্তর—নববিধ সাধনাখ্যা ভক্তি। মানব জীবনের প্রয়োজন কি ? উত্তর—প্রেম। প্রেম লাভের উপায় নববিধ ভক্তি। এই প্রেম কোন্ মানবের প্রয়োজন ? উত্তর যে মানব নিজের সহিত শ্রীভগবানের সম্বন্ধ ও দ্বৈতভাব অক্ষুণ্ণ রাখে। ভগবানের সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ কি ? উত্তর—জীব ভগবানের নিত্য দাস।

সমাপ্ত

শ্রীজানকীনাথ পাল।

লালাবাবু।

বৈষ্ণব মাত্রেই মথুরান্তর্গত গোবর্দ্ধনের পবিত্রতা সম্বন্ধে বিশেষরূপ অবগত আছেন। তথাকার রমণীয়তা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। গিরি-গোবর্দ্ধন অসংখ্য তরুলতা বক্ষে ধারণ করিয়া কি এক অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কোথাও ঘনসন্নিবিষ্ট নিম্ববৃক্ষ, কোথাও তমাল বৃক্ষ-রাজি, কোথাও বা কদম্ব তরুদল সুদীর্ঘ শাখা প্রশাখা বিস্তার করতঃ সর্ব্বদাই জন-মনো-লোচনের তুষ্টি সম্পাদনে নিয়োজিত রহিয়াছে। কোথাও বিহঙ্গের সুমধুর কলধ্বনি, কোথাও সমীরণের মৃদুল হিল্লোল প্রদান করিয়া গোবর্দ্ধন সর্ব্বদাই প্রকৃতির সেবায় অগ্রসর হইতেছে। স্থানে স্থানে গিরিগুহায় ঈশ্বর-পরায়ণ যোগিবৃন্দ ধ্যানমগ্ন রহিয়া গোবর্দ্ধনের পবিত্রতা বর্দ্ধন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তার নিমিত্ত সন্ন্যাসিবৃন্দ যে যে উপকরণ প্রার্থনা করেন, গোবর্দ্ধন তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি প্রদান করিতে সমর্থ; সুতরাং সংসার বিরাগীর ঈশ্বরোপাসনার নিমিত্ত এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান বৃন্দাবনে অতি অল্পই আছে, সন্দেহ নাই। তাই পরমভক্ত বৈষ্ণবচূড়ামণি লালাবাবু ঈশ্বরোপাসনার্থ গোবর্দ্ধনকেই বাসোপযুক্ত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তথায় লালাবাবুর কুঞ্জ প্রস্তুত হইল; তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্তই সে কুঞ্জে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

লালাবাবু গোবর্দ্ধনে স্বীয় কুঞ্জের নিকটে 'জায়েন' মন্দির নামক একটী উৎকৃষ্ট মন্দির ও তন্মধ্যে 'রংজী' নামক একটী প্রতিকৃতির প্রতিষ্ঠা করেন।

লালাবাবু পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণদাস বাবাজীকে যথার্থ এবং পরম যোগী জ্ঞানে বিশেষ ভক্তি করিতেন; লালাবাবুর প্রতিও তাঁহার আন্তরিক যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। সেই কারণ লালাবাবু উক্ত সন্ন্যাসীর নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা শ্রবণ করিলে মনুষ্য মাত্রকেই স্তম্ভিত হইতে হয়। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও বৃন্দাবনে ভিক্ষুকবেশে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ভাণ্ডারে জীবের উদরানল নির্ব্বাণোপযোগী সমুদয় উপকরণ বর্ত্তমান থাকিতেও তিনি কতদিন অভুক্ত থাকিতে অনুমাত্র কষ্ট অনুভব করিতেন না। পরের উদর পূরণ জন্য যিনি

সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন এবং নিজের মুখের আহার্য্য পরের ভোগের নিমিত্তই যিনি উৎসর্গ করিয়া মনের প্রীতি সম্পাদন করিতেন, দেবদ্বিজ অতিথি-সেবা যাঁহার জীবনের মুখ্য ব্রত ছিল, তিনি কিরূপ প্রকৃতির মনুষ্য ছিলেন, তাহা অনায়াসেই মানব মাত্রেরই অনুমেয়।

কৃষ্ণদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া লালাবাবু প্রথমতঃ প্রসাদ ভোজন করিতেন। অতঃপর সে আহার ত্যাগ করিয়া তিনি মাধুকরী (অর্থাৎ মধুকরেরা যেরূপ নানা পুষ্প হইতে মধু সঞ্চয় করিয়া উদর পূরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন গৃহস্থের বাটী হইতে ভিক্ষালব্ধ খাদ্য সংগ্রহ) দ্বারা নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। লালাবাবু যতই চেষ্টা করুন না কেন, তাঁহার সেই উদর পূর্ত্তির জন্য তাঁহাকে কখনই অধিক বাটীতে ভিক্ষার্থে গমন করিতে হইত না।

প্রত্যহ লালাবাবুর আহারের নিমিত্ত অতি সুন্দর সুন্দর রুটী প্রস্তুত করিয়া ব্রজবাসিগণ তাঁহার আগমন-পথ নিরীক্ষণ করিত। অদ্যাপি ব্রজধামে একপ্রকার রুটী প্রস্তুত হয়, তাহা "লালাবাবুর রুটী" নামে বিখ্যাত। তিনি যাঁহার বাটী ভিক্ষার্থ যাইতেন, তিনিই তাঁহাকে প্রচুর খাদ্য দ্রব্য প্রদান করিতেন; সেই কারণ তিনি পরে প্রত্যহ আর একাধিক গৃহে গমন করিতেন না। তাহাতেও তাঁহার দিনেকের জন্যও উদর পূরণের ব্যাঘাত ঘটে নাই। শত চেষ্টা করিয়াও লালাবাবু তাঁহার প্রতি সাধারণের সহানুভূতির পথে কণ্টকারোপে অপারগ হইতেন। অতঃপর তিনি সন্ধ্যার সময় কম্বলাবৃত দেহে গুপ্তবেশে কোন এক গৃহস্থের আলয়ে ভিক্ষার্থ গমন করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে কোন এক সময়ে সহসা কোন এক গৃহস্থের আলয়ে ভিক্ষার্থ গমন করিয়া যদি কিছু পাইতেন ভালই, নতুবা অভুক্ত হইয়াই কুঞ্জে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন। পরিশেষে লালাবাবু আহার পরিত্যাগ করিয়া ফলমূল, তৎপর শুষ্ক পত্র চর্ব্বণ দ্বারাই জীবন কাটাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এবম্প্রকারে লালাবাবু স্বীয় রসনা ও উদরকে নিজের দাসত্বে নিয়োগ বিষয়ে সফলকাম হইয়াছিলেন। যোগের এমনি প্রভাব, সন্ন্যাসীর এমনই পরাক্রম। মনুষ্য যে রসনার তৃপ্তি সাধনার্থ দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতেছে, উদরের নিমিত্ত যাহার ক্ষণমাত্র বিশ্রামের অবসর নাই, লালাবাবু কিরূপে সেই উদরকে আয়ত্ব করিয়াছেন, অস্মাদৃশ অজ্ঞানের হৃদয়ে অবশ্য এ প্রশ্ন উদিত হওয়া অসম্ভব নহে। যে শক্তি লাভ করিয়া লালাবাবু উক্ত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা লাভ করা অনায়াসসাধ্য নহে। সেই অপূর্ব্ব শক্তি

লাভের নিমিত্তই যোগী ঋষিগণ সর্ব্বদাই ধ্যান-নিমগ্ন, সেই শক্তি লাভের নিমিত্তই মনুষ্যকে স্বার্থত্যাগরূপ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হয়। সেই শক্তি লাভের নিমিত্তই সংসারের সুখ, স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পত্তি সমস্তই বিস্মৃত হইয়া তরুতল ও গিরিগুহা বা নির্জ্জন প্রদেশের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। লালাবাবু বহুদিন হইতে সাধনা করিয়াই এই সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শেষ জীবনে লালাবাবু আর কোন সংসারী লোকের সহিত মিলিতেন না। শুনা যায়, একদা বৃন্দাবনের শেঠ বংশোদ্ভব পারকৃজী, লালাবাবুর সহিত গোবর্দ্ধনে সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলে লালাবাবু বলিয়া পাঠান যে "যদি তিনি (পারকৃজী) সন্ন্যাসীর বেশে আসিতে পারেন, তাহা হইলেই অভ্যর্থিত হইবেন, নতুবা নহে।"

ব্যাপার এই যে, পারকজীও বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু লালাবাবু যখন শ্রেষ্ঠীকে তাঁহার অনুগমনের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি অস্বীকৃত ও পশ্চাৎপদ হন। সম্ভবতঃ তখন পর্য্যন্ত পারকজী সংসারসুখ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। হয়ত অর্থ তাঁহার নিকট তখনও সন্ন্যাস জীবন অপেক্ষা মধুর বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের পর লালাবাবু সংসারাসক্ত মনুষ্যের সহিত কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত কহিতে নিতান্ত যে অনিচ্ছুক ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু কাহিনীই ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

গোয়ালিয়রের মহারাণী গোবর্দ্ধনে লালাবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে লালাবাবু তাঁহার সহিত আলাপ করিতে অনভিপ্রায় প্রকাশ করেন। যাহা হউক, যখন মহারাণী লালাবাবুকে পরম সাধু জ্ঞানে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন, তৎকালে লালাবাবু মহারাণীর নিকট হইতে দ্রুতপদে পলায়ন করেন। সেই সময় সহসা মহারাণীর অশ্ব লালাবাবুকে পদাঘাত করে! সেই আঘাতেই লালাবাবু ভূতলশায়ী হন। অতঃপর অন্যান্য ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া তাঁহার গোবর্দ্ধনস্থ কুঞ্জে লইয়া যান। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার গুরুদেবের অঙ্কে শয়ন করিয়া রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি সন্দর্শন করিতে করিতে ১২২৮ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথিতে * ৪৬ বৎসর বয়সে,

* কথিত আছে, মৃত্যুকালে লালাবাবুকে তাঁহার গুরুদেব জিজ্ঞাসা করেন, বৎস, তুমি এখন কি দেখিতেছ? তাহাতে তিনি উত্তর করেন 'গুরো, ৺ কৃষ্ণচন্দ্রমাজিও ও

ভক্তপ্রবর সাধু লালাবাবু, মর্ত্ত্যলোক হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করেন। এতাদৃশ সাধুর অসাময়িক মৃত্যুতে কিয়ৎক্ষণের জন্য জগৎ যেন নিষ্প্রভ হইল, প্রকৃতি দেবীর শোভা মলিন হইয়া গেল, সমীরণের ক্রীড়া বন্ধ হইল, পক্ষিকুল স্তম্ভিত হইয়া অরবে বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিল।

ন্যূনাধিক অশীতি বর্ষ হইল, লালাবাবু স্বর্গে গমন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবাসী কেন তাঁহার নাম বিস্মৃত হইতে পারিতেছে না? কেন অদ্যাবধি প্রত্যহ উত্তর ভারতে সেই পবিত্র নামের বিজয় ঘোষণা হইতেছে? লালা-বাবুর অলৌকিক ধর্ম্মানুরাগ-জনিত সৎকীর্ত্তিই তাঁহার নামের স্মৃতি জাগরিত করিতেছে। বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতির অলোকসামান্য স্বার্থত্যাগই অদ্যাপি আবালবৃদ্ধবনিতার অন্তঃকরণে লালাবাবুর নাম স্মরণ করাইয়া দিতেছে। জগৎ হইতে একটী রত্ন বিলুপ্ত হইলে পুনরায় কোন ক্রমেই সেরূপ আর একটী রত্ন দৃষ্ট হয় না। পাঠক! আর কয়টী রাজা রামকৃষ্ণ দেখিতে পাই-তেছ? আর কয়জন লালাবাবু তোমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে?

লালা বাবুর মৃত্যু কাহিনী আলোচনা করিলে আমরা একটী উৎকৃষ্ট বিষয়ের উপদেশ লাভে সমর্থ হই। যদি পৃথিবীতে পাপ পুণ্যের অস্তিত্ব সম্ভবে, যদি মনুষ্য পাপ ও পুণ্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাহাদের ফলভোগে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সে ফলভোগ মানবের ইহ জন্মে নহে, পরজন্মে। এ কথা মিথ্যা হইলে লালাবাবুর কখনই অকালে অশ্বপদাঘাতে অপমৃত্যু সংঘটিত হইত না।

লালাবাবুর এই আকস্মিক অপমৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে অস্মদ্দেশে একটী অন্তঃসারবিহীন জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। মনুষ্য অনায়াসে মনুষ্যের মৃত্যুর কারণ স্থির করিয়া দিয়াছে, ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক, আমরা সাধারণের অবগতির নিমিত্ত প্রসঙ্গক্রমে সেই জনশ্রুতির উল্লেখ করিতেছি। "দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন" নামক পুস্তক লালাবাবুর মৃত্যু প্রসঙ্গে এ জনশ্রুতির পোষকতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

লালাবাবুর আমলে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত রেল পথ প্রস্তুত হয় নাই, সেই কারণ তিনি নৌকারোহণে বৃন্দাবন ধাম গমন করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি

রাধাবল্লভজীকে দর্শন করিতেছি। এ কথা শুনিয়া গুরুদেব বলেন, বৎস ভাল করিয়া দেখ দেখি, তাহাতে লালাবাবু বলিয়াছিলেন যে "রাধাকুণ্ডের ঘাটে রাধাকৃষ্ণ উভয়ে পাশা খেলা করিতেছেন, ইহা দেখিতেছি।"

এই যে, "পথি মধ্যে বারাণসীর ঘাটে পৌঁছিয়া তিনি (লালাবাবু) স্বীয় নৌকার আবরণ (পরদা) ফেলাইয়া দিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, বৈষ্ণবের শৈব তীর্থ ক্ষেত্র কাশী দর্শন অনুচিত বিবেচনায় লালাবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় লোচনদ্বয়কে কাশী দর্শন বিষয়ে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। এই পাপেই তাঁহার অপমৃত্যু ঘটে। বলা বাহুল্য যে, জন শ্রুতির অসাধ্য কিছুই নাই। হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ সুধী পরম ভক্ত বৈষ্ণবচূড়ামণি লালাবাবু এইরূপ অশাস্ত্রীয় ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া যে শৈবগণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া সুপবিত্র কাশী দৃশ্য দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, এ কথার উপর কথনই আস্থা স্থাপন করা যায় না। যাঁহার বৈষ্ণব শাস্ত্রে বিশেষ অধিকার আছে, তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে—

"পরাৎপর তরং যান্তি নারায়ণপরায়ণঃ।
নতে তত্র গমিষ্যন্তি যে দ্বিষন্তি মহেশ্বরং॥
যোমাং সমর্চ্চয়েং নিত্যমেকান্তং ভাবমাশ্রিতঃ।
বিনিন্দিন দেবমীশানং স যাতি নরকাযুতং॥

অন্যত্র চ

মদ্ভক্তঃ শঙ্করদ্বেষী মদ্দ্বেষী শঙ্করপ্রিয়ঃ।
উভৌ তৌ নরকং যাতৌ যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ॥
১৪শ বিলাসঃ। ৬৫। হরিভক্তি বিলাসঃ।

অনুবাদঃ—স্বয়ং ভগবানই বলিয়াছেন যে, নারায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করেন, এ কথা যথার্থ কিন্তু যদি তাঁহারা মহেশ্বরের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে উক্ত ধামে গমনে সক্ষম হন না।

একান্ত ভাবাশ্রয় করিয়া যে সর্ব্বদাই আমার পূজা করে, কিন্তু ঈশ্বরের নিন্দা করিয়া থাকে, সে অযুত সংখ্যক নরকে গমন করে।

অন্যত্রেও যদি আমার ভক্ত শঙ্কর দ্বেষী হয় এবং শঙ্কর ভক্ত আমার প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করে, তাহা হইলে উভয়েই চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে॥ ৬৫॥

অতএব হয় শীর্ষ পঞ্চরাত্রে।

শ্রীহরিহর প্রতিষ্ঠায়াং শ্রীভগবতৈ চোক্তং।
যঃ শিবঃ সোঽহমেবেহ যো ইহং স ভগবান্ শিবঃ.
নাবয়ো রন্তরং কিঞ্চিদাকাশা নিলয়োরিব॥
বহ্বচ পরিশিষ্টে॥

শিবায় বিষ্ণুরূপায় শিবরূপায় বিষ্ণবে।
শিবস্থ হৃদয়ং বিষ্ণুর্বিষ্ণোস্ত হৃদয়ং শিবঃ॥
১৪ বিলাসঃ। ৬৬। হরিভক্তি বিলাস।

অতএব হয় শীর্ষ পঞ্চরাত্রে শ্রীহরির প্রতিষ্ঠায় শ্রীভগবান কহিয়াছেন—যিনি শিব তিনিই আমি, যিনি আমি তিনিই শিব যেমন আকাশ ও বায়ুর অর্থাৎ কারণের সহ কার্য্যের ভেদ নাই, সেইরূপ আমাদেরও অভিন্ন জানিবে।

বহ্বৃচ পরিশিষ্টে শিবরূপী বিষ্ণু ও বিষ্ণুরূপী শিব শিবের হৃদয় বিষ্ণু ও বিষ্ণুর হৃদয় শিব॥৬৬॥

শ্রীভগবানুবাচ।
অহং ব্রহ্মাচ সর্ব্বশ্চ জগতঃ কারণং পরং।
আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ং দৃগ বিশেষণ॥
৪৭ শ্লোক শ্রীমদ্ভাগতম।৪৬। ৭অ।

আমাকে যে জগতের আদি কারণ আত্মা, ঈশ্বর, সমস্ত বিষয়ের সাক্ষী ভেদ ভ্রান্তি বিহীন বলিয়া দর্শন করিতেছে, সেই আমি, ব্রহ্মা এবং শিব।

তাস্মিন ব্রহ্মণ্য দ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি।
ব্রহ্ম রুদ্রৌচ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোঽনু পশ্যতি॥
৪৯ শ্লোক। শ্রীমদ্ভাগবতম।
৪স্ক। ৭অ।

আমি একমাত্র অদ্বিতীয়, পরমাত্ম স্বরূপ এবং পরব্রহ্ম। অজ্ঞান ব্যক্তিগণ ব্রহ্মা, মহাদেব ও ভূতনিচয়কে আমা হইতে ভিন্ন বলিয়া দর্শন করে!

ত্রয়াণামেক ভাবানাং যোন পশ্যতি বৈভিদাং।
সর্ব্ব ভূতাত্মণাং ব্রহ্মণ্ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥
৫১ শ্লোক। শ্রীমদ্ভাগবতম।
৪স্ক। ৭ম।

ব্রহ্মা শিব এবং আমি আমরা এক এবং সকল ভূতের আত্মা। যিনি আমাদের মধ্যে পার্থক্য না দেখেন, অর্থাৎ তিনকই এক দেখেন, হে ব্রহ্মণ, তিনিই শান্তি লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

তথাহি

কথং বা ময়ি ভক্তিং স লভতাং পাপপুরুষঃ।
যো মদীয়ং পরং ভক্তং শিবং সম্পূজয়েন্নহি॥

যে আমার পরম ভক্ত শিবের সম্যক্ প্রকারে পূজা না করে, সেই পাপ পুরুষ কিরূপে আমাতে ভক্তি লাভ করিবে ?

"শ্রীবদনে কৃষ্ণচন্দ্র বোলেন আপনে।
শিব যে না পূজে সেবা মোরে পূজে কেনে ?
শ্রীচৈতন্যভাগবত। ৪র্থ অধ্যায়।"

মোর প্রিয় শিব প্রতি অনাদর যার।
কেমতে বা মোরে ভক্তি হইবে তাহার ॥
অন্ত্য খণ্ড। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত (৪র্থ অধ্যায়।

অন্যত্র চ—

যঃ শিবঃ সোহমেবেহ যোঽহং স ভগবাঞ্ছিতঃ।
নাবয়ো রন্তরং কিঞ্চিদাকাশানিলয়োরিব ॥

যেই শিব সেই আমি, যেই আমি সেই শিব। আকাশের সহিত অনিলের যেরূপ পার্থক্য আমার সহিত শিবেরও সেই পার্থক্য।

শিবস্ত শ্রীবিষ্ণোর্যা ইহ গুণ নামাদি সকলং।
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ অথলু হরিনামাহিতকরঃ ॥

যে শিবের ও শ্রীবিষ্ণুর নামে, গুণে ভেদজ্ঞান করে, সে নিশ্চয়ই হরিনামের অহিত করে।

লালাবাবুর স্বর্গ গমনের পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার পত্নী বিখ্যাতা রাণী কাত্যায়নী কান্দী রাজসম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিলেন। লালাবাবুর মৃত্যুর সময় তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীনারায়ণ সিংহের বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র, সে সময় রাণী কাত্যায়ণীই পুত্রের অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাণী কাত্যায়ণীর সময়ে কান্দীর রাজষ্টেট্ আরও উন্নত হইয়াছিল। রাণী কাত্যায়ণী সৎকার্য্যে ও পরোপকারব্রতে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেন। শ্রীনারায়ণ সিংহ তিনটী দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কাহারই গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মে নাই। তাঁহার রামমোহিনী ও শ্যামমোহিনী নামে কন্যা ছিলেন।* এবং তাঁহার জীবদ্দশাতেই দ্বিতীয়া পত্নীর মৃত্যু হয়। শ্রীনারায়ণ সিংহ তাঁহার প্রথমা† ও তৃতীয়া পত্নীদ্বয়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি প্রদান

† ইনি মুর্শিদাবাদে ঝাঁকুরাণী নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইঁহার নাম তারাসুন্দরী, ইনি পাঁচথুপীর স্বর্গীয় বাবু নিত্যানন্দ ঘোষ হাজরার কন্যা।

* পাঁচথুপীর স্বনামপ্রসিদ্ধ জমীদার স্বর্গীয় কালিদাস ঘোষের সহিত প্রথমার ও কৃষ্ণগোপাল ঘোষ মৌলিকের সহিত দ্বিতীয়ার বিবাহ হয়।

করিয়াছিলেন, তদনুসারে জ্যেষ্ঠা পত্নী রশোড়া নিবাসী কৃষ্ণসুন্দর ঘোষের (রাণীকাত্যায়ণীর ভ্রাতার) দ্বিতীয় পুত্র হরিমোহন (পরে প্রতাপচন্দ্র) ও কনিষ্ঠা পত্নী তৃতীয় পুত্র রামমোহনকে (পরে ঈশ্বরচন্দ্র) দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ইঁহাদের দ্বারাও কান্দীর রাজ সম্পত্তির যথেষ্ট পুষ্টি সাধিত হয়। প্রতাপচন্দ্র অনেক সৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই তিনি গভর্ণ-মেণ্টের নিকট হইতে "রাজাবাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। শিক্ষা বিষয়ে প্রতাপচন্দ্রের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। কান্দীর ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতাপচন্দ্রের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। প্রতাপচন্দ্রের গিরিশচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র. কান্তিচন্দ্র, ও শরচ্চন্দ্র নামে চারি পুত্র এবং প্রভাবতী, লীলাবতী ও প্রিয়ম্বদা (১) নামে তিন কন্যা ছিলেন, পুত্রগণের মধ্যে এখন শরচ্চন্দ্রই জীবিত। কান্দীর গিরিশচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয় স্বর্গীয় রাজা গিরিশচন্দ্রের সাধারণ হিতকর কার্য্যে আসক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। রাজা পূর্ণচন্দ্রের সতীশচন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্র নামক দুই পুত্র। কিছুদিন গত হইল শ্রীশচন্দ্র কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

আমরা মধ্যে মধ্যে সতীশচন্দ্রের দানশীলতার কথা শুনিতে পাই। কান্তিচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র অপুত্রক। গিরিশচন্দ্র পূর্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশ-চন্দ্রকে দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের ইন্দ্রচন্দ্র ও অমর-চন্দ্র নামক দুইটী পুত্র ও কৃষ্ণকামিনী (২) নামে এক কন্যা জন্মে। অমরচন্দ্র বাল্যাবস্থাতেই কালকবলে পতিত হন। অল্পদিন হইল ইন্দ্রচন্দ্রও ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইন্দ্রচন্দ্র দুইটী বিবাহ করেন, তাঁহার জীবিতা-বস্থাতেই প্রথমা পত্নীর মৃত্যু ঘটে, উক্ত পত্নীর গর্ভে একটীমাত্র কন্যা হইয়া-ছিল তাঁহার নাম সরস্বতী (৩)। ইন্দ্রচন্দ্রের কনিষ্ঠা স্ত্রী সাহিত্য জগতে সুপরি-

(১) পাঁচথুপীর বুনীয়াদী জমীদার বংশীয়, নম্রশীল শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণানন্দ ঘোষ রায় মহাশয়ের সহিত ইঁহার (প্রিয়ম্বদার) বিবাহ হয়। কয়েক বৎসর হইল প্রিয়ম্বদা অকালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার একমাত্র স্বর্গীয়া কন্যা কৃষ্ণকুমারী "দুহিতার বিলাপ" নামক একখানি কবিতা পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

(২) জজানের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন ঘোষ মহাশয়ের সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছে।

(৩) পাঁচথুপীর মৌলিক বংশীয়, কুলে শীলে, রূপে গুণে ও বিদ্যায় সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ জমী-দার শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক মহাশয়ের সহিত সরস্বতীর বিবাহ হয়। সরস্বতী অল্প বয়সেই বহুগুণের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। স্বদেশের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট মমতা ও

চিন্তা ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখিকা রাণী মৃণালিনী বর্ত্তমান * "প্রতিধ্বনি" "কল্লোলিনী" "নির্ঝরিণী" প্রভৃতি কয়েকখানি ইঁহার লিখিত কবিতা পুস্তক আছে। ইঁহার গর্ভে সন্তান সন্ততি জন্মে নাই। ইন্দ্রচন্দ্র ইঁহাকে পোষ্য পুত্র গ্রহণের অনুমতি দেওয়ায় ইনি ইঁহার ভ্রাতাকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহার নাম অরুণচন্দ্র। আজকাল কান্দীর রাজবংশীয়েরা কলিকাতার অধিবাসী। কোন কোন যাত্রা মহোৎসবাদি উপলক্ষে কেহ কেহ কচিৎ কান্দীতে আগমন করেন মাত্র।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক।

কালীপ্রসন্ন সিংহ—

"মহাভারত" (মূল সংস্কৃত হইতে বঙ্গভাষায় গদ্যানুবাদ,—পুরাণ-সংগ্রহ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত ১ম গ্রন্থ), "হুতোম প্যাঁচার নক্সা," "বিক্রমোর্ব্বশী" (সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ) রচয়িতা, এবং 'পরিদর্শক' নামক পত্রিকা সম্পাদক।

বংশ পরিচয়—স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ, কলিকাতার অন্তর্গত যোড়া-

শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে অল্প দিন হইল সেই আদর্শ মহিলা অকালে দেশের লোককে কাঁদাইয়া, পবিত্রচেতা স্বামীর হৃদয়ে দুঃখ যাতনা প্রদান করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সত্যেন্দ্রনারায়ণ নামক একটী পুত্র ও শৈলেশকুমারী এবং কনককুমারী নাম্নী দুই কন্যা বর্ত্তমান।

* ১৯০৫ সালের ১৫ই জুন তারিখে, ন্যূনাধিক অষ্টাবিংশ বৎসর বয়সে, মৃণালিনী (১৮৭২ সালের ৩ আইনানুসারে) বৈধব্য দশায়, বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেনকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আর আমরা এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে চাহি না, তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমরা মহাত্মা লালাবাবুর গুণপণায় বিমুগ্ধ হইয়া মনোল্লাসে একদিন যে পুস্তকের মুখবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, সহসা লালাবাবুর প্রপৌত্র-বধূ (?) মৃণালিনীর এই কার্য্যে লালাবাবুর পবিত্র কুল কলঙ্কিত হইতে দেখিয়া গভীর দুঃখের সহিত আমাদিগকে সেই পুস্তকের উপসংহার করিতে হইল।

সাঁকোর সুবিখ্যাত কায়স্থ জমীদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহ, সার্ টমাস রম্‌বেল্ড ও মিঃ মিডলটনের নিকট মুর্শীদাবাদ ও পাটনায় দেওয়ানী কর্ম্ম করিতেন। শান্তিরাম সিংহের দুই পুত্র ১ প্রাণকৃষ্ণ ও ২ জয়কৃষ্ণ। জয়কৃষ্ণের পুত্র নন্দলাল। নন্দলাল সিংহ, স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের জনক।

সমগ্র অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের বঙ্গানুবাদ, স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের মহীয়সী কীর্ত্তি। বহু কৃতবিদ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর সহায়তায় ক্রমিক আট বৎসরকাল (১৭৮০—১৭৮৮ শক) পরিশ্রমের পর এই অনুবাদ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। এই বিরাট ব্যাপারে যে বিপুল অর্থব্যয় হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। সিংহ মহাশয় এই "মহাভারত" গ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন।

"১৭৮০ শকে সৎকীর্ত্তি ও জন্মভূমির হিতানুষ্ঠান লক্ষ্য করিয়া ৭ জন কৃতবিদ্য সদস্যের সহিত আমি মূল সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। তদবধি এই আট বর্ষকাল প্রতিনিয়ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া বিশ্বপতি জগদীশ্বরের অপার কৃপায় অদ্য সেই চির সঙ্কল্পিত কঠোর ব্রতের উদ্‌যাপন স্বরূপ মহাভারতীয় অষ্টাদশ পর্ব্বের মূলানুবাদ সম্পূর্ণ করিলাম। অনুবাদিত গ্রন্থ কতদূর সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, তাহা গুণাকর পাঠকবৃন্দ ও সহৃদয় সমাজ বিবেচনা করিবেন। তবে সাহস করিয়া এই মাত্র বলিতে পারি যে, অনুবাদ সময়ে মূল মহাভারতের কোন স্থানই পরিত্যাগ করি নাই ও উহাতে আপাতরঞ্জন অমূলক কোন অংশই সন্নিবেশিত হয় নাই। অথচ বাঙ্গালা ভাষার প্রসাদ গুণ ও লালিত্য পরিরক্ষণার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন পাইয়াছি এবং ভাষান্তরিত পুস্তক সকলে সচরাচর যে সকল দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে, সে গুলির নিবারণার্থ বিলক্ষণ সচেষ্ট ছিলাম।

* * * * *

"আমি বহু যত্নে, আসিয়াটিক্ সোসাইটীর মুদ্রিত এবং সভাবাজারের রাজবাটীর, মৃত বাবু আশুতোষ দেবের ও শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুস্তকালয়স্থিত, তথা আমার প্রপিতামহ দেওয়ান ৺ শান্তিরাম সিংহ বাহাদুরের কাশী হইতে সংগৃহীত হস্তলিখিত পুস্তক সমুদয় একত্র করিয়া বহু স্থানের বিরুদ্ধ ভাবের ও ব্যাসকূটের সন্দেহ নিরাকরণ পূর্ব্বক অনুবাদ করিয়াছি। এ বিষয়ে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের সুবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তিনি এরূপ না করিলে মহাভারতের দুরবগাহ কূটার্থের কখনই প্রকৃষ্টানুবাদ করণে সমর্থ হইতাম না। * *

"মহাভারতানুবাদ সময়ে অনেক স্থলে অনেক কৃতবিদ্য মহাত্মার নিকট আমাকে ভূয়িষ্ট সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট চির জীবন কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ

রহিলাম। আমার অদ্বিতীয় সহায় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং মহাভারত অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং অনুবাদিত প্রস্তাবের কিয়দংশ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধীনস্থ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রচারিত ও কিয়ডাগ পুস্তকাকারেও মুদ্রিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি মহাভারতের অনুবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছি শুনিয়া, তিনি কৃপাপরবশ হইয়া সরল হৃদয়ে মহাভারতানুবাদে ক্ষান্ত হন। বাস্তবিক, বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদে ক্ষান্ত না হইলে আমার অনুবাদ হইয়া উঠিত না। তিনি কেবল অনুবাদেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই, অবকাশানুসারে আমার অনুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন ও সময়ে সময়ে আমি যখন কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিতাম, তখন স্বয়ং আসিয়া আমার মুদ্রাযন্ত্রের ও ভারতানুবাদের তত্ত্বাবধারণ করিয়াছেন। ফলতঃ বিবিধ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পাঠ্যাবস্থাবধি আমি যে প্রকারে উপকৃত হইয়াছি, তাহা বাক্য বা লেখনী দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না।

"এতদ্ভিন্ন আমার প্রিয়চিকীর্ষু বান্ধবেরা ও কলিকাতার অদ্বিতীয় পৌরাণিক শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সোমপ্রকাশ সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, প্রেসিডেন্সী কলেজের বাঙ্গালা সাহিত্যাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলদর্পণ নাটক প্রভৃতির লেখক শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র ও ভাস্কর সম্পাদক শ্রীক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন প্রভৃতি মহাত্মারা অনুবাদ সময়ে সৎপরামর্শ ও সদভিপ্রায় দ্বারা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত অনুবাদিত ভাগ হইতে উৎকৃষ্ট প্রস্তাব সকল সংগ্রহ করিয়া অমিত্রাক্ষর পদ্যে ও নাটকাকারে পরিণত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আমাকে বিলক্ষণ উৎসাহিত করিয়াছেন।

"যে সকল মহাত্মারা সময়ে সময়ে আমার সদস্য পদে ব্রতী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের ব্যাকরণের অধ্যাপক ও সংস্কৃত রঘুবংশের বাঙ্গালা অনুবাদক মৃত চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ, মৃত কালীপ্রসন্ন তর্করত্ন, মৃত ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরমাত্মীয় মৃত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মৃত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও মৃত অযোধ্যানাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ১০ জন অনুবাদ শেষের পূর্ব্বেই অসময়ে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ঐ সকল মহাত্মাদিগের নিমিত্ত আমাকে চিরজীবন যারপর নাই দুঃখিত থাকিতে হইবে।

"একাকার বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত রামসেবক বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি সদস্যদিগকে মনের সহিত সকৃতজ্ঞ চিত্তে বারবার নমস্কার করিতেছি। এই সমস্ত সুবিচক্ষণ সদস্যদিগের কৃপাবলেই আমি অনায়াসে মহাভারত স্বরূপ সমুদ্রের পরপার প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলাম। হিন্দু কলেজের ২য় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালিপদ চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃত যন্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অন্যতর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য ও সরজিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাভারত মুদ্রাঙ্কণ সময়ে, কেহ পুরাণ সংগ্রহ যন্ত্রের তত্ত্বাবধারক, কেহ প্রুফদর্শক ও কেহ

কাপি পাঠক ছিলেন। হুগলি গবর্ণমেণ্ট নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ২য় শিক্ষক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন বহুদিন ভারতানুবাদের পরিদর্শকতা ও শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ পুরাণান্তরের উপদেশ প্রদান করিয়া আমাকে যথেষ্ট উপকৃত করিয়াছেন। ব্রাহ্ম সমাজের বর্ত্তমান উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাক্‌ড়াশী ও ঐ সমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, তথা বর্ত্তমান সহকারী সম্পাদক ও উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি মহাত্মারাও মুদ্রাঙ্কণ ও পুরাণ সংগ্রহ যন্ত্র স্থাপন বিষয়ে আমাকে সম্যক্ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত সমস্ত মহাত্মাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

"হিন্দু সমাজের শিরোভূষণ স্বরূপ সুবিখ্যাত শব্দকল্পদ্রুম গ্রন্থকার পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, মহাভারতের অনুবাদ বিষয়ে আমাকে প্রার্থনাধিক সম্মানিত ও উপকৃত করিয়াছেন। রাজাবাহাদুর প্রতিদিন সায়ংকালে আমার অনুবাদিত গ্রন্থের আনুপূর্ব্বিক পাঠ শ্রবণ করিয়াছেন এবং সময় সময় অনুবাদ বিষয়ক বিবিধ সৎপরামর্শ দ্বারা আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি বিখ্যাত হিন্দু দলপতিরা আমার নির্দ্দিষ্ট পাঠক ছিলেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে যে মহাত্মারা আমার বিতরিত পুস্তক সমুদয় পাইয়াছেন, প্রায় সকলেই প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে পাঠ করিয়া আমাকে ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য করিয়াছেন।"

(অষ্টাদশপর্ব্ব অনুবাদের উপসংহার হইতে উদ্ধৃত)

এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি পরম ভক্তিভাজন স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পুণ্য নাম স্মরণে উৎসর্গ করা হইয়াছিল।

"হুতোম প্যাঁচার নক্সা" গ্রন্থে তৎকালীন কলিকাতা হিন্দু-সমাজের অবিকল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি, সাধারণ ও নিত্য ব্যবহৃত কথোপকথনের ভাষায় রচিত।

"এই নক্সায় একটি কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহার করা হয় নাই সত্য বটে, অনেকে নক্সাখানিতে আপনারে আপনি দেখিতে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি যে সেটি নন তা বলা বাহুল্য, তবে কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই, অথচ সকলেরি লক্ষ্য করেছি। এমন কি, স্বয়ং ও নক্সার মধ্যে থাকিতে ভুলি নাই।"

এই গ্রন্থখানি ১৭৮৪ শকে প্রথম প্রকাশিত হয়।

স্বর্গীয় সিংহ মহাশয়, ১৮৬০ খ্রীঃ হইতে পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামী প্রকাশিত "পরিদর্শক" পত্রিকার কিছুকাল সম্পাদকতা করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত, এই তিন ভাষাতেই সমধিক ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

ইনি, সাহিত্যের ন্যায় সঙ্গীত-বিদ্যারও একজন বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। সঙ্গীত শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে তিনি নিজ বাটীতে একটী সঙ্গীত-সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন; দুঃখের বিষয়, সভ্যগণের মনোমালিন্য বশতঃ এই সমাজ অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। সিংহ মহাশয়, সর্ব্ব প্রথম কলাবতী বীণার তম্বুরার জন্য অলাবুর পরিবর্ত্তে কাগজের তুম্বী নির্ম্মাণ করিয়া সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। সঙ্গীত সমাজ এই নিমিত্ত সিংহ মহাশয়ের নিকট কতক পরিমাণে ঋণী, সন্দেহ নাই।

সিংহ মহাশয়ের বাটীতে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হইত। তাঁহার নিজ অনুবাদিত "বিক্রমোর্ব্বশী" নাটকের অভিনয়ও তাঁহার বাটীতে হইয়াছিল।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ম্মচারিগণের অনুরোধমত কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়, স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করেন। পাদরী লং সাহেব এই অনুবাদ গ্রন্থ আপন নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। এই উপলক্ষে, লংসাহেবের নামে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে তাঁহার এক সহস্র টাকা জরিমানা ও একমাস কারাদণ্ড হয়। সিংহ মহাশয় এই জরিমানার টাকা তৎক্ষণাৎ আদালতে প্রদান করিয়াছিলেন।

কালীপ্রসাদ দ্বিজ—

"মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী" রচয়িতা।

(পরিষদ-পত্রিকা ১০। অতি ১২৩ পৃঃ)

কালীময় ঘটক—

"চরিতাষ্টক" (১ম ও ২য়) "ছিন্নমস্তা" (উপন্যাস); "কৃষিশিক্ষা" "কৃষি-প্রবেশ," "সুরেন্দ্র-জীবনী," "পদ্যময়," "মিত্র-বিলাপ," "মেলা" প্রভৃতি রচয়িতা।

জন্ম—১২৪৭ সাল কোজাগর রাত্রি, নদীয়ার অন্তর্গত রাণাঘাট গ্রামে জন্ম-গ্রহণ করেন।

মৃত্যু—১৩০৭ সাল ৩রা আষাঢ় রাত্রি ৮—৪৯ মিনিটের সময় ৬০ বৎসর বয়সে পরলোক প্রাপ্ত হন।

পিতা, চন্দ্রকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত; ইঁহারা বন্দ্যোবংশীয় রাঢ়াশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ। কালীময়ের পিতামহ, তৎকালীন সম্মানজনক 'ঘটক' উপাধি লাভ করেন। তদবধি ইহঁারা 'ঘটক' বলিয়া খ্যাত।

শৈশব শিক্ষা—কালীময়ের পিতার সাংসারিক অবস্থা তাদৃশ স্বচ্ছল ছিল না। এই নিমিত্ত কালীময়, পাঠশালায় পাঁচ ছয় বৎসর মাত্র পাঠ করিলে পর তিনি তাঁহাকে জমীদারী সেরেস্তায় কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু কালীময়ের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অসাধারণ অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া তিনি পুনরায় কালীময়কে রাণাঘাট স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। রাণাঘাট স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইলে, স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ে অধীনে হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া অসাধারণ অধ্যবসায় এবং প্রকৃষ্ট শিক্ষাপ্রণালী গুণে মাত্র দেড় বৎসর মধ্যেই অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে কালীময় নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

কালীময়, সূত্রধর, দরজী, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি শিল্পদিগের কার্য্যে বিশেষরূপ অভ্যস্ত ছিলেন।

কার্য্যক্ষেত্র—পাঠ শেষ করিয়াই কালীময়, নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভালুকা গ্রামের বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হন। এই স্থানে তিন চারি বৎসর কাল কার্য্য করিলে পর বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বেলেড়া গ্রামের বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া আগমন করেন। এই সময়,তিনি যশোহর জেলার অন্তর্গত বারাকপুর গ্রাম নিবাসী প্রেমচাঁদ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের একমাত্র কন্যা কাশীশ্বরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

বিবাহ

বেলেড়া গ্রামে কিছুদিন কার্য্য করিলে পর, নিজগ্রামের জমীদার পালচৌধুরী মহাশয়দিগের সহায়তায় স্বীয় বাটীর সন্নিকটে একটী বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহারই অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে এই বিদ্যালয়টীর ছাত্র সংখ্যা এত বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, তিনি একক এত গুলি বালকের তত্ত্বাবধারণে অসমর্থ হইয়া চারি পাঁচ জন অতিরিক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

তিনি এই সময়, মজুর ও ব্যবসায়িগণের শিক্ষার নিমিত্ত একটী নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত রাণাঘাটের বালিকাবিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারণের ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কালীময়ের প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গলা স্কুলটী, কয়েক বৎসর পর, তদানীন্তন স্কুল

সমূহের ইন্‌স্পেক্টর গেরেট সাহেব ও রাণাঘাটের জমীদার সুরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী মহাশয়ের উদ্যোগে, রাণাঘাটের ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহিত মিলিত হইয়া যায়।

সাহিত্য-সেবা—'চরিতাষ্টক' গ্রন্থখানি, বঙ্গভাষায় একটী সুপ্রতিষ্ঠিত স্কুল-পাঠ্য পুস্তক। এই পুস্তকখানি লিখিবার জন্য তাঁহাকে অসাধারণ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল। রাণাঘাট নিবাসী বন্ধু শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের (ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট) মৃত্যু উপলক্ষে তিনি 'মিত্র-বিলাপ' নামক পুস্তক রচনা করেন। কৃষি প্রদর্শনী উপলক্ষে 'মেলা' নামক ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক প্রকাশিত করেন। চরিতাষ্টক দুই খণ্ড রচনা করিলে পর কালীময়ের একটী মূক ও বধির পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে—"ছিন্নমস্তা" উপন্যাস খানি এই সময় রচিত হয়; ইহাতে এই মূক ও বধির সন্তানের কতকটা চিত্র অঙ্কিত আছে। তদনন্তর "কৃষি শিক্ষা" ও "কৃষিপ্রবেশ" রচনা করেন। পূর্ব্বোল্লিখিত রাণাঘাটের জমীদার সুরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী মহাশয়ের জীবন বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া সুরেন্দ্র-জীবনী নামক পুস্তক রচনা করেন। ইহার পর তিনি আর কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই।

কালীময়, তিনটী পুত্র সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন—১ম জ্ঞানানন্দ (মূক ও বধির), ২: ধ্যানানন্দ, ৩ কৃষ্ণানন্দ।

(বঙ্গভাষার লেখক ৬৯৩-৯৫পৃঃ)

কালী মির্জ্জা—

'কালিদাস মুখোপাধ্যায়' দেখুন।

কাশীদাস মিত্র মুস্তৌফী—

'অঞ্জন শলাকা', 'আত্মানুভূতি', 'কাশিকা', 'শক্তিতত্ত্বসার', 'গুপ্তলীলা', 'প্রয়াগ মাহাত্ম্য', 'বিবেক রত্নাবলী', 'বিচার দীপিকা', 'জ্ঞান রসায়ন', 'তত্ত্বপ্রকাশ', 'বিচার তরঙ্গিণী', 'প্রেমানন্দ লহরী,' 'সজ্জন রঞ্জন,' ও 'শঙ্কর বিজয়-জয়ন্তী' প্রভৃতি রচয়িতা।

কাশীদাস, হুগলী জেলার অন্তর্গত সুখড়িয়া নিবাসী ৺ দেওয়ান গোবিন্দচন্দ্র মিত্রের পৌত্র। ইহাঁরা দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ; পূর্ব্ব নিবাস, নবদ্বীপ অন্তর্গত উলা, আধুনিক বীরনগর। কাশীদাসের ঊর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ রামেশ্বর মিত্র ঢাকার নবাব বাহাদুরের নিকট "মুস্তৌফী" উপাধি প্রাপ্ত হন।

কাশীনাথ কর্ম্মোপলক্ষে বহুকাল ধরিয়া এলাহাবাদে বাস করেন। শেষাবস্থায় স্থায়িভাবে কাশীতে অবস্থান করিতেন।

কাশীদাস, পারস্য ভাষায় সমধিক ব্যুৎপন্ন ছিলেন। পরে কাশীবাস করিয়া সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষার আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। কাশীদাসের শেষ গ্রন্থ "শঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী" ১৮৬৯ সালে কাশীতে লিখিত এবং ১৮৭১ সালে এলাহাবাদে মুদ্রিত হয়।

প্রবাসী।

কাশীনাথ—

'কালনেমীর রায়বার" নামক কবিতা রচয়িতা।

নিবাস—লক্ষ্মীপুর।

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন—

'ন্যায়দর্শন', 'পুরুষ-পরীক্ষা', 'হিতোপদেশ', 'জ্ঞানচন্দ্রিকা,' 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' প্রভৃতি রচয়িতা।

পুরুষ পরীক্ষা, হিতোপদেশ, প্রবোধচন্দ্রিকা, এই তিনখানি পুস্তক, ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য রূপে নির্দ্ধারিত ছিল।

এই সকল পুস্তকের লিপিপদ্ধতি বিশুদ্ধ হইলেও অতিরিক্ত পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগে তাদৃশ শ্রুতিসুখকর নহে।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ—

সঙ্গীত ও বিবিধ ইংরাজী কবিতা গ্রন্থ রচয়িতা।

জন্ম—১২১৬ সাল ২২শে শ্রাবণ, শনিবার (৫ই আগষ্ট ১৮০৯ খ্রীঃ) খিদিরপুরে মাতামহ রামনারায়ণ বসু সর্ব্বাধিকারীর বাটীতে জন্ম গ্রহণ করেন।

মৃত্যু—১২৮০ সাল ২৭শে কার্ত্তিক (১১ই নভেম্বর ১৮৭৩ খৃঃ) কলিকাতা হেদুয়ার বাটীতে পরলোক গমন করেন।

বংশপরিচয়—কালীপ্রসাদের পিতামহ মুন্সী তুলসীরাম ঘোষ, পূর্ব্বনিবাস হাওড়ার অন্তর্গত পৈতাল নাম গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া, কর্ম্মোপলক্ষে ঢাকায় অবস্থান করিতেন। এখানে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লবণ-কুঠীর দেওয়ান বা খাজাঞ্জী ছিলেন! এই কার্য্যে তিনি বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ১২০৫ সালে এই কার্য্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উঠাইয়া দিলে তিনি কলিকাতা শ্যামবাজারে আসিয়া একটী বৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। তুলসীরামের দুই পুত্র—১ম শিবপ্রসাদ,

২য় ভবানীপ্রসাদ। জ্যেষ্ঠ শিবপ্রসাদের দুই পত্নী; প্রথমা পত্নীর গর্ভে খিদিরপুরে কাশীপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন।

ইঁহারা কুলীন কায়স্থ এবং কলিকাতার অন্যতম বিখ্যাত জমীদার।

শৈশব, শিক্ষা, বাল্যরচনা—কাশীপ্রসাদ মাতৃগর্ভ হইতে সপ্তম মাসে ভূমিষ্ঠ হন এবং তদবধি দ্বাদশবর্ষ কাল পর্য্যন্ত মাতামহাশ্রয়ে অবস্থান করিতেন। ফলে, তিনি কিছু বেশী আদুরে হইয়া পড়িলেন, লেখাপড়ায় তেমন মনোযোগ দিলেন না। এমন কি, এই দ্বাদশবর্ষ বয়সের সময় পর্য্যন্ত তিনি কেবল বর্ণ পরিচয় মাত্র করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি পিতার নিকট তিরস্কৃত হইয়া কলিকাতায় পড়িবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। মাতামহ রামনারায়ণ, এই নিমিত্ত জামাতাকে অনুরোধ করিয়া হিন্দুকলেজে একেবারে তিন শত টাকা জমা দেওয়াইলেন। এইরূপে কাশীপ্রসাদ ১৮২১ খৃঃ ৮ই অক্টোবর তারিখে হিন্দুকলেজে ৭ম শ্রেণীতে অবৈতনিক ছাত্ররূপে ভর্ত্তি হইলেন। অকাতর পরিশ্রমে ও অসাধারণ মেধাশক্তি গুণে, কাশী প্রসাদ ৩ বৎসর মধ্যেই সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। কাশীপ্রসাদ হিন্দু কলেজে সর্ব্বসমেত ৮ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই সময় মধ্যে তিনি প্রতি বৎসর বার্ষিক পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ৩টী স্বুবর্ণ পদক, ৫টী রৌপ্য পদক, ৩৫০ খানি পুস্তক এবং নগদ ৬০০৲ শত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পাঠ্যাবস্থায় (১৮২৭ খ্রীঃ শেষভাগে) অধ্যাপক H. H. Wilson সাহেবের প্ররোচনায় কাশীপ্রসাদ, 'The young poet's first attempt' নামক কবিতা এবং James Mill রচিত সুবৃহৎ ভারত ইতিহাসের প্রথম চারি অধ্যায়ের সমালোচনা করিয়া 'A short review of James Mill's History of British India' নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। এই শেষোক্ত প্রবন্ধটী এত যুক্তি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছিল যে, ইহার একাংশ ১৮২৮ খৃঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ও তৎপরে Asiatic Society's Journalএ পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা বালক কাশীপ্রসাদের পক্ষে কম সম্মানের কথা নহে।

কাশীপ্রসাদ, তৎকালীন হিন্দুকলেজের সুবিখ্যাত কাপ্তেন রিচার্ডসন্, ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি ভারত-হিতৈষী পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট শিক্ষ লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলেই কাশীপ্রসাদের অসাধারণ ধী-

শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন এবং বালক কাশীপ্রসাদও ইহঁাদিগকে পিতৃতুল্য সম্মান করিতেন। ছাত্র কাশীপ্রসাদের কোন সদ্‌যুক্তিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া ডেভিড হেয়ার বলিয়াছিলেন—

The spiritual sermon which Babu Kali Prosad preached on that day appealed to my heart. I do not remember to have heard any such thrilling, eloquent and soul-stirring sermon from any Hindu, not even from any Christain preacher of Calcutta.

সাহিত্য-সেবা—কাশীপ্রসাদ, বঙ্গভাষায় প্রায় ৩০০ শত সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। এই সঙ্গীতগুলি প্রায় অধিকাংশই আদিরসঘটিত এবং পরকীয়া প্রেম বিষয়ক। সঙ্গীতগুলি নিধু বাবুর গানের ন্যায় সুমধুর ভাবে পরিপূর্ণ। ঈশ্বর বিষয়ক গীতগুলিও কবির প্রগাঢ় ভক্তির পরিচায়ক। দুইটী গীত যথা,

(১) (ভৈরবী—আড়া)

কি দিয়ে তুষিব তাঁরে ব'লে আপনার
ফল ফুল যত দেখি সকলি তাঁহার।
প্রচণ্ড প্রতাপী বীর কীটের ক্ষুদ্র শরীর
জীবনে, পতনে যিনি সদা নির্ব্বিকার॥

(বাহার—আড়া)

(২) শ্বেত শতদলোপরে শ্বেতাম্বর কলেবরে
শ্বেতমালা গলোপরে বিরাজে শ্বেতবরণী
বেদ বেদান্ত তন্ত্র নৃত্য গীত বাদ্য যন্ত্র
সকলের মূল মন্ত্র ব্রহ্মময়ী সনাতনী।
চরণের কিবা শোভা মধুলোভে মধুলোভা
লোহিত কমল ভ্রমে ধায়,
সারদা শুভ বরদা অজ্ঞানের জ্ঞানপ্রদা
বিধাতার ধ্যেয় সদা বেদমাতা নারায়ণী।

কাশীপ্রসাদ, বঙ্গভাষা অপেক্ষা ইংরাজী ভাষায় রচনার অধিক মনোযোগী ছিলেন এবং তাহাতেই তিনি সমধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ১৮২৮ খ্রীঃ কলেজ পরিত্যাগ করিয়া তৎকালীন নানাবিধ সাময়িক পত্র

ইংরাজী রচনা। ইংরাজী কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেকগুলি পুস্তক ও প্রবন্ধ (কবিতা ও অন্যান্য বিষয়ক) ইংরাজী ভাষায় রচনা করেন। (১) "The Shair" একখানি ক্ষুদ্র কাব্য, ইহাতে কয়েকটি ইংরাজী তানমান সঙ্গত সুন্দর সঙ্গীত আছে। এই কাব্য খানির নাম প্রথমতঃ "The Minstrel" রাখা হইয়াছিল, কিন্তু পরে এই নাম রাখা হয় (সেয়ার পারস্য কথা= সন্ন্যাসী-নায়ক)। এই কাব্যের বর্ণনা অতি সুন্দর, ইংলণ্ডে ইহার যথেষ্ট আদর হইয়াছিল। (২) "The Hindu Festival" এই কাব্যগ্রন্থে কাশীপ্রসাদ এক একটী হিন্দু উৎসব উপলক্ষ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করেন। এই কবিতাগুলি প্রথমতঃ Calcutta Literary Gazetteএ প্রকাশিত হয়। পরে Shair এর সহিত পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়। স্বভাব-সুলভ প্রাঞ্জলতা গুণে, এই সংক্ষিপ্ত কবিতাগুলির ভাব সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। (৩) 'The Poems' এই পুস্তকেও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কবিতাগুলিও এত সুন্দর যে সুপ্রসিদ্ধ কাপ্তেন রিচার্ডসন্ সাহেব তাঁহার Selection from British Poets নামক কবিতাসংগ্রহ গ্রন্থে কাশীপ্রসাদের এই পুস্তক হইতে "The Boatman's Song to Ganga" নামক গানটী উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে আশাতীত ভাবে সম্মানিত করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে তিনি লিখিয়াছেন—

"Let some of those narrow-minded persons, who are in the habit of looking down upon the natives of India with an arrogant and vulgar contempt, read this little poem with attention and ask themselves if they could write better verses *not in a foreign language* but even in their own."

অর্ম্মণ্ড ইলিয়ট নামক একজন ইংরাজ "Views from India and China" নামক গ্রন্থে কলিকাতা মধ্যে কেবলমাত্র কাশীপ্রসাদের অসাধারণ গুণ গরিমার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,

"In English in which he expressed himself with so much strength, grace and facility as fastly to excite the surprise and admiration of all who judge of the great difficulties to

be encountered in composing poetry in foreign language. His "Shair" established the reputation of his in India and favourably in England. The Boatman's Song to Ganga" is perhaps the most beautiful of any productions from the same pen."

কাশীপ্রসাদ নিম্নলিখিত কয়েকখানি গদ্য ইংরাজী গ্রন্থ রচনা করিয়া ইংরাজী ভাষার উপর তাঁহার অসাধারণ অধিকার প্রদর্শন করিয়াছেন। (১) Memoirs of Indian Dynasties containing, (a) The Scindhiah of Gowalior, (b) King of Lucknow, (c) The Holkar of Indore, (d) The Nowab of Hydrabad, (e) The Gaekwar of Baroda, (f) The Bhonslah of Nagpore, (g) The Nawab of Bhoupal, (২) Sketches of Ranjit Sing, (৩) Sketches of King of Oudh (৪) On Bengalee Poetry, (৫) On Bengalee works and writers, (৬) The Vision—a tale.

On Bengalee works and writers নামক গ্রন্থে, ভারতচন্দ্র, নিধু-বাবু, প্রভৃতি বঙ্গীয় কবিগণের গ্রন্থের সমালোচনা আছে। এই সমালোচনা উপলক্ষে তিনি বঙ্গীয় কবিগণের কবিতা উদ্ধৃত করিয়া, তৎসমুদয়ের যে ইংরাজী অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন,তাহা যেমন মূলানুযায়ী, তেমনই সুন্দর।

দেখি নগরের শোভা বাখানে সুন্দর
সম্মুখে দেখেন সরোবর মনোহর
সানবান্ধা চারিঘাট শিবালয় চারি
অবধূত জটাভস্মধারী সারি সারি
চারিপাশে সুচারু পুষ্পের উপবন
গন্ধলয়ে মন্দবহে মলয় পবন
কুহু কুহু কোকিলা কোকিলগণ ডাকে
গুণ গুণ গুঞ্জরে ভ্রমর ঝাঁকে ঝাঁকে
টল্ টল্ করে জল মন্দ মন্দ বায়
রাজহংস রাজহংসী খেলিয়া বেড়ায়॥

The citys' splendour struck Sundars' eyes.
And see, a charming lake before him lies

With brick-built places four for men to land
And on the bank four Siva's temples stand
In rows the mendicants are seated there
Besmeared with ashes, waiving matted hair
With groves of flowery plants and bank are bound
Where *malay's* soft gale waft odours round
Where cukoos sweetly sing their cooling song
And humming soft the bee's unnumbered throng
Stirred by the breeze, the waters quivering stray
Where male and female swans together play.

১৮৪৫-৪৬ খ্রীঃ কাশীপ্রসাদ "The Hindu Intelligencer" নামক একখানি রাজনীতি ও সাহিত্য বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। তিনি নিজে ইহার সম্পাদক ও সত্ত্বাধিকারী ছিলেন। দ্বাদশ বৎসর কাল অতি দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইয়া, সিপাহী বিদ্রোহের পর সংবাদ পত্রের বিরুদ্ধে আইন পাশ হইলে, ১৮৫৮ খ্রীঃ এই পত্রিকা খানির প্রচার বন্ধ হইয়া যায়।

কাশীপ্রসাদ কলিকাতা ফৌজদারী আদালতের একজন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট এবং Justice of the Peace ছিলেন। তিনি সাধারণ হিতকর কার্য্যে যোগদান করিতেন।

(সাহিত্য কল্পদ্রুম ৩।১২৯-৩৮ ; প্রদীপ ৫।২৮০-৫ বঙ্গভাষার লেখক ২৬৪-৫ ; প্রবাসী ২।২৭৪-৫ ; সংসা ২।৩৭০)

শ্রীশিবরতন মিত্র।

স্মৃতি।

তুমি সকলি ভুলেছ কিগো?
হৃদয়ের মাঝে　　স্মৃতির কুসুমে
আজি কি জাগা'য়ে দিব?
তুমিই আমায় সম্রাট বেশে
স্বর্ণ মুকুট পরায়েছ হেসে,

তুমিই আবার দিয়াছ বিদায়
সাজা'য়ে ভিখারী মোরে !
সে কথা স্মরিতে সখিলো
নয়ন ঝরে !
শৈশব ভোরে দেখিনু তোমায়—
ক্ষুদ্র বালিকা তুমি,
শুভ্র আলোকে উজলিয়া এলে
আমার হৃদয় ভূমি।
সোহাগ আদরে লইনু তোমায়,
খেলিবার সাথী করিলে আমায়,
ফুল ফল ল'য়ে কত খেলিলাম
সারা শৈশব ভরে ;—
সে কথা স্মরিতে আজি গো
নয়ন ঝরে !
আজি সে কথা পড়ে কি মনে ?
বুকের মাঝারে মাথাটি রাখিয়া
চাহিতে নয়ন কোণে।
তোমারে লইয়ে নিভৃত কুঞ্জে
কুসুম তুলিয়া পুঞ্জে পুঞ্জে
মালা গাঁথি' তব পরাতাম গলে,
সাজাতাম কত সাজে।
মনে হ'লে আজি দারুণ
হৃদয়ে বাজে !
সে দিন গিয়াছে, সে সুখ গিয়াছে,
গিয়াছে বনের পাখী ;
চকোর গিয়াছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
পাপিয়া গিয়াছে ডাকি'।
শুভ্র আলোক সোণার বরণ
নিবিয়া গিয়াছে চাঁদের কিরণ,
তুমিত গিয়াছ ছাড়িয়া আমায়,
হয়েছে বাসর ভোর।

তোমারি জাগিয়া উথলে
নয়ন লোর !
সবিত গিয়াছে, রহিয়াছে শুধু
কোমল-কঠিন স্মৃতি।
নিরাশায় কি গো প্রণয়ের শেষ
এই কি জগৎ রীতি !
ব্যর্থ সাধনা, বিফল জীবন,
শুকাইয়ে এল ফুল-যৌবন,
এবারের মত সকলি বিফল,
বুঝিনু জগৎ নীতি।
সবি ত গিয়াছে, রহিল
কেবলি স্মৃতি !

শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীরঙ্গলাল বাবুর গান।

আজি বাঙ্গালার সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন সুপ্রসিদ্ধ লেখক কবি রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি অপূর্ব্ব গান সাধারণকে উপহার দিতেছি। সুরসিক পাঠকগণ গানটি একবার পড়িয়া দেখুন মন কিরূপ মোহিত হয়।

কালাংড়া—ঠুংরী।

কত করুণা তোমার হে নিরন্তর জীবে।
কেবা পারিবে গণিতে, কৃপা কত অবনীতে,
বর্ণিতে রসনা হারে।
(ওহে) মনে হোলে পুলকেতে তনু শিহরে।
ধন্য হে তোমায়, সৃজিলে মায়ায়,
তাই নাথ ! মায় সুতে পালন করেন সস্নেহ ভাবে।
(ওহে) স্তনে ক্ষীর আয়োজন, করিতো হে কোন জন।
অজ্ঞান শিশুর তরে,
যদি হে কাতর হোতে করুণা কোরে ?

মায়ের মমতা যেমন, না পাই খুঁজিয়া তেমন,
শিশুতে কি তার জানে।
হই উদাস উদাস মাকে ভাবিলে মনে।
আঁখি ছল ছল, শত ধারায় জল, বহে হে কেবল,
সকল ভুলিয়া থাকি বিরলে নীরবে।
মাকে না দেখিতে পেলে, বিষাদে দুখের ছেলে,
মা বলিয়া হয় হে অজ্ঞান।
কে আছে জগতে নাথ! মায়ের সমান।
একে সকলি মিছারো, কেহ নহে কারো, তোমার সংসারো,
আরো হোতো হে অসারো, মার্ মায়ার অভাবে।
দিলে চলিতে চরণ, কর করিতে গ্রহণ,
শ্রবণ দিলে শুনিতে,
নাসিকা দিয়াছে নাথ নিঃশ্বাস নিতে।
এই দিয়াছে নয়ন, তাই জেনেছি তোমার—জগত কেমন।
এই মুখ দিলে নাথ করিতে ভোজন।
এই মুখে খাই তাই বাঁচিছে জীবন।
আর কে কোথায় এমন কৃপার উপমা পাবে।
(তোমার) দয়ার তুলনা নাই, তোমায় চিনি না চিনি—জেনেছি তাই,
(তোমার দয়ার তুলনা নাই ওহে জেনেছি তাই,)
জানে শিশু, জানে পশু, পাখীরাও জানে,
(ওহে বনের পাখীরাও জানে।)
জেনে শুনে কেমন্ কেমন্ হই যেন প্রাণে।
ভেবে ভেবে তাই, আকাশ পানে চাই, তোমারে না পাই,
রবি শশী তারা কি আর বুঝাবে।
সবার সাজার ধন, অযাচিত আকাশ ভূষণ,
ভুবন উজ্জ্বল করে।
জুড়ায় জীবের আঁখি জগত হেরে।
কিবা গগন সাজানো, কত মাণিক জুড়ানো,
বিনা দিন, রাত্তির রতনো—
হায় থাকিতে নয়নো অন্ধ হোতো হে সবে।

এই তোমার বসুমতী, হোতেছে হে শস্যবতী,
জীবের জীবিকা জেনে,
ফল মূল তরুলতা দিতেছে এনে।
হা নাথ! আহার বিনে,
সাধের জীবন, হোতোহে নিধন,
এসুখ কেমনে সুখ দিতোহে তবে।
শস্য দিবে বসুন্ধরা, তাই হে জলেতে ভরা,
জলধর দেয় আসি জল
জলধারা বিনা শুধু ধরার কি বল ?
এই বারি বায়ু, জগতের আয়ু, বারিবায়ু বিনা,
কে কোথায় জানি না,
পরাণে বেঁচেছে কবে ?
সাজ আনি মনোমত, সাজাও জগৎকে কত,
তাক্ হোয়ে থাকে আঁখি কোন দিকে চাবে।
কোথা থেকে কি খেলা খেলিছে ভবে !
নাচে মন নাচে প্রাণ, তোমারি ভাবে।
নাচে প্রতি অঙ্গ, হেরে তোমারি তরঙ্গ,
উথলে রস তরঙ্গ,
রঙ্গ কবি নেচে নেচে কত গুণ গাবে।
(ওহে) প্রেমে বিগলিত, চিত আচম্বিত,
হয় চমকিত, বাক্য স্তম্ভিত,
বারেক তোমারে ভেবে।

ভক্তজীবনী।

২

কালিদাস ঠাকুর।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ, নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় শিষ্য, গৌরাঙ্গদাস ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ কালিদাস ঠাকুর পিতা মাতার অন্তর্ধ্যানের পর,

কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ শ্যামদাসের সহ রায়সা গ্রামে অবস্থান করিতে লাগিলেন, সংসারের কোন কার্য্যেই তাঁহার তৃপ্তি বোধ হইতে লাগিল না, কেবল শ্যাম সুন্দরের সেবায় দিবা রাত্র অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, কনিষ্ঠ শ্যামদাসও জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিয়া অতি শুদ্ধাচারে শ্যামসুন্দরের সেবায় নিমগ্ন রহিলেন। পৈতৃক ভূসম্পত্যাদি যাহা কিছু ছিল, তৎসমুদায় দেবার কার্য্যেই ব্যয় হইতে লাগিল, অন্য কোন চিন্তা নাই, ক্রমে সমস্তই হস্তান্তর হইতেছে, দেখিয়া আত্মীয় স্বজনগণ বিষয়াদি রক্ষার দিকে মন দিতে বলিলে, কালিদাস বলিতেন, আপনারা আমাকে ওরূপ অনুরোধ করিবেন না, যে সময়টুকু বিষয়ের দিকে মনোনিবেশ করিব, সেই সময়টুকু শ্যামরায়ের চিন্তা হৃদয় হইতে দূর করিতে হইবে, বিষয়ের চিন্তা একবার হৃদয়ে স্থান দিলে ক্রমেই সমস্ত হৃদয়টুকু তাহারই অধিকার ভুক্ত হইয়া যাইবে, হয়ত শেষে শ্যামরায়ের স্থান আর হৃদয়ে থাকিবে না, আমি এরূপ জঘন্য কাজ কিছুতেই করিতে পারিব না, বিষয় চিন্তা করিতে হইলেই শ্যামরায়ের চিন্তা কমিয়া যাইবে, আমি তাহা কখনই পারিব না, আমার হৃদয় এখনও এত প্রশস্ত হয় নাই যে আমি একই সময় উভয় চিন্তা করিতে পারি, বরং আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার আর অন্য চিন্তা না আসে, শ্যামরায় যখন আমার হৃদয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করিবেন, তখন যদি তিনি আমার হৃদয়াসনে উপবেশন করিয়া অন্য চিন্তা করিবার আদেশ দেন, তাহা হইলে তখন অন্য চিন্তা করিব, তাঁহার আদেশ ভিন্ন আমার অন্য চিন্তা করিবার অধিকার নাই, এ দেহ মন সমস্তই তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছি, তিনিই আমার ব্যবস্থা করিতে হয় করিবেন, না করিতে হয় করিবেন না, তাহাতে আমার সুখ দুঃখ নাই, আমি সে ব্যবস্থা করিতেও প্রার্থী নই। কালিদাসের এই প্রকার কথা শুনিয়া আত্মীয় স্বজনগণ নীরব হইতেন। দুই ভ্রাতাই নিত্যানন্দ স্বরূপে সর্ব্ব প্রথমে, রাজসাহী অঞ্চলে গৌরহরির প্রবর্ত্তিত হরিনাম সুধা সর্ব্ব সাধারণকে অকাতরে বিতরণ করিতে লাগিলেন, যাঁহারা সেই সুধার স্বাদ পাইলেন, তাঁহারা চরিতার্থ হইয়া শ্যাম সুন্দরের সেবা পূজার সহায়তা করিতে লাগিলেন, শ্যাম রায়ের সেবা পূজা বেশ চলিতে লাগিল, কালিদাস, শ্যামদাসের খ্যাতিও রাজসাহী দেশে ক্রমে ক্রমে বিস্তার হইয়া গেল। কিন্তু নব-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের বিরোধীও যে সমস্ত ছিল, বিশেষতঃ শাক্ত ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত ভণ্ড ব্যক্তিগণ মধ্যে অনেকেই নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন জন্মা-

হইতে লাগিল, অল্প সংখ্যক বৈষ্ণবের সহায়তায় বহুসংখ্যক অন্য ধর্ম্মাবলম্বী-গণের বিরুদ্ধাচরণ সহ্য করা অন্যের পক্ষে অসাধ্য হইলেও কালিদাস বিচলিত হইলেন না, শাক্ত ধর্ম্মাবলম্বী আত্মীয় স্বজনগণ ভয়ব্যঞ্জক কোন কথা বলিলে, তিনি বলিতেন, ভয় কি, ঘরে যে বিশ্বম্ভর আছেন, তিনিই রক্ষা করিবেন, আর রক্ষা না করেন ভালই, তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, আমাকে ওসব কথা বলিবেন না, কে কাহার কি করিতে পারে? আমার কিছুই নাই, সমস্ত শ্যামরায়কে দিয়াছি, এই যে দেহ ইহাও আমার নয়, শ্যামরায়ের, নিতাইচাঁদ নিয়েছিলেন, তিনি শ্যামরায়কে দিয়াছেন, আমি কি করিব? যাহা কিছু বলিতে হয়, আপনারা শ্যামরায়কে বলুন, আমাকে বলা না বলা বৃথা। আত্মীয়-স্বজন এই সমস্ত কথা শুনিয়া অবাক্ হইতেন, অতি নির্ব্বোধ বিবেচনায় বিরক্তানুভব করিয়া চলিয়া যাইতেন, কালিদাসের আত্মত্যাগ, একনিষ্ঠা দেখিয়া যখন সকলেই বুঝিলেন, এ সামান্য হৃদয় নয়, এ হৃদয়ের ভাব বিচলিত করিবার উপায় নাই, তখন সকলেই নিরুপায় হইয়া অন্য পথ অবলম্বন করিতে লাগিলেন।

ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উপলক্ষে শ্যামরায়ের অঙ্গনে দোলের বিশেষ ধুমধাম হইবে, অনুরাগী বৈষ্ণবগণ পূর্ব্ব হইতেই উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন, নানাস্থান হইতে ভক্তগণ আসিতে লাগিলেন, বায়নাগ্রাম কীর্ত্তনানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, আগন্তুক জনগণ শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিয়া কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া প্রতিদিন প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন, প্রতিদিন শত শত মণ চাউলের অন্ন ও তৎপরিমাণে বিবিধ ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইয়া নানা উপচারে শ্যামসুন্দরের ভোগ হইতে লাগিল, কোথা হইতে কে আয়োজন করিতেছে, কিছুই কেহ বলিতে পারিতেছে না, অথচ সকলেই তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিল, একটী প্রাণীও উপবাসী থাকেন না, এইরূপে তিন দিন দোলের আনন্দে অতিবাহিত করিয়া যাত্রীগণ যথাস্থানে চলিয়া গেলেন, কিন্তু একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দুইটী কন্যাসহ শ্যামরায়ের বাটীতেই থাকিয়া গেলেন, ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সকলেই অনুমান করিলেন, ইনি অতি তেজঃপূর্ণ পবিত্র ব্রাহ্মণ, হরিনামেও ইঁহার বিশেষ প্রীতি আছে, দোলের সময় বহুলোকের মধ্যে কেহই খোঁজ খবর লইবার সময় সুযোগ পাই নাই, এখন লোকের ভিড় কমিয়া গিয়াছে, ভিন্ন স্থানের অপরিচিত লোক দেখিলেই পরিচয় লওয়ার ইচ্ছা সকলেরই হইয়া থাকে, কোন কোন

ব্যক্তি ব্রাহ্মণের পরিচয় লইয়া জানিলেন, ব্রাহ্মণ রাজসাহী অঞ্চলের একজন পবিত্র বংশের বংশধর, কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া নানাস্থানে পাত্র অন্বেষণে ভ্রমণ করিতেছেন, ইহাও তিনি প্রকাশ করিলেন, আমার অভিলাষ আমার এই দুই কন্যা কালিদাস এবং শ্যামদাসের সহ বিবাহ দিয়া চরিতার্থ হইব, ইঁহারা যদি সহজে বিবাহ না করিতে চান, তাহা হইলে আমি শ্যামসুন্দরের অঙ্গনে কন্যাদ্বয় সহ নিরাহারে ধন্না লাগাইব, দেখিব শ্যামসুন্দরের দয়া হয় কি না? কালিদাসের আত্মীয়গণ মধ্যে, যাঁহারা বিষয়াদিতে মনোনিবেশ [illegible] জন্য সর্ব্বদা অনুরোধ করিতেন, তাঁহারা মনে করিলেন, এই সদ্বংশজাতা কন্যাদ্বয়কে দেখিলে কালিদাস নিজের এবং কনিষ্ঠের বিবাহে সম্মতি দিলেও দিতে পারেন।

একদিন কালিদাস শ্যামসুন্দরের পূজা ভোগ সমাধা করিয়া উপস্থিত জনগণকে প্রসাদ ভক্ষণার্থে সাদরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। সকলেই যথাস্থানে প্রসাদ ভক্ষণার্থ গমন করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ কন্যাদ্বয়সহ অঙ্গনেই বসিয়া থাকিলেন, তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া করযোড়ে বলিলেন, দেবতা! আপনি বসিয়া থাকিলেন কেন? প্রসাদ ভক্ষণার্থ আমার সহ আসুন, প্রচুর স্থান আছে, বসাইয়া দিব। ব্রাহ্মণ কোন উত্তর না করিয়া বসিয়া থাকিলেন। কালিদাস পুনরায় সবিনয়ে বলিলেন, আমার কি কোন অপরাধ হইয়াছে? যদি অপরাধ হইয়া থাকে, তবে ক্ষমা করুন, আমি সামান্য মনুষ্য, আপনি অতিথি দেবতা, দেবতার নিকট মানুষের অপরাধ পদে পদেই হইয়া থাকে, অপরাধ ক্ষমা করিয়া কন্যাদ্বয়সহ মহাপ্রসাদ ভক্ষ করিতে চলুন। ব্রাহ্মণ তাহাতেও নিরুত্তর। ভক্ত কালিদাস আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ব্রাহ্মণের পদযুগল ধারণ করিয়া বলিলেন, প্রভু আপনার কি অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলুন, এই ক্ষুদ্র জীবের দ্বারা যথাসাধ্য আপনার অভিপ্রায় প্রতিপালনে অন্যথা হইবে না, ব্রাহ্মণ ভক্ত কালিদাসের মুখে এই প্রকার কাতরোক্তি শুনিয়া বলিলেন, বাপু, তুমি অতি সাধু পুরুষ, তোমার কথা মিথ্যা হইবার নয়, তুমি যথাসাধ্য আমার বাসনা পূর্ণ করিতে সম্মত হইলে, তবে আমার বাসনা শ্রবণ কর। আমার এই কন্যা দুইটীকে তোমাদের দুই ভ্রাতাকে বিবাহ করিতে হইবে। তোমরা সদ্বংশজাত, পবিত্র সাধু পুরুষ, এবং রূপে গুণে তোমাদিগের অপেক্ষা ভাল পাত্র আর আমি দেখিতে পাইতেছি না। আর আমার কন্যাদ্বয়ও বিশ্রী নয়,

তাহা দেখিতেই পাইতেছ। তোমাদের যোগ্য হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যদ্যপি আমার এই বাসনা পূর্ণ কর, তবেই অদ্য শ্যামসুন্দরের প্রসাদ ভক্ষণ করিব, নতুবা কন্যাদ্বয় সহ শ্যামসুন্দরের অঙ্গনেই দেহপাত করিব স্থির করিয়াছি। কালিদাস ব্রাহ্মণের এবম্বিধ কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিলেন। কি করিবেন, এবং কি বলিবেন, কিছুই সহজে স্থির করিতে না পারিয়া এক মনে শ্যাম রায়কে চিন্তা করিতে লাগিলেন, মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, প্রভু একি করিলা, এ কি তোমার পরীক্ষা, যদি পরীক্ষা প্রয়োজন ছিল, তাহা হইলে এত কঠোর পরীক্ষা কেন করিতেছ? আমি সামান্য জীব, আমি কি তোমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব? প্রভু আর ভাবাইও না, আমার ত আর কিছুই নাই, এ দেহ, মন, প্রাণ, সমস্তই নিতাই চাঁদ তোমাকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, ব্রাহ্মণ জানে না যে, এই কঠিন কথার উত্তর আমার দিবার শক্তি নাই, আমি কে যে, আমাকে জিজ্ঞাসা করে? তুমি তোমার এই ক্ষুদ্র জীবের দ্বারা যাহা বলাইবে, সে তাহাই বলিবে, তোমাকে এই অনুরোধ করিলেই ভাল হইত, প্রভু! যাহা বলাইতে হয় বলাও, যাহা করিতে হইবে, করাও কিন্তু অতিথি যেন অনাহারে না যায়, আর তোমার এই ক্ষুদ্র জীবের বাসনাও যেন অসম্পূর্ণ না হয়, ভক্ত কালিদাসের কথা যেন শ্যাম সুন্দরের কর্ণে প্রবেশ করিল। বিপদভঞ্জন মধুসূদন বিপদ হইতে উদ্ধারের পথ করিয়া দিলেন। কালিদাস বলিলেন, দেবতা আমি দার পরিগ্রহ করিব না, ইহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছি, ভগবানের ইচ্ছাও বোধ হয় তাহাই, এরূপ ক্ষেত্রে কি প্রকারে আপনার কন্যার পাণি গ্রহণ করিব? তবে আমি যখন বলিয়াছি যে আপনার বাসনা যথাসাধ্য পূর্ণ করিতে ক্রটী করিব না, তখন অবশ্যই আপনার বাসনা পূর্ণ করিতে হইবে, আপনার বাসনা আপনার কন্যাদ্বয়কে পাত্রস্থ করা, তাহা আমি করিয়া দিব, আপনার কোন আপত্তি না থাকিলে আমার ভ্রাতার সহিত আপনার দুই কন্যার বিবাহ দিব। ইহাতে কোন অশুভ হইবে না। ব্রাহ্মণ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সম্মত হইলেন এবং কন্যাদ্বয় সহ রাধা শ্যামের প্রসাদ ভক্ষণে গমন করিলেন, ব্রাহ্মণের নাম ধামাদির কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না, কন্যাদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম লক্ষ্মী এবং কনিষ্ঠার নাম সরস্বতী উল্লেখ আছে।

কালিদাস কামিনী কাঞ্চন স্পর্শ করিবেন না, পূর্ব্বেই স্থির করিয়া-

ছিলেন। এই বংশ রক্ষা করার জন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভুর অভিপ্রায় ছিল, তজ্জন্য কালিদাস কনিষ্ঠ শ্যাম দাসের দ্বারাতেই বংশ রক্ষা করিবেন, এই ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু এক সঙ্গে দুইটী কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে হইবে, তাহা তিনি মনে করেন নাই। আজ অতিথি ব্রাহ্মণের কন্যাদায় মুক্ত করিতে গিয়া শ্যামদাসকে এক কালে দুইটী বিবাহ দিতে হইল। শ্যাম দাস জ্যেষ্ঠের নিতান্ত অনুগত, বিবাহের কথা শুনিয়া কোন প্রতিবাদ করিলেন না। কেবলমাত্র অন্যকে বলিলেন, দাদা আমাকেই শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন, দাদা ভাবিয়াছেন, শ্যাম দাস এক শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিবে না। তাই এককালে দুইটী শৃঙ্খলে বাঁধিবেন, স্থির করিয়াছেন। তা করুন আমিও দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, দাদাও ইহাতে মুক্ত থাকিতে পারিবেন না। সে সময় শ্যামদাসের এই কথার অর্থ বুঝা গেল না,পরে তাঁহার কথাগুলি সম্পূর্ণভাবেই ফলিয়াছিল, পরে তাহা প্রকাশ পাইবে। শুভদিন দেখিয়া শ্যামরায়ের অঙ্গণে শ্যামদাসের শুভ পরিণয় হইয়া গেল, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন, লক্ষ্মী সরস্বতী প্রকৃত লক্ষ্মী সরস্বতীর ন্যায় শ্যামরায়ের সংসারে বিরাজ করিতে লাগিলেন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কিছুদিন শ্যামরায়ের বাটীতে থাকিয়া সমস্ত বিষয় সম্পত্তি শ্যামরায়কে অর্পণ করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে চলিয়া গেলেন, তৎপর আর তাঁহার কোন সন্ধান কেহ পায় নাই, আর কোন স্থানে তাঁহার উল্লেখও হয় নাই।

কালিদাস শ্যামদাসের এবং ভ্রাতৃবধূদ্বয়ের নিষ্ঠা দর্শনে আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন, শ্যামদাস শ্যামরায়ের সেবা পূজার সমস্ত কার্য্যই নিজে করিতে আরম্ভ করিলেন, কালিদাস নিশ্চিন্ত মনে শরণ, মনন ও কীর্ত্তনাদিতে সময় কাটাইতেছেন, শ্যামরায়ের মহিমা এবং ভ্রাতৃ যুগলের ধর্ম্মভাবের কথা দেশ মধ্যে ক্রমেই বহুল প্রচার হইতে লাগিল। একদিন কালিদাস শ্যামদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, শ্যামদাস আমার প্রতি প্রভুগণ তীর্থ পর্যাটনের আদেশ করিয়াছেন, আমি তীর্থ পর্য্যটনে যাইব, তুমি কোন চিন্তা করিও না, একমনে শ্যামরায়ের সেবা পূজা করিতে থাক,শ্যামসুন্দর তোমার একমাত্র রক্ষক, সংসারে আর কেহই কাহারও নয়, শ্যামরায়ই একমাত্র ভরসা, আমি অদ্যই যাইতেছি, ইহাতে অন্যমত করিও না, শ্যামদাস কিছুকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, বেশ, কত দিনে ফিরিয়া আসিবেন ? কালিদাস বলিলেন, কতদিনে ফিরিয়া আসিব, তাহা এখন বলিতে

পারি না, প্রভুগণ যখন পাঠাইবেন তখনই আসিব, প্রভুগণের ইচ্ছার উপরই সমস্ত নির্ভর করে, আমার ইচ্ছায় কিছু হইতে পারে না, তুমি মহাজ্ঞানী হইয়া একথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ ? শ্যামদাস যেন কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন, জ্যেষ্ঠের বিরহ-জনিত কষ্টের ছায়া যেন হৃদয়ে পতিত হইয়া শোকের ভাব আসিতে লাগিল। কালিদাস তাহা বুঝিতে পারিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না, কেবল মাত্র বলিলেন, শ্যামদাস, আমার আসিতে কতদিন হইবে, স্থির নাই, জাহ্নবা ঈশ্বরী যখন এদেশ পবিত্র করিতে আসিবেন, সেই সময় তুমি বধূদ্বয় সহ তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিও, তোমাকে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি না। শ্যামরায় যাহা করাইবেন, তাহাই করিবা। বিধর্ম্মিগণের অত্যাচারে বিচলিত হইও না, ভক্ত মণ্ডলীর মনোবাঞ্ছা যথাসাধ্য পূর্ণ করিও। আমি প্রত্যাগমন করিলে তোমার ভার অনেক কমাইয়া দিব। কালিদাস সেই দিনই শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের সেবা পূজা করিয়া প্রসাদ গ্রহণান্তে তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন।

শ্রীবণওয়ারিলাল গোস্বামী।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ।

গার্হস্থ্যাশ্রম ।

স্রোত ফিরিয়াছে। বিজাতীয় শিক্ষা ও নবোদ্ভাবিত ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় মধ্যে দিন কয়েক হিন্দুসমাজের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল,সে ভাব আর নাই। এখন ইংরেজী শিক্ষিত নব্য যুবকেরাও আপনাকে "হিন্দুসন্তান" নামে পরিচয় দিতে আর কুণ্ঠাবোধ করেন না। অনেকে শাস্ত্রালোচনায়ও মনোনিবেশ করিয়াছেন। সম্বাদপত্র, সভা, সমিতি ও থিয়টরাদিতে সর্ব্বত্রই হিন্দুধর্ম্মের বক্তৃতা—হিন্দুধর্ম্মেরই আলোচনা হইতেছে। সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকা ভূমিতেও হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন ও ধর্ম্মপ্রচারেরও চেষ্টা চলিতেছে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে ইহা শুভলক্ষণ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতই কি তাহাই ? কথাটা ধীরভাবে একবার চিন্তা করিয়া দেখা, হিন্দুসন্তান মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ফলকথা আজিকালি যে ভাবে হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা চলিতেছে, তাহাকে শুভ লক্ষণ না বলিয়া, অবনতির বা অধঃপতনের

পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়াই আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে। এখনকার নব্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেরই সমগ্র শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস নাই। বাছিয়া গুছিয়া লেজামুড়া বাদ দিয়া আপনাদের অনুকূল মত যাহাতে দেখিতে পান, কেবল সেই সকল শাস্ত্রই তাঁহারা মানিয়া থাকেন। ভগবানের অবতার-স্বরূপ পূজ্যপাদ ঋষিগণকে সর্ব্বজ্ঞ ও অভ্রান্ত পুরুষ বলিয়াও তাঁহারা মনে করেন না। ইঁহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক আবার সংস্কার-প্রয়াসী। হিন্দুধর্ম্মের কোন কোন অংশকে সুসংস্কৃত ও বর্ত্তমানকালের অবস্থোপযোগী-রূপে গঠন করিয়া লইতেও তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প। কতকগুলি লোক হিন্দুর জাতিভেদ প্রথাটা এককালীন উঠাইয়া দিয়া একাকার করণে বদ্ধপরিকর। কেহ কেহ বা শাস্ত্রমতে খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিবার আবশ্যকতাই অনুভব করেন না। বলা বাহুল্য যে, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কেবলই যথেচ্ছাচার চলিতেছে। আমাদের বেদমূলক আর্য্যধর্ম্ম সনাতন ও নিত্য পদার্থ। যাহা নিত্য, কোনকালেই তাহার পরিবর্ত্তন সম্ভবে না। হিন্দুর সমগ্র শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস ও শাস্ত্রোক্ত আচার নিয়মাদি সম্যক্‌রূপে পালন না করিয়া, কেবল বাক্যে আপনাকে 'হিন্দু' নামে পরিচিত করিলেই 'হিন্দু' হওয়া যায় না। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় কথিত হইয়াছে,—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥"

শ্রীভগবান্‌ অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে বলিতেছেন, যে ব্যক্তি শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি শাস্ত্রবিধিকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে কোন-কালেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না; এবং তাহার সুখ ও পরাগতিও লাভ হয় না। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি শাস্ত্রবিধি দৃষ্টে স্বীয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া, তদনুসারেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাক।

এখন শাস্ত্র কাহাকে বলে এবং কোন্‌ কোন্‌ ঋষি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, সেই কথাটা বলা যাইতেছে। যথা,—

"শব্দব্রহ্মরূপ অনাদি অপৌরুষেয় বেদই আর্য্যধর্ম্মের মূল। এই বেদ-শাস্ত্রই ভারতীয় আর্য্যজাতির নিখিল কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের কল্পবৃক্ষ-স্বরূপ। বেদাঙ্গ, বেদান্ত, স্মৃতি, আগম ও পুরাণাদি যাবতীয় শাস্ত্রই বেদের

ভিন্ন ভিন্ন শাখাভেদ মাত্র। বেদজ্ঞান-সম্পন্ন পশ্চাল্লিখিত ঋষিগণই ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। যথা,—

"মন্বত্রি বিষ্ণুহারীত যাজ্ঞবল্ক্যো শনোঽঙ্গিরঃ।
যমাপস্তম্ব সম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী।
পরাশর ব্যাসশঙ্খ লিখিতা দক্ষগোতমৌ।
শতাতপো বশিষ্টশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ॥"

মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ ও বশিষ্ট, এই বিংশতি জন বেদজ্ঞ ঋষিই ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক। অর্থাৎ ইঁহাদের বাক্যই বেদবৎ মাননীয়।

অতএব আমরা হিন্দুসন্তানগণের অবশ্যপালনীয় শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান পদ্ধতি ও আশ্রমধর্ম্মের কথা ক্রমশঃ সাধারণ্যে প্রচার করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আশা করি, এতদ্দ্বারা শাস্ত্রানভিজ্ঞ স্বধর্ম্মপালনেচ্ছু হিন্দুসন্তানগণের কিয়ৎ-পরিমাণেও সাহায্য হইতে পারিবে।

ব্রাহ্মণের জন্য শাস্ত্রে চতুরাশ্রমের বিধান হইয়াছে। যথাঃ—

"চত্বার আশ্রমাশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ।
গার্হস্থ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ বানপ্রস্থঞ্চ ভিক্ষুকম্॥"

বামন পুরাণ।

আশ্রম চারিটী—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক। এই চতুরা-শ্রমের মধ্যে নিজ নিজ অধিকারানুসারে কোন একটী আশ্রমকে অবলম্বন করিয়া থাকিতেই হইবে। কেননা দ্বিজগণ ক্ষণকালের জন্যও আশ্রমবিহীন হইয়া থাকিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া থাকেন। যথা,—

"অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু ক্ষণমাত্রমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেন বিনা তিষ্ঠন্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে হ্যসৌ॥"

দক্ষসংহিতা।

কেবলমাত্র সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর, এই যুগত্রয়ের নিমিত্তই পূর্ব্বোক্ত চতুরাশ্রমের বিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু কলিযুগে মানবগণের আধ্যা-ত্মিকী শক্তির হ্রাস হওয়ায়, অন্যান্য আশ্রম একবারে উঠাইয়া দিয়া, শাস্ত্র কেবল গার্হস্থ্যাশ্রম ও ভিক্ষুকাশ্রমের বিধান করিয়াছেন। যথা, তন্ত্রে,—

"ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোঽপি ন প্রিয়ে।
গৃহস্থো ভিক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ যুগে।'

আবার বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণেও কথিত হইয়াছে,—

"সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলু-বিধারণম্।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা॥
দেবরেণ সতোৎপত্তিমধুপর্কে পশোর্বধঃ।
মাংসদানং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা॥
দত্তাঽক্ষতায়াঃ কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং পরস্য চ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মাচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ॥
মহাপ্রস্থান-গমনং গোমেধঞ্চ তথা মখম্।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ॥"

সমুদ্রযাত্রা, কমণ্ডলু ধারণ, (সন্ন্যাস) অসবর্ণা কন্যাগণের সহিত দ্বিজগণের বিবাহ, দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপত্তি, মধুপর্কের নিমিত্ত পশুবধ, শ্রাদ্ধে গোমাংস-দান, বানপ্রস্থাশ্রম, অক্ষতযোনি দত্তা কন্যার অন্য পাত্রে পুনর্দ্দান (বিধবা-বিবাহ) দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্রহ্মচর্য্য (ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম) নরমেধ, অশ্বমেধ ও গোমেধ যজ্ঞ এবং মহাপ্রস্থানগমন, এই ধর্ম্মগুলি কলিযুগে একবারেই বর্জ্জনীয়।

কলিযুগের নিমিত্ত গৃহস্থাশ্রম ও ভিক্ষুকাশ্রম, এই দুইটী আশ্রমের বিধান থাকিলেও আমরা প্রয়োজনবোধে আপাততঃ কেবল গৃহস্থাশ্রমের কথাই এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব। অপর তিনটী আশ্রমের অধিকারী ব্যক্তিগণের একমাত্র আশ্রয়স্থান বলিয়া, শাস্ত্রকারগণ গৃহস্থাশ্রমকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছেন। যথা,—

"চতুর্ণাম শ্রমাণাং হি গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠমাশ্রমম্

গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইলে, অগ্রে যথাশাস্ত্র বিবাহ ও সৎকুলজাতা সুলক্ষণা পত্নী-পরিগ্রহ আবশ্যক। নতুবা গৃহস্থাশ্রমে অধিকার হয় না। এবং পত্নী ব্যতিরেকে গৃহস্থাশ্রমের কার্য্যও চলিতে পারে না। কিন্তু আট-চল্লিশ বৎসর বয়সের পর যদি গৃহীর পত্নীবিয়োগ হয়, তাহা হইলে তিনি আর বিবাহ না করিলেও প্রত্যবায়ভাগী হয়েন না। এইরূপ মৃতপত্নীক গৃহীকে রণ্ডাশ্রমী বলে। যথা,—

"চত্বারিংশদ্বৎসরাণাং সাষ্টানাঞ্চ পরে যদি।
স্ত্রিয়া বিযুজ্যতে কশ্চিৎ স তু রণ্ডাশ্রমী মতঃ॥"

ভবিষ্য পুরাণ।

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বীরভূমি সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। বীরভূমির আকার ডিমাই আটপেজী পাঁচ ফর্ম্মার কম হইবে না।

২। বীরভূমি প্রতিমাসের প্রথম দশদিনের মধ্যে প্রকাশিত হইবে। মাসের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে আমাদের পত্র লিখিবেন।

৩। বীরভূমির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা মাত্র। এক খণ্ডের মূল্য ৵১০। নমুনা পাইতে হইলে ৵১০ টিকিট পাঠাইতে হয়।

৪। বিজ্ঞাপনের হার,

মলাটে	১ পৃষ্ঠা	মাসিক		৩৲
"	½	"	"	২৲
বিজ্ঞাপনীর ভিতর	১	"	"	২॥০
"	½	"	"	১॥০

প্রতি লাইনে /১০।

বহু দিনের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে আমরা স্বতন্ত্র চুক্তি করিয়া থাকি। বিজ্ঞাপনের টাকা অগ্রিম দেয়।

শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য্য বি, এ,
ম্যানেজার।
কীর্ণহার, জেলা বীরভূম।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

৫ম খণ্ড বীরভূমির ৯ সংখ্যা গ্রাহকগণের নিকট প্রেরিত হইল। এখনও বহু গ্রাহক মূল্য দেন নাই। গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন অনতিবিলম্বে আপন আপন দেয় মূল্য পাঠাইয়া দেন। অথবা যদি আপত্তি না থাকে, তবে আমরা ভিঃ পিঃ ডাকে কাগজ পাঠাইয়া মূল্য আদায় করিব। যাঁহাদের আপত্তি আছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সত্বর জানাইবেন। ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না। পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ ও জীবন গ্রাহকগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে। ইহা স্মরণ করিয়া গ্রাহকমহোদয়গণ কার্য্য করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য্য, বি, এ,
ম্যানেজার।
কীর্ণহার, পোঃ জেলা বীরভূম।

কলিকাতা, ৩০/৫ মদনমিত্রের লেন, নব্যভারত-প্রেসে,
শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত। ১৩১২ সাল।

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের বীরভূমি একত্রে অগ্রহায়ণের প্রথমে প্রকাশিত হইবে।

বীরভূমি

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

ম খণ্ড] আশ্বিন, ১৩১২ [১০ম সংখ্যা।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ,

সম্পাদিত।

সূচী।

কীর্ণহারের সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশহিতৈষী জমিদার শ্রীযুক্ত
বাবু সৌরেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের সম্পূর্ণ
ব্যয়ে বীরভূম জেলার অন্তর্গত
কীর্ণহার গ্রাম হইতে
শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য্য বি, এ
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
১২ই আশ্বিন—১৩১২।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ১॥০। এই সংখ্যার মূল্য ৶১০।

৫ম খণ্ড।] আশ্বিন, ১৩১২ [১০ম সংখ্যা

দোষ কাহার ?

ভারত অধঃপতিত, আর আমরা, ভারতবাসী, অসার, অন্তঃসার-শূন্য, কলহপ্রিয়, বাক্‌সর্ব্বস্ব ; আমরা তোষামোদ-নিপুণ, দাস্যানুজীবী ; আমরা দুর্ব্বল, উৎসাহ-বিহীন। আমাদের একতা নাই, একপ্রাণতা নাই, আমাদের উদ্যম নাই, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা নাই, আমরা অব্যবস্থিতচিত্ত অনুকরণপ্রিয়। এক কথায়, বিংশ শতাব্দীর ভারতবাসী ভারতবাসিত্ব-বিহীন আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান-রহিত এক অদ্ভুত জাতি, তাই আমরা আজ জগতের নিকট ঘৃণিত, তাই আমরা আজ এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তাই আমরা আজ উদরান্নের জন্য লালায়িত ও পশুর ন্যায় পদদলিত।

দোষ কাহার? সোণার ভারত কাহার দোষে কোন্ পাপে এইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন? যে আর্য্যভূমি এক সময়ে সভ্যতার শীর্ষভূমি ছিল, যে ভারত এককালে ধর্ম্ম ও বিদ্যাচর্চ্চায় পৃথিবীস্থ সকল জাতিকে পরাস্ত করিয়াছেন, রত্নপ্রসবিনী, বহু শস্যশালিনী যে ভারতের অধিবাসিগণ অন্নকষ্ট কাহাকে বলে, কখন জানিত না, সেই ভারতমাতা কেন আজ দীনা, হীনা, মলিনা, পরপদ-দলিতা? সেই ভারতসন্তান আজ কোন্ দুরদৃষ্ট দোষে ভীষণ অন্নকষ্ট-ক্লিষ্ট এবং দগ্ধোদরপূরণের নিমিত্ত পরপদলেহনে নিযুক্ত?

দোষ কাহার? আমাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় লোক আছেন, তাঁহারা বলিবেন যে, ভারতীয় ধর্ম্ম ও সমাজনীতিই সকল অনর্থের মূল; বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু রীতিনীতি ভারতের সর্ব্বনাশ করিয়াছে ও করিতেছে। বিধবার বৈধব্য, শিক্ষিত নব যুবকের বালিকা পত্নীর সহিত পুতুলের মত দিনযাপনই আমাদের "পরাধীনতা, দারিদ্র্য, কাপুরুষতা ও লাম্পট্যের"

প্রতিপোষক। তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে বলেন, "ধর্ম্ম ও সমাজই আমাদের প্রধানতম শত্রু"; পূর্ব্বকালীন অকালকুষ্মাণ্ডগণের মস্তিষ্ক-প্রসূত ভারত-লণ্ডভণ্ডকারী ঘোর কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুধর্ম্মকে কর্ম্মনাশার গভীর জলে ডুবাইয়া দাও, হিন্দুসমাজকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া অতল জলধিতলে নিক্ষেপ কর। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দোহাই দিয়া দেশে যথেচ্ছাচার-স্রোত প্রবাহিত কর, বিধবার বিবাহ দাও, বাছিয়া বাছিয়া শিক্ষিতা সুরসিকা বিংশতি বর্ষীয়া নবযুবতীর পাণিগ্রহণ কর, ভারতের দুঃখ ঘুচিবে, ভারতের পুনরভ্যুদয় ঘটিবে, অন্নকষ্ট ঘুচিবে, পরাধীনতা যাইবে, স্বাধীনতা আসিবে, রাঙের ভারত আবার সোণা হইবে।" তাঁহাদের এইমত কতদূর সমীচীন, তাহা সুধিগণের বিবেচ্য। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি উপরোক্ত উক্তির বিশেষ সারবত্তা দেখিতে পাই না। হইতে পারে, আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ বর্ত্তমান যুগের সম্যক উপযুক্ত নহে, কিন্তু আমাদের আধুনিক অধোগতির জন্য আমরা নিজে যে পরিমাণে দায়ী, আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ তাহার শতাংশের একাংশের জন্যও দায়ী নহে। আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা আমাদের স্বকৃতপাপের ফল; স্বকৃতকর্ম্মের বোঝা ধর্ম্ম ও সমাজের উপর চাপাইয়া আমরা লোকচক্ষে বা ঈশ্বরের কাছে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিব না। আবহমান কাল ভারতে হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত আছে বা ছিল, আবহমানকাল ভারতবর্ষে হিন্দুসমাজ আছে বা ছিল, হিন্দুধর্ম্ম বা হিন্দুসমাজ নূতন বস্তু নহে, কিন্তু ভারতের দুর্দ্দশা আধুনিক। যখন ভারতবর্ষে ধর্ম্মবন্ধন ও সমাজবন্ধন প্রবল ছিল, যখন এই পুণ্যভূমিতে ধর্ম্মপ্রাণতা ছিল, তখন ভারতের ধন ছিল, ঐশ্বর্য্য ছিল, পরাক্রম ছিল, স্বাধীনতা ছিল। তবে জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে, উন্নতির পর অবনতি, অভ্যুদয়ের পর পতন, জাগতিক ধর্ম্ম। প্রাচীন মিশর বল, পারস্য বল, রোম বল, গ্রীস বল, সকলেরই মহা অভ্যুদয়ের পর মহাপতন হইয়াছিল, কিন্তু সেখানে হিন্দুধর্ম্ম বা হিন্দুসমাজ ছিল না।

আর এখন আমাদের ধর্ম্ম কোথায়? প্রকৃত হিন্দুত্ব দেশ হইতে ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে; হিন্দুধর্ম্ম পাশ্চাত্য শিক্ষায় ও সভ্যতায় আসুরিক জ্যোতির প্রখর কিরণ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া দেশের অতি নিভৃত প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; কঙ্কালমাত্রে পর্য্যবসিত গতাসুপ্রায় এই ধর্ম্মকে লাঞ্ছনা করিবার জন্য আর লোকচক্ষে বাহির করিও না, তাহাকে নির্জ্জনে নিভৃতে মরিতে দাও, পরে কঙ্কালগুলি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিও। আর সমাজ—

ধর্ম্ম ও সমাজ এক শৃঙ্খলে বদ্ধ, যেখানে ধর্ম্মবন্ধন নাই, সেখানে সমাজবন্ধন অসম্ভব, আমরা সমাজের মস্তকে অনেকদিন পদাঘাত করিয়াছি; ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজও লুপ্তপ্রায়। এখনও সমাজে বাল্যবিবাহ আছে বটে, কিন্তু ইহারাই যে আমাদের অধোগতির কারণ, ও উন্নতির অন্তরায়, ইহা কেমন করিয়া স্বীকার করিব ? পাশ্চাত্য সমাজে বিধবাবিবাহ আছে, এবং তাহার যশ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। বিধবার বিবাহ দিয়া কতক গুলি অবলা কুমারীকে চিরকৌমার্য্য গ্রহণ করাইয়া আমাদের লাভ কি ? বাল্যবিবাহ ত্যাগ করিলেই আমরা 'মানুষ' হইতে পারিব না, বিধবার বিবাহ দিলেই আমাদের পুনরুত্থান ঘটিবে না; প্রকৃত মানবপদবাচ্য হইতে হইলে যাহা যাহা আবশ্যক, আমরা তাহা হারাইয়াছি। তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার উপায় কেবলমাত্র সমাজসংস্কার নহে, আত্মসংস্কার; সমাজ ও ধর্ম্ম আমাদের প্রধান শত্রু নহে, আমরাই আমাদের পরম শত্রু।

কেহ কেহ বলেন, হিন্দুধর্ম্ম সমষ্টির সারাংশটুকুর নাম "Self-effacement." আমি বলি, ভারতবাসীর পক্ষে, বিশেষতঃ দুর্ব্বলচিত্ত বাঙ্গালীর পক্ষে পাশ্চাত্যশিক্ষা ও সভ্যতার সারাংশটুকুর নাম "Self-effacement." সুদূর মফঃস্বলে, যেখানে এখনও পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্যক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, সেখানে এখনও ভারতবাসীর জাতীয়ত্ব আছে, ভাষা আছে, খাদ্য আছে, পরিচ্ছদ আছে, আর আমরা শিক্ষিত সভ্যতাগ্রস্ত যুবক, আমাদের কিছুই নাই, আমাদের আত্মমর্য্যাদা গিয়াছে, জাতীয়ত্ব গিয়াছে, স্বদেশীয় সমস্তই আমাদের নিকট ঘৃণিত—বর্ব্বরতা বা কুসংস্কারমাত্র। আমরা পৈতৃক নাম ছাড়িয়াছি, 'রামকুমার' ঘুচাইয়া আর, কে, হইয়াছি, 'মিত্র' ঘুচাইয়া 'মিটার' হইয়াছি, জাতীয় পরিচ্ছদ ছাড়িয়া হ্যাটকোট ধরিয়াছি, জাতীয় খাদ্য ত্যাগ করিয়া 'কারি-শেরি কাটলেট শ্যাম্পেনে' উদরপূর্ত্তি করিতেছি। ইংরাজির বুকুনি মিশাইয়া জাতীয় ভাষাকে কি একটা 'কিম্ভুত কিমাকার' করিয়া তুলিয়াছি। আমরা ক্ষুদ্র পতঙ্গ, পাশ্চাত্য সভ্যতারূপ উজ্জ্বল বহ্নির বাহিক শোভায় আত্মহারা হইয়া তাহাতে পুড়িয়াছি, আমাদিগকে দেখিয়া আমরা কোন্ জাতি, কোন্ বংশে আমাদের জন্ম, সহজে অনুমান করা যায় না। আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব নাই, আমরা অধঃপতিত, জাতিচ্যুত, আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার বর্ণশঙ্কর, ভারতমাতার পিণ্ডদানে আর আমাদের অধিকার নাই। আমরাই "self-effacement." এর চরম উদাহরণ স্থল।

তাই বলিতেছি, আইস, আমরা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আত্ম সংস্কার করি। পাশ্চত্য সভ্যতার বাহ্যিক অনুকরণে আমাদের লাভ নাই। যদি আমরা পাশ্চাত্য জাতিগণকে আমাদের জাতীয় জীবনের আদর্শ করিতে চাই, তবে আমাদিগকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সারভাগ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাদিগের নিকট একতা, একাগ্রতা, স্বজাতিপ্রীতি, স্বদেশানুরক্তি শিক্ষা করিতে হইবে, তাহাদের উদ্যম ও অধ্যবসায়ের অনুকরণ করিতে হইবে, বাচালতা ও হুজুগপ্রিয়তা ত্যাগ করিয়া প্রকৃত কার্য্যকারিতায় মনোনিবেশ করিতে হইবে। আমাদের প্রতিবেশী জাপানের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, জাপান পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা স্বার্থত্যাগ শিখিয়াছে, স্বদেশের জন্য, স্বদেশবাসীর জন্য আত্মোৎসর্গ শিখিয়াছে, পরমুখাপেক্ষিতা ত্যাগ করিয়া স্বাবলম্বন শিখিয়াছে, তাই জাপানের বল আছে, বিক্রম আছে, তাই জাপানের টোগো আছে, ওয়ামা আছে, তাই আজি জাপানের জয়নাদে দিক্‌দিগন্ত পরিপূরিত, তাই আজি পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতির বিস্ময়-দৃষ্টি জাপানের উপর নিপতিত, তাই আজি আমাদের ব্রিটিস সিংহের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রুষ ভল্লুক জাপান কর্ত্তৃক নির্জ্জিত, দলিত ও অপমানিত।

সৌভাগ্য ক্রমে আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার পূর্ণ আদর্শ আমাদের নিজের দ্বারে পাইয়াছি। ইংরাজ আমাদের রাজা, ইংরাজ পাশ্চাত্য জাতির শীর্ষস্থানীয়, ইংরাজের নিকট আমাদের শিখিবার অনেক আছে। কিন্তু এখন সুবিধাসত্ত্বেও আমরা কি শিখিয়াছি? আমরা কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষার বাহ্য চাকচিক্যের অনুকরণ করিয়াছি, সভা করিতে, বক্তৃতা দিতে, রিজলিউসন পাশ করিতে ও হাততালি দিতে শিখিয়াছি, দেশীয় আচার, ব্যবহার, ভাষা, খাদ্য, পরিচ্ছদ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম,সমস্তই ভাসাইয়া দিতেছি, এমন কি, ঘাড়ের চুলগুলি শুদ্ধ কাটিয়া চামড়া বাহির করিয়া ফেলিয়াছি, এক কথায় আমরা ইংরাজি আদর্শে আপনাদিগকে দেবতা গড়িতে গিয়া বানর করিয়া ফেলিয়াছি। যে সকল মহৎ গুণে ইংরাজ শ্রেষ্ঠ, আমরা তাহার কয়টী গ্রহণ করিতে পারিয়াছি? এখনও আমরা স্বার্থান্ধ; সঙ্কীর্ণচিত্ত, এখনও আমরা দ্বেষ হিংসা জর্জ্জরিত, এখনও আমরা উদ্যম, অধ্যবসায়, স্বাবলম্বন বিরহিত, স্বদেশপ্রীতি দূরে থাকুক, আমাদের মধ্যে পারিবারিক প্রীতির অভাব। যাহারা উপার্জ্জনাক্ষম সহোদর ভ্রাতাকে এক মুষ্টি অন্ন প্রদানে কুণ্ঠিত, তাহাদের মধ্যে স্বজাতি-প্রেম সুদূরপরাহত। দেশের শিক্ষিত ও শীর্ষস্থানীয়

ব্যক্তিগণের উপর দেশের উন্নতি বা অবনতি অনেকটা নির্ভর করে, সাধারণ লোকে তাঁহাদের অনুকরণ করিবে মাত্র, সাধারণ লোকে তাঁহাদের উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিবে মাত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় বিকৃতভাবাপন্ন, সুতরাং তাঁহাদের সহিত সাধারণ লোকের সহানুভূতি অল্প। যতদিন এই সহানুভূতি বর্দ্ধিত না হইবে, যতদিন শিক্ষিতগণ সাধারণ ব্যক্তিবর্গকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে না শিখিবেন, যতদিন সাধারণে তাঁহাদিগকে দেশের স্বার্থশূন্য প্রকৃত বন্ধু বলিয়া চিনিতে না পারিবে, ততদিন দেশের প্রকৃত উন্নতির আশা অল্প।

আর এক কথা, ইংরাজ-রাজ আমাদের ঘোর প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া বঙ্গচ্ছেদ করিতেছেন, তাই আজ আমরা মানের কান্না কাঁদিতেছি। সমস্ত বঙ্গদেশে বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার ত্যাগের হুজুগ উঠিয়াছে। ফলাফল ভবিষ্যতের গর্ভে, তবে আমাদের অতীত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয়, আমরা আমাদের কথা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব না, দুই দিনের হুজুগ দুই দিনে অন্তর্হিত হইবে, আমরা যেমন ছিলাম, তেমনি থাকিব, মাঞ্চেষ্টরের বস্ত্র বিক্রয় হইবে, বিলাতী ব্যবসায়ীর দ্রব্য বিক্রয় হইবে, লাভের মধ্যে আমরা জগতের অসার ও বাক্‌সর্ব্বস্ব বলিয়া অধিকতর প্রতিপন্ন হইব। বহুকাল হইতে শুনিতেছি, দেশের সর্ব্বনাশ হইল, দেশের সমুদয় অর্থ বিলাতী ব্যবসায়িগণ আত্মসাৎ করিল, সংবাদ পত্রে, সভায়, হাটে, ঘাটে, বাটে, বহুবার এই কথা শুনিয়াছি, কিন্তু ইহার প্রতিবিধান কল্পে আমরা বিশেষ কোন উপায় অবলম্বন করিয়াছি কি? কিছুই না। বরং প্রয়োজনীয় দ্রব্যে বল, বিলাসিতায় বল, আমরা সর্ব্ববিষয়ে বিদেশী ব্যবসায়ীর শরণাপন্ন হইয়াছি, দেশের অর্থ হাতে তুলিয়া অম্লান বদনে, অকাতরে বিদেশীর হস্তে সমর্পণ করিতেছি। দেশের শিল্পিগণ অন্নাভাবে মৃতপ্রায়, বিদেশীয়গণ আমাদের অর্থে পুষ্ট, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমরা রাজনৈতিক আন্দোলন লইয়া ব্যস্ত। আমরা বাগাড়ম্বরে মত্ত হইয়া অনেক সময় বৃথা নষ্ট করিয়াছি, দেশের উন্নতির জন্য, দেশীয় শিল্প. দেশীয় বাণিজ্যের উদ্ধারের জন্য কার্য্যতঃ বিশেষ কিছুই করি নাই। শুনিয়াছি, বোম্বাইয়ে কল কারখানা হইয়াছে, মান্দ্রাজ, মধ্য প্রদেশে কল কারখানা হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের অবস্থা শোচনীয়। ভারতে তেত্রিশ কোটী লোক থাকিতে কেন এমন হইল? বাঙ্গালাই বা

এতদিন এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট কেন? বাঙ্গালায় দুই একটী কল কারখানা যাহা স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাই বা অতি শৈশবে বিলীন হইল কেন? দেশে রাজা মহারাজা আছেন, ধনী আছেন, জমিদার আছেন, যাঁহারা সরকার বাহাদুরের এক কথায় লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা সহি করিতে পারেন, তাঁহারা এ সকল প্রকৃত দেশহিতকর কার্য্যে এত নিশ্চেষ্ট কেন? আমাদের কি আছে, আমরা আমাদের বলিতে কি রাখিয়াছি যে, আমরা এক কথায় বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার ত্যাগ করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিব? আমাদের ভীষণ সমস্যা উপস্থিত, আমরা আজ বিষম পরীক্ষা স্থলে দণ্ডায়মান, আমরা সর্ব্বজন সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা আর বিদেশীয় বস্তু ব্যবহার করিব না, জগতের লোক আমাদের প্রতি চাহিয়া থাকিবে, জগতের লোক উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিবে আমাদের কথার কোন মূল্য আছে কি না। সাবধান ভাই, দেখো যেন লোক হাসাইও না, শত্রু হাসাইও না, ঘৃণিত বাঙ্গালী নাম অধিকতর ঘৃণিত করিও না, বদ্ধপরিকর হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, জগৎ দেখুক বাঙ্গালি একবারে মরে নাই। ধর্ম্ম, সমাজের দোষ কি? আমাদের ধর্ম্ম আমাদিগকে বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিতে ভূয়ো ভূয়ো নিষেধ করে, আমরা ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া পূজা পার্ব্বণে, দোলে দুর্গোৎসবে বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিতেছি; আর কত বলিব? আমরা আজ স্বকৃত পাপের ফলভোগ করিতেছি; ঈশ্বরের রাজ্যে পাপের দণ্ড অবশ্যম্ভাবী।

শেষ কথা, আমাদের রাজা বঙ্গচ্ছেদ করিতেছেন, তাঁহারা দেশের শাসন কর্ত্তা, তাঁহাদের বিশ্বাস, একজন শাসনকর্ত্তা দ্বারা এত বড় প্রদেশের শাসন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন, আমরা আমাদের বক্তব্য বলিয়াছি, ভবিষ্যৎ অনিষ্টাশঙ্কায় এই বঙ্গবিভাগে ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছি, কিন্তু রাজা আমাদের যুক্তি তর্ক সমীচীন বোধ করেন নাই। তিনি বঙ্গবিভাগে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। আমরা শত সভা করিয়া, সহস্র চীৎকার করিয়া যে তাঁহার মত পরিবর্ত্তনে সমর্থ হইব, সে আশা আর নাই, তবে আর বৃথা গণ্ডগোল করিয়া আমরা রাজা প্রজার মধ্যে অসদ্ভাবের বৃদ্ধি করি কেন? রাজইচ্ছা পূর্ণ হউক, বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হউক। বঙ্গবিভাগ করিয়া ইংরাজ কিছু এক ভাগকে ভারত সমুদ্রের পরপারে নিক্ষেপ করিবেন না, বাঙ্গালা যেখানে আছে, সেইখানেই থাকিবে, বাঙ্গালী জাতি বাঙ্গালীই থাকিবে। একতা,

ভ্রাতৃভাব, স্বদেশপ্রীতি আমাদের হস্তে, ইংরাজ তাহা কাড়িয়া লইতে পারিবেন না। বঙ্গ বিভাগে যে ক্ষতি অনির্ব্বার্য্য, তাহা সহ্য কর, কিন্তু যাহার প্রতিবিধান আমাদের চেষ্টা সাপেক্ষ, তাহার প্রতিকারকল্পে অদ্য হইতে শপথ পূর্ব্বক আত্ম সমর্পণ কর। আমরা বহুদিন হইতে রাজনৈতিক আন্দোলন করিতেছি, অনেকবার কংগ্রেসের বৈঠক হইয়াছে, আর বর্ত্তমান বঙ্গবিভাগেও আমরা অনেক চীৎকার করিয়া অযথা শক্তিক্ষয় করিয়াছি। আমরা যদি কিছুদিনের জন্য রাজনীতি পরিত্যাগ করিয়া লুপ্তপ্রায় দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের উদ্ধার সাধনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি, কংগ্রেসের জন্য যদি অজস্র অর্থব্যয় না করিয়া সেই টাকায় দেশে কল কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করি, আমরা অল্পদিনে, অল্প আয়াসেই বিশেষ ফললাভ করিতে পারিব। দেশের অর্থ দেশে থাকিবে, দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, দেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দকে আর এক মুঠা অন্নের জন্য বিদেশীয়ের দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইতে হইবে না।

দোষ কাহার? দোষ আমাদের, দোষ আমাদের অব্যবস্থিতচিত্ততার, দোষ আমাদের হঠকারিতার, দোষ আমাদের পরমুখাপেক্ষিতার ও অনুকরণপ্রিয়তার। দোষ আমাদের স্বদেশদ্রোহিতার, আমরা স্বদেশদ্রোহী, সেইজন্য স্বদেশীয় যাবতীয় বস্তু ত্যাগ করিয়াছি। ধর্ম্ম ও সমাজ আমাদের বিশেষ কিছু ক্ষতি করে নাই। আমরাই আমাদের পরম শত্রু। আইস আজ হইতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আত্মসংস্কার করি, জগতে মনুষ্য নামে পরিচিত হইবার চেষ্টা করি, মানুষ হইলে সকলেই সম্মান করিবে, রাজাও আমাদের সম্মান করিবেন, আমাদের আবদার রক্ষা করিবেন। নতুবা আমরা যেমন আছি, চিরকাল তেমনি থাকিব, কেহ আমাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিবেন না।

ভারতে সত্য-মহিমা।

ভারতে আর্য্যজাতি সত্যকে যে ভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছেন, অপর কোন দেশে কোন জাতি সত্যকে সেভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সকল সভ্য, এমন কি, অসভ্য জাতিগণের মধ্যেও সত্যের সম্মান এবং সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সত্যের পূর্ণ মহিমা ভারতের আর্য্যজাতিই

হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রে ও নীতিশাস্ত্রে সত্য সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে—ভারতীয় সাহিত্যে সত্যের অতি উন্নত আদর্শ অঙ্কিত হইয়াছে—তাহারই অমোঘ প্রভাবে ভারতীয় জাতীয়-চরিত্রে সত্যের প্রতি অবিচলিত অনুরাগ চিরস্ফুট ছিল। ইতিহাসে তাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়—হিউ এন্থ সিয়ঙ্, মেগাস্থিনিস-প্রমুখ পর্য্যটক বা ঐতিহাসিকগণ বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে জগতের নিকট ভারতবাসীর দৃঢ় সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন। সত্যসম্বন্ধে প্রাচীন আর্য্যগণের কিরূপ উচ্চ ধারণা ছিল, আমরা এই প্রবন্ধে তাহাই দেখিতে চেষ্টা পাইব।

আর্য্য-জাতিই সত্যের আদিম উপাসক, প্রাচীন আর্য্যগণই প্রথম সত্যের অনুসন্ধানে এই বিশাল বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বের দিকে কৌতুহলদৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, তাঁহারা বিশ্বের বাহ্য গাম্ভীর্য্য বা সৌন্দর্য্যে সত্য খুঁজিয়া পাইলেন না। দেখিলেন, এই প্রত্যক্ষ বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু পরিবর্ত্তনের অধীন—কাল যাহা দেখিলেন আজ তাহা নাই—কাল যেটিকে যেরূপ দেখিলেন আজ সেটি অন্যরূপ—কাল যেটি যেভাবে ছিল আজ তাহা অন্যভাবে পরিবর্ত্তিত। এইরূপ পরিবর্ত্তন-স্রোতে প্রত্যেক বস্তু অস্থির, অস্থায়ী—উৎপত্তি ক্ষয় বৃদ্ধি, ধ্বংস প্রভৃতি নানারূপে সকল বস্তুর উপর পরিবর্ত্তনের ক্রিয়া প্রকাশিত—সুতরাং ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ, অণু হইতে মহান্—সামান্য হইতে বিশেষ, এই বাহ্যজগতে "আছে" বলিতে প্রত্যক্ষ কোন বস্তু নাই—গাম্ভীর্য্য বা সৌন্দর্য্য হেতু যাহা কিছু "আছে" বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল—পরীক্ষায় তাহা ছায়ার ন্যায় অবস্তুরূপে প্রতীত হইল—বিশ্ব অসত্যরূপে প্রতিভাত হইল। জ্ঞানের আলোকময় উজ্জ্বল রাজ্য তাঁহাদের দৃষ্টির মধ্যে পড়িল—আবরণ সরিয়া পড়িল—এই বিশ্বের ঈশ্বর সত্যরূপে আর্য্যমনীষিগণের নয়ন সমক্ষে স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন—জগতে একমাত্র অনির্ব্বাণ মহৎ সত্য চিরজাগরিত,—পরিদৃশ্যমান অনন্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে একমাত্র অক্ষয় অপরিবর্ত্তনীয় সত্য চির বিদ্যমান—বিস্পষ্ট ব্যবহারশীল অনন্ত বৈচিত্রের মধ্যে অনন্ত একরস সত্য চিরবিরাজমান। আর্য্যজাতির অমূল্য ধর্ম্ম গ্রন্থ বেদ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিতেছেন—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈত্তিরীয়ে) অথবা এতদাত্ম্যমিদঞ্চ সর্ব্বং তৎসত্যঞ্চতত্ত্বমসি"। (ছান্দগ্যে) "সদেব সৌম্যেদগ্র আসীৎ" (ছান্দগ্যে)

অথবা—"আত্মা বা ইদমেকাগ্র আসীৎ" (ঐতরীয়ে); এইরূপ মহাবাক্য সমূহে ঈশ্বরের আত্ম-পরিচয় প্রকটিত হইয়াছে, বেদ ঈশ্বরের আত্মপরিচয়-বাণী—বেদে আর্য্যজাতির অটল বিশ্বাস এবং অচলা ভক্তি। এবং সেই বেদে যাহা সৎ তাহা সৎ, তাহাই সত্য, তাহাই জ্ঞান, তাহাই আত্মা, তাহাই ব্রহ্ম। যাহা অনাদি, অনন্ত, অজয়, অমর, অক্ষয়—যাহা বিশ্ব সৃষ্টিরও পূর্ব্বে ছিল—বিশ্বের অভ্যন্তরে রহিয়াছে এবং বিশ্বের ধ্বংসের পরও থাকিবে; তাহাই প্রকৃত সত্য। আর্য্যজাতির ভাষায় তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব পরিস্ফুট—জগৎ সংসার বিশ্ব সকলই গত্যর্থ ধাতুমূলক, পরিণাম বিধ্বংসী এবং পরিবর্ত্তন-শীল, কেবল "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং" অথবা "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যাং প্রয়ন্ত্য ভিসংবিশন্তি তদ্বি-জিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্মেতি।" এইরূপ সত্য ব্রহ্মভাবে বেদ পরিপূর্ণ। প্রাচীন আর্য্যগণ সত্যের এই বিশ্বাসের ভাব হৃদয়ে ধরিয়া সত্যের উপাসনা করিয়াছেন;—আজীবন সত্যের অনুসন্ধানে, সত্যের অনুষ্ঠানে এবং সত্যের ধ্যানে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা কেবল মাত্র লৌকিক ব্যবহার বা আচরণে সত্যের অনুষ্ঠান জীবনের উচ্চ লক্ষ্য মনে করেন নাই—তাঁহারা অসীম অনন্ত পূর্ণ সত্যকে সম্মুখে রাখিয়া জীবনের প্রত্যেক চিন্তায়, প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক কার্য্যে সত্যের অনুসরণ করিতেন।

বেদে এইরূপ সত্য ব্রহ্ম ভাব নিবদ্ধ থাকিলেও বেদে চতুর্ব্বর্ণের অধিকার না থাকায়, এই উচ্চ উদার ভাব তত্ত্বান্বেষী মনীষিগণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, জন সাধারণের হৃদয়ে বিকশিত হইবার সুযোগ পায় নাই, এইরূপ আশঙ্কা উদিত হইতে পারে। কিন্তু এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। বেদ সাধারণের অধীতব্য নহে সত্য, কিন্তু পুরাণ সমূহ সাধারণের নিত্য পাঠ্য গ্রন্থ। যাঁহারা জ্ঞানের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য বেদ—যাঁহারা সংসারের সেবায় আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য পুরাণ, যাঁহারা বিষয়-বৈচিত্র্য-জনিত বৈষম্য নিরাকৃত করিয়া একাকার জ্ঞানে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে অগ্রসর তাঁহাদের জন্য বেদ—যাঁহারা বিক্ষেপবিভ্রমশীল ক্ষুদ্র মন লইয়া সর্ব্বময় জ্ঞানের সম্মুখীন হইতে পারেন না, তাঁহাদিগকে ধীরে ধীরে মধুর আকর্ষণে জ্ঞানের আলোক রাজ্যে আনয়ন করিতে পুরাণ সমূহ। পুরাণ আর্য্য জাতির সাধারণ সম্পত্তি, বেদের মহান্ ভাবে অনুপ্রাণিত—উচ্চ জ্ঞানের রশ্মিমালায় আলোকিত। বেদবিৎ মহর্ষি-

গণ বেদের জ্ঞান পুরাণে আনয়ন করিয়া সাধারণ জ্ঞানের গ্রহণীয় করিয়াছেন—জটিলকে সরল করিয়াছেন—কঠিনকে কোমল করিয়াছেন—নীরসকে সরস করিয়াছেন—দুর্লভকে সুলভ করিয়াছেন—দুর্ব্বোধকে সহজবোধ্য করিয়াছেন। পুরাণ একাধারে ইতিহাস, কাব্য, দর্শন—ইহাতে দার্শনিকের সূক্ষ্ম চিন্তা নিহিত আছে:—কবির ভাবের লহরী ক্রীড়া করিতেছে,—ঐতিহাসিকের বাস্তব ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে মানব ভাগ্যের অনন্ত পরিবর্ত্তন, সংসারের অনন্ত পরীক্ষা, জীবনের অনন্ত সংগ্রাম প্রকাশিত হইতেছে—পাপ পুণ্যের কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, পুণ্যের স্থির নিশ্চয় অভ্যুদয় ও পাপের অবশ্যম্ভাবী পতন ইহাতে উজ্জ্বলবর্ণে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার শিক্ষা হৃদয়-স্পর্শিনী—ইহা মানব হৃদয়ের সকল ভাবকেই স্পর্শ করে—হীন ভাবকে ক্ষীণবল করিয়া উচ্চ ভাবকে উন্নত, পরিপুষ্ট ও প্রবল করে, এবং পুণ্যের প্রতি অনুরাগ, পাপের প্রতি ঘৃণা, এবং জ্ঞানের জন্য আগ্রহ উৎপাদিত করে। পুরাণ সমূহ আর্য্য জাতির হৃদয়, মন এবং চরিত্রের উপর অনন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, রাজা মহারাজ হইতে দীন দরিদ্র; মহামহোপাধ্যায় হইতে নিরক্ষর মূর্খ, সমাজের সকল শ্রেণীর সকল লোকের উপর পুরাণ সমভাবে প্রভাবশালী, ইহা জ্ঞানের পূর্ণ ভাণ্ডার, ভাবের অক্ষয় প্রস্রবণ, সুশিক্ষার সুন্দর উৎস। মানবপ্রকৃতির পরিতোষসেব্য পুষ্টিকর পথ্য পানীয় ইহাতে পর্য্যাপ্ত প্রচুর। পুরাণ সমূহ বেদের প্রতিধ্বনি তুলিয়া পরম সত্যের প্রচার করিতেছে। পুরাণশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম শ্লোকেই ভগবান ব্যাসদেব পরম সত্যের বন্দনা করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন—ব্যাসের সেই অমর বাক্য—ধাম্না স্বেন নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি—পণ্ডিতমূর্খ সকলের কর্ণে বেদের ধ্বনি তুলিতেছে। পঞ্চম বেদ স্বরূপ মহাপুরাণ মহাভারতে সত্য প্রশংসায় কথিত হইয়াছে "সত্যং ধর্ম্মস্তপোযোগঃ সত্যং ব্রহ্ম সনাতন।" আদি কবি বা বাল্মীকির রামায়ণ গ্রন্থে ভগবান রামচন্দ্রের মুখনিঃসৃত মহাবাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে "সত্যমেবেশ্বরো লোকে সত্যে ধর্ম্ম সদাশ্রিত।" বহ্নিপুরাণে সত্যের প্রশংসা ক্ষেত্রে কথিত হইয়াছে "তস্মাৎ সত্যং পরং ব্রহ্ম সত্যমেব পরং তপঃ।" কেবল উল্লিখিত পুরাণগুলিতে নয়—অথবা কেবল উল্লিখিত স্থলে নয়—প্রায় সকল পুরাণে যেখানে সত্যের প্রসঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, সেই খানেই সত্যের ব্রহ্মত্ব পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। পুরাণ সমূহ সমস্বরে বেদেরই প্রতিধ্বনি করিতেছে।

সত্যের পরব্রহ্ম স্বরূপতা ঘোষণা করিয়াই পুরাণ সমূহ নীরব হয় নাই, যাহাতে এই ভাব সাধারণ হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়—যাহাতে সত্যের প্রতি সাধারণের যথোচিত শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হয়—যাহাতে জন সাধারণ প্রাণের সহিত সত্যের পূজা করিতে শিখে—তজ্জন্য পুরাণ সমূহ সত্যের মহিমা কীর্ত্তনে মুক্তকণ্ঠ। সত্যের প্রতি ভক্তির উদ্রেক করিতে বাক্যে যত শক্তি থাকিতে পারে, পুরাণ-প্রণেতা ঋষিগণ তাহা সত্যের মহিমা ঘোষণায় প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, জগতে যাহা কিছু আশ্চর্য্য, যাহা কিছু গম্ভীর, যাহা কিছু সুন্দর, সকলই সত্য হইতে উদ্ভূত। যে প্রখর প্রভা জীব সহ্য করিতে পারে না—যে মধুর আলোক হৃদয়ে আনন্দ রাশি ঢালিয়া দেয়—যে চঞ্চল বিভা নয়ন চমকিত করে—যে প্রচণ্ড শিখা সকলই দগ্ধ করে, যে নিঃশ্বাসবায়ু জীবন রক্ষা করে—যে অদৃষ্ট শক্তি নিচয় মানবের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করে—সেই সকলই সত্য-প্রসূত। সত্যই সূর্য্যের প্রভা শক্তি, শশধরের শোভাশক্তি, অগ্নির দাহিকা শক্তি, ইন্দ্রের রাজশক্তি, যমের সংহার শক্তি—অমৃতের মৃত্যবারণী শক্তি, সত্যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত—সত্যে লোক প্রতিষ্ঠিত, সত্যের শক্তিতে স্বর্গ অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী ধৃত। সত্য সকলের ধারণা শক্তি—সত্য সকল শক্তির মূল।

সত্যেন গম্যতে স্বর্গং মোক্ষং সত্যেন প্রাপ্যতে।
সূর্য্য স্তপতি সত্যেন সোমঃ সত্যেন রাজতে॥
যমঃ সত্যেন হরতি সত্যেনেন্দ্রবিজায়তে।
বরুণশ্চ কুবেরশ্চ তৌ চ সত্যে প্রতিষ্ঠিতৌ॥ (বারাহে)
সত্যেনার্কঃ প্রতপতি সত্যেনাপ্যায়তে শশী॥
সত্যেনামৃতমুদ্ভূতং সত্যে লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥
বৃষ শ্চতুষ্পাদ্ ভগবান্ ধর্ম্মঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।
দ্যৌরন্তরীক্ষং পৃথিবী সত্যেনৈব ধৃতান্যত॥ (রামায়ণে)
সত্যেন বায়ুরভ্যেতি সত্যেন স্তপতে রবিঃ।
সত্যেনাগ্নির্দহেন্নিত্যং স্বর্গং সত্যেনগচ্ছতি॥ (বহ্নিপুরাণে)

মানুষ যাহা কিছু ভালবাসে, যাহা কিছু আশা করে, যাহা কিছু লাভের জন্য লালায়িত, সকলেরই উৎপত্তিক্ষেত্র সত্য। বিদ্যা বল, বুদ্ধি বল, যশঃ বল, কীর্ত্তি বল, পুণ্য বল, সুখ বল, মোক্ষ বল, স্বর্গ বল, এ সকলই সত্যের মূলে সুলভ। তপশ্চর্য্যা, যজ্ঞ, ব্রত প্রভৃতি শ্রেয়ঃ লাভের পথগুলি সত্যেরই

পথ—সত্যই পরম ধর্ম্ম, সত্যই পরমাগতি, সত্যই পরম পদ। সত্যই বেদে জাগ্রত, সত্যই ব্রহ্ম। সাধুগণের একমাত্র আশ্রয়ভূমি সত্য। সত্য সম্বন্ধে অধিকারিভেদ নাই, সত্য সর্ব্ব বর্ণের অবিকৃত ধর্ম্ম। এবং সকলের সহিত অবিরোধ হেতু প্রধান ধর্ম্ম। যাহা সত্য, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না—তাহার নিকট সকলকেই মস্তক অবনত করিতে হয়।

চতুর্ব্বর্ণস্য ধর্ম্মাণাং সঙ্করো নপ্রশস্যতে।
অবিকারিতমং সত্যং সর্ব্ববর্ণেষু ভারত॥
সত্যং সৎসু সদা ধর্ম্মঃ সত্যং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
সত্যমেব নমস্যেত সত্যংহি পরমাগতিঃ। (মহাভারতে)
সত্যং বেদেষু জাগর্ত্তি সত্যঞ্চ পরমং পদং।
কীর্ত্তির্যশশ্চ পুণ্যঞ্চপিতৃ দেবর্ষি পূজনম্॥
আদ্যোবিধিশ্চ বিদ্যাচ সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতং।
সত্যং যজ্ঞস্তপা বেদামন্ত্র সেবা সরস্বতী॥ (বহ্নিপুরাণে)

পুরাণ সমূহ আর্য্য জাতিকে শিক্ষা দিতেছেন যে, যত প্রকার পুণ্য কর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে সত্যের অনুষ্ঠানই সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ। আর্য্যঋষিগণ বলিতেছেন, একটি কূপ খননে মহাপুণ্যআছে, শত কূপ প্রতিষ্ঠায় যে পুণ্য,এক বাপী খননে ততোধিক পুণ্য, শত বাপী প্রতিষ্ঠায় যে ফল, এক যজ্ঞে ততোধিক ফল,—শত যজ্ঞে যে ফল, এক পুত্রে ততোধিক ফল,—শত পুত্রে যে ফল, সত্যে ততোধিক ফল, সুতরাং সত্য সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়। অথবা সহস্র অশ্বমেধ এবং সত্য তুলাদণ্ডে তুলিত হইলে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্যই গুরুতর হইবে।

বরং কূপশতাদ্বাপী বরং বাপী শতাৎক্রতুঃ।
বরং ক্রতু শতাৎ পুত্রঃ সত্যং পুত্র শতাদ্ বরম্॥
অশ্বমেধ সহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধ সহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে॥ (মহাভারতে)
অশ্বমেধ সহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধ সহস্রাদ্ধি সত্যমেবাতিরিচ্যতে॥ (রামায়ণে)

এইরূপে আর্য্য ঋষিগণ সত্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন—সত্যের গৌরব সাধারণ হৃদয়ে জাগরূক রাখিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারা সত্যের প্রকৃত তত্ত্ব জগৎ সমক্ষে প্রচার করিয়া মানুষকে তাহার

দৈনন্দিন কার্য্য কলাপে সত্যের অনুসরণ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। সত্যই নীতির প্রাণ, যে সকল গুণ মনুষ্য চরিত্রের অলঙ্কার স্বরূপ, সে গুলি সত্যেরই আকারভেদ। সমতা, দম, অমাৎসর্য্য, ক্ষমা, হ্রী, তিতিক্ষা, অনসূয়তা, ত্যাগ, ধ্যান, আর্য্যত্ব, ধৃতি, দয়া, অহিংসা, এই ত্রয়োদশ গুণ সত্যের ত্রয়োদশ রূপ।

সত্যঞ্চ সমতা চৈব দমশ্চৈব ন সংশয়ঃ।
অমাৎসর্য্যং ক্ষমাচৈব হ্রীস্তিতিক্ষাণসূয়তা ॥
ত্যাগো ধ্যানমথার্য্যত্বং ধৃতিশ্চ সততং দয়া।
অহিংসা চৈব রাজেন্দ্র সত্যাকারাস্ত্রয়োদশ ॥ (মহাভারতে)

সত্য মনুষ্য কর্ত্তব্যের বিশাল ক্ষেত্রটি ব্যাপ্ত হইয়া আছে। যে ব্যক্তি সত্যের প্রতি উদাসীন, সে কর্ত্তব্য জ্ঞানহীন, নীতিহীন, চরিত্রহীন, দুরাচার। সে সংসারে সম্মান লাভ করিতে পারে না বা খ্যাতি লাভ করিতে পারে না—মূর্ত্তিমান পাপের ন্যায়—বিষধর সর্পের ন্যায় লোকে তাহাকে ভয় করে—সে সংসারের ভার স্বরূপ। অনন্ত নরকে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না, নরকের বহ্নি—অনন্তকালেও তাহার পাপরাশি দগ্ধ করিতে পারিবে না। পুরাণ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিতেছে, সত্যের ন্যায় ধর্ম্ম নাই—মিথ্যার ন্যায় ভীষণ পাপ নাই—সকল পুরাণেই এই মহান্ উপদেশ উদ্গীত হইয়াছে, বোধ হয় সকল পুরাণেই দেখিতে পাইবেন—

নহিসত্যাৎপরোধর্ম্ম নানৃতাৎপাতকংমহৎ ॥

এই জন্য পুরাণের যেখানে সেখানে সত্য কথনের উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং মিথ্যাভাষণের ভীষণ পরিণাম বিবোষিত হইয়াছে। সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই, সত্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ নাই এবং জগতে মিথ্যার অপেক্ষা তীব্রতর কোন পাপ নাই। সত্যবাদী মনুষ্য অক্ষয় লোক গমন করেন, মিথ্যাবাদী মনুষ্য সর্পের ন্যায় জগতকে উদ্বেজিত করে। আপনার জন্য, এমন কি, পুত্রের জন্যও যাঁহারা মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করেন না, সেই বুধগণই স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন।

নাস্তি সত্যসমো ধর্ম্মো ন সত্যাদ্বিদ্যতেপরম্।
নহিতীব্রতরং কিঞ্চিদনৃতাদিহবিদ্যতে ॥ (মহাভারতে)
সত্যবাদীহিলোকেঽস্মিন্ পরংগচ্ছতিচাক্ষয়ং।
উদ্বিজন্তেযথা সর্পান্নরাদনৃতবাদিনঃ ॥ (রামায়ণে)

আত্মার্থে বা পরার্থে বা পুত্রার্থে বাপি মানবঃ
অনৃতং যে ন ভাষন্তেতেবুধাঃ স্বর্গগামিণঃ ॥

সত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব পুরাণের সর্ব্বত্রই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সত্যই যে সর্ব্বথা অনুসরণীয়, এই রূপ উপদেশেই পুরাণ পরিপূর্ণ। তথাপি মনুষ্যপ্রকৃতির স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা স্মরণ পথে রাখিয়া আর্য্যশাস্ত্রকারগণ সাধারণ মানবের পক্ষে অবস্থা বিশেষে মিথ্যা ভীষণ দোষাবহ বিবেচনা করেন নাই। তাঁহারা সূক্ষ্ম ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন, যাহাতে জগতের বা অপরের অনিষ্ট নাই অথচ প্রীতি বা কল্যাণ আছে, তাহা মিথ্যা হইলেও নিন্দনীয় হয় না, সেই জন্য কখনও বা বলিয়াছেন,সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ মাব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্‌” কখনও বা বলিয়াছেন,স্ত্রীযুনর্ম্ম বিবাহে চ বৃত্ত্যর্থে প্রাণসঙ্কটে। গোব্রাহ্মণার্থে হিংসায়াং নানৃতং স্যাজ্জুগুপিসতং॥ সংসারের সহস্র সম্পর্কে যাঁহারা জড়িত—অথচ পবিত্রভাবে সংসারের কুটিলবর্ত্মে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক,তাঁহারা ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিচার করিয়া—সত্যমিথ্যার সূক্ষ্ম রেখা লক্ষ্যপথে রাখিয়া কার্য্য করিবেন, ইহাই আর্য্যশাস্ত্রকারগণের ধীর উপদেশ—ধর্ম্মের মূলগত অর্থ ধারণা এবং মুখ্য উদ্দেশ্য লোকস্থিতি। সুতরাং ধর্ম্মের মূল মন্ত্র অহিংসা—যাহাতে হিংসা নাই বা অপরের অমঙ্গল অপকার, ক্ষতি বা ক্লেশ নাই, তাহাই ধর্ম্ম—এরূপ ক্ষেত্রে সহজ দৃষ্টিতে যাহা মিথ্যা, তাহাও ক্ষেত্রবিশেষে ধর্ম্মরূপে গণ্য হইতে পারে। সুতরাং সত্য মিথ্যার সূক্ষ্মভেদ নির্ণীত না হইলে অনেক সময় ধর্ম্মরক্ষা হয় না। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বিশদভাবে আলোচনা করিতে হইলে এই প্রবন্ধ অতীব গুরুতর আকার ধারণ করিবে। তবে এ সম্বন্ধে কাহারও কৌতূহল উদ্রিক্ত হইলে তিনি মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে সত্যানৃতক বিভাগ নামক ১০৯ অধ্যায় মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিলে দেখিতে পাইবেন, আর্য্যশাস্ত্রকারগণ কিরূপে সূক্ষ্ম উদার নীতির বশবর্ত্তী হইয়া সমাজ রক্ষার ও ধর্ম্মরক্ষার বিধান করিয়া গিয়াছেন। আর্য্য ঋষিগণ সত্যের প্রকৃত তত্ত্ব জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। জনসাধারণকে চিন্তায়, বাক্যে, কার্য্যে সত্যের অনুসরন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, আবার স্থল বিশেষে বা অবস্থা বিশেষে অসত্যেরও আদর করিতে বলিয়াছেন, কারণ মিথ্যা জনসমাজে নানাভাবে নানারূপে আধিপত্য করিতেছে—কবির কল্পনায় মিথ্যা ক্রীড়া করিতেছে—শিষ্টাচার সমাদরের অভ্য-

স্তরে মিথ্যা উঁকি মারিতেছে—পরিহাস রসালাপে মিথ্যা মিশ্রিত রহিয়াছে—এইরূপ নানাভাবে মিথ্যা মনুষ্য সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে। এরূপ মিথ্যা সমাজ হইতে উন্মূলিত হইতে পারে না—এবং দূষণীয় বা দণ্ডনীয় নহে। তথাপি প্রকৃত সাধু ব্যক্তি কখনও তাহার সুযোগ গ্রহণ করেন না—যিনি সত্যের উপাসনা করিতে শিখিয়াছেন, তিনি অসত্যকে কখনই হৃদয়ে স্থান দিবেন না। প্রকৃত চরিত্রবান, নীতিবান্ ব্যক্তি কোন মতে সত্য হইতে বিচ্যুত হয়েন না। সাধু ব্যক্তি সত্যের জন্য সুখ, শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হন। সংসারে এমন ভীষণ কষ্ট বা যন্ত্রণা নাই, যাহা সাধু ব্যক্তি সত্যের জন্য হাসিতে হাসিতে সহ্য করিতে না পারেন। সত্যের জন্য যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ ত সামান্য কথা, সত্য-সঙ্কল্প মহাপুরুষগণ অম্লে অম্লে দেহের মাংস বা জীবনের শোণিত দান করিয়া সত্যের উপাসনা করিয়া থাকেন। মানুষ সত্যের বলে স্বভাবসুলভ দুর্ব্বলতা দূর করিয়া মহাবলে বলীয়ান হয়—এবং সত্যের মহত্ত্বে মনুষ্যত্ব দেবত্বকে হীনপ্রভ করে। যিনি সত্যের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনি সমগ্র বিশ্বে যাহা কিছু লোভনীয় বস্তু আছে, তাহার সহিত সত্যের বিনিময় করিতে পারিবেন না। কোটি কহিণুর সত্যের নিকট কোটি তুচ্ছ উপলখণ্ড। কোটি কালিফোর্ণিয়ার স্বর্ণরাশি সত্যের নিকট কদর্য্য শুষ্ক কর্দ্দম পিণ্ড। সত্য অমূল্য সংসারের জটিল কর্ম্মক্ষেত্র। জীবনের সহস্র সংশ্রবে কিরূপে সত্য পালন করিতে হয়, সত্যের জন্য কতদূর আত্মত্যাগ করিতে হয়, পুরাণ সমূহে তাহার সহস্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। সত্যপরায়ণতা সম্বন্ধে দুই চারিটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া আমরা দেখাইব, আর্য্যগণ কিরূপ ভাবে সত্য পালনে অনুরক্ত ছিলেন। বিশ্বজিদ যজ্ঞে দৈত্যরাজ বলির নিকট যখন বামনরূপী ভগবান ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থী হইয়া দণ্ডায়মান, দৈত্যগুরু শুক্রচার্য্য বামনরূপী ভগবানের ছলনা বুঝিতে পারিয়া দানকল্পতরু দৈত্যপতিকে সঙ্কল্প-চ্যুত করিতে কত শাস্ত্র বাক্য, কত কূট নীতি, কত কুটিল যুক্তিরই না অবতা-রণা করিয়াছিলেন, কিন্তু বলির অটল সঙ্কল্প কিছুতেই টলিল না। সর্ব্বনাশ আসন্ন জানিয়াও বলি সত্যপালনে প্রস্তুত হইলেন। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রকে ধনরত্ন রাজ্য সর্ব্বস্ব দান করিয়া পত্নীপুত্রসহ, পথের ভিখারী হইলেন, দক্ষিণার অর্থ সংগ্রহের জন্য আত্মজ ও অর্দ্ধাঙ্গিনীকেও অর্থের বিনিময়ে পরের হস্তে অর্পণ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না এবং অবশেষে—

ঘৃণিত চণ্ডালের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া সত্যরক্ষার কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। উশীনরপুত্র মহারাজ শিবি শরণাগত কপোতকে রক্ষা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন বলিয়া শ্যেনের ক্ষুধা শান্তির জন্য কপোত মাংসের পরিবর্ত্তে নিজদেহের মাংসদানে স্বীয় সঙ্কল্প রক্ষা করিয়াছিলেন। সত্যব্রত মহারাজ দশরথ সত্যভঙ্গ ভয়ে প্রাণাধিক পুত্র রামচন্দ্রকে বনে নির্ব্বাসিত করিয়া স্বয়ং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন, তথাপি অণুমাত্র সত্য হইতে বিচলিত হইলেন না। সত্যপ্রতিজ্ঞ দেবব্রত সত্যের অনুরোধে সংসারের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কৌমারব্রত অবলম্বনে জীবন কাটাইলেন এবং সত্যের ভীষণ পরীক্ষায় অটল থাকিয়া জগতে ভীষ্ম নামে পরিচিত হইলেন। অলর্ক ঋষি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে স্বীয় চক্ষু উৎপাটিত করিয়া তাহাকে দান করিলেন, তথাপি অঙ্গীকার হইতে বিচ্যুত হইলেন না। পুরাণে এরূপ দৃষ্টান্ত বহুল।

এই মহতী শিক্ষায়—উপদেশে এবং দৃষ্টান্তে আর্য্য জাতির অন্তঃকরণবৃত্তি পরিমার্জ্জিত, হৃদয় পবিত্রীকৃত এবং চরিত্র বিশুদ্ধ উপাদানে সুগঠিত। প্রাচীন ভারতে এই শিক্ষার ফলে ভারতবাসীর নৈতিক চরিত্র অতীব উন্নত ছিল—তখনও এই অধঃপতিত ভারতে সত্যনিষ্ঠা ভারতবাসীকে পরিত্যাগ করে নাই। তবে এই শিক্ষার প্রভাব যতই শিথিল হইতেছে,ভারতবাসীর নৈতিক অধোগতির পথ ততই প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত হইতেছে। যাহা হউক, বর্ত্তমান সমাজের নৈতিক অবস্থা এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে—ভারতে সত্যের মহিমা ইহার আলোচ্য। আমরা এই প্রবন্ধে যতটুকু আলোচনা করিয়াছি—তাহাতে স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে বা সাহিত্যে সত্যের মহিমা পূর্ণভাবে প্রকটিত হইয়াছে। আর্য্য মণীষিগণ তাঁহাদের দর্শন বা সাহিত্যে কোন কল্পিত রেখার দ্বারা ধর্ম্ম এবং নীতিকে পৃথক করেন নাই—পাশ্চাত্য জাতি ধর্ম্ম (Religion) এবং নীতিকে (Morality) পৃথক রাখিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্ম এবং নীতি—পরস্পর অন্যান্যাশ্রয়িভাবে জড়িত—যাহা মনুষ্য হৃদয়ের ঈশ্বরাভিমুখিনী বৃত্তিনিচয়কে পুষ্ট করে, তাহা ধর্ম্ম এবং যাহা মনুষ্য হৃদয়ের উচ্চ ভাবগুলির বিকাশ করে, তাহা নীতি—সুতরাং নীতি ধর্ম্মভাবের সম্পূর্ণ অধীন—যাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব প্রবল, তিনি কখনই হীনভাবের সেবা করিবেন না—যিনি ধর্ম্মবলে বলীয়ান, তিনি নৈতিক বলে বলীয়ান। নীতি অনন্যাশ্রয়া লতিকার ন্যায় ধর্ম্মভাবকে

আশ্রয় করিয়াই সজীব এবং সতেজ থাকে—ধর্ম্মভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে নীতি সংশ্রয়ক্রমবিচ্ছিন্ন বল্লরীর ন্যায় ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়। ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যজাতি কখনও নীতিকে পৃথক আসনে বসাইয়া পূজা করেন নাই—নীতি সতত ধর্ম্মের অনুগামিনী হইয়া আর্য্যজাতির নিকট অলক্ষ্যে পূজা পাইয়াছে। সুতরাং ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে সত্য কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার নির্দ্দেশ করিতে হইলে, সত্য ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে কোন্ স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহাই দেখিতে হইবে এবং যতদূর দেখা হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—সত্য যে স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহার ঊর্দ্ধে আর কোন স্থান নাই। বঙ্গ সাহিত্যে এখন যে নৈতিক চরিত্র, নৈতিক বল, নৈতিক সাহস, নৈতিক জীবন প্রভৃতি পদের বহুল প্রচলন দৃষ্ট হয়, তাহাতে বঙ্গসাহিত্যে ইংরাজী সাহিত্যেরই প্রভাব সূচিত হইতেছে—এগুলি ইংরাজী moral character, moral strength, moral courage, moral life প্রভৃতি পদেরই অনুবাদ মাত্র। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে—নৈতিক বলের পরিচয় দিতে হইলে সত্যনিষ্ঠাই সর্ব্বাগ্রে গণনীয় হইত, কারণ সত্যই সকল নীতির মূল এবং সকল নীতির বল। ভাষা মনুষ্যহৃদয়ের দর্পণ-ভাব, জগতের ইতিহাস। ভাষায় যে শব্দের অধিক প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, জাতীয় জীবনে সেই ভাবেরই সমধিক প্রভাব সূচিত হয়। প্রাচীন সাহিত্যে সত্য সম্বন্ধে যত প্রকার বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে, অন্য কোন গুণ সম্বন্ধে তত প্রকার বিশেষণ দৃষ্ট হয় না। সত্যবান্, সত্যপরায়ণ, সত্যসন্ধ, সত্যনিষ্ঠ, সত্যবাদী, সত্যবচস্, সত্যভাষী, সত্যবাক্, সত্যসঙ্কল্প, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সত্যসঙ্গর, সত্যব্রত, সত্যবিক্রম, সত্যপরাক্রম, প্রভৃতি বহু বিশেষণ সত্যের প্রাধান্য সূচিত করিয়াছে। যে দিকে যে ভাবে আলোচনা হউক না কেন, আর্য্য-জাতির ভাবে এবং ভাষায় সত্যের সর্ব্বপ্রাধান্য সর্ব্বপ্রকারে প্রতিষ্ঠিত। আমরা প্রধানতঃ পুরাণকেই অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধে সত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম—কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরাণ একাধারে দর্শন, কাব্য এবং ইতিহাস। যতদিন জগতে আর্য্যজাতি বা আর্য্যধর্ম্মের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন পুরাণ কখনও প্রণষ্ট-গৌরব হইবে না—পুরাণ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির প্রাণারাম ধন, —ভারতীয় ভাব জগতে পুরাণের একাধিপত্য—পুরাণ পরবর্ত্তী কবিগণের ভাবকে অনুপ্রাণিত এবং কল্পনাকে অনুরঞ্জিত করিয়াছে—কালিদাস ভবভূতি ভারবি প্রভৃতি পরবর্ত্তী মহাকবিগণও পুরাণ হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া

সাহিত্য-ক্ষেত্রে কল্পনার নূতন কল্পতরুর সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধুময়ী তুলিকার সজীব স্পর্শে সত্যেরও মনোহর চিত্র কত স্থলে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আমরা তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হইলাম, কেবল মহাকবি ভবভূতির একটি শ্লোক এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি—সত্য বাক্যের কত ফল, তাহা কবির ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

কামান্ দুগ্ধে বিপ্রকর্ষত্যলক্ষ্মীং
কীর্ত্তিং সূতে দুষ্কৃতং যা হিনস্তি।
তাঞ্চাপ্যেতাং মাতরং মঙ্গলানাং
ধেনুং ধীরাঃ সূনৃতাং বাচমাহুঃ॥

যাহা (দুগ্ধের ন্যায়) সকল কামনা প্রদান করে, সকল অলক্ষ্মী দূর করে, কীর্ত্তি প্রসব করে এবং দুষ্কৃতি বিনষ্ট করে, সুধীগণ সেই সত্যবাদীকে সকল মঙ্গলজননী কামধেনু বলিয়াছেন।

শ্রীবলীন্দ্র সিংহদেব।

সার্ সালারজঙ্গ।

সার্ সালারজঙ্গ একজন ভারতের বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ। তিনি ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ৪৯ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ মদিনা হইতে আসিয়া কন্‌কান (Concan) উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহারা বিজাপুরের একটী ভদ্রবংশীয় পরিবারের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদিগের একজন বংশধর প্রথম নিজামের ধর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার বংশের কোন না কোন ব্যক্তি হাইদ্রাবাদ রাজ্যের রাজকার্য্য পরিচালনে সংশ্লিষ্ট থাকিতেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের রাজত্বকালে মির আলুম (Mir Alum) হাইদ্রাবাদ রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার জামাতা মুনিয়ার উল্ মুল্‌ক আমীর-উল-উম্‌রা; তাঁহার ঐ পদের উত্তরাধিকারী হয়েন। তিনি সার্ সালারজঙ্গের পিতামহ ছিলেন। তাঁহার পদে তাঁহার পুত্র সিরাজুল্-মুলক (সার্ সালারজঙ্গের খুড়া) নিযুক্ত হয়েন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মে

তারিখে সিরাজুল্ মুল্কের মৃত্যু হয়। ৩ দিবস পরে সালারজঙ্গ ঐ পদে মনোনীত হয়েন। তখন তাঁহার বয়স ১৯ বৎসর। সেই সময়ে বেরার-প্রদেশ (Berars) বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। উক্ত বেরার-প্রদেশ প্রদানে হাইদ্রাবাদের প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ হইতে সমগ্র প্রজা-মণ্ডলী বিশেষ উৎপীড়িত, ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়াছিল। উক্ত বেরার প্রদেশ হাইদ্রাবাদ রাজ্যের একটী উৎকৃষ্ট অংশ। এরূপ বিপন্ন অবস্থায় পক্ককেশ পরিণত-মস্তিষ্ক রাজনীতিজ্ঞ পুরুষও যাহা করিতে শঙ্কিত ও ভাবিত হয়েন, তাহাই সালারজঙ্গকে বীরহৃদয়ে আলিঙ্গন করিতে হইল। ধনাগার অর্থশূন্য, করসংগ্রহ প্রণালী যতদূর অনিষ্টকারী ও ক্ষতিজনক হইতে পারে, তাহা হইয়াছিল। হাইদ্রাবাদ বিশৃঙ্খলতা ও অসন্তোষের আবাসভূমি হইয়া উঠিয়াছিল। সালারজঙ্গ আপনার ও সমস্ত কর্ম্মচারীর বেতন কমাইয়াছিলেন। তিনি পুলিসের বন্দোবস্ত সুদৃঢ় করিলেন। আরববাসী, রোহিলা এবং অপরাপর দ্বন্দ্বপ্রিয় দুষ্ট লোকদিগের হাইদ্রাবাদে জমায়েত বা একত্রিত হইয়া গোলযোগ এবং নানারূপ ষড়যন্ত্র করিবার পথ রুদ্ধ করিলেন। চারি বৎসরের মধ্যে তিনি রাজ্যে আশ্চর্য্য এবং অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সংঘটন করিলেন। বাণিজ্যের উন্নতি এবং রাজস্ব বর্দ্ধিত হইল। প্রজাদিগের জীবন এবং সম্পত্তি যাহাতে সুরক্ষিত হয়, তাহার সুবন্দোবস্ত হইল। রাজ্যের এইরূপ গুরুভার বহনকালে সালার্জঙ্গের একটী ভয়ানক পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইল। সেই পরীক্ষার গুরুত্ব একজন ইউরোপবাসী বা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীর বুঝিবার নহে। তিনি নিজে মুসলমান হইয়া মুসলমান রাজার অধীনে চাকুরি করিতেন। সিপাই বিদ্রোহানল সেই সময়ে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার গগনস্পর্শিনী শিখা ইংরাজের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়াছে। যে পরাক্রমশালী রাজশক্তি ভারতে হিন্দু ও মুসলমানের রাজ্য বিলুপ্ত করিয়াছে, তাহার আজ বড়ই দুর্দ্দিন! সেই বিক্রমশালী ইংরাজ রাজ্য আজ সমূলে উৎপাটিত হইয়া পতন হইবার ভয়ে টলটলায়মান। হাইদ্রাবাদের রাজপথে প্রজাগণ দলে দলে ফিরিঙ্গিদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব বলিয়া চীৎকার করিতেছে। লোলজিহ্বা উগ্রমূর্ত্তি রণচণ্ডী রুধির পিপাসায় অধীর হইয়া ভীষণ হুঙ্কার পূর্ব্বক চারিদিকে নৃত্য করিতেছে! মধ্যভারত এবং দাক্ষিণাত্যের প্রজাবৃন্দ হাইদ্রাবাদের ইঙ্গিত অপেক্ষা করিতেছে। হাইদ্রাবাদের বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন হইলেই তাহারা সকলেই ইংরাজের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হয়। বঙ্গের গবর্ণর হাইদ্রাবাদের রেসিডেণ্টসাহেবকে এই মর্ম্মে তারে খপর পাঠাইলেন যে, নিজাম যদ্যপি আমাদিগের পক্ষ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইয়া বিদ্রোহবহ্নি অচিরাৎ একদিকে বোম্বাই-প্রদেশ এবং অপর দিকে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। নাইজাম বিদ্রোহী-দিগের দলে যোগ দেন নাই, কিন্তু সজ্জিত বিদ্রোহোন্মত্ত লোকদিগের অযথা আস্ফালন পূর্ব্বক ভয়প্রদর্শন এবং কুৎসিত গালি-বর্ষণ দমন-ভার একজন চতুর্বিংশতি বৎসর বয়স্ক যুবার হস্তে সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত। যাহারা বিদ্রোহী-দিগের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ না করিবে,তাহাদিগের বিষম বিপদ উপস্থিত। এইরূপ বিপদসঙ্কুল সময়ে যখন হাইদ্রাবাদের রাজনৈতিক আকাশ ঘোর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন, তখন নাইজামের মৃত্যু হইল। বিপদের উপর বিপদ! একে ঝটিকাময় ঘোর অন্ধকার, তায় বজ্রাঘাত। মন্ত্রী সমস্ত বিপদ দেখিলেন এবং বুঝিলেন। পিতার মৃত্যুর পরমূহূর্ত্তেই তিনি পুত্রকে গদীতে বসাইলেন। অভিষেক কার্য্য হইতে ফিরিতে না ফিরিতে তদানীন্তন রেসিডেণ্ট কর্ণেল ডেভিডসন্ ভারতপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিংয়ের নিকট হইতে টেলিগ্রাম পাই-লেন,যে "দিল্লীর পতন হইয়াছে এবং দিল্লী শত্রুহস্তগত হইয়াছে।" তিনি অবি-লম্বে, সালারজঙ্গকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার নিকট শুনিলেন যে,এই সংবাদ তিন দিন পূর্ব্বে বাজারে রাষ্ট্র হইয়াছে। এই সংবাদ সুযোগে সালার-জঙ্গ এবং তাঁহার অনুচরবর্গ অভিষেক স্থানীয় ইউরোপীয়দিগকে অনায়াসেই নিহত করিয়া বিদ্রোহীদিগের মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারিতেন। কিন্তু সালারজঙ্গ আপনার সুখ্যাতি এবং জীবনের মায়া পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া স্বজাতি এবং সহধর্ম্মীদিগের উপরে অনেক উচ্চে দণ্ডায়মান রহিলেন। উন্মত্ত প্রজাগণ রোষসহকারে তাঁহার দেশহিতৈষিতা এবং ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে লাগিল। তিনি সে সমস্ত কিছুতেই দৃক্‌পাত না করায়, বিদ্রোহীরা তাঁহার জীবন নষ্ট করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি হিমাদ্রি সদৃশ অচল অটল হইয়া রহিলেন। তাঁহার দৃঢ়চিত্ত আরবীয় দেহরক্ষকেরা কিছুতেই বিচলিত হইল না। তিনি তাহাদিগের সাহায্যে হাইদ্রাবাদ নগরের তোরণ ও অপরাপর নিষ্ক্রামণ পথ সকল এরূপে রক্ষা করিলেন যে, দুর্বৃত্ত বিদ্রোহিগণ আর বাহিরে যাইতে পারিল না। যাহারা রেসিডেন্সী (রেসিডেণ্ট-আবাস) আক্রমণ করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে দণ্ড দিয়া ভবিষ্যতে আর কোনরূপ অত্যাচার একেবারে বন্ধ করিয়াছিলেন।

তিনি সেই সময়ে হাইদ্রাবাদ রাজ্যের সৈন্য দিয়া অন্যস্থানে ইংরাজের সাহায্য করিয়াছিলেন। একজন তদানীন্তন ইউরোপীয় ভারততত্ত্বজ্ঞ লিখিয়াছেন, "বিদ্রোহ সময়ে সালারজঙ্গের কার্য্য কলাপ একেবারে অমূল্য।"

সিপাই বিদ্রোহের পর সার সালারজঙ্গ দেশের উন্নতি সাধন কল্পে মনোনিবেশ করিলেন। হাইদ্রাবাদ রাজ্যের রাজস্ব ৭৫ লক্ষ হইতে ২॥০ আড়াই কোটে টাকার পরিবর্দ্ধিত হইল; প্রজা সংখ্যাও এক তৃতীয়াংশ বাড়িল; প্রজাদিগের সচ্ছন্দে চলিবার রাস্তা এবং রেল পথে নির্ম্মিত হইল, পূর্ত্ত বিভাগে খাল খননাদি কার্য্য হইল; রাজস্ব বৃদ্ধি জন্য দেশের অধিকাংশ জরিপ হইল; বিদ্যাচর্চ্চায় বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হইল; কার্য্যকরী এবং সুন্দর পুলীশ বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হইল; এবং অকর্ম্মণ্য সৈন্য রক্ষা বা গ্রহণ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশের বড় লোক সকল তাঁহার এই সংস্কার কার্য্যে বিশেষঃ প্রতিবন্ধকতা (প্রতিকূলতা) করিয়াছিলেন। সংস্কার কার্য্যে তিনি যেরূপ পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা আদৌ সে পথ পছন্দ করিতেন না। তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। এমন কি, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে চক্রান্ত করিয়া নাইজামের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে বলা হইয়াছিল যে, রেসিডেণ্ট কর্ণেল ডেভিডসন্ শীঘ্রই মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিবেন। নাইজামও তাহাতে বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তিনি তজ্জন্য রেসিডেণ্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেব তাঁহার কথায় চমকিত ও বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "আমি ইহার বিন্দুবিসর্গও জানি না।" কিন্তু সালারজঙ্গে যত কেন ষড়যন্ত্র হউক না, বৃটীশগবর্ণমেণ্টের সহিত সখ্যভাব সংরক্ষণে বিশেষ পটু ছিলেন।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এইচ্ এইচ্ আফ্‌জুল্-উল-দৌলার মৃত্যুতে সার সালারজঙ্গ পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত রিজেণ্ট (Regent) হইলেন; আমিয়ী কুবীর Ameer-i-Kubeer) তাঁহার কো-রিজেণ্ট হইলেন। যুবরাজ প্রিন্স্ অব ওয়েলস্ যখন ভারত পরিদর্শনের আইসেন, তিনি সার সালার্‌জঙ্গকে এতদূর ভালবাসিয়াছিলেন এবং সম্মান করিয়াছিলেন যে, তাঁহারি অনুরোধে সালার্‌জঙ্গ বিলাত দর্শনে যাত্রা করিয়াছিলেন। বিলাতে এবং ইউরোপের অপরাপর স্থানে তাঁহাকে রাজোচিত সম্মানের সহিত গ্রহণ করা হইয়াছিল। কিন্তু বিলাত হইতে প্রত্যাগমন কালে সিমলা শিখরস্থ নূতন রাজ প্রতিনিধির

সভাস্থ নূতন সভ্য সকল তাঁহাকে অভাবনীয় ঔদাস্য ও উপেক্ষার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।

পাঠকের বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে যে, সরকার বাহাদুরের বিরার প্রদেশ গ্রহণ করিবার পর, সার্ সালারজঙ্গ হাইদ্রাবাদের মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হয়েন। গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে উহার পুনঃ প্রাপ্তি তাঁহার নিকট স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু তাঁহার যত্ন ও বুদ্ধি কৌশলে তদ্‌সম্বন্ধে বিলাতে বড়লোকদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। লর্ড লিটন ও তাঁহার সদস্যগণ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটরীকে অকস্মাৎ ছাড়াইয়া দিলেন এবং চিরশত্রু একজনকে কো-রিজেণ্টের পদে নিযুক্ত করিলেন। এক সময়ে তাঁহারা তাঁহার অবস্থা এতদূর অসচ্ছল করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, যাহাতে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, ইহা তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ অভিপ্রেত ছিল, কিন্তু হাইদ্রাবাদ রাজ্যের সৌভাগ্যক্রমে তাহা ঘটে নাই। সার সালারজঙ্গ অনেক বিঘ্ন বিপত্তি কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও মন্ত্রীপদ পরিত্যাগের চিন্তা করেন নাই। বরং উহার স্থায়িত্বের ভিত্তি স্বীয় কার্য্য দক্ষতায় বদ্ধমূল করিয়া মানসীক তেজ, স্বাধীনতা, অধ্যবসায় এবং সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

সালারজঙ্গকে ভারতের মধ্যে অত্যুৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ-পরিহিত ব্যক্তি বলা হইত। এই বাক্য অর্থহীন ছিল না, যেহেতু তাঁহার পরিচ্ছদ অতি সরল এবং আড়ম্বরশূন্য ছিল এবং তিনি অনেক বহুমূল্য হীরকখচিত পরিচ্ছদধারী ভারতীয় রাজপুরুষদিগের অপেক্ষা আপনার শুভ্রবর্ণ ক্ষুদ্র উষ্ণীশ অধিকতর গৌরব ও সম্মানের সহিত মস্তকে ধারণ করিতেন। তিনি একজন দীর্ঘকায় সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল চিন্তাযুক্ত ও স্থির, ঈষৎ হাস্যে প্রফুল্লিত হইত, কিন্তু তাহাতে চতুর বদনভাষাজ্ঞ পণ্ডিত তাঁহার হৃদয়ের ভাব কিছুমাত্র বুঝিতে পারিতেন না। তিনি সুন্দর ইংরাজী অক্লেশে লিখিতে ও বলিতে পারিতেন। তাঁহার আচার ব্যবহার এতদূর সুন্দর ও মনোহর ছিল যে, বিরার প্রদেশ প্রত্যর্পণ সম্বন্ধে তাঁহার একজন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ও বিপক্ষ ইংরাজ কর্ম্মচারী মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন যে, "ক্ষমতাশালী ও উচ্চশ্রেণীর ইংরাজকে হাইদ্রাবাদে পাঠান উচিত নহে, তাহা হইলে সার সালারজঙ্গ তাঁহাকে নিশ্চিত বশীভূত করিবেন।"

সার সালারজঙ্গ ভারতে একজন ক্ষমতাশালী রাজনীতিজ্ঞ ও কর্ম্মবীর। তাঁহার শ্রমশীল জীবন সাধারণের আদর্শ। তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে ৬ টার সময় শয্যা হইতে উঠিয়া দরবারে বসিতেন। সেই দরবারে অতি হীন ব্যক্তিও অবাধে প্রবেশ করিতে পারিত। তৎপরে পাঠাগারে যাইতেন, ধনাগারে হিসাব দেখিতেন এবং রেসিডেন্সির পারস্য ভাষাজ্ঞ মুন্সির সহিত দিবসের চিঠিপত্র সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেন; তৎপরে বিচারপতি আসিয়া সাক্ষাৎ করিতেন। তখন ১০টা বাজিত। সেই সময়ে ১৫ মিনিট আহারে বসিতেন। আহারান্তে প্রধান মুন্সির কথা শুনিতেন এবং পূর্ব্বদিবসে যে সমস্ত আবেদন পত্র গৃহীত হইত, তৎসম্বন্ধে কথোপকথন করিতেন। মধ্যাহ্নকালে খাস-কামরায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ১২॥ টার সময় নাগরিক ভদ্রলোকদিগের সহিত দরবারে বসিতেন। তৎপরে রেসিডেন্সিস্থ মুন্সি তাঁহার নাম স্বাক্ষরের জন্য কাগজপত্র দাখিল করিতেন। বেলা দুই টার সময় হাইদ্রাবাদ রাজ্যের নিম্নতন কর্ম্মচারিদিগের সহিত, নগরের প্রধান প্রধান সাউকারদিগের (Soucare) সহিত এবং নিজামের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। অপরাহ্ন বেলা ৫॥ সাড়ে পাঁচ টার সময় তিনি ক্রমান্বয়ে আপনার ঘোটকদিগকে এবং তৎপশ্চাতে নিজামের অশ্বশালাস্থিত ঘোটকদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শকটারোহণে বা অশ্ব-পৃষ্ঠে নগরভ্রমণে বাহির হইতেন। ফিরিয়া আসিয়া ভোজনে বসিতেন। ভোজনান্তে রাত্রি ১০টা ৩০ মিনিট পর্য্যন্ত আপনার চিঠিপত্র লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন।

ভারতীয় গবর্ণর জেনারেল লর্ড লিটনের ভারত পরিত্যাগের পর, তিনি পুনরায় ভারত গবর্ণমেন্টের প্রিয় ও বিশ্বাসভাজন হইলেন। তদবধি হাইদ্রাবাদ রাজ্যের সম্পূর্ণ শাসনভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইল। সিমলা শৈলশিখরে লর্ড রিপণ এবং তাঁহার সদস্যদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি যাহার পর নাই অপ্যায়িত এবং সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারি অকৃত্রিম যত্নে এবং কার্য্য-কুশলতায় বিরার প্রদেশ নিজামকে প্রত্যর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, অকাল মৃত্যু বশতঃ, তাঁহার এই স্বপ্নবৎ মহৎ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কে, সি, এস, আই উপাধি এবং ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জি, সি, এস, আই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে অকস্-

ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানসূচক ডি, সি, এল, উপাধি প্রদান করেন।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বিসূচিকা রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি দুইটী পুত্র এবং দুইটী কন্যা রাখিয়া যান।

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।

। গার্হস্থ্যাশ্রম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিবাহ আট প্রকার। যথা,—

"ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥"

মনু।

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ও পৈশাচ। এই আট প্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহই শ্রেষ্ঠ ও ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত-কল্প। ব্রাহ্মবিবাহের লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যথা—

"ব্রাহ্মো বিবাহ আহূয় দীয়তে শক্ত্যালঙ্কৃতা।
তজ্জঃ পুনাত্যুভয়তঃ পুরুষানেকবিংশতিন্॥"

যাজ্ঞবল্ক্য।

যে বিবাহে বরকে আহ্বান করিয়া যথাশক্ত্যলঙ্কৃতা কন্যা প্রদত্ত হয়, তাহার নাম ব্রাহ্ম বিবাহ। এই বিবাহে কন্যাদাতা একবিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত নরক ত্রাণ রূপ ফল লাভ করে। বর্ত্তমান কালে এই ব্রাহ্ম বিবাহই সর্ব্ব বর্ণের মধ্যে প্রশস্তকল্প বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। এতদ্ব্যতীত আসুর বিবাহ অপ্রশস্ত ও নিন্দনীয় হইলেও তাহাও হিন্দুসমাজের সম্প্রদায় বিশেষে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। আসুর বিবাহের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ এইরূপ যথা,—

"জ্ঞাতিভ্যো দবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানাং স্বাচ্ছন্দাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে॥"

মনু।

যে বিবাহে পিত্রাদি জ্ঞাতিবর্গ ও বিবাহ্যা কন্যাকে ধনদানে (শুল্ক বা পণ) পরিতুষ্ট করিয়া কন্যা গ্রহণ করা হয়, তাহারই নাম আসুর বিবাহ। এই বিবাহ অতীব নিন্দনীয়। এবং এইরূপ বিবাহের কন্যাদাতাগণ "শুক্র-বিক্রয়ী" অভিধানে অভিহিত ও সমাজে অবজ্ঞাত হইয়া থাকে। শাস্ত্রমতে শুক্রবিক্রয়ীর মুখদর্শন করিতে নাই। যথা,—

"কন্যাবিক্রয়িণাঃ পুংসাং মুখং পশ্যেন্ন শাস্ত্রবিৎ।
পশ্যেদজ্ঞানতো বাপি কুর্য্যাদ্‌ভাস্কর দর্শনম্‌॥"

কন্যাবিক্রয়ীর মুখদর্শন করিবে না। যদি দৈবাৎ বা অজ্ঞানতঃ দর্শন হয়, তবে সূর্য্যদর্শনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সেই পাপের ক্ষালন করিতে হইবে। শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন,—

"তদ্দেশং পতিতং মন্যে যত্রাস্তে শুক্রবিক্রয়ী।"

শুক্রবিক্রয়ী যে দেশে বাস করিবে, সে দেশ পর্য্যন্ত পতিত। কেবল তাহাই নহে; ক্রয়ক্রীতা কন্যা পত্নী মধ্যে গণ্য হয় না। তাহার দ্বারা কি দৈব, কি পৈত্র্য, কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। সে দাসীতুল্যা, যথা,—

ক্রয়ক্রীতা তু যা নারী ন সা পত্ন্যভিধীয়তে।
ন সা দৈবে, ন সা পৈত্রে, দাসীন্তু কবয়ো বিদুঃ।

যাহা হউক, ব্রাহ্ম ও আসুর বিবাহ ব্যতীত অন্য ছয় প্রকারের বিবাহ এখন আমাদের দেশে প্রচলিত নাই।

হিন্দু বিবাহের মূল উদ্দেশ্য অতীব উচ্চতম, অতীব মহৎ। পতি পত্নীর মধ্যে পরস্পর পার্থক্য ভাব নষ্ট করিয়া, উভয়ের একীকরণ করাই হিন্দু বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। যত দিন পতি ও পত্নী পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ না হন, তাবৎ তাঁহারা অর্দ্ধাঙ্গ মাত্র। কিন্তু পবিত্র বিবাহরূপ সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইলেই তখন তাঁহাদের পূর্ণতা বা একীকরণ কার্য্য পরিসমাপ্ত হয়। কি ভাবে এই একীকরণ কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত দুইটী বিবাহের মন্ত্র এই স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। একটী মন্ত্রে বর, কন্যাকে বলিতেছেন,—

"ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব॥"

মর্ম্মার্থ এই যে, এখন হইতে তোমার হৃদয় আমার ও আমার হৃদয় তোমার হইল। দ্বিতীয় মন্ত্রে বর বলিতেছেন,—

"ওঁ প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি, অস্থিভিরস্থীনি,
মাংসৈর্ম্মাংসানি ত্বচাত্বচম্।"

অর্থাৎ তোমার ও আমার সম্বন্ধে প্রাণে প্রাণে, অস্থিতে অস্থিতে, মাংসে মাংসে ও চর্ম্মে চর্ম্মে মিল হইয়া যাউক।

এই দুইটী উত্তর বিবাহ বা কুশণ্ডিকার অন্তর্গত বেদ মন্ত্র। বেদ মন্ত্র উপযুক্ত স্বরসংযোগে যথাযথরূপে উচ্চারিত হইলেই তাহাতে তড়িৎ শক্তির ক্রিয়ার বিকাশ হইয়া পতি পত্নীর মধ্যে শক্তি সামঞ্জস্য রক্ষার সহায়তা করিয়া থাকে। ফল কথা এই ভাবে একীকরণ না হইলে, প্রকৃত দাম্পত্য প্রেম কখনও বদ্ধমূল ও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। যে প্রেম কেবল মাত্র রূপজ মোহে সমুৎপন্ন, তাহা ক্ষণভঙ্গুর। রূপের মোহ কাটিয়া গেলেই অধিকাংশ স্থলে সে প্রেমের বিলয় হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, হিন্দু জাতির ন্যায় একীকরণমূলক বিবাহ বা প্রকৃত দাম্পত্য প্রেম, পৃথিবীর অন্য কোন দেশীয় লোকের কল্পনাতেও কখন উদিত হয় নাই।

হিন্দু বিবাহের মূল উদ্দেশ্যের কথা বলিলাম। কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও দুইটী প্রধানতম উদ্দেশ্য আছে। একটী ভগবানের সৃষ্টিরক্ষা বা বংশ রক্ষার্থ পুত্রোৎপাদন। সেই পুত্রের দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্ত্যর্থ জলপিণ্ডের সংস্থান হইয়া থাকে। যথা,—

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ।"

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, ধর্ম্মাচরণ। "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।"

আটচল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে গৃহস্থাশ্রমের যাবতীয় কার্য্যই সস্ত্রীক হইয়া করিতে হয়। নতুবা সে কার্য্য নিষ্ফল হইয়া থাকে। বিবাহের পর সধবা স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বতন্ত্র ভাবে আর কোন কর্ত্তব্য কার্য্য নাই। তাঁহারা স্বামীকৃত কার্য্যের ফল লাভ ও স্বামীসুশ্রূষা দ্বারাই স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন, যথা,—

"নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপাসনম্।
পতিং সুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥"

তবে সধবারা ইচ্ছা করিলে, পতির অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক অন্য ব্রতনিয়মাদিরও অনুষ্ঠান করিতে পারেন। কিন্তু তাহা করিতে হইলে, সেই

সেই কার্য্যের অনুষ্ঠাতৃ দেবতাকে পতি দেবতার অভিন্নভাবেই অর্চ্চনা করিতে হইবে। নতুবা পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের হানি হইয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়বৃত্তির তৃপ্তি সাধনই যে বিবাহের উদ্দেশ্য নহে, এ কথা শাস্ত্রোক্ত ঋতুচর্য্যা বা দারোপগমন-বিধির পর্য্যালোচনা করিলে, স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। প্রথম রজোদর্শনের রাত্রি হইতে ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের ঋতুকাল। এই কালের মধ্যে জ্যোতিষশাস্ত্র-সম্মত বার, তিথি ও নক্ষত্রাদির প্রতি লক্ষ্য করিয়া, কোন একটী প্রশস্ত দিনে পুত্রকামী হইয়া দারোপগমন করাই শাস্ত্র-কারগণের অভিপ্রেত। এইরূপ বৈধ স্ত্রীসহবাস জন্য ব্রহ্মচর্য্য ব্রতেরও কোন হানি হয় না। দারোপগমনে এই প্রকার সাবধানতা অবলম্বনের হেতু এই যে, জীবের জন্মকালে যেরূপ গ্রহ নক্ষত্রাদির সংস্থান বা সমাবেশ থাকে, তাহাদের প্রভাবানুসারেই জাত বালকের প্রকৃতি গঠিত হয়। সেই জন্যই একই পিতা মাতা হইতে সমুৎপাদিত সন্তান সন্ততিগণ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। পশু পক্ষ্যাদি ইতর জীবজন্তুগণের সঙ্গমক্রিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক লক্ষ্য করিলেও এ বিষয়ে অনেক উপদেশ লাভ হয়। তাহারা স্বাভাবিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কেবল সন্তানোৎপাদনের নিমিত্তই স্ত্রীপুরুষে সঙ্গত হইয়া থাকে। কিন্তু একবার গর্ভধারণ হইয়া গেলে, তাহা-দের মধ্যে পরস্পর সম্মিলনেচ্ছা এককালীন রহিত হইয়া যায়। সুতরাং ইহাই যে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অভিপ্রেত কার্য্য, সে পক্ষে সন্দেহ মাত্রও নাই। কিন্তু কালমাহাত্ম্যে আমরা এমনি অধঃপতিত হইয়াছি যে, শাস্ত্রের মহামূল্য উপদেশ বাক্যের প্রতি আর আমাদের কিছুমাত্রও আস্থা নাই। এখন আমরা ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিই দারোপগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করিয়া স্ত্রীসহবাসে যথেচ্ছচার অবলম্বন করিয়া থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ এখন যেন পরস্পর পরস্পরের ভোগের সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে। আবার ফলও তাহার তেমনি বিষময় হইতেছে, এখন আর কোন সংসারে পূর্ব্বেকার ন্যায় কুলপাবন সৎপুত্রের প্রায়ই উদ্ভব হয় না। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বা পুত্রবধূ ঘরে আসিলে শেষাবস্থায় যে পিতা মাতাকে অশেষ লাঞ্ছনা বা অশান্তি ভোগ করিতে হয়, তাহা ত অহরহঃই প্রত্যক্ষ হইতেছে। যাহা হউক, আমরা যথাসময়েই শাস্ত্রোক্ত ঋতুচর্য্যা বা দারোপগমন বিধির বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়, সীতাহাটী।

সংসার।

(ভুবনমোহিনী প্রতিভার বিখ্যাত কবি কর্ত্তৃক লিখিত।)

(১)

বিশাল সংসার-ক্ষেত্র অপূর্ব্ব
সুন্দর, ঘোর গম্ভীর দর্শন!
অদ্ভুত অনন্ত শূন্য অনন্ত ঐশ্বর্য্য পূর্ণ,
অনন্ত সবিতা, গ্রহ, নক্ষত্র,
—চন্দ্রমা, পৃথ্বী, পূর্ণ নিরঞ্জন
দিবস, রজনী, ঊষা, প্রাতঃসন্ধ্যাকাল
সিন্ধু, বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে বহে অনুক্ষণ!

(২)

অনল, অনিল, জল, মৃত্তিকা,
আকাশ, বিশ্ব বিকাশ কারণ;
সর্ব্বত্র সঙ্গতভাবে, ভাঙ্গিছে গঠিছে ভবে,
জড়' কি অজড়' ছোট বড় সর্ব্বভূতে
কিবা নিয়ম লিখন!
কি এক অদ্ভুত, সূক্ষ্ম, সর্ব্বশুভপ্রদ
শক্তি, বাসনা বলেতে, বিশ্ব চলিছে কেমন!

(৩)

সকলি বিচিত্র! এই অনন্ত নিখিল-
-ঘোর চিন্তা পারাবারে,
কে পারে বা সন্তরিতে? দুর্গম সৈকত হ'তে
দেখিয়া অপার সিন্ধুতরঙ্গ উচ্ছ্বাস,
ত্রাস জন্মায় অন্তরে!
অনন্ত বিশ্বেতে ক্ষুদ্র কঙ্কর সন্নিভ
এই পৃথিবীর জ্ঞানী, ভ্রমে সৈকতে সন্তরে!

(৪)

হে এ ক্ষুদ্র পৃথিবীর মানব সকল !
পেয়ে বুদ্ধির পালক,
অবোধ পতঙ্গ মত, স্পর্দ্ধায় উড়িছ কত ?
কতক্ষণ উড়িবে বা ? পড়িবে এখনি ছিন্ন হইয়া পালক,
অনন্ত প্রকৃতি রাজ্যে অণু হতে অণু হয়ে
কিসের কারণে দম্ভে মারিছ মালক ?

(৫)

সাগর, সরিৎ, বৃক্ষ, ব্রততী,
কুসুম, ফল, শস্য সুশোভিনী,
নানা পশু পক্ষী প্রাণী, নানা ধন রত্ন-খনি,
নানা দেশ, জনপদ জননী ;
ধরণী, সুখময়ী চন্দ্রাননী ;
অহরহঃ জীবন উচ্ছ্বাস কোলাহলময়ী
মাতঃ ! ভ্রান্ত শিশু মোরা কিছুই না জানি।

(৬)

অনন্ত বিশ্বের চিন্তা দূরে থাক,
মাতঃ তব মহিমা ভাবিতে,—
কোটি কল্পযুগ গত, জলের বুদ্‌বুদ্ মত
কত শত জ্ঞানী ভেসে উঠিল,
ডুবিয়া গেল কাল-সাগরেতে ;
"ক'টী সত্য অদ্যাবধি অবিরোধি ভাবে
ভবে হয়েছে ঘোষিত তাহা হইবে বুঝিতে !"

(৭)

"সত্য যা'তা স্বতঃসিদ্ধ," সময়
আপনি তাহা করিবে প্রচার,
অসত্যে আবৃত হয়ে, ভ্রান্ত সত্য বুঝাইয়ে,
সয়তান পণ্ডিত হ'ল, জল্লাদ রাজন,
চোর হ'ল জমিদার !
ছলে, বলে, কৌশলে, "মৃত্তিকা অধিকার
প্রথা" রাজধর্ম্ম বলিয়া "সংহিতা" হল তার

(৮)

হিংসা, লোভ, মাৎসর্য্য প্রমত্ত
হয়ে লোক, করে ঘোর গণ্ডগোল,
নীচতার দাস হয়ে, বিবেকের মাথা খেয়ে,
মনুষ্যত্ব, জ্ঞান ধর্ম্ম, ডুবায়ে অতলে
স্বার্থ অন্বেষে কেবল!
যে যত "পাশব" শক্তি করিবে সঞ্চয়
এই অবনীর মাঝে হবে সে তত সফল।

(৯)

বঞ্চক, নিষ্ঠুর, নীচ, নরাধম
যারা, প্রায় তারাই প্রধান!
যথার্থ উন্নত যারা পদতলে প'ড়ে তারা,
অন্নহারা, গৃহহারা, দীন-হীন
প্রায়, অহো! একি এ বিধান?
রাখালে রাজত্ব করে বসি উচ্চস্থানে,
যেন কতই নীতিজ্ঞ, জ্ঞানী, ধার্ম্মিক, ধীমান!

(১০)

সমাজের শীর্ষস্থানে, বসিয়া
কতই করে বিজ্ঞতার ভাণ!
সাজি ধর্ম্ম-অবতার, হরিতে ভূমির ভার,
সর্ব্বেশ্বর ঈশ্বরের শক্তি যেন
নরদেহে হয়ে মূর্ত্তিমান,
অবনীতে অবতীর্ণ হয়েছে আসিয়া,
সর্ব্বলোকে জ্ঞান দিয়া, শান্তি করিতে বিধান!

(১১)

অহে ও অবনীবাসী মানব সকল!
কেন এত ভ্রান্ত চিত?
সকলেই ভাই ভাই, কেহ ছোট বড় নাই,
প্রভু, দাস, রাজাপ্রজা, বৈষম্য-
বিধান, সব শয়তান কল্পিত!

শত শত ধর্ম্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, দেখিতেছ,
মিথ্যা উহা! ও সকল ধূর্ত্তদের কৃত।

(১২)

মাৎসর্য্য মোহের বশে
প্রতিপত্তি লালসায় যত ধূর্ত্তগণ,
নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায় গঠন করেছে হায়!
"বিশ্বব্যাপী লোকধর্ম্ম, এক
সম্প্রদায় ভাব, নাহিক এখন!"
সকলেই সকলের হইয়া বিপক্ষ
এই সংসার শ্মশানে করে আত্ম নির্য্যাতন!

(১৩)

হীন-বীর্য্য দীন হীন, বিবেক-
বিমূঢ় হয়ে মানব মণ্ডল,
বৈষম্য বিপাকে পড়ি, অকূলে ডুবালে তরি,
কল্পতরুতল ছাড়ি, আশ্রয়
করেছে সবে ঘোর মরুস্থল!
হরি হরি! কি হবে জীবের গতি! ক্ষুদ্রতায়
আচ্ছন্ন সংসার, ঘোর দুঃখেতে বিহ্বল!

(১৪)

কে করিবে এ দুঃখের প্রতীকার
আর! ভবে কে আছে তেমন?
বুদ্ধ চৈতন্যের মত হইলেও হবে না ত!
দেশ কাল পাত্রোচিত, বীর ধীর
অবতার চাহি একজন!
সময় প্রকৃতি গুণে জন্মেছে, জন্মিবে কিম্বা
সেই সুসন্তান, সত্য করিতে স্থাপন।

(১৫)

আত্মত্যাগী, মহাবল, লোক
হিত-প্রাণ এক আসিছে সংসারে!

লৌহ পরিচ্ছদ পরি, শ্বেতকায় অশ্বে চড়ি,
নাশিতে মানব অরি, বজ্র অসি পতাকা ধরিয়া হুহুঙ্কারে,
"লোকধর্ম্ম-সংহিতা রচিয়া অভিনব,"
এই মহাত্মা সংসারের সত্য প্রচারের তরে!

(১৬)

সত্যান্বেষী, হুরাশয়, দুর্দ্দম
দুরাত্মাগণে, বিনাশি বলেতে,
সর্ব্বলোক-হিতবিধি, কাঙ্গালের হারানিধি
উদ্ধারিয়া, মৃত্যগণে করি প্রাণ দান, শান্তি দিবে জনে জনে,
পাপমেঘ মুক্ত হয়ে, উঠিবে জ্ঞানের চন্দ্র,
আলোকি অবনী, ঘোর তিমির-গগনে!

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মনের কথা।

বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ ত হইয়া গেল। তোমাদের এত চীৎকার, এত কোলাহল কোন কাজেরই হইল না! ইংরাজ রাজ তোমাদের কোন কথাই গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি যাহা ভাল বুঝিয়াছেন, যাহাতে রাজা প্রজা উভয়ের হিত হইবে বুঝিয়াছেন, তাহাই করিলেন। তোমরা কাঁদিলে কি হইবে?

ইহাতে বুঝিলে কি? তোমাদের ছেলে পিলে অনেক সময় অনেক আবদার করিয়া থাকে। "এটা নেব, ওটা নেব, ইহা করিব, উহা করিব," বলিয়া ত তোমাদিগকে অনেক সময়ে বিব্রত করিয়া তোলে। তোমরা সকল সময়ে কি ছেলের কথা শুন? মনে কর "ছেলেদের বুদ্ধি নাই, বিবেচনা নাই, জ্ঞান হয় নাই বলিয়া উহারা যা' তা' বলিতেছে। ওসব কথা কি শুনিতে আছে? যাহাতে ছেলেদের হিত হইবে, তোমরা তাহাই করিয়া থাক; ছেলেদের কথা ত মানিয়া চল না। ইংরাজও তোমাদিগকে তেমনি ছেলের ন্যায় ভাবিয়া থাকেন। তোমরা যতই নিজেদের বুদ্ধির বড়াই কর না কেন, পরীক্ষায় যতই তোমরা ইংরাজদিগকে হারাইয়া দাও না কেন, ইংরাজ জানে, তোমাদের যত বুদ্ধিই থাকুক, সে ত ছেলের বুদ্ধি। সংসারের

খবর তোমরা কি রাখ? রাজনীতির তোমরা কি ধার ধার? ও সম্বন্ধে তোমাদের কোন কথা বলা ধৃষ্টতা। সুতরাং তোমাদের কথা অগ্রাহ্য।

ইহা যদি আজ বুঝিয়াছ, তবে ভালই হইয়াছে। যদি না বুঝিয়া থাক, তবে তোমাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। এত দিন যে উহা বুঝিতে পার নাই, তাহাতেও তোমাদের বুদ্ধির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। আর এই সোজা সোজা কথাটা না বুঝিতে পারিলেও ত তোমাদের মঙ্গল নাই।

বুঝ আর নাই বুঝ, কথাটা কিন্তু খাঁটি। ইংরাজ জানে যে তোমরা গোলমাল করিতে পার, কাজ করিতে পার না। শিশুর ন্যায় হুজুগ করিতে পার, কিন্তু দুইটা তাড়া দিলে, কিম্বা, গ্রাহ্য না করিলে, বাড়ী গিয়া ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়। ঠিকই হউক, আর বেঠিকই হউক, তোমাদের সম্বন্ধে কিন্তু ইংরাজের ধারণাটা এইরূপ। আচ্ছা, এখন বুঝ দেখি, এরূপ ধারণা করায় কি ইংরাজের পক্ষে অন্যায় হইয়াছে?

কিছু অন্যায় হয় নাই। সেদিন পর্য্যন্ত তোমরা যাহা কিছু করিয়াছ, তাহার ত সবই ছেলেমি। "বালানাং রোদনং বলং।" যখন তোমাদের বোধ হইয়াছে যে, রাজা অন্যায় করিয়াছেন, তখনই তোমরা চীৎকার করিয়াছ; ক্রন্দনের তারস্বরে গগন বিদীর্ণ করিয়াছ। ইংরাজ সব দেখিয়াছেন, সব শুনিয়াছেন, কিন্তু হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। অসহায় শিশুর ক্রন্দনে যেমন রাগের লেশ থাকে না, অভিমানের গন্ধ থাকে না, তোমাদের ক্রন্দনেও সেরূপ কিছু ছিল না। তোমরা কাঁদিয়াছ, ইংরাজ গ্রাহ্য করেন নাই, অথবা তোমাদিগকে কোন খেলনা দিয়াছেন, তোমরা চুপ করিয়াছ।

এখন বল দেখি, ইংরাজ তোমাদিগকে যে 'ছেলের জাত' মনে করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কিছু দোষ আছে কি?

এখন দেখিতেছি, তোমাদের বয়স হইয়াছে। ছেলের যখন একটু বয়স হয়, তখন সে মনের মত জিনিস না পাইলে রাগ করে, অভিমান করে। রাগিয়া বলে "যাও ভাত খাইব না।" তখন মা বাপে ছেলের খোসামোদ করে, যাহা চায় তাহা দেয়, তখন ছেলের অভিমান যায়, ছেলে ভাত খায়। তোমরাও যে তাহাই করিতেছ। ইংরেজ তোমাদের কথা শুনিলেন না, তোমাদের দেশকে দুই ভাগ করিয়া দিলেন। তোমরা অভিমান ভরে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলে "যাও, তোমরা আমাদের কথা শুনিলে না, আমরা আর তোমাদের জিনিস কিনিব না।" তোমরা ত রাগের বশে, অভিমানের

বশেই এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ। মানুষের রাগ, অভিমান কত দিন থাকে ?

বাস্তবিকই বেশী দিন থাকে না। যাহার উপর রাগ করি, অভিমান করি, তাহার উপর আমার মনের টান নিশ্চয়ই থাকে। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণে ঝগড়া হইয়াছিল, শ্রীরাধা দুর্জ্জয় অভিমান করিয়াছিলেন "শ্রীকৃষ্ণের মুখ দেখিব না", এমন কি "কাল বরণ আর হেরিব না" এইরূপ পুনঃ পুনঃ শপথ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরাধার মনের টান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি খুবই ছিল। শ্রীরাধিকা মান করার কিছু পরেই ভাবিলেন "কি কু-কর্ম্মই করিয়াছি, এখন শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া দু'টা কথা বলিলেই সব চুকিয়া যায়।" হইলও তাহাই। শীঘ্রই মিটমাট হইয়া গেল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাওয়া বন্ধ হইয়াছিল, কিনা সে খবর কেহ রাখ কি ?

খুব আশঙ্কা হইতেছে, তোমরা বা তাহাই কর! রাধা বিনোদিনী যেমন কৃষ্ণ-প্রেমে পাগলিনী ছিলেন, তোমরাও যে তেমনি ইংরেজ-প্রেমে পাগল! সাহেবী চাল চলনে, সাহেবী হাব ভাবে, সাহেবী জিনিসের নামে তোমরা যে একবারে যেন হাতে স্বর্গ পাও! তোমরা সাহেবদের অনুকরণে জাতিভেদ উঠাইতে চাও, বিধবার বিবাহ দিতে চাও, কুখাদ্য অখাদ্য সব খাইতে চাও, বাঙ্গালীদিগকে ডাকিয়া আনিয়া ইংরাজীতে বক্তৃতা কর, বাঙ্গালীকে ইংরাজীতে পত্র লিখিয়া থাক; তোমাদের কোন্ কাজে সাহেব প্রেমের পরিচয় না পাওয়া যায় ? তোমরা দেশীয় আচার ব্যবহারকে বর্ব্বরতার চিহ্ন মনে কর, টিকি রাখা, তিলক করাকে ঘৃণা কর; তোমরা সাহেবী পোষাক পর, সাহেবী বুলি ঝাড়। তোমরা যে ভিতরে বাহিরে পূরা সাহেব। আজ তোমার প্রণয়পাত্র তোমাকে অবজ্ঞা করিয়াছেন, তাই তুমি অভিমান ভরে বলিতেছ, "শাদা মুখ আর হেরিব না, বন্ধু হে উলঙ্গ হইয়া থাকিব, তবু তোমার কাপড় পরিব না, ইত্যাদি, ইত্যাদি।" আবার এখনি যদি সাহেবরা তোমাদের একটু আদর করেন, তোমাদের পিঠে হাত বুলাইয়া দেন, তবে তোমরা যে সাহেব সেই সাহেবই হইবে। তখন সাহেবদের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিবে, "ছি! ছি! দারুণ মানের লাগিয়ে বঁধুরে হারায়েছিলাম।"

তাতেই ত ভয় হয়, তোমরা ঠিক রাখিতে পারিবে না। যদি তোমরা অভিমান বা রাগের বশে বিলাতী জিনিস ছাড়িবার প্রতিজ্ঞা না করিয়া

স্বদেশের প্রকৃত কল্যাণ কামনায় অথবা আর্য্যোচিত ঘৃণার বশে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে, তবে তোমাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারিতাম। তবে জানিতাম যে তোমরা এই ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে। ঘৃণা ও স্বদেশ প্রেম স্থায়ী, অভিমান বা রাগ স্থায়ী নহে।

তাহাই যদি হয়, তবে একবার দেখা যাউক, তোমার স্বদেশ-প্রেম ও বিজাতীয় দ্রব্যের প্রতি ঘৃণা আছে কিনা ?

অনেক দিন পূর্ব্বে "বীরভূমি"তে আমরা বলিয়াছিলাম যে, স্বজাতি-প্রেম না থাকিলে স্বদেশ-ভক্ত হওয়া অসম্ভব। সে সব কথার পুনরুল্লেখ না করিয়া মোটামুটি দুটো কথা বলিয়া যাই। তুমি ইংরাজী পড়িয়াছ, বি-এ, এম্-এ, পাশ করিয়াছ, মনে খুব পণ্ডিত হইয়াছ। তোমরা চেয়ারে বসিতেছ, সাবান মাখিতেছ, ষ্টকিং পায়ে দিতেছ। আরও কত কি করিতেছ! কিন্তু ভাই, তোমাদের যে সেই একটা (Conscience) না কি আছে, তাহার দোহাই দিয়া বল দেখি, তোমরা নিরক্ষর বা পুরাতন ধরণে শিক্ষিত হিন্দু-দিগকে প্রীতির চক্ষে দেখ কিনা ? যদি বল 'দেখি,' তবে মিথ্যা বলিবে; যদি বল 'দেখি না,' তবে তোমার স্বজাতি-প্রেম কৈ ? "বন্দে মাতরং" বা ভারতমাতার গান করিলে স্বদেশ-ভক্ত হওয়া যায় না। তুমি যত বড়ই সাহেব হওনা কেন, তুমিত "কালো আদমি" আর আমাদের রামধন মোড়-লও "কালা আদ্‌মি।" উভয়েই এক পর্য্যায়ের ভিতর, তোমার উচিত, রামধন মোড়লকে নিজের লোক বলিয়া ভাবা। তাহার আচার ব্যবহার তাহার রীতি নীতির প্রতি অবজ্ঞা করা তোমার উচিত নয়। কিন্তু তুমি কর তাই। ফলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াইয়াছে যে, ইংরাজী শিক্ষিত দলের সঙ্গে সাধারণ-লোকের আর তেমন ভালবাসা নাই। কেমনতর একটা 'পর পর' ভাব দাঁড়াইয়াছে। রামধন ত আর তোমাকে তেমন ভক্তি করে না। তবে ভয় করে বটে। তোমার বাবাকে সে খুড় ঠাকুর বলিবে, কিন্তু তোমাকে সে 'বাবু' বলিবে। যাউক, অত কথায় আর কাজ নাই। আসল কথা এই যে, তোমরা কেমনতর একটা জীব হইয়া দাঁড়াইয়াছ। দেশের লোকের প্রতি তোমাদের ভালবাসা নাই। তোমরা স্বদেশভক্ত হইবে কি করিয়া ?

প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিক ও স্বজাতি-প্রেমিক হইতে হইলে স্বধর্ম্মে আস্থা-বান হইতে হইবে। পূর্ব্বপুরুষদিগের রক্তে তোমার শরীর ও মন গঠিত;

তাঁহাদের যাহা ধর্ম্ম. তোমারও সেই ধর্ম্ম ভিন্ন অপর ধর্ম্ম নাই। যদি পূর্ব্ব পুরুষদিগের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা থাকে, ভক্তি থাকে, তবে তাঁহাদের ধর্ম্মে তোমার ভক্তি না হইবে কেন? তবে দেখ, স্বধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা করায় তুমি কি মহা পাপই করিতেছ! ধর্ম্মে আস্থা না থাকিলে কোন কালে কাহারও উন্নতি হয় না। মহামতি কার্লাইল বলিয়াছেন; "মানুষই বল, আর জাতিই বল, ধর্ম্মে বিশ্বাস না থাকিলে কেহ কখন বড় হয় না।" কিন্তু তোমাদের ধর্ম্মে আস্থা নাই। তোমরা বড় হইবে কিসে? আর্য্য ধর্ম্মে যদি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার, যদি পরম পবিত্র শাস্ত্র সমূহের নির্দ্দেশ অনুসারে শরীর ও মনকে নিয়ন্ত্রিত কর, তবে দেখিবে, মানুষ হইবার জন্য যে সকল সদ্‌গুণ থাকা আবশ্যক, সে সবই আপনা আপনি তোমার পবিত্র হৃদয় আশ্রয় করিবে। যে দেহে ভগবানের অধিষ্ঠান হইয়াছে, কেবল তথায় সদ্‌গুণাবলীর অবস্থান সম্ভব। তখন দেখিবে, তোমার আত্ম-সম্মান (self-respect) জন্মিয়াছে। তুমি ভাবিবে, তুমি ভগবানের দাস, তুমি দেবতুল্য, প্রাচীন আর্য্যগণের বংশধর, নীচতা তোমার ত্রিসীমাতেও আসিতে পারে না। তখন তুমি আর সাহেবের পদাঘাত নীরবে সহ্য করিতে পারিবে না। তখন তোমার হৃদয় সমগ্র বিশ্বকে প্রেমালিঙ্গন করিতে উৎসুক হইবে। ধীর গম্ভীর ভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইবে। কাহারও নিন্দা করিবে না। কাহারও নিন্দায় বিচলিত হইবে না। তখন তুমি স্বজাতির প্রতি প্রীতি করিতে পারিবে; রামধন মোড়ল তোমাকে দাদা ঠাকুর বলিবে, তুমিও তাহাকে রামধন দাদা বলিতে লজ্জিত হইবে না। তখন তুমি পেণ্টালুন কোট পরিয়া সাহেব সাজিতে পারিবে না। লাট সাহেবের সভায় তখন আর দেশীয় পোষাক পরিয়া যাইতে কুণ্ঠিত হইবে না, আমেরিকা জাপান যেখানেই যাও, স্বদেশীয় রীতি নীতি, স্বদেশীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। তখনই তুমি প্রকৃত দেশভক্ত হইবে। আদরের সহিত স্বদেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করিবে। অস্পৃশ্য বলিয়া, বিদেশীয় দ্রব্য ত্যাগ করিবে। তখনই তুমি বিদেশীয় দ্রব্য বর্জ্জনে কৃতকার্য্য হইবে।

এই ত আমাদের বিশ্বাস। তবে তোমরা একটা হুজুগ তুলিয়াছ, বড় মন্দ কর নাই। কান্না কাটি চেয়ে অনেকটা ভাল করিতেছ। তবে 'সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং"। তাড়াতাড়ি হৈ চৈ করিলে খেলায় হার হয়, ধীরভাবে চারি পাঁচ চা'ল ভাবিয়া খেলিলে তবে বিপক্ষকে মাৎ করিতে পারিবে।

তাই বলিতেছিলাম, তোমরা যেরূপ পত্তন করিয়াছ, গাঁথিয়া তুলিতে পারিবে ত? অভিমান বা রাগ যদি তোমাদের মসলা হয়, তবে ত নিশ্চয়ই তোমার সাধের অট্টালিকা অচিরে ভূমিসাৎ হইবে। আর যদি ধর্ম্মের মসলায় পাকা করিয়া গাঁথিতে পার, তবে তোমাদের ঐ হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় তোমাদের জাতীয় চরিত্র অতি সুদৃঢ় ভাবে সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইবে। কত ভাগীরথী মন্দাকিনী তাহা হইতে নিঃসৃত হইয়া পীযূষ ধারায় জগৎ শীতল করিবে।

উদ্ধার

প্রথম সর্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চাহিয়া চাহিয়া বীর চন্দ্রমার পানে
ধীরে ধীরে শিলাতলে করিলা শয়ন।
স্নিগ্ধ জলকণা স্পর্শে স্নিগ্ধ সমীরণ,
লাগিল সেবিতে বীরে,—ধীরে ধীরে ধীরে
নিদ্রা আসি অভিভূত করিল যুবারে।
স্তব্ধ বসুন্ধরা, নিশা তৃতীয় প্রহর;
হাসিছে চন্দ্রমা নীল প্রশান্ত গগনে,
জ্বলিছে নক্ষত্র রাজি, গাইতেছে পাখী
দূর বিটপ শাখায়; কুসুম কাননে,
খেলিছে ফুটন্ত ফুল স্নিগ্ধ সমীরণে,
পরিয়া সোহাগ মাখা জ্যোছনার হার;
আধফোটা ফুলগুলি সুরভি ভাণ্ডার
না পারে রাখিতে হাসি, তাই ধীরে ধীরে
মেলিতেছে আঁখিপাতা প্রেম বিলেপিত।
লতা, পাতা, তৃণ, তরু, সাগর, শিখর,
রজত কিরণে ধৌত, স্নিগ্ধ নিরমল;
হাসিছে প্রকৃতি যেন জ্যোছনা আলোকে।
অভিমানী কমলিনী হেরি প্রাণনাথে
আনন্দে সহস্রভাগ, সুখে ক্রীড়া রত
উর্ম্মিসনে বারিবুকে, পড়ে আছাড়িয়া
মুহুর্মুহুঃ মনস্তাপে সরসীর কোলে।
স্বচ্ছ বারিবক্ষে শশী প্রতিবিম্ব হেরি
বিহ্বল রূপের মোহে—আকুল নয়ান।
বিশাল পয়োধি বক্ষে, সাগর সৈকতে
পড়িয়াছে রজতের দিব্য আস্তরণ;
পড়িয়াছে যুবকের প্রশান্ত বদনে
চন্দ্রালোক, সে আলোকে প্রতিভাত,মরি!
চাঁদমুখ, ধরাতলে শশীর উদয়।
মণিময় অঙ্গত্রাণ, কিরীট কুন্তল,
অসি-কোষ, ধনুঃ তূণ ঝকে চন্দ্রালোকে।
কে গাইল ওই?
উদারা মুদারা তারা
সযতনে সাধা গলা আহা কি মধুর!
কি প্রকম্প, কি উচ্ছ্বাস, কি লয় তরল!
কাঁপায়ে কানন গিরি, অর্ণব, কন্দর,
নৈশ সমীরণ সনে নাচিতে নাচিতে
মিশাইল মহাশূন্যে,সে স্বর লহরী।
নক্ষত্রে নক্ষত্রে চন্দ্রে গ্রহে উপগ্রহে—
মহা ব্যোমে প্রতিধ্বনি ধ্বনিল মধুর।

ভাঙ্গিল বীরের নিদ্রা, আগ্রহে শুনিল
সে গীত, যেমতি মৃগ দূর বংশীধ্বনি।
শব্দ লক্ষ্য করি বীর চলিল সত্বরে।

দ্বিতীয় স্বর্গ।

কাননে।

অদূরে কানন-ছায়া আবরি শৈলের কায়া,
কল্পনার চারুচিত্র রমনীয় স্থান,
ধীরে ধীরে বীরবর প্রবেশিল সে কান্তার,
যেদিকে ফিরায় আঁখি হরে মন প্রাণ।
মধুর বসন্ত নিশি হাসে যেন দশদিশি
নিশির শিশির ধৌত স্নাত কলেবর,
বিটপ বল্লরিগণ রজতের আস্তরণ
পরিয়াছে সিক্ত অঙ্গে দৃশ্য মনোহর।
শিশির মাখিয়া গায় বায়ুসনে দুলে যায়,
ফোট ফোট ফুলগুলি সুরভি আধার,
ঝোপে ঝাপে লতাবনে গায় পাখী আনমনে
গগনে নাচিয়া যায় লহরী সুধার।
ধাইছে তটিনী ধীরে, পড়িয়াছে স্বচ্ছনীরে
তারা শশী প্রতিবিম্ব কি শোভা অপার!
তরঙ্গে তরঙ্গে ভিন্ন, হায়রে! যেনবা ছিন্ন
স্রোতস্বিনী নীলবক্ষে চপলার হার।
কাটি চন্দ্র, ভাঙ্গি তারা, গাঁথি কত মালা
মন ভুলাবার তরে না দিয়া কাহার গলে
রেখেছে প্রকৃতি সতী সাজাইয়া ডালা।
ওই পোহাইছে নিশি ; শশীকুমুদিনী
ম্লানমুখে পরস্পরে লইছে বিদায়,
লতা পাতা তৃণ ফুল কাঁদিছে বিটপ কুল
নয়নে শিশিরকণা, অনিমেষ চায়।

ক্রমশঃ

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক।

কাশীরাম দাস, দেব—

'মহাভারতে'র সুবিখ্যাত পদ্যানুবাদক, 'স্বপ্নপর্ব্ব', 'জলপর্ব্ব' এবং 'নলোপাখ্যান' রচয়িতা।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার সন্নিকট ইন্দ্রাণী পরগণা মধ্যে, ব্রাহ্মণী নদীর তটস্থিত সিঙ্গি নামক গ্রামে, কাশীরাম দাস, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দেব উপাধিধারী, কায়স্থকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস স্বরচিত "জগন্নাথ মঙ্গল" গ্রন্থে যে আত্ম পরিচয় প্রদান

করিয়াছেন, তাহা হইতে ইহাঁদিগের এইরূপ বংশতালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়—
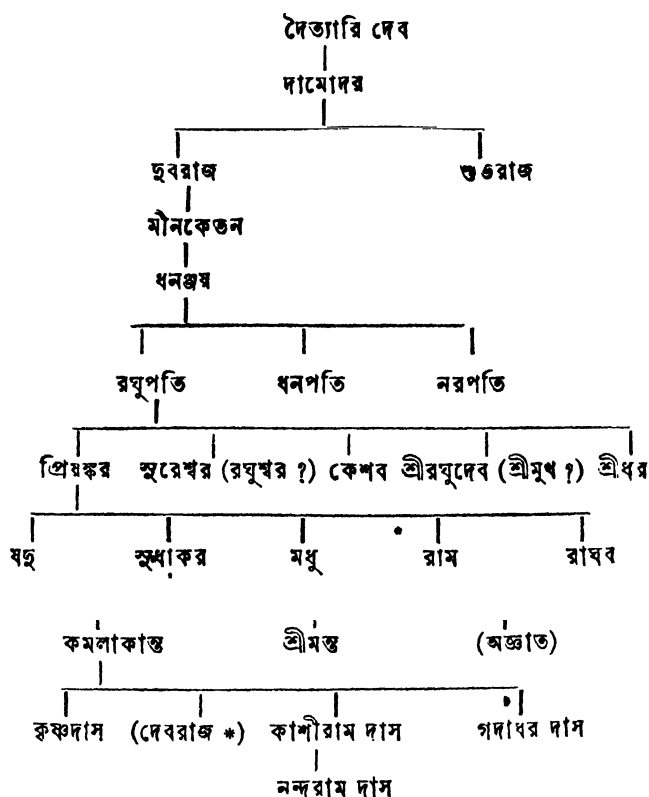
কাশীরাম দাস, ১৫২৬ শক বা ১০১১ সালে বিরাট-পর্ব্ব রচনা সম্পূর্ণ করেন। গদাধর দাস, ১০৫৫ সালে "জগন্নাথ মঙ্গল" গ্রন্থের রচনা সমাধা করেন ; কাশীরাম দাস তখনও বর্ত্তমান ছিলেন। ইহা হইতে কাশীরাম দাস কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার কতকটা আভাষ পাওয়া যায়।

জনশ্রুতি আছে, কাশীরামদাস মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আতাসগড়ের রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া পাঠশালায় শিক্ষকতা করিতেন। এই রাজবাড়ীতে সমাগত পুরাণপাঠকারী পণ্ডিত ও কথকদিগের মুখে পুরাণাদি শ্রবণ করিয়া কাশীরামদাস মহাভারতানুবাদে কৃতসঙ্কল্প হন।

* গদাধর দেবরাজের উল্লেখ করেন নাই। কাশীরাম দাস স্বয়ং এক স্থানে লিখিয়াছেন—"মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ। বিরচিল কাশীদাস দেবরাজানুজ।"

হরিহরপুরের পতিরাম মুখোপাধ্যায়ের পুত্র 'সর্ব্বগুণসম্পন্ন' পুরুষোত্তম মুখোপাধ্যায় কাশীরাম দাসের শিক্ষা বা দীক্ষাগুরু ছিলেন।

সিঙ্গি গ্রামে 'কেশেপুকুর' নামক একটি পুষ্করিণী বর্ত্তমান আছে। জন সাধারণে, উহা কাশীরাম দাস কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কাশীরাম দাসের পুত্র, ১০৮৫ সালে আষাঢ় মাসে আপন পুরোহিতকে বাস্তুভিটা দান করেন। এক্ষণ অমৃতসমান মহাভারত-রচয়িতা দেশবিখ্যাত কাশীরাম দাসের সেই বাস্তুভিটায় একজন গন্ধবণিক বাস করিতেছে!

কাশীরাম দাসের পূর্ব্বে, সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, বিজয় পণ্ডিত, শ্রীকর নন্দী, দ্বিজ, অভিরাম, কৃষ্ণানন্দ বসু, আনন্দ মিশ্র, নিত্যানন্দ ঘোষ, রামচন্দ্র খাঁ, কবিচন্দ্র সারণ, ষষ্ঠীবর, গঙ্গাদাস সেন, রাজেন্দ্র দাস, গোপীনাথ দত্ত, রামেশ্বর নন্দী প্রভৃতি কবিবৃন্দ-রচিত সমগ্র মহাভারত বা তৎসংসৃষ্ট কোন কোন পর্ব্বাধ্যায় বা উপাখ্যান মালা রচনা করিয়াছেন। এই সকল পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের মধ্যে অনেকেরই সমবিষয়াবলম্বনে নাতি-দীর্ঘ-রচনা কাশীরাম দাসের বর্ণনা ও ভাষা হইতে স্থলবিশেষে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু মূল বর্ণিত বিষয়ের সূত্রাবলম্বনে সামঞ্জস্য রক্ষা ও অসংখ্য মনোমত আবান্তর উপাখ্যান মালা সংযোগে ধারাবাহিকরূপে মহা-ভারতের ন্যায় বিরাট গ্রন্থের রচনা, প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের যে অপূর্ব্ব নিদর্শন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। এই সুবৃহৎ গ্রন্থের অনেকস্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের রচনা সন্নিবেশিত আছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এ বিষয়ের জন্য কাশীরাম দাসের ন্যায় প্রতিভাশালী অধ্যবসায়,শীল কবি অথবা দায়িত্বজ্ঞানবর্জ্জিত বিবেকশূন্য লিপিকারক দায়ী, তাহা চিন্তার বিষয় এবং মীমাংসা-সাপেক্ষ।

মহাভারত

কাশীরাম দাসের বর্ণনা গুলি অতিশয় স্বভাবিক ও সুন্দর—যেন অগণিত চিত্রপট গ্রন্থমধ্যে যথেচ্ছ গ্রথিত রহিয়াছে। আবার অধিকাংশ স্থলেই এই চিত্রগুলি কেমন জীবন্ত—বর্ণিত বিষয়গুলি মুহূর্ত্তমধ্যে সম্মুখে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীশিবরতন মিত্র।

বীরভূমি সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। বীরভূমির আকার ডিমাই আটপেজী পাঁচ ফর্ম্মার কম হইবে না।

২। বীরভূমি প্রতিমাসের প্রথম দশদিনের মধ্যে প্রকাশিত হইবে। মাসের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে আমাদের পত্র লিখিবেন।

৩। বীরভূমির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা মাত্র। এক খণ্ডের মূল্য ৵১০। নমুনা পাইতে হইলে ৵১০ টিকিট পাঠাইতে হয়।

৪। বিজ্ঞাপনের হার,

মলাটে	১ পৃষ্ঠা	মাসিক	৩৲
„	½ „	„	২৲
বিজ্ঞাপনীর ভিতর	১ „	„	২৷৹
„	½ „	„	১৷৹

প্রতি লাইনে ১০।

বহু দিনের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে আমরা স্বতন্ত্র চুক্তি করিয়া থাকি। বিজ্ঞাপনের টাকা অগ্রিম দেয়।

শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য্য বি, এ,
ম্যানেজার।
কীর্ণহার জেলা বীরভূম।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

৫ম খণ্ড বীরভূমির ১০ম সংখ্যা গ্রাহকগণের নিকট প্রেরিত হইল। এখন বহু গ্রাহক মূল্য দেন নাই। গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন অনতিবিলম্বে আপন আপন দেয় মূল্য পাঠাইয়া দেন। অথবা যদি আপত্তি না থাকে, তবে আমরা ভিঃ পিঃ ডাকে কাগজ পাঠাইয়া মূল্য আদায় করিব। যাঁহাদের আপত্তি আছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সত্বর জানাইবেন। ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না। পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ ও জীবন গ্রাহকগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে। ইহা স্মরণ করিয়া গ্রাহকমহোদয়গণ কার্য্য করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য্য, বি, এ,
ম্যানেজার।
কীর্ণহার পোঃ জেলা বীরভূম।

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

৫ম খণ্ড] কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, ১৩১২ [১১শ ও ১২শ সংখ্যা।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ,

সম্পাদিত।

সূচী।

কীর্ণাহারের সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশহিতৈষী জমিদার শ্রীযুক্ত
বাবু সৌরেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের সম্পূর্ণ
ব্যয়ে বীরভূম জেলার অন্তর্গত
কীর্ণাহার গ্রাম হইতে
শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য্য বি, এ
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩১২

৫ম খণ্ড] কার্ত্তিক, ১৩১২ [১১শ সংখ্যা।

জাগরণ।

(১)

একি একি জাগরণ ?
আজ দীর্ঘ নিদ্রা পরে
আনন্দে, আবেগ ভরে
জাগিল, মেলিল বঙ্গ-সন্তান নয়ন !
কর্ম্ম পরে অবসাদ,
ঘুচিতেছে ; নাহি সাধ—
অলস নিদ্রার মাঝে দেখিতে স্বপন।
এস জাগি 'বঙ্গ-মার' পুত্র-কন্যাগণ !

(২)

একি নব জাগরণ !
দূরিয়া বিলাস মোহ,
বঙ্গ-মাতা পানে চাহ,
নবীন উদ্যমে তাঁর ঘুচাতে বেদন।
দুঃখ নীর সযতনে
মুছিয়া বসন কোণে,
চির দিন রও মাতৃ সেবা-পরায়ণ !
সার্থক হইবে তবে নব জাগরণ।

(৩)

একি নব জাগরণ!
হৃদয়ে লইয়া ভক্তি
লইয়া অনন্ত শক্তি,
জাগ জাগ বঙ্গবাসী বাঙ্গালার 'ধন'!
দূরে বা নিকটে রও
একতায় বদ্ধ হও।
মুখে নহে, আজি চাই প্রকৃত বন্ধন।
বিফলে যাবেনা তবে নব জাগরণ।

(৪)

একি নব জাগরণ।
কাজ চাই নহে কথা
এদারুণ মর্ম্ম ব্যথা,
ভুলিব, ভুলিব তবে জ্বালা অসহন।
সম্মুখের অন্ধকার
দূর কর এইবার
জ্বাল জ্বাল সমাদরে তীব্র হুতাশন।
এক মনে ছিঁড়ে ফেল মোহের বন্ধন।

(৫)

একি একি জাগরণ!
কত যুগ যুগান্তর
মোহে বদ্ধ নিরন্তর!
ফিরাও প্রবৃত্তি-স্রোত আজি গো এখন।
বঙ্গ-মার হাতে গড়া
পরের 'চরণে পড়া'
আজ কেন রব মোরা? নহে তা কথন।
দূর কর ঘুম ঘোর এযে জাগরণ!

(৬)

এই জাগরণ মাঝে
চির নিশি চির দিন
উৎসাহ না করি লীন
কর্ম্মে ব্যস্ত রব লয়ে নবীন জীবন।
বৃথা নহে কর্ম্ম ভোগ,
সাধনায় সিদ্ধি যোগ!
সমবেত চেষ্টা নহে বিফল কখন।
নিদ্রা নাই আজি শুধু আছে জাগরণ!

শ্রীমতী—

বস্ত্র শিল্পের কথা।

অনেক দিন হইল, আপনার চরণ-সেবা করিতে পারি নাই। আপনি আর আমাদের সংবাদ রাখেন কি না, জানি না, আমরা কিন্তু রাখি। "বীরভূমি" পত্রের জন্মের বৎসর আমরা ইহাতে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ লইয়া কয়েকটি প্রবন্ধ লিখি, এবার বস্ত্র শিল্পের কথা লইয়া আপনার নিকট উপস্থিত। মনে আছে, বোধ হয়, একবার আপনি পত্র লিখিয়াছিলেন, "গরীব ব্রাহ্মণের কথা রাখিও, তোমার "মহাজনবন্ধু"তে যাহাতে লোকে দেশী কাপড় ব্যবহার করে, তাহা লিখিও।" আজ আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। বঙ্গের সকলেই দেশী কাপড় ব্যবহার করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছে। এই বার ফলাফল যাহা দাঁড়াইবে, তাহাই আপনার ঐ পূর্ব্ব পত্রের উত্তর জানিবেন।

ভারতের বস্ত্র শিল্প কত দিনের, তাহা অজ্ঞাত। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য বেদ। উহার মধ্যে ঋগ্বেদে দেখা যায়, যে যুগে উহার স্তোত্রগুলি রচিত হইয়াছিল, তৎকালে আর্য্যেরা কাপড় বুনিতে এবং বর্ম্ম, শিরস্ত্রাণ, তনুত্রাণ এবং নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে জানিতেন। তাঁহারা স্তম্ভ বিশিষ্ট অট্টালিকা, খদির ও শিশুকাষ্ঠের রথ, নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার, এমন কি, উক্ত বেদে সমুদ্র গমনের উল্লেখ থাকায়, ইহাও প্রতীত হয় যে, প্রাচীন

আর্য্যেরা নৌকা ও জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে জানিতেন। স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন, ধাতু গলান, কর্ম্মকারের ভস্ত্রাযন্ত্র, সুবর্ণ সজ্জা বিশিষ্ট অশ্ব প্রভৃতির উল্লেখ আছে। বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ হইতে ইহাও প্রমাণ হয় যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা অতি প্রাচীনকাল হইতেই সঙ্গীতের চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন।

কৌষেয় বস্ত্র বলিলে রেশম বস্ত্র বুঝায়। পাণিনির চতুর্থ অধ্যায়ে এই কৌষেয় কথাটির ব্যুৎপত্তি দেওয়া আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে পাণিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ৪০০ অব্দে জীবিত ছিলেন। সুতরাং তৎকালে যে ভারতবর্ষে পট্ট বস্ত্রের ব্যবহার ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে শত-পথ-ব্রাহ্মণ পাণিনীয় ব্যাকরণ অপেক্ষাও প্রাচীন। এই শত-পথ-ব্রাহ্মণে "কেশিবাসে'র উল্লেখ আছে। সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র যে অতি প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষ হইতে রোমক সাম্রাজ্যে ও অন্যত্র রপ্তানী হইত, ইহা সুপরিজ্ঞাত কথা। বার্ডবুড সাহেব বলেন, আনুমানিক ৪৫০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে লিখিত এস্থারের পুস্তক (Book of Esther) নামক বাইবেলের অংশ বিশেষে প্রথম অধ্যায়ে মূল হিব্রুতে কার্পাস কথাটী আছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় কার্পাস বস্ত্র সুদূর জুড়িয়া দেশে সুপরিজ্ঞাত ও প্রচলিত ছিল। বোগদাদের খলিফা-গণের অন্তঃপুরে ঢাকাই মস্‌লিনের প্রভূত আদর ছিল। বুদ্ধদেবের জীবিত কালে ভারতে অতিশয় সূক্ষ্ম বস্ত্রের ব্যবহার ছিল। মোগল বাদশাহদিগের সময় সূক্ষ্ম রেশমী ও কার্পাস বস্ত্রের যার পর নাই আদর ছিল। আক-বরের পরিচ্ছদাগার সংলগ্ন কারখানায় বহুসংখ্যক সুদক্ষ তন্তুবায় কাজ করিত। জাহাঙ্গীরের সময় প্রস্তুত ১৫ গজ লম্বা এবং এক গজ চৌড়া ঢাকাই মস্‌লিনের ওজন হইত মোটে ৫ তোলা। এখন অত বড় মস্‌লিন প্রায় দশ তোলার কমে হয় না। সে কালে উহার মূল্য ছিল ৬ শত টাকা, এখন উহার দাম দেড় শত টাকার অধিক নহে। বর্ত্তমান সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যখন যুবরাজ ছিলেন ও আমাদের দেশে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার জন্য বরাত দিয়া ৩টি থান করান হয়। প্রত্যেকটী ২০ গজ লম্বা এবং এক গজ চৌড়া এবং ওজন প্রায় সাড়ে নয় তোলা। খুব ভাল কুড়ি গজ চৌড়া মস্‌লিনের থান অঙ্গুরীর ভিতর দিয়া টানিয়া লওয়া যাইতে পারে। এরূপ এক থান বুনিতে ছয় মাস লাগে। মূল্য ৩ শত টাকা। বিখ্যাত

পর্য্যটক টাভের্ণিয়ে বলেন যে, পারস্য সম্রাট সাহ সাফির (১৬২৮-১৬৪১খৃঃ অঃ) দূত ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া নিজ প্রভুকে একটী রত্ন খচিত নারিকেল উপহার দেন। উহার ভিতর ৩০ গজ লম্বা এক থান মস্‌লিন বস্ত্র ছিল। উহা এরূপ কোমল ও সূক্ষ্ম ছিল যে, ছুইলে মনে হইত না যে, কিছু ছুঁইলাম।

এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম মসলিন পূর্ব্বে ঢাকায় প্রস্তুত হইত, তাহা ঘাসের উপর বিছাইয়া দিলে দেখিতে পাওয়া যাইত না। সান্ধ্যশিশির হইতে পৃথক করা যাইত না বলিয়া ইহার নাম ছিল "শবনম" (সান্ধ্যশিশির) আর এক প্রকার মসলিনের নাম ছিল, "আব-রওআন" (অর্থাৎ প্রবহমান জল) ওহো! এইরূপ কবিত্বপূর্ণ এদেশী বস্ত্রের কত নাম ছিল। ভারতবর্ষই তন্ত্র বয়ন বিদ্যায় জগতের মধ্যে পূর্ণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। আজ সেই ভারতের বস্ত্রশিল্পের এরূপ দুর্দ্দশা কেন? এজন্য কি কান্না পায় না?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। তবে আমাদের মত জানাইতে পারি। ১ম, ভারতের ধর্ম্মই সারাৎসার। কৃষি, শিল্প যাহারা করে, তাহারা ছোটলোক, এই প্রবৃত্তি এদেশী বড়লোকের বা ভদ্র সমাজে আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। আমার একটা কাঁচকলা এবং একমুষ্টি চাউল হইলেই দিনপাত হইবে, টোলে বসিয়া কেউ কাহার নয় জগৎ মিথ্যা মা' বাপ মিথ্যা, সবই মিথ্যা এই বলিয়া বেদান্ত পাঠ আরম্ভ করি। বাস্তবিক এভাবটী যদি আমাদের সকলের মধ্যে স্থায়ী হয়, তাহা হইলে অদ্যাপিও কোন দেশের শিল্প আসিয়া আমাদের কায়দা করিতে পারে না। বাসনা বৃদ্ধির জন্য বিলাসিতা আসিয়াই বিদেশী চুরুট, সিগারেট, এসেন্স, দর্পণ, ঘড়ি, গাড়ী, ছড়ি, দেশালাই, সাবান, ষ্টকিন, জুতা, গেঞ্জি, শাল, আলয়ান, চুচ, সূতা ইত্যাদি দ্রব্য বিজড়িত হইয়াছে। নচেৎ একখানা গৈরিক বসন এবং দিনান্তে একবার হবিষ্যান্ন! আর কিছুই আমার সঙ্গী নহে। তখন আমাকে নষ্ট করে কে? এই যে প্রতিজ্ঞা করিয়া বিদেশী দ্রব্য ত্যাগ করিতে বলা হইতেছে, ইহার পরিণাম ঐরূপ সন্ন্যাসব্রত যিনি লইতে পারিবেন, তিনিই প্রতিজ্ঞা পালনে সক্ষম হইবেন। আমরা ইংরাজী যুগেও দেশী শিল্পীকে ঘৃণা করিয়াছি। পরাধীনতায় মন দাসত্ব করে, সেই সঙ্গে রুচিও আমাদের দাসত্ব করিয়াছে। সাহেব হইব, বিলাত যাইব, আমাদের আহার বিহার বিলাতী ধরণের হইবে। ইহাই শয়নে স্বপনে ভাবিয়াছি, দেশী

দোকানী পশারী চাষী উহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি ? এদেশী ভদ্র লোকের এই মহাজ্ঞানের জন্য যে, এদেশী শিল্পে ঘৃণাকর ধারণা; এই ধারণাতেই এদেশী ভদ্রসমাজ অন্ধ হইয়াছিলেন। ইংরাজ বণিক, এদেশে আসিয়া উঁকিমারিয়া দেখিলেন, এদেশী ভদ্রসমাজ কৃষি, শিল্পে অন্ধ! কিন্তু ইহারা কেউ কাহার নহে বলিয়া, বাসনা কমাইয়া আছে ভাল! ইঁহাদের ভিতর আমাদের পণ্য দ্রব্য ঢুকাইলে ইঁহাদের অন্ধ চক্ষুর উপর বস্ত্র বাঁধিতে হইবে। এমন ভাবে বাঁধিব পরিণামে যখন ইহারা দাঁড়াইতে শিখিবে, তখন দেখিবে, ইহাদের চারিদিক বাঁধা! আমাদের এখন এই অবস্থা। বন্দুক ত দূরের কথা, গৃহে ৩া০ হস্ত লাঠি রাখিবার আইন নাই। ঐ যে আমাদের চক্ষু বাঁধা হইয়াছে, তাহা কি ? ইংরাজরাজের আইন। এদেশী যে কোন শিল্পের অবনতি ইংরাজের আইনের বলেই সাধিত হইয়াছে। এজন্য কিছু করিবার যোটা নাই। কিছু বলিবার শক্তিও নাই। তজ্জন্যও আইন আছে। চুপ করিয়া থাকিতেই হইবে। রাজা দয়া করিয়া আমাদের মুক্তি না দিলে, এ দেশের আর নিস্তার নাই। রাজার সহিত কলহ করাও যুক্তি-যুক্ত নহে। আমাদের দেশ রক্ষার অনেক সুযোগ হেলায় শ্রদ্ধায় চলিয়া গিয়াছে। যখন পারস্য এবং আরব দেশের লোক ভারতবাসীর নিকট বস্ত্র বয়ন শিক্ষা করে, তখন এ দেশীর উচিত ছিল, তাঁহাদের সহিত একটা চিরস্থায়ী সত্ব রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া, তাহা আমরা দিই নাই। তৎপরে যখন ইহা আরবের নিকট হইতে মিশর, তাহার পর মধ্য আফরিকা, ক্রমশঃ সিরিয়া হইতে ভূমধ্য সাগরের উপকূলবর্ত্তী দেশ সমূহ মধ্যে বস্ত্র শিল্প বয়ন পদ্ধতি প্রসারিত হইল, তখন আমরা কি করিয়াছিলাম? কিছুই না। ইহাদের নিকট হইতে দ্বাদশ শতাব্দির শেষভাগে বা ত্রয়োদশ শতাব্দির প্রারম্ভে স্পেন ইটালির লোক কার্পাস বস্ত্র বয়ন শিক্ষা করিল, তখন আমরা কি করিয়াছিলাম ? কিছুই না। ষোড়শ শতাব্দার শেষভাগে ওলন্দাজগণ যখন কার্পাস বস্ত্র বয়ন শিক্ষা করিল, তখন আমরা কি করিয়াছিলাম? কিছুই না। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরাজ জাতি প্রথমে কার্পাস বস্ত্রের পরিচয় পান। এই সময় ভারতীয় কার্পাস বস্ত্র প্রতিযোগিতায় বিলাতী পশমী বস্ত্র মারা পড়িবার উদ্যোগ হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া ১৭২০ কি ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ রাজ ভারতীয় কার্পাস বস্ত্র আইন দ্বারা বিলাতে যাওয়া নিষেধ করিয়া দেন। এজন্য বিলাতের প্রজারা ঘোর আন্দোলন করে,

শস্তায় ভারতের কাপড় পাইবে না বলিয়া অনেক আপত্তি করেন। রাজা সে কথা গ্রাহ্য করেন নাই। ইংরাজ রাজ ঘর সামলাইতে চিরকাল পারদর্শী। তবে ১৭৩৬ অব্দে উক্ত আইনের কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা হয়। কিন্তু ইহার পরই ওয়াট, কে, হারগ্রীভস এবং আর্করাইট প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ নূতন নূতন যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া বিলাতবাসীকে ভারতীয় সুলভ মূল্যের বস্ত্রের দরে কাপড় করিয়া দেন। বিলাতবাসী সুস্থ হইল। ১৭৬৩ সালে ইংলণ্ডে কার্পাস বস্ত্র বয়নের অনুমতিসূচক আইন বিধিবদ্ধ হয়। তৎপরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে কার্পাস শিল্পের অবাধ উন্নতি আরম্ভ।

ইংরাজ আইনের বলে ভারতীয় বস্ত্রক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়া স্বদেশকে দাঁড় করাইলেন। আমরা সাগর পারে বাণিজ্য করিব না। তাহা হইলে জাতি যাইবে। পূর্ব্ব হইতে আমরা যদি অন্যান্য দেশে জাহাজ লইয়া বাণিজ্য করা অভ্যাস রাখিতাম, তাহা হইলে, এ দেশের কোন শিল্প সমূলে নষ্ট হইত না, সে মতি গতি আমাদের ছিল না, এখনও নাই। যে বস্ত্র পূর্ব্বে বিলাতে বিক্রয় করিয়া দাম পাইতাম, সেই বস্ত্র এক্ষণে ঘরে বসিয়া সস্তা বলিয়া অবাধে আমরা লইতে লাগিলাম। কুঁড়ের দোরে গঙ্গা হইল, আলসে কুঁড়ে গোঁফ খেজুরের চূড়ান্ত অভিনয় আমরা করিলাম। ইহার ফলে এদেশী তাঁতীকে খুন হইতে দিলাম। তৎপরে ১৮৬৬-৬৭ অব্দে প্রথম হিসাব ধরা হইল, বিলাতী কাপড় এদেশে কত আসিতেছে। সে বৎসর দেখা গেল, ১৩ কোটি ২৭ লক্ষ ২৭ হাজার ৪ শত ১০ দশ টাকার কার্পাসজ দ্রব্য বিদেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে। ১৮৭৫—৭৬ সালে ১৬ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার অধিক। ১৮৮৮—৮৯ সালে ২৭ কোটি ৭৬ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। ইহার মধ্যে ইংলণ্ডই সেবার যোগান ২৭ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের কার্পাস বস্ত্র। আজ কাল আসিতেছে ৩০ কোটি টাকার কাপড়।

এই যে বস্ত্র শিল্পের এত আমদানী ইহার মধ্যে কেবল ইংলণ্ড আছেন, তাহা নহে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ইহার সঙ্গে আমরিকা ছিল, জর্ম্মান ছিল, কিন্তু আইন বলে উহাদের আসা ক্রমশঃই হীন করা হইয়াছে। ভারতের বস্ত্র ও সূত্রের কল গুলিও সময় সময় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু আইনের বলে, ডিউটী ইত্যাদি করিয়া ম্যানচেষ্টারের বস্ত্র ব্যবসায় উন্নতির পথ অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে। ভারত মোটা সুতা করিবে, ম্যানচেষ্টার সরু সূতা কাটিবে। ভারত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সরু সুতা যোগাইবে,

ম্যানচেষ্টার এবং ম্যানচেষ্টার শীত প্রধান দেশের মোটা সূতা করিবে, ভারত। বাণিজ্য চলিবার এই পথ ইংরাজ করিয়াছেন।

কেবল বস্ত্র বলিয়া নহে, ভারতের চিনি পূর্ব্বে বিদেশ যাইত, এখন তাহা বন্ধ হইয়াছে। বিলাস দ্রব্যই আমাদের বিলাতী জাহাজে আসিত, এক্ষণে ক্রমে ক্রমে ভারতের ভক্ষ দ্রব্যেও হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। ভারতবাসী আমরা ক্রমে আহারে বিহারে বিলাতের অধীন হইব, সেই চেষ্টা হইতেছে। বিলাতী রান্না দ্রব্য সংরক্ষিত হইয়া জাহাজে আসিতেছে; তাহাই আমরা খাইতে শিখিতেছি, ধিক্ আমাদের প্রবৃত্তিকে! সেই সকল স্রোত প্রতিজ্ঞা করিয়া ফিরিবে ত? নচেৎ বিলাতী বস্ত্রকে আমরা যে তাড়াইতে পারিব, সে আশা করি না। করিতে পারি, রাজা যদি দয়া করেন। আমাদের বস্ত্র গেল, চিনি গেল, নীল গেল, গালা যায় যায় হইয়াছে। আমাদের উচ্চ চাকরীও গেল। তবে আমরা কি লইয়া থাকিব, রাজন্, ইহার বিচার কর! আজ আমাদের তাঁতিরা বস্ত্র যোগাইতে পারিবে কি না বলিয়া ভাবিতেছি! রাজা একবার ম্যানচেষ্টারের আইনটা সরাইয়া লউন দেখি, তখন দেখিবে, এই তাঁতিরাই কেবল ভারতের নহে, ইংলণ্ডের লোকেরও বস্ত্র যোগাইয়া আসিবে। আইন না সরিলে আমাদের কিছু করিবার উপায় নাই। রাজা না রাখিলে, আমাদের বাঁচিবার উপায় নাই। আমরা ভূয়া বিষয় লইয়া রাজার সহিত তর্ক করি। এই সকল কাজের বিষয় লইয়া রাজার সহিত পরামর্শ করা উচিত। মা লক্ষ্মীরা উলবুনা পরিত্যাগ করিয়া চরকায় সূতা কাটুন। আমরা আবার সন্ন্যাসী হই। বাসনা পরিত্যাগ করি। তবে যদি প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়।

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল—মহাজনবন্ধু সম্পাদক।

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম।

আজ কাল কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য সর্ব্বদেশীয় বিদ্বন্মণ্ডলীই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে সবিশেষ মান্য ও শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া থাকেন! থিওসফী সম্প্রদায় ভুক্ত উচ্চ শ্রেণীর সভ্যগণের প্রতি বিশেষ আদেশ এই যে প্রত্যেক সভ্য প্রতিদিন গীতার অংশ বিশেষ অবশ্যই পাঠ করিবেন, নচেৎ তিনি ভ্রষ্টাচারী বলিয়া বিবেচিত হইবেন। জার্ম্মাণ দেশে গীতার এক এক শ্লোকের

উপর এক এক বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। অনেকেই ইংলণ্ডের ঋষিতুল্য পণ্ডিত কার্লাইল্ ও আমেরিকার ঋষিতুল্য ভাবুক পণ্ডিত এমার্সনের নাম শুনিয়াছেন, ইহাঁরা গীতার পক্ষপাতী ছিলেন। মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ভূপ্রদক্ষিণ কালীন এক দিন এমার্সনের পুস্তকাগার দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলেন। তিনি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, এমার্সনের পুস্তকাগারে জগতের নানা স্থান হইতে নানা রত্নরাজি সংগৃহীত হইয়া যত্নে সুরক্ষিত হইতেছে, তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া সপ্ততাল আলমায়রার সর্ব্বোপরি দ্বিতীয় কৌস্তুভ মণির ন্যায় শোভা পাইতেছে। আমাদের বড়লাট লর্ড কার্জ্জন বাহাদুর গীতা পাঠ করিয়াছেন কিনা জানিনা, কিন্তু তিনি ১৯০৫ সনের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরগণের সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছেন (১) তাহাতে গীতার আভাস পাওয়া যায়। শ্রীগীতা বলেন "ভূতগণের আদিকাল বা পূর্ব্বাবস্থা অজ্ঞাত, মধ্যকাল অর্থাৎ জীবন-কাল ব্যক্ত, এবং মরণের পর যে কাল তাহাও অজ্ঞাত"। গীতার বক্তা শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগজ্জনকে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ উপদেশ করিয়াছেন। জীবের আদি ও অন্ত যখন ঘোর তমসাচ্ছন্ন, তখন প্রত্যেক লোক-হিতৈষীরই কর্ত্তব্য এই যে, ভূতগণ ব্যক্তিজীবনকালে কোন্ পথ দিয়া কিরূপে তাহাদের দুর্ব্বল দেহ-তরণী জীবনসাগরে চালিত করিবে, তাহার উপায় নির্দ্দেশ ও সংস্থাপন করা।

সেই সর্ব্বজন-পূজিত শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া মানবমণ্ডলীকে তাহাদের জীবনগতি পরিচালনের প্রকৃত পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। দার্শনিকগণ এই ভগবদুক্তির আংশিক প্রামাণ্য স্বীকার ও আংশিক প্রামাণ্য অস্বীকার করাকে অযৌক্তিক জ্ঞান করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"আমি সর্ব্বভূতের মহেশ্বর, কিন্তু ইদানীং লীলাকরণার্থ নরবপু গ্রহণ করিয়াছি। মূর্খগণ আমার পরমতত্ত্ব না জানিয়া মানুষ দেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।" (গীতা ৯।১১)।

(1) In the little space of navigable water for which we are responsible, between the mysterious past and the still more mysterious future, our duty has been to revise a chart that was obsolete and dangerous, to lay a new course for the vessel, and to set her helm upon the right track.

"যিনি আমার স্বেচ্ছাকৃত জন্ম ও অলৌকিক লীলাদি যথার্থরূপে জানেন, তিনি দেহত্যাগ করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।" (গীতা ৪।৯)।

ভগবানের এই উপদেশই বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপক্রমণিকা।

এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে শ্রীভগবানের চরিতামৃত ও মধুরলীলা আস্বাদন করাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমরূপ অদ্ভুত পদার্থ লাভের ইহাই সুগম উপায়। শ্রীভগবানের জন্ম কর্ম্ম ও লীলাদি শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে ও লীলাস্থান গোলোকধাম, বৃন্দাবন, মথুরাপুরী, দ্বারকাপুরী অদ্যাপি জগন্তভাবে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। "সম্মুখে থাকিতে বস্তু" তাহা উপেক্ষা করিয়া মরীচিকায় ভ্রান্ত হইয়া জ্যোতিরভ্যন্তরে সাকার রূপ অথবা "তমসঃ পরস্তাৎ" অন্ধকারের পরপারে নিরাকার, অব্যক্ত ব্রহ্ম অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন কি? শ্রীগীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুন শ্রীভগবান্‌কে অব্যক্ত, অনির্দ্দেশ্য, কূটস্থ ব্রহ্মকে উপাসনার কথা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীভগবান্ ঈষদ্ধাস্য করিয়া উত্তর দেন, "তোমার এতাধিক ক্লেশ করিবার প্রয়োজন কি? আমার জন্ম কর্ম্ম যথার্থরূপে অবগত হও।"

শ্রীশুকদেব গোস্বামী ভাগবতে বলিয়াছেন "কলিকালে সকল লোকেই প্রায় অল্পায়ু, তাহাতে আবার আলস্য পরবশ, নির্ব্বুদ্ধি ও বিঘ্নব্যাকুল, অধিকন্তু রোগাদি দ্বারা উপদ্রুত, সুতরাং কলিকালে ভূরি ভূরি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়ঃ সাধন করিবার সম্ভাবনা নাই, কলির জীবের পক্ষে ভগবানের জন্ম কর্ম্ম লীলা শ্রবণ করিয়া বাসুদেবে ভক্তিমান্ হওয়াই বিহিত ধর্ম্ম।'" কলিকালের উপাস্য দেবের উপাসনা প্রণালী শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—

> কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
> যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

যিনি বাস্তবিক কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু কলিকালে শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি অঙ্গীকার করতঃ অবতীর্ণ হইয়া গৌরবর্ণ হইয়াছেন, (কি জানি, কার রূপ সাগরে ঝাঁপ দিয়া ও গৌর সেজেছে), তাঁহাকে অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ সহিত বুদ্ধিমান্ লোকেরা কলিকালে সঙ্কীর্ত্তনবহুল যজ্ঞ দ্বারা উপাসনা করিয়া থাকেন।

এই গৌরবর্ণ প্রচ্ছন্নাবতারটী কে? উদ্ধৃত শ্লোকটীর অর্থ করিয়া

শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্যকে ভঙ্গীক্রমে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "এই অবতার কে? স্পষ্ট করিয়া বল, শুনিয়া সন্দেহ ঘুচিয়া যাউক।" শ্রীচৈতন্য দেব উত্তর করেন "অবতার কখনও বলিয়া বেড়ায় না যে "আমি অবতার, বুদ্ধিমান্ লোকে রূপ গুণ ও লীলা দ্বারা বুঝিতে পারে।" বাস্তবিকও সনাতন গোস্বামী বুঝিতে পারিয়াছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারী এবং শ্রীরামানন্দ রায়ও দেখিতে পাইয়াছিলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ বাস্তবিক কৃষ্ণবর্ণ, তাঁহার সম্মুখে এক স্বর্ণ পুত্তলিকা (রাধিকা) বিদ্যমান্, তাঁহার স্বর্ণকান্তিতে শ্রীগৌরাঙ্গের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত। ইহাই গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপক্রমণিকা।

মথিয়া সকল তন্ত্র, হরিনাম মহামন্ত্র,
করে ধরি জীবেরে বুঝায়।
সঙ্কীর্ত্তনরূপে ঢেউ তরঙ্গ বাড়িল।
ভকত মকর তাহে ডুবিয়া রহিল॥
হরিনামের নৌকা করি নিতাই সাজিল।
দাঁড় ধরি হরিদাস বাহিয়া চলিল॥

শ্রীভগবান্ নিত্য সত্য, যদি তিনি কোন নাম, রূপ ও বিগ্রহ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তৎসমস্তই নিত্য, তিনি যে লীলা করেন, তাহাও নিত্য, তাঁহার আদিও নাই, অন্তও নাই। মায়াবাদীর মতে বিগ্রহ ও রূপ অনিত্য, মায়াবিজৃম্ভিত মাত্র, সাধকদিগের হিতার্থে ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হয় মাত্র, ভগবান্ অরূপ। কিন্তু বৈষ্ণবগণ ইহাকে অযৌক্তিক ও অপ্রামাণিক বিবেচনা করেন। যিনি নিত্য সত্য, ত্রিসত্য, তিনি কখনও মিথ্যারূপ গ্রহণ করেন না। পূর্ণভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যদেব সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ব পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ় ধন,
প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে॥

ভগবান ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু, তিনি ভক্তগণের ইচ্ছায় রূপ ধরেন বটে, কিন্তু তিনি সর্ব্বরূপের আশ্রয়, তজ্জন্যই ভক্তগণ তাঁহাকে যেরূপ দেখিতে চায়, তিনি সেইরূপেই দেখা দিয়া থাকেন।

ভগবানের নরলীলাই যখন সর্ব্বোত্তম লীলা, তখন শ্রীভগবান পূর্ণরূপে—
"জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং দ্বিভুজং শ্যাম-সুন্দরং।"

শ্রীভগবান একমাত্র গুণ ও মহিমা দ্বারাই অনুভূত হয়েন। পূর্ণজ্ঞানী তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় কান্তি অনুভব মাত্র করিতে পারেন। কিন্তু ভক্ত তাহাতে পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া তাঁহার নিত্য মূর্ত্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, ও তাঁহার কৃপাবলে ঐ ব্রহ্মজ্যোতির অভ্যন্তরে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিয়া কৃতকৃতার্থ হন। ইহার ঊর্দ্ধদেশে আর কেহ যাইতে পারেন নাই। ইহাই সর্ব্বমীমাংসার পরিসমাপ্তি। এইরূপ নিত্য, এই রূপ রতন ভক্তগণের গূঢ়ধন, ইহা দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি। ইহা লীলারম্ভে যুগলমূর্ত্তি শ্রীরাধাকৃষ্ণ, আবার স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত এই দ্বিমূর্ত্তির একত্র সম্মিলন শ্রীগৌরাঙ্গ।

বিরুদ্ধবাদী জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ণ ভগবান, তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তর, (১) গীতা ও ভাগবত (২) শ্রীগৌরাঙ্গ। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, গীতার এক অংশ মানিয়া অপর অংশ অমান্য করিবার অধিকার তোমার নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ যে, ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তাহার সন্দেহ মাত্র নাই, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ও শ্রীভাগবতকে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

ভক্তগণের স্বীয় স্বীয় রুচি অনুসারে কেহ শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার যুগলমূর্ত্তি, কেহ শ্রীরাম সীতার যুগলমূর্ত্তি, কেহ শ্রীহরপার্ব্বতীর যুগলমূর্ত্তি, কেহ হরিহর মূর্ত্তি, কেহ কৃষ্ণ বলরাম ও কেহবা শ্রীগৌর নিত্যানন্দকে ভজনা করিয়া থাকেন। ইহাই ভক্তিধর্ম্ম। ভক্ত, ভগবানের সাকার মূর্ত্তি দেখিতে চায়, তাঁহাকে ভালবাসিতে চায়, তাঁহার সহিত কথা কহিতে চায়, তাঁহাকে "মা" অথবা "পিতা" বলিয়া তাঁহার সহিত আবদার করিতে চায়। কিন্তু জ্ঞানী ও যোগী ধ্যানযোগে পরমব্রহ্মের অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয় সত্তা চিন্তা করিয়া সেই সত্তা অনুভব করিতে প্রয়াস পায়। আমরা জগন্মাতার বৃদ্ধাবস্থার সন্তান, আমাদের পূর্ব্বে জগতীতলে অসংখ্য অসংখ্য মানবমণ্ডলী জন্মগ্রহণ করিয়া সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগক্রমে যে বহুদর্শিতা অর্জ্জন করিয়াছেন, সেই বহুদর্শিতার ফল উপেক্ষা করিয়া আমরা স্বতন্ত্র ও স্বয়ম্ভুবের

ন্যায় আচরণ করিলে কোন বিষয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে কি ? শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসও বলিয়াছেন "ভক্তিযোগই যুগধর্ম্ম।" তুমি যীশুখ্রীষ্টকেই পূজা কর কি মহম্মদকেই ভজনা কর, তুমি অর্হৎকেই উপাসনা কর কি বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বা দণ্ডকেই অর্চ্চনা কর, তুমি কৃষ্ণরাধিকা, রামসীতা, হর-গৌরী, গৌরনিতাই, কালী, শিব, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ যাহাই বিশ্বাস কর না কেন, তোমাকে কলিযুগের ধর্ম্ম ভক্তিযোগ অবলম্বন করিতেই হইবে। তাহা ভিন্ন কলিকালে অন্যগতি নাই, নাই, নাই ! ! "কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা"। সে যাহা হউক, বৈষ্ণবধর্ম্মই আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, তৎসম্বন্ধেই কিছু বলা যাইতেছে।

আমরা ক্রমশঃ দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, কার্য্য (কৃষ সম্বন্ধীয়) বৈষ্ণব ধর্ম্ম ভক্তিযোগের আরম্ভ, এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ভক্তিযোগের পরিসমাপ্তি। শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন, "মাধুর্য্য ভগবত্তাসার।" "রসো বৈ সঃ" (উপনিষদ্) শ্রীল শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় এক স্থানে বলিয়াছেন ভক্তি-যোগের শ্রীগীতায় যেখানে পরিসমাপ্তি, শ্রীমদ্ভাগবতে সেই স্থানে আরম্ভ। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুররস ভাগবতে বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু তাহা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পরিস্ফুট করিয়াছেন, তাহা নিজে আচরণ করিয়া ভক্তগণকে আস্বাদন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। এই কার্য্য অংশাবতার দ্বারা হইতে পারে না। কারণ শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমুখ গাথা এই—

"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥"

শ্রীচৈতন্যদেবই—

ভববিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে প্রেম
জগতে ফেলিল ঢালি।
কাঙ্গালে পাইয়া খাইয়া নাচয়ে
বাজাইয়া করতালি ॥
হাসিয়া কাঁদিয়া প্রেমে গড়াগড়ি
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকোলি,
কবে বা ছিল এ রঙ্গ !

শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম বলিয়াছেন যে, ভক্তি ধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায় হইলে পূর্ণ ভগবান্ ভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

"কাল বশে ভক্তি লুকাইয়া দিনে দিনে।
পুনর্ব্বার নিজ ভক্তি প্রকাশ কারণে॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম প্রভু অবতার।
তাঁর পাদপদ্মে চিত্ত রহুক আমার॥"
"বৈরাগ্য সহিত নিজ ভক্তি বুঝাইতে।
যে প্রভু কৃপায় অবতীর্ণ পৃথিবীতে॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-তনু পুরুষ পুরাণ।
ত্রিভুবনে নাহি যাঁর অধিক সমান।" (শ্রীচৈতন্য-ভাগবত)।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়দেশরূপ উদয়াচলে দিননাথ ও নিশানাথের ন্যায় যুগপৎ উদিত হইয়াছেন—"সহোদিতৌ গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ।" কেন উদিত হইলেন, তাহার কারণ এই যে সমুজ্জ্বল প্রেমভক্তিরস অনর্পিতচরী ছিল, অর্থাৎ পূর্ব্বে কোন যুগে কাহাকেও প্রদত্ত হয় নাই, তাহা সর্ব্ব সাধারণের নিকট বিলাইবার জন্য 'হরিলুট' দিবার নিমিত্ত।

শ্রীশুকদেব গোস্বামী রাজা পরীক্ষিৎকে যে ভগবদ্ধর্ম্ম শ্রবণ করাইয়াছিলেন, তাহার অতিরিক্ত কিছু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে আছে কি না, তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ভাগবতের ব্রহ্মস্তব হইতে ভক্তি ধর্ম্মের অঙ্কুরাবস্থা বর্ণনা করা যাইতেছে।

প্রহ্লাদ, ধ্রুব, শুকদেব, নারদ, উদ্ধব, বিদুর, অক্রুর, মৈত্রেয়, ভীষ্ম, ব্রজ গোপিকা, ব্যাস প্রভৃতি সকল ভক্তই ভগবানের সাকার রূপের উপাসক ছিলেন। ভাগবতে আছে "এই সংসার সিন্ধু অতি দুস্তর। লোক সমুদয় বিবিধ দুঃখ দাবানলে প্রপীড়িত। যদি তাহারা এই দুঃখ সাগর পার হইতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাদের কোন্ ভেলায় চড়িতে হইবে, না, পুরুষোত্তম ভগবানের লীলাকথা রস শ্রবণ করিতে হইবে।"

ফলতঃ ভগবানের সঙ্গ-সুখ ও প্রেম-সুখ লাভ করিতে হইলে তাঁহার লীলা শ্রবণ ও স্মরণ করা এবং তাঁহার পরম বিরহে তন্ময়ত্ব ভাবে ভাবিত হওয়াই একমাত্র উপায়। ইহা কিরূপে হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে শ্রীশুকদেব গোস্বামী রাজা পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন যে "লীলা করণার্থ নরদেহধারী শ্রীকৃষ্ণ

অনাবৃত ব্রহ্ম ছিলেন।" সকল জীবই ব্রহ্ম, ইহা সত্য বটে, কিন্তু অন্যান্য জীবে ব্রহ্মত্ব আবৃত বা পরিচ্ছিন্ন, কিন্তু নরবপুধারী পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে ব্রহ্মত্ব অনাবৃত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহাদের প্রত্যেক অণুপরমাণু ব্রহ্মময়। তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের লীলা শরীরের যে কোন অংশকে এবং তাঁহাদের যে কোন প্রকট লীলাকে যিনি যে ভাবেই চিন্তা ও স্মরণ করুন না কেন তাহাতেই তিনি ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করিবেন। অবতারী ভিন্ন কোন জীবকে এইরূপ চিন্তা করিলে ভগবৎ প্রেম লাভ হয় না। মনে করুন পতির ভিতর কিম্বা পিতার ভিতর ব্রহ্ম আছেন বটে, কিন্তু আবৃত অবস্থায়, সুতরাং পতিকে বা পিতাকে স্মরণ বা মনন করিলে ব্রহ্ম লাভ হয় না। যেমন ইচ্ছায়ই হউক, অনিচ্ছায়ই হউক ঔষধ সেবন করিলেই রোগ মুক্ত হয়, সেইরূপ শত্রুভাবেই হউক কি মিত্রভাবেই হউক, পতিভাবেই হউক কি কাম বশতঃই হউক, যিনি যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে বা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে স্মরণ মনন করিয়াছেন, তিনিই উদ্ধার পাইয়াছেন। ভাগবত বলেন—

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেবচ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥

যে কোন প্রকারেই হউক, অনাবৃত ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে বা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যে আসক্ত জন্মিলেই তাহা মুক্তির কারণ হয়। ভগবানের প্রতি অবিচ্ছিন্ন কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, সম্বন্ধ ও সৌহৃদ্য বিধান করিয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও লীলাদি বর্ণিত আছে। শ্রীদশমই ভাগবতের সার অংশ। শ্রীদশমের পূর্ব্বে ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে নবম সর্গে বর্ণিত আছে যে, ব্রহ্মা শ্রীভগবানের নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে সমাধি অবলম্বন করিয়া একশত বৎসর কাল তপস্যা করিয়া ভগবানের প্রকৃত রূপ, নিত্যরূপ দর্শন করিলেন ও ভগবান্‌কে স্তব করিতে লাগিলেন। আমি ঐ স্তব হইতে নিম্নে দুইটী শ্লোকের অনুবাদ করিয়া দেখাইতেছি যে ভক্ত ভগবানের সাকার রূপ দেখিতে চাহে এবং বসুদেবের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেও ভগবান "জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরং" ছিলেন ও আছেন।

"হে পরম! তব রূপ দেখিনু আঁখিতে যাহা,
নির্ব্বিকল্প নিত্য জ্যোতিঃ আনন্দ স্বরূপ তাহা।
ছিল যাহা অপ্রকাশ, ইহা সেই স্বপ্রকাশ,
ইহা সেই পরব্রহ্ম, নাহি অন্য ইহা ছাড়া।
হে আত্মন্! এ ভুবন, যেরূপে কর সৃজন,
সেই তব এইরূপ, কিন্তু ইহা বিশ্ব ছাড়া॥"

"শ্রুতি সমীরণ করিয়া বহন
তব পদাম্বুজ গন্ধ সুশোভন।
আনি দেয় নরে, শ্রবণ বিবরে,
করে স্নান তাই যে জন সুজন॥
পরা ভক্তি ডোরে, পদে বাঁধা প'ড়ে,
থাক তার হৃদি সরোজে তখন।
সুজন বলিয়া, তারে ধরা দিয়া,
স্বজন বলিয়া করহে গ্রহণ॥

"অভক্তের কথা কেন কই বৃথা,
ভক্তি বিনা নাই সাধনা আর।
হৃদয় কমলে, ভক্তি যোগজলে,
যে জন ক্ষালিত করে বার বার,
সেজন তখন করিয়া শ্রবণ
তব গুণ, তবে সুপথ পায়।
হৃদয় উজলি শ্যামরূপ ঢালি
দাও হে শ্যামল সুন্দর কায়!
যদি ভক্তজনে কদাপি না শুনে,
তব গুণাবলী হে ভক্তবৎসল,
তবু ধ্যান বলে আনে হৃদি স্থলে,
নব নব রূপ তব ভক্ত দল।
সেইরূপ ধরি দেখা দাও হরি
যেরূপের ভক্ত, ভকত তোমার,
ভকতের তরে নানা রূপ ধ'রে
পুরাইছ নাথ! বহু আশা তার॥"

শ্রীদশমে ব্রহ্মার অন্য একটী স্তব আছে, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ ভক্তির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ভক্তিকামী ভগবানের এইরূপ রতন আস্বাদন করিতে পারেন।

একদা প্রাতঃকালে শ্রীহরি পঞ্চমবর্ষ বয়সে শ্রীবৃন্দারণ্যে পুলিন ভোজন করিবার অভিপ্রায়ে বৎস পালক সখাবৃন্দকে মনোহর শৃঙ্গনিনাদ করিয়া একত্র করিলেন। তৎপর সকলে সহস্র সহস্র বৎসগণকে অগ্রে করিয়া ব্রজ হইতে বহির্গত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের রাখাল সখাগণ সকলেই পরমানন্দময়। তাঁহাদের হস্তে ভোজন দ্রব্যের শিকা, বেত্র, শিঙ্গা ও বেণু শোভা পাইতে ছিল। তাঁহারা বনে যাইতে যাইতে নানা বর্ণের পত্র পুষ্প ফলাদি দিয়া ও ময়ূর পুচ্ছ এবং গৈরিক ধাতু দিয়া ভূষণ নির্ম্মাণ করতঃ সাজিতে লাগিলেন। কোন রাখাল আমোদ করিবার জন্য অন্য রাখালের শিকা লুকাইয়া রাখিয়া তাহা পরে প্রত্যর্পণ করিতে লাগিলেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ বনশোভা দর্শনের জন্য কিছু দূরে গমন করেন তখন রাখাল বালকেরা "আমি আগে ছুঁইয়াছি, আমি আগে ছুঁইয়াছি" এই বলিয়া আনন্দ কোলাহল করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ছুঁইয়া খেলা করিতে লাগিলেন। কোন রাখাল বেণু, কেহ শিঙ্গা বাজাইতে লাগিলেন, কেহ কেহ ভ্রমরের সুরে সুর মিলাইয়া গান করিতে লাগিলেন, কেহ বা কোকিলের সহিত কলধ্বনি করিতে লাগিলেন, কোন রাখাল ভঙ্গী করিয়া পক্ষীর ছায়া অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন, কেহবা হংসের সহিত হংসগতি অনুকরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন, কেহবা বকের সঙ্গে বকের ন্যায় বসিয়া পড়িলেন,কেহ বা ময়ূরের সহিত নাচিতে লাগিলেন। কোন রাখাল বৃক্ষশাখায় শাখা মৃগের পুচ্ছ ধরিয়া টানিতে লাগিলেন,কেহ বা বানর শাবককে টানিতে লাগিলেন, কেহ বানরের সহিত বৃক্ষে উঠিয়া বৃক্ষের শাখায় শাখায় বেড়াইতে লাগিলেন। কোন রাখাল ভেকের ন্যায় ক্ষুদ্র জলধারা উল্লম্ফন করিতে লাগিলেন, কেহবা প্রতিবিম্বকে, কেহবা প্রতিধ্বনিকে উপহাস করিতে লাগিলেন।

অহো ব্রজরাখালগণের কি পরমাশ্চর্য্য সৌভাগ্য! নিশ্চয়ই তাহাদের পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য সঞ্চিত ছিল। যোগী ও জ্ঞানিগণ যাঁহার সত্তা অনুভব মাত্র করিতে পারেন, কিন্তু বহু কৃচ্ছ্র আয়াস করিয়াও চরণ রেণু লাভ করিতে পারেন না, ভক্তগণ অতি গৌরবে যাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন, সেই ভুবনমোহন ভগবানের সহিত ব্রজরাখালগণ সখ্যভাবে ক্রীড়া করিতেছেন।

কাঁধে চড়ে কাঁধে চড়ায় করে ক্রীড়ারণ। রাখাল বালকগণ এইরূপ পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া খেলা করিতেছেন এমন সময়ে কংসপ্রেরিত মূর্ত্তিমতী আসুরী শক্তি—অঘাসুর বিশাল অজগর দেহ ধারণ করিয়া বৎসবৃন্দ সহ বালকগণকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ঐ অসুরের মুখবিবরে প্রবেশ করিয়া তাহার গলদেশ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে দেববালাগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং দেবগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। পদ্মযোনি ব্রহ্মা তাহা শ্রবণ করিয়া বৃন্দারণ্যে আগমন করতঃ ভগবান শ্রীহরির শ্রীবাল গোপাল মূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হইলেন।

এদিকে বালগোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুরকে দর্শন করিয়া রাখাল বালকগণকে লইয়া সকলে একত্র হইয়া স্বীয় স্বীয় শিকা খুলিয়া পরমানন্দ কৌতুকে পুলিনভোজনে নিযুক্ত হইলেন। সর্ব্বযজ্ঞ যাঁহার তৃপ্ত্যর্থে পর্য্যাপ্ত হয় না, সেই যজ্ঞভুক হরি অদ্য রাখাল বালকগণের সহিত সরসী তীরে বসিয়া ভোজন করিতেছেন! শ্রীকৃষ্ণের উদর ও বস্ত্রের মধ্যে বেণু, বাম কুক্ষিতে শিঙ্গা ও বেত্র, বামহস্তে দধিমিশ্রিত বৃহৎ অন্নের গ্রাস, বামহস্তের অঙ্গুলীর সন্ধিস্থানে পিলু প্রভৃতি গ্রাসোচিত ফল, এবং দক্ষিণ হস্তে ভোজন নিমিত্ত ক্ষুদ্র অন্নের গ্রাস শোভা পাইতেছিল। বৎসবৃন্দ কোমল শষ্পাঙ্কুর আহার করিতে করিতে নয়নান্তরালে যাইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগকে খুঁজিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অন্নের কবল হস্তে করিয়াই গমন করিলেন। ইত্যবসরে ব্রহ্মা রাখালবালকরূপী শ্রীকৃষ্ণের মহিমা জানিবার জন্য বৎসগণকে ও বৎস পালগণকে হরণ করিয়া লইয়া তাহাদিগকে এক স্থানে মায়াবদ্ধ করিয়া রাখিয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার এই কর্ম্ম জানিতে পারিয়া নিজেই হৃত সংখ্যক বৎস ও বৎস পালের রূপ ধারণ করিয়া প্রযোজ্য প্রযোজক কর্ত্তৃরূপে এক বৎসর কাল বিহার করিতে লাগিলেন এবং "বিষ্ণুময়ং ইদং জগৎ" এই মহাবাক্যের সার্থকতা দেখাইলেন। এক বৎসর পরে ব্রহ্মা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের এই অলৌকিক লীলা দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইলেন। তিনি আরও দেখিলেন সকল বৎস ও রাখালই পীত কৌশিক বস্ত্র পরিহিত চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের দুর্নিরীক্ষ্য তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে মোহিত করিতে আসিয়া নিজেই মোহিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার মোহ অপনোদন করিয়া

পুনরায় রাখাল বালকরূপে তাঁহাকে দেখা দিলেন। তখন ব্রহ্মা বালগোপাল রূপী শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন।

"অয়ি নন্দতনুজ! শ্রীবালগোপালরূপী তোমাকে পাইবার জন্য তোমাকে নমস্কার করিতেছি। তুমি নবনীরদ শ্যামলকান্তি গ্রহণ করিয়াছ, তোমার পরিধানে পীত কৌশিক বসন, কর্ণে গুঞ্জার কুণ্ডল, চূড়ায় ময়ূর পুচ্ছ, গলে বনমালা, উদরের বস্ত্র মধ্যে বেণু, বামকুক্ষিতে বেত্র ও বিষাণ, বাম হস্তে দধি মিশ্রিত অন্নের স্নিগ্ধ গ্রাস শোভা পাইতেছে। তুমি কোমল চরণ যুগল দিয়া বনভ্রমণ করিতেছ।" (১)।

(যদি বল যে স্তব করিতে যাইয়া ভগবানের এই যথাদৃষ্টরূপ স্তব করিতেছ কেন? তজ্জন্য বলিতেছেন) "হে দেব! তোমার দুর্নিরীক্ষ্য তেজ সহ্য করিতে না পারায় আমার প্রতি কৃপা করিয়া এই সুলভরূপে আমাকে দেখা দিতেছ, কারণ তুমি স্বেচ্ছাময়,ভক্তবাঞ্ছার রূপ ধারণ কর, কিন্তু তোমার এরূপও প্রকৃতির অতীত, ইহাতে ধাতু সম্বন্ধ নাই। তোমার এই সহজ রূপের মহিমাই কেহ বর্ণনা করিতে সক্ষম নহেন। সুতরাং কোন্ ব্যক্তি মন নিরুদ্ধ করিয়া তোমার সাক্ষাৎ পরিপূর্ণ কেবল আত্মসুখানুভূতিস্বরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মকরূপ বর্ণনা করিতে পারেন? আমি বেদপ্রবর্ত্তক ব্রহ্মা হইয়াও তাহা পারি না।" (২)।

(যদি শ্রীহরির শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক রূপের মহিমা কেহই বর্ণনা করিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে অন্যেরা কিরূপে মুক্ত হইবে, তজ্জন্য বলিতেছেন) "হে পূজনীয়! তুমি ত্রিলোকের অজিত হইলেও এইরূপ ভক্ত কর্তৃক কায়মনোবাক্যের দ্বারা জিত হইয়া তাহার নিকট বাঁধা পড়িয়া থাক, তাহার জিহ্বাগ্রে সর্ব্বদা তোমার নাম নৃত্য করে, তাহার হৃদয়নিকুঞ্জ-বনে তোমার এই রূপরতন বিহার করে, এবং তাহার মস্তক তোমার শ্রীবিগ্রহের নিকট প্রণামে, হস্ত তোমার পূজায়, চরণ তোমার বিগ্রহ সমীপে গমনে, কর্ণ তোমার লীলা শ্রবণে, নাসিকা তোমার শ্রীচরণার্পিত তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণে এবং নয়ন তোমার রূপসুধা পানে বিভোর থাকে। সেই ভক্ত কিরূপ, না, যিনি জ্ঞানার্জ্জনে ও তোমার স্বরূপবিচারে প্রয়াস (শ্রম) না করিয়া, তীর্থ ভ্রমণাদির জন্য কষ্ট না করিয়া স্বস্থানে আসিয়াই সাধুগণের বদন হইতে স্বতঃই উচ্চারিত এবং তৎসন্নিধানে বাস জন্য স্বতঃই শ্রুতিমূলগত তোমার গুণ লীলাদি শ্রবণ করিয়া মাত্র জীবন ধারণ করেন।" (৩)

(ভক্তি বিনা শুধু জ্ঞান ফলোপধায়ক হয় না এই জন্য বলিতেছেন) "হে বিভো! করুণাময়! যেমন নির্ঝর হইতে সুস্বনে বারিধারা প্রবাহিত হয় সেইরূপ সর্ব্ব মঙ্গলালয় এক ভক্তি হইতেই জ্ঞান, অভ্যুদয় অপবর্গ প্রভৃতি সমস্ত ক্ষরিত হইয়া থাকে। এইরূপ সর্ব্ব মঙ্গলালয় ভক্তিকে উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা শুধু জ্ঞান লাভার্থ যম আসন মুদ্রা নিয়ম প্রাণারাম প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া বহুক্লেশ করেন তাঁহাদের শুধু ক্লেশই অবশিষ্ট থাকে। যেমন তণ্ডুল-কণা লাভার্থ স্তূপীকৃত তুষরাশি আঘাত করিলে কোন ফল হয় না। প্রত্যুত হস্তবেদনা ও সময় নষ্ট হয় তদ্রূপ।" (৪)।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সহজ কথায় বলিয়াছেন—যে কলিকাতায় যাইতে পারে সে গড়ের মাঠ পশুশালা সমস্তই দেখিতে পারে, কিন্তু আসল কথা আগে কলিকাতায় যাওয়া চাই। সেইরূপ যাহার প্রেমভক্তি জন্মে তাহার পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়।

(ভক্তি বিনা যোগ বিফল হয় তাহা প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন) "হে ভূমন্! হে অচ্যুত! পূর্ব্বেও এই জগতীতলে বহু বহু যোগিগণ যোগ দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া তোমাতে সর্ব্ব প্রকার লৌকিক চেষ্টা ও স্বীয় কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া তোমার রূপগুণ, লীলা, কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তি লাভ করতঃ সুখে তোমার নিত্যপার্ষদত্বরূপ উত্তম গতি লাভ করিয়াছেন।"(৫)

এই স্তব হইতে আর অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। উপরে যাহা কথিত হইল তাহাই বৈষ্ণব ধর্ম্মেরও ভক্তিধর্ম্মের সাধারণ সার মর্ম্ম। এখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষত্ব আলোচনা করা যাইতেছে।

যদি শুক প্রোক্ত শ্রীভাগবত শ্রবণ করিলে ও শ্রীবাসুদেবের জন্ম কর্ম্ম লীলা শ্রবণ করিলে গৌড়বাসী সর্ব্বাঙ্গীন শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে অনর্পিতচারী (যাহা পূর্ব্বে কোন যুগে কাহাকেও প্রদত্ত হয় নাই) অভিনব প্রেমভক্তিরস বিলাইবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ গৌড়ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন কেন? যদি বেদান্ত দর্শনই জ্ঞানযোগের সারমর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়া থাকেন, যদি শ্রীভগবদ্গীতাই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের মূলমন্ত্র বিঘোষিত করিয়া থাকেন, যদি শ্রীশুকদেব গোস্বামীই শ্রীভাগবতে ভক্তিযোগের চরম মীমাংসা সংস্থাপিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ সমস্ত "ঝালাইবার জন্য," পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য স্বয়ং অবতারীকে অবতরণ করিতে হইত না। বাস্তবিক শ্রীচৈতন্য-

দেব প্রচারিত প্রেম ভক্তির ধর্ম্ম জগতের সমগ্র দর্শন শাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান শাস্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্রের উচ্চতর গ্রামে অবস্থিত। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলেন—

পূর্ব্বে ব্রজ বিলাসে   যেই তিন অভিলাষে
যত্নেহ আস্বাদ নহিল।
শ্রীরাধার ভাবসার,   আপনি করি অঙ্গীকার,
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল ॥
আপনি করি আস্বাদনে,   শিখাইল ভক্তগণে,
প্রেম চিন্তামণির প্রভু ধনী।
এই গুপ্তভাব সিন্ধু,   ব্রহ্মা না পায় এক বিন্দু,
হেন ধন বিলাইল সংসারে।
ঐছে দয়ালু অবতার,   ঐছে দাতা নাহি আর,
গুণ কেহ নারে বর্ণিবারে ॥

(এই তিন বস্তু এই—স্বীয় মাধুর্য্য রস, শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা, কৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদনে রাধার সুখ)।

শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশেষত্ব এইরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন:—"শ্রীমদ্ভাগবতের পরম তাৎপর্য্য, যাহা শ্রীব্যাসনন্দন শুকদেব গোস্বামী কর্তৃক রাসপ্রসঙ্গে উত্থাপিত মাত্র হইয়াছে, কিন্তু বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হয় নাই (কারণ অনুশীলন ব্যতীত প্রাপ্তির উপায় না থাকায়, এবং তাহা জানিবার ও আস্বাদন করিবার তৎকালে পাত্রীভাব থাকায়—অথাৎ দুরন্বয়তাহেতু) তাহা এবং শ্রীরাধার রতি কেলি-নাগর শ্রীকৃষ্ণ তাহার রাসলীলাস্বাদক প্রেম বিস্তার লিখিত আপনি সেই হরি শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহে ইহলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন।"(১)

'দুরন্বয়তা' হেতু শুকদেব বিস্তারিত করেন নাই। শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিগূঢ় লীলারস সন্দর্ভ বেত্তা তখন ছিল না, আপনি আচরণ না করিলে এই রসাস্বাদন অপরকে শিক্ষা দেওয়া যায় না, এবং উপযুক্ত পাত্র অর্থাৎ ব্রজ পরিকরগণ তখন বর্ত্তমান না থাকায় শ্রীশুকদেব গোস্বামী বিস্তারিত করেন

(১) শ্রীমদ্ভাগবতস্য পরমং তাৎপর্য্য মুট্টঙ্কিতং শ্রীবৈয়াসকিনা দুরন্বয়তয়া রাসপ্রসঙ্গেঽপি যৎ। যদ্রাধারতিকেলিনাগর রসাস্বাদৈকতত্ত্বাজনং তদস্ত প্রথনায় গৌরবপুষা লোকেঽবতীর্ণো হরিঃ॥

নাই। তৎপর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি ও ভাবসার অঙ্গীকার করিয়া (কি জানি কার রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়া ও গৌর সেজেছে) শ্রীগৌর বিগ্রহে শ্রীনিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য, গদাধর পণ্ডিত, শ্রীবাসাদি সহ ও ব্রজলীলার সখা সখীবৃন্দসহ অবতীর্ণ হইয়া সেই মাধুর্য্য রস বিস্তারিত করেন ও দেখাইয়া দেন যে "মাধুর্য্য ভগবত্তাসার," "রসো বৈ সঃ"।

শ্রী প্রকাশানন্দ সরস্বতী আরও লিখিয়াছেন—"প্রেম নামক অদ্ভুত পরম পুরুষার্থ, যাহা কেহ শ্রবণও করেন নাই, নাম মহিমা কি তাহা পূর্ব্বে কেহই জানিতেন না, শ্রীবৃন্দাবনের পরম মাধুর্য্যে কেহ প্রবেশ করিতেই পারেন নাই, এবং পরমাশ্চর্য্য মাধুর্য্যরসের পরাকাষ্ঠা স্বরূপা শ্রীরাধাকে কেহই পূর্ব্বে অবগত ছিলেন না, কেবল এক চৈতন্যচন্দ্রই করুণা করিয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন।

"হে ভ্রাতঃ! তুমি গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রভাব বিশিষ্ট নামাবলীই কীর্ত্তন কর, আর তাঁহার জগন্মঙ্গল মনোহর মধুর মূর্ত্তিই ভাবনা কর। কিন্তু যদি তোমাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টি পতিত না হয়, হায়! তবে সেই মহাপ্রেমরসোজ্জ্বল বিষয়ে তোমার আশা ও সম্ভব নহে।"

ইতিপূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই কলির উপাস্যদেব, উপাসনা প্রণালী—সংকীর্ত্তনবহুল যজ্ঞ।

এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে প্রেমই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের একটী বিশেষত্ব। প্রেম নামক অদ্ভুত পঞ্চম পুরুষার্থ, যাহার নাম লোকে কর্ণে শুনিয়াছিল মাত্র, কিন্তু অর্থ বুঝিত না এবং প্রাপ্তির উ[illegible] জানিত না, এবং এখনও অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা যাহার নূতনত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তাহা চৈতন্যদেবের অভিনব আবিষ্কার। পূর্ব্বেও প্রেমশব্দ ছিল বটে, কিন্তু জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এই অদ্ভুত প্রেমের আভাস মাত্র দিয়াছেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ইহা নিজে আচরণ করিয়া পরিস্ফুট করিয়াছেন। মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদ অবস্থায় স্বরূপ দামোদর (ললিতা সখী) ও রামানন্দ রায়ের (বিশাখা সখীর) সহিত রাত্রি দিন—

চণ্ডী দাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীত গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে,
গায়, শুনে পরম আনন্দ॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর (লীলা শুক) কর্ত্তৃক বিরচিত। শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীজয়দেব কর্ত্তৃক বিরচিত। রায়ের নাটক গীতি— রামানন্দ রায় কর্ত্তৃক বিরচিত শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটিকা। শ্রীচণ্ডীদাস ও শ্রীবিদ্যাপতির রচিত বহু বৈষ্ণব পদাবলী দৃষ্ট হয়। শ্রীবিদ্যাপতি ১২৯৬ শকে (১৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দে) মিথিলার অন্তর্গত বিসকী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীচণ্ডীদাস মৈথিলী পণ্ডিত বিদ্যাপতির সমসাময়িক। উভয়েই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হয়েন। শ্রীচণ্ডীদাস ব্রাহ্মণকুলে বীরভূম জেলার অন্তর্গত শাঁকুলিপুর থানার অধীন কীর্ণাহারের আড়াই ক্রোশ দক্ষিণ নান্নুর গ্রামে প্রাদুর্ভূত হয়েন। শ্রীজয়দেব বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুলী বা কেন্দুবিল্ব গ্রামে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীজয়দেব নবদ্বীপ বাস করা কালীন শ্রীচৈতন্যাবতারের আভাস পাইয়াছিলেন।

এক দিন অনেক চম্পক পুষ্প লৈয়া।
কৃষ্ণপাদপদ্ম পূজে মহাহর্ষ হৈয়া॥
শ্যামল সুন্দররূপ ধিয়ায় অন্তরে।
দেখে গৌররূপ সে শ্যামল কলেবরে॥
গৌরকান্তি চাঁপা পুষ্প পুঞ্জের সমান।
দেখিতে দেখিতে রূপ হৈল অন্তর্দ্ধান॥ (ভক্তি রত্নাকর)।

এই সঙ্গে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর নামও উল্লেখযোগ্য। প্রেম—কল্পবৃক্ষের মূলস্কন্ধ ও মালী স্বরূপ স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব। এই বৃক্ষের প্রথম অঙ্কুর শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী। সেই অঙ্কুরপুষ্ট হইয়া শ্রীঈশ্বরপুরী হইলেন। তাহা হইতে "চৈতন্য-মাল্য" মূলগুঁড়ি জন্মিলেন। এই গুঁড়ির উপর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীনিত্যানন্দ এই দুই স্কন্ধ জন্মিলেন, তাহা হইতে বহু শাখা প্রশাখা জন্মিয়া ব্রহ্মাণ্ড ছাইয়া ফেলিলেন।

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর প্রেমের কথা অতি অদ্ভুত, তিনি নীলাকাশে নীরদমালা দেখিলেই নীরদবরণ স্মরণ করিয়া প্রেমে অচেতন হইতেন। একটী গীতে আছে—

নীলাকাশে শশী যেমন,
শ্যামের বামে প্যারী তেমন,

তারকা গোপিকাগণ,
প্রেমরসের সঙ্গিনী।
জয় রাধা শ্রীরাধা বলি,
গোপিকা দেয় করতালি,
নৃত্য করে বনমালী,
বামে রাধা বিনোদিনী॥

শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরী এই দৃশ্য দেখিতেন।

উপরে প্রেম নামক অদ্ভুত পঞ্চম পুরুষার্থের কথা বলা হইয়াছে। এই অদ্ভুত প্রেম কি পদার্থ? ইহা অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম। অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম কাহাকে কহে ইহা যাঁহারা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে অভিলাষ করেন তাঁহারা যেন শ্রীআনন্দবাজার বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে লিখিত পণ্ডিত বৈষ্ণবভক্তের লেখনীপ্রসূত "অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করেন। সে যাহা হউক আমার বক্তব্য বিষয় যথাসাধ্য লিখিতে চেষ্টা করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার যে অকৈতব প্রেম, তাহা নরলোকে দুর্লভ। এই প্রেম কামগন্ধহীন, ইহাতে পার্থিব মলিনতা নাই। শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার দেহও অপ্রাকৃত, তাহাতে জীবের ন্যায় ধাতুসম্বন্ধ নাই। তাঁহাদের দেহ চিন্ময়। চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে রামানন্দ রায়ের দেহ তখন অপ্রাকৃত ছিল, কলুষিত কামভাব তাহা স্পর্শ করিতে পারিত না। শ্রীরাধাকৃ প্রেম নির্ম্মল নিষ্কাম, জাম্বুনদে প্রাপ্ত বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় বিমল ও উজ্জ্ব। ইহা জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু তাহা নিজে আস্বাদন করিয়া আমাদের জন্য প্রসাদ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে আচরণ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন যে পুরুষলোকেরও গোপিকার প্রেম সঞ্জাত হইতে পারে, তাহাতে অপবিত্র কামগন্ধ থাকিতেই পারে না। এই জন্যই মহাপ্রভু বলিয়াছেন শ্রীভাগবতের শুকদেব বর্ণিত রাসলীলা শ্রবণ করা জীবের একান্ত কর্ত্তব্য, না শুনিলে প্রত্যবায় আছে। কিন্তু রাসলীলা শ্রবণের উপযুক্ত হইতে হইলে অগ্রে চিত্তশুদ্ধির আবশ্যক, এবং শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তণই "চেতোদর্পণমার্জ্জনং।"

পরম বৈষ্ণবী রজকী রামিণী শ্রীচণ্ডীদাসের ধর্ম্মসঙ্গিণী ছিলেন, কিন্তু উভয়ের প্রেমে কামগন্ধ ছিল না।

শ্রীচণ্ডীদাস ঠাকুর অনেক পদে "পীরিতির" বর্ণনা করিয়াছেন।

"ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন,
কেহ না দেখয়ে তারে।
প্রেমের পিরীতি যে জন জানয়ে
সেই সে পাইতে পারে॥" (চণ্ডীদাস)।

"পীরিতি পীরিতি কি রীতি মুরতি
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে পীরিতি না ছাড়ে
পীরিতি গঢ়ল যে॥
চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনী
পীরিতি না কহে কথা।
পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পীরিতি মিলায়ে তথা॥" (চণ্ডীদাস)।

শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুরের একটী পদে আছে—

"মাধব সো অব সুন্দরী বালা।
অবিরত নয়নে বারি ঝরু নিঝর
জনু ঘন শাওন মালা॥
পূর্ণমিক ইন্দু নিন্দি মুখ সুন্দর
সো অব ভেল শশীরেহা।
কলেবর কমল কাঁতি জিনি কামিনী
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা॥
উপবন হেরি মুরছি পড়ি ভূতলে
চিন্তিত সখীগণ সঙ্গ।
পদ অঙ্গুলী দেই ক্ষিতিপর লিখই
পানি-কপোল-অবলম্ব॥"

শ্রীকৃষ্ণ নামে যে শরীর অবশ হয় তাহা চণ্ডীদাসের একটী পদে এইরূপ বর্ণিত আছে:—

"কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া হৃদয়ে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥”

শ্রীজয়দেব গোস্বামী নবদ্বীপ ছাড়িয়া ছিন্ন কন্থা ও করোয়া মাত্র সম্বল লইয়া নীলাচলে গমন করেন ও তথায় বৃক্ষতলে বাস করিয়া দিবানিশি হরিভজন করিতেন। পরে তিনি এক কুটীর নির্ম্মাণ করতঃ রাধা মাধবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া যুগল মূর্ত্তির সেবা করিতেন। কথিত আছে তাঁহার প্রেম-রসাত্মক কাব্যে শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন ও একদা তাঁহার জীর্ণ কুটীরের বেড়ার বাঁধ বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। একদা জয়দেব “স্মর-গরল-খণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং” এই পর্য্যন্ত লিখিয়া মনে করিলেন “ভগবান্ শ্রীরাধার চরণ মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন এ কথা কেমন করিয়া লিখিব?” এই চিন্তা করিতে করিতে তিনি স্নান করিতে গমন করিলেন, ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া ঐ পদ পূরণ করিয়া দিয়া গেলেন— “দেহি পদপল্লবমুদারং”।

শ্রীসনাতন গোস্বামী বৈষ্ণবতোষিণী টীকায় লিখিয়াছেন—

“কইঅব রহিঅং প্রেম্মং নহি হোই মানুষে লোএ।
জই হোই কস্স বিরহো বিরহে হোণ্ডম্মি কো জীবই॥”
কৈতবরহিতং প্রেম ন ভবতি মানুষে লোকে।
যদি ভবতি কস্য বিরহো বিরহে ভবতি কো জীবতি॥

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় ইহার অনুবাদ এইরূপ করিয়াছেন :—

“অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
সেই প্রেম নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ,
বিয়োগ হৈলে কেহ না জীয়য়॥”

(ক্রমশঃ)

শ্রীজানকীনাথ পাল শাস্ত্রী, বি, এল।

মানব জাতির ইতিহাস।

(আমাদের কিং কর্ত্তব্যতা।)

"Where lies the land to which the Ship would go ?
Far, far ahead, is all, her seamen know.
And where the land she travels from ? Away,
Far, far behind is all that they can say."

মানব জাতির জীবনতরী কোথায় যাইয়া কূল পাইবে, এবং এই তরণী কোথা হইতে আসিয়া জীবনসাগরে বাহিচ খেলিতেছে, তাহা মানবের জানিবার সাধ্য নাই। বাস্তবিকই ভূতগণের আদি ও নিধন উভয়ই অব্যক্ত, মধ্যভাগ মাত্র ব্যক্ত। আমাদের এই দশা, এই অপরিহার্য্য নিয়তি সর্ব্বজনাধিগত, সুতরাং তজ্জন্য কোন মানবেরই শোক ও বিলাপ করিবার প্রয়োজন নাই। মানব জাতির এই অনিশ্চিত আদিম অবস্থা ও অজ্ঞেয় পরিণাম অবস্থার মধ্যস্থলে, বিষম বিপত্তির মধ্যে আমরা চক্ষু হীন বলদের মত তৃণ ভক্ষণ করিতেছি। বলদ হইলেও ত স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিরূপ জ্ঞানের সাহায্যে পথ দেখিয়া চলিতে পারিতাম। কিন্তু আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানময় আত্মা আছেন, তজ্জন্য—

"We look before and after
And shrink from what is not."

এই বিষম অবস্থায় পতিত আমাদের কর্ত্তব্য কি? সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই এই প্রশ্নের একই উত্তর দিবেন—মানবজাতির জীবনের ব্যক্ত মধ্য ভাগের বিষয় যথাসাধ্য যথার্থতঃ জ্ঞাত হও, এই ব্যক্তকালের ইতিহাস পর্য্যালোচনা কর, পূর্ব্বে পূর্ব্বে মানবজাতি জাতীয় জীবন যাপনে যে যে ভুল করিয়া কঠোর শাস্তি ভোগ করিয়াছে, তোমরা বর্ত্তমান জাতীয় জীবন যাপনে সেই সেই ভ্রম পরিহার কর, নচেৎ পূর্ব্বের ন্যায় তুমিও কঠোর দণ্ডভোগী হইবে, এই ব্যক্ত মধ্যকালের বহুদর্শিতার দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে—"History repeats itself." কত জাতি উন্নতির ও সভ্যতার চরমদশায় উপনীত হইয়াছিল, কিন্তু জাতীয় দুর্নীতির জন্য, অধঃপতিত হইয়াছে, এমন কি ভূতল হইতে নির্ম্মূল হইয়াছে। বর্ত্তমান মানব

জাতি যেরূপ সভ্যতার ও উন্নতির উচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়াছে, তাহা অপেক্ষাও শত গুণ উচ্চতর সভ্যতাপদবীতে আটলাণ্টিস জাতি—টলটেক জাতি—উপনীত হইয়াছিল। কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনীয়া নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম ভঙ্গ করায় জাতীয় দুর্নীতির জন্য তাহারা আটলাণ্টিক মহাসাগরের অতলগর্ভে প্রোথিত হইয়াছে—"এক জন না রহিল বংশে দিতে বাতি।" (১) অনভিজ্ঞেরা মনে করিতে পারেন মানব জাতির সকল মানবেইত আর অপরাধী নহেন, তবে নিরপরাধ মানবগণ অপরাধীর সহিত তুল্য দণ্ডভোগ করে কেন? অপরিবর্ত্তনীয়া নিয়তি যে মহদুদ্দেশ্যে পরিচালিত হইতেছেন তাহা সংসাধনের জন্য নিয়তির নিকট এক শত কোটি লোকের এই ক্ষণিক জীবন অতি তুচ্ছ। যেমন অনন্ত জীবনের তুলনায় এই ক্ষণিক জীবন যৎসামান্য কালস্থায়ী, সামান্য কার্য্য উদ্ধার করিতে দশ সহস্র পিপীলিকা বা মধুমক্ষিকার অথবা সৈনিকের জীবন অতি তুচ্ছ বিবেচিত হইয়া থাকে তদ্রূপ। কারণ এই যে দৈহিক মৃত্যু, ইহা প্রকৃত মৃত্যু নহে, ভাবী উন্নতির উপক্রমণিকা মাত্র। কেহ কেহ বলিতে পারেন দুর্নীতিগ্রস্ত মানবজাতিকে সংহার করিতে নিয়তি এত বিলম্ব করেন কেন, শীঘ্র শীঘ্র সংহার করিয়া উৎকৃষ্টতর মানব জাতি প্রস্তুত করিলেই পারেন? মহাকালরূপিণী মহাকালী নিয়তির নিকট দুই চারি শত কোটি বৎসর অতি সামান্য কাল। মহাত্মা কার্লাইল একটী উত্তর দিয়াছেন এই—

"Because Justice is so often delayed, so fools may think there is no Justice. But it is as sure as life, it is as sure as death."

যদি ন্যায়সঙ্গত ভাঙ্গা গড়াই নিয়তির নীতি হয় তাহা হইলে এক জাতির কতক মানবের অপরাধের জন্য সমস্ত জাতিকে ভাঙ্গিয়া ফেলেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, মানবজাতি এক বৃহৎ অট্টালিকা, ইহা উৎকৃষ্টরূপে নির্ম্মিত করিতে নিয়তির ইচ্ছা, নিয়তি সুদক্ষ রাজমিস্ত্রী, অট্টালিকার ভিত্তিতে কোন দোষ দেখিলে তাহা সহ্য করিতে পারেন না, যত পরিমাণ অংশ ভগ্ন করা প্রয়োজন তাহাই করিয়া থাকেন, এবং তাহা করিতে হইলে কবির কথিত "অঙ্গুলীবোরগক্ষতার" ন্যায় সর্পদষ্টা সমস্ত অঙ্গুলীই কর্ত্তন করেন। নিয়তি-রাজমিস্ত্রী কাহার জন্য এই মানবমন্দির প্রস্তুত করেন?

(১) Scot Elliot নামক লেখকের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ History of Atlantis দ্রষ্টব্য।

উত্তর—তাঁহার প্রভুর জন্য। প্রভু এই মানবমন্দির রূপ অত্যুত্তম হর্ম্ম্য দ্বারা কি করিবেন? সাধক উত্তর দিবেন—তিনি নিরন্তর বিহার করিবেন।

"হৃদয় নিকুঞ্জবনে বিহর বিহর নাথ নিশি দিন।"

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মানবজাতিগণ কিরূপ অপরাধ করিয়া, নিয়তির কোন্ নিয়ম ভঙ্গ করিয়া তাঁহার কোপে পতিত হইয়াছেন তাহা সূক্ষ্মরূপে, তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা বহুদর্শিতার দ্বারা জানিতে পারিয়াছি যে "সত্যমেব জয়তি," সত্যেরই জয় হয়। এইরূপ বহুদর্শিতার দ্বারা জানিয়াছি যে সুনীতির জয় হয়, ন্যায়ের জয় হয়, ধর্ম্মের জয় হয়, ইত্যাদি। এক কথায় বলিতে গেলে নিয়তির প্রভুর ইচ্ছাই "পূর্ণ হয় এ জগতে।" তিনি কে—"সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম আনন্দ রূপং যদ্বিভাতি,"—সৎ-চিৎ—আনন্দ, সচ্চিদানন্দময় পুরুষ। তিনি ভক্তের—"রসো বৈসঃ"—রসিকশেখর।

এই পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত চারিটী মানব জাতির উত্থান ও পতন হইয়াছে। এই চারি মূল জাতির প্রত্যেকটীর সাত সাতটী করিয়া শাখা বা উপজাতি ছিল। সুতরাং এ পর্য্যন্ত ২৮টী উপজাতি উন্নীত ও নিয়তিচক্রে অধঃপতিত বা অন্তর্হিত হইয়াছে। এক্ষণে পঞ্চম জাতি চলিতেছে। এই পঞ্চম জাতির নাম আর্য্যজাতি। ইহার জন্ম প্রায় সাড়ে আট লক্ষ বৎসর হইল হইয়াছে। এই পঞ্চম জাতির মধ্যেও সাতটী শাখা বা উপজাতি হইবে, তন্মধ্যে পাঁচটী হইয়াছে, এবং দুইটী অবশিষ্ট আছে। এই সপ্ত শাখা বিশিষ্ট আর্য্যজাতির দ্বারা পৃথিবীর বর্ত্তমান কল্প শাসিত হইতেছে ও হইবে। তৎপর ৬ষ্ঠ জাতি ও তাহার সপ্ত শাখা এবং তৎপর ৭ম জাতি ও তাহার সপ্ত শাখা পৃথিবী শাসন করিবে। তৎপর মানব জাতির পরিণাম দশা উপস্থিত হইবে। চতুর্থ জাতি জলনিমজ্জনে বা মহাপ্লাবনে ধ্বংস হয় এবং ৫ম জাতি অর্থাৎ বর্ত্তমান আর্য্যজাতি নির্ম্মিত হইবেন। ৫ম জাতি অগ্নি দ্বারা, ৬ষ্ঠ জাতি জলপ্লাবনে এবং ৭ম জাতি অগ্নিদ্বারা বিনষ্ট হইবেন। এই আর্য্যজাতি বা পঞ্চম জাতির ১ম শাখা ভারতবর্ষের আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুগণ, তাঁহাদের বিশেষ নাম আর্য্য, যদিও সমগ্র ৫ম জাতির নামই আর্য্য। এই ৫ম জাতি বা আর্য্য-জাতির ২য় শাখা আর্য্য সেমিটিক, ৩য় শাখা ইরাণী, ৪র্থ শাখা কেলটিক, ৫ম শাখা টিউটনিক, ইহারাই এখন পৃথিবীর প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতি। চতুর্থ জাতির ধ্বংসাবশেষ এবং তৃতীয় জাতির ধ্বংসাবশেষ এখনও বহুল পরিমাণে

পৃথিবীতে বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা আর্য্য নহেন, এই অর্থে অনার্য্য ও অসভ্য। কিন্তু তাঁহারাও কেহ কেহ আর্য্যজাতির সংস্পর্শে আসিয়া আর্য্যজাতির নিকট শিক্ষা-বিধান করিয়া আর্য্যজাতির শিষ্য হইতেছেন, এবং আর্য্যজাতির গুণ অনুকরণ করিয়া আর্য্যজাতির হস্ত হইতে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছেন। ৪র্থ জাতির ৪র্থ শাখা তুরানী, তাহারাই রাক্ষস নামে অভিহিত হইত। যেমন রামায়ণে বর্ণিত রাক্ষসাদি। ৪র্থ জাতির ৭ম শাখা তুরানী হইতে জাত, ইহার নাম মঙ্গোলিয়ান্। জাপানীরা মঙ্গোলিয়ান্, অর্থাৎ ৪র্থ জাতির শেষ সময়ের ৭ম শাখার এক অংশ। সুতরাং জাপানীরা আর্য্য নহেন এই অর্থে অনার্য্য ও অসভ্য। ৪র্থ জাতি জলপ্লাবনে ধ্বংস হইলে ও সমস্ত শাখা বা উপজাতি ধ্বংস হয় নাই। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জাপানীরা হিন্দুদিগের এক জাতীয় আত্মীয় নহেন। জাপানীরাই নিজে আর্য্যজাতির পদানুসরণ করিয়া কোনরূপে জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছেন। পঞ্চম জাতির প্রথম শাখা আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দুদিগকে অনার্য্য জাপানের শিক্ষা দিবার কিছুই নাই ও থাকিতেই পারে না। ইহার কারণ আমি পরে লিখিতেছি। হিন্দুদিগের যদি কিছু শিক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে টিউটনিক শাখা অর্থাৎ ৫ম শাখা ইংরেজের নিকটই করিতে হইবে। তাহাতে কোন লজ্জার কারণ নাই। বিশেষতঃ সেই শিক্ষা আর্য্যশিক্ষা হইবে, অন্য শিক্ষা অর্থাৎ ৪র্থ জাতির শাখা বিশেষের নিকট শিক্ষা অনার্য্য ও অযশস্কর হইবে। যাঁহারা বলেন ইংরেজকে পরিত্যাগ করিয়া জাপানের অনুকরণ করিতে হইবে, তাঁহাদিগকে বলা যায় "হেদে দেখ ধায় যত কুলাঙ্গার।" যাঁহারা বলেন আসিয়াবাসীকে ইয়ুরোপ ও আমিরিকার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে তাঁহারা জানেন না আর্য্যজাতি কি উপকরণে গঠিত হইয়াছে। হিন্দুরা যখনই বিদেশে গিয়াছেন তখনই ব্রহ্মবিদ্যা লইয়া অসভ্য জাতিকে আর্য্যোচিত গুণাবলী শিক্ষা দিতে গিয়াছেন। ইংরেজেরা যখনই বিদেশে গিয়াছেন, তখনই বাইবেল হাতে করিয়া গিয়াছেন, এবং অগ্রে মিশনারীগণ ও তৎপর সৈনিকগণ উপস্থিত হইয়াছেন।

আর্য্যজাতি ভ্রাতৃদ্রোহী, পুত্রদ্রোহী নহেন। পরবর্ত্তী শাখাকে পূর্ব্ববর্ত্তী শাখার নিকট ভ্রাতা ও পুত্র উভয়ই বলা হইয়া থাকে। যে বৈবস্বত মনু সাড়ে আট লক্ষ বৎসর যাবৎ পরিশ্রম করিয়া আর্য্যজাতিকে নির্ম্মিত করিয়া-

ছেন, তাঁহার উপকরণরাজি পরে বর্ণনা করিতে'ছ। আপাতমনোরম চাকচিক্য দেখিয়া একজনকে বন্ধু ও আপাতপ্রতীয়মান পরুষ ব্যবহার দেখিয়া একজনকে শত্রুজ্ঞান করা আর্য্যোচিত জ্ঞানের পরিচায়ক নহে। ঈশ্বরের অভিশপ্ত টল্‌টেক্‌ জাতির (৪র্থ জাতির শাখার) বহু দোষ জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে একটী এই ছিল যে অপরকে সদ্বিদ্যা শিক্ষা দিত না। তাহার ফল যাহা হইবার, তাহা প্রাচীনকালের ইতিহাসবেত্তাগণ অবগত আছেন। যদি ইংরেজ জাতি সেইরূপ দুরপণেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়েন, তাহা হইলে শাসনকর্ত্তাও অদূরবর্ত্তী বলিতে হইবে, কারণ এই পঞ্চম উপজাতি, আর মাত্র দুই উপজাতি অবশিষ্ট আছে, তৎপরই মন্বন্তর। কিন্তু শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করা যায় মন্বন্তরের পর যে জাতি হইবে তাহাও আর্য্যজাতিরই উন্নত শাখা দ্বারা গঠিত হইবে। তাই আমি বলিতেছিলাম, আর্য্যজাতির প্রথম শাখা ভ্রাতৃদ্রোহী নহেন, হইবেনও না। ভগবান্‌ না করুন, যদি কখনও হয়েন তাহা হইলে আর্য্যত্ব হারাইবেন। মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে দেখাইয়াছেন যে "মহাপুরুষ বলিলেন ইংরেজই ভারতের রাজা হইবেন।" বেদের কৌথুমী শাখার কুথুমিলালও বলিতেছেন "ইংরেজ রাজা ও শিক্ষক থাকিলেই আর্য্যজাতির উপকার হইবে।"

শিক্ষা বিষয়ে জাতিই আমাদের লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হওয়া উচিৎ, দেশ বিশেষ বা মহাদেশ বিশেষ কখনও লক্ষ্যের বিষয়ীভূত নহে। এই জন্য হিন্দুশাস্ত্র মেদিনীমণ্ডলকে এই সপ্তদ্বীপে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) শ্বেতদ্বীপ (২) প্লক্ষ (৩) শাল্মলী (৪) কুশাবর্ত্ত (৫) ক্রৌঞ্চ (৬) শাকদ্বীপ (৭) পুষ্কর। পৃথিবীর যত অংশ এক এক মন্বন্তরের পর জলের উপরিভাগে বর্ত্তমান্‌ থাকে সেই সমস্ত অংশকে দ্বীপ কহা যায়। এক এক মানব জাতি এক এক দ্বীপবাসী, তন্মধ্যে এই বিশেষত্ব আছে যে সকল মূলজাতিই শ্বেতদ্বীপের অবিনশ্বর দেবভূমি উত্তর মেরু প্রদেশ হইতে আগমন করিয়াছেন ও করিবেন। এখন পৃথিবীর যে ভূভাগ জলের উপরি আছে, তাহার নাম ক্রৌঞ্চ দ্বীপ, আমরা পঞ্চম জাতীয় মানব। অপর দুই দ্বীপ এখনও জন্মে নাই, তাহা এই ক্রৌঞ্চদ্বীপ বিধ্বংসের পর হইবে। প্রকৃত দেশ হিতৈষী হইতে হইলে সমগ্র দ্বীপকে নিজের পৃথিবী বা দেশ জ্ঞান করিয়া যথাসাধ্য আর্য্যোচিত গুণাবলীর উন্নতি বিধান করিতে হইবে। মহাত্মা হার্ব্বার্ট স্পেন্সারও মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন যে সমস্ত পৃথ্বীকে নিজের দেশ জ্ঞান করাই

প্রকৃত দেশ হিতৈষিতা। এক দেশের বা এক জাতির উপকার করিতে যাইয়া ন্যায়, সুনীতি, সত্য ও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করা দেশহিতৈষিতা নহে, কিন্তু সর্ব্বত্র গুণের আদর করিতে হইবে। তিনি জাপানকেও এক পত্র লিখিয়া আর্য্য ইংরেজ হইতে সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই মহা সত্যের অপলাপ করিলেই নিয়তির হস্তে উদ্ধার নাই।

উল্লিখিত সপ্তদ্বীপের প্রথমটী শ্বেতদ্বীপ। বহু লক্ষ বৎসরের আন্দোলন বিলোড়নের পর প্রথমে সামান্য মাত্র কঠিন ভূমি দেখা দিল। ইহাই মেরু পর্ব্বতের শিখর ভূমি। ইহা উত্তর মেরু প্রদেশের শিখরভূমি, ইহাই অবি-নশ্বর পবিত্রভূমি, এক মাত্র পবিত্র ভূমি—দেবগণের আবাস ভূমি। ইহা শ্বেত মৃত্তিকায় বিভূষিত, জম্বুদ্বীপের (পৃথিবীর) কেন্দ্রভূমি, ইহাকে জম্বুদ্বীপও কহা যায় কারণ তখন এই পরিমাণ ভূমি দ্বারাই সমগ্র পৃথিবী গঠিত হইয়া-ছিল।০ মেরু পর্ব্বত উত্তরে জল হইতে সর্ব্ব প্রথম উত্থিত হইয়া পাদদেশ হিমালয় নামক পর্ব্বতমালার অভ্যন্তরে দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিয়াছিল। হিন্দু মাত্রই মেরু পর্ব্বতের নাম জানেন, কারণ তাহাকে তাঁহার জাতির (উপরি যে সকল জাতি ও উপজাতির কথা বলা হইল সেরূপ জাতি কিন্তু নহে) উৎপত্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলেই বলিয়া থাকেন—

"যাবৎ মেরৌ স্থিতা দেবা যাবৎ গঙ্গা মহীতলে। চন্দ্রসূর্য্যৌ গগণে যাবৎ তাবৎ তাঁহার কুল উৎপন্ন হইয়াছে। আমি এখানেই বলিয়া রাখি এ উক্তির ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। বাইবলও বলেন, হিন্দুশাস্ত্রও বলেন, পৃথিবী ঈশ্বরের অনেক পরের সৃষ্ট গ্রহ। আমরাও বলি চান্দ্রমস পিতৃগণ দ্বারা প্রথমে পৃথিবীর মানবজাতি গঠিত হইয়াছিলেন।

উক্ত প্রথম পাঁচটী দ্বীপ কিরূপে ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়ছে, তাহার আবহাওয়ার (জল বায়ুর) পরিবর্ত্তন হইয়াছে, প্রাচীন বা বর্ত্তমান পৃথিবীর কোন কোন ভূখণ্ড তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহা লিখিবার পূর্ব্বে একটী আবশ্যকীয় কথা এখানে জ্ঞাপন করিতেছি। এক কোটী আশী লক্ষ বৎসর হইল সত্যযুগ অস্তমিত হইয়াছে, তৎপর হইতে ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ চলিতেছে। সত্যযুগে নরনারীর পার্থক্য ছিল না, তখন দেবগণ, চান্দ্রমস পিতৃগণ, অগ্নিস্বত্ত পিতৃগণ জন্মগ্রহণ করিতেন, রাজা ও প্রজা ছিলেন। তখন পার্থিব পদার্থ ঘনীভূত হইয়াছিল না। পদার্থ ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত হইয়া মানবজাতি ক্রমে ক্রমে অতি সুন্দর আকার ধারণ করিতেছে। সুতরাং

জড় পদার্থ সম্বন্ধে পৃথিবী ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু আত্মিক বিকাশ ও সত্য সম্বন্ধে অবনত হইতেছে। সত্য যুগে অবিমিশ্রিত বিশুদ্ধ সত্য বিরাজ করিতেন, তৎপর ক্রমে ক্রমে পদার্থের অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পঞ্চ বিষয় ভোগের কামনা দ্বারা আত্মা সংস্পৃষ্ট হওয়ায় আত্মিক বিকাশের ও সত্যের অবনতি হইতেছে। পদার্থ ক্রমে ঘনীভূত হওয়ায় আত্মাও ক্রমে দৃঢ় কারাগারে আবদ্ধ হইতেছে। মানবজাতির ইন্দ্রিয়োপভোগের শক্তিও বাড়িতেছে। একটা উদাহরণ দেখুন। তৃতীয় ও চতুর্থ জাতির লোকের ঘ্রাণ গ্রহণের শক্তি অতি সামান্য, আর্য্যজাতিতে এই শক্তির উদ্ভব ও উন্নতি হইতেছে। ব্রহ্মায় ও চীনের পর্য্যুসিত মাংসাদি আহারের কথা স্মরণ করুন। আর্য্যজাতির পরেও অপর দুই জাতির অধিক সংখ্যক ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব ও উন্নতি হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বে আত্মার স্থূল দেহ এরূপ ঘন ছিল না, আত্মায় আত্মায় মিলন হইবার ও আত্মার দূরদর্শন, দূরশ্রবণ প্রভৃতির জন্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধিক সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত না। ইহাই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের ক্রম-বিকাশের ও ক্রম-অবনতির একটা প্রধান কারণ। ক্রমশঃ

শ্রী——বাচস্পতি।

পরিণাম।

১

অসার সংসারে এসে মজিয়া বিষয় রসে
বৃথায় কাটিয়া গেল দিন!
শৈশব, কৈশোর আর যৌবন স্ফাটিকাকার,
দেখিতে দেখিতে বিমলিন!

২

প্রৌঢ়তাও যায় যায়, বার্দ্ধক্য আগত প্রায়,
স্ফূর্ত্তি হীন, ক্ষীণ দেহ মন,
গলিত দশন পাঁতি পলিত চিকুর ভাতি
লোলিত স্খলিত সুগঠন!

৩

ভাবন্ত মস্তক যুড়ে "মৃত্যুর নিশান উড়ে,"
শুক্লকেশ কার্পাসের প্রায়!
ঘোষণা করিছে তায় "শমন আগত প্রায়,
সাবধান, দিন বহে যায়!"

৪

ভুলিয়া আশার মোহে সেদিকে কেহ না চাহে,
কে শুনে সে স্বভাবের বাণী?
কামনার কণ্ডুয়নে, ছুটি অতীতের পানে
ভবিষ্যতে তিলেকে না গণি!

৫

ভবিষ্যৎ অন্ধকার, আশা শূন্য, কদাকার,
তারে লয়ে কিবা সুখ আছে?
অতীতের সুখস্মৃতি ত্রিদিবের প্রতিকৃতি,
ভাতে নয়নের কাছে কাছে!

৬

হায়রে জীবন মোর, হায়রে হৃদয় তোর,
এখনো গেলনা সুখ আশা?
অতীতের মোহময়ী মরীচিকা যায় বহি,
তাহা দেখি বাড়িয়াছে তৃষা?

৭

যে দিন চলিয়া গেছে তা'র কি তুলনা আছে?
পুনর্ব্বার পাইবে কি তাহা?
পাইবে কি সে রতনে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে,
অবহেলে হারায়েছ যাহা?

৮

আর কি তোষিতে তোরে স্বর্গীয় সুষমা ধরে
প্রকৃতি দেখা'বে নানা নাট?
আর কি নয়নে তোর আছে সে অঞ্জন ঘোর
হেরিবে রঞ্জিত মাঠ ঘাট?

সে আলোক নিবায়েছে,　　তিমিরে ভরিয়া গেছে
সে সজ্জিত ভব রঙ্গালয়!
বিকট কঠোর কাল,　　পাতিয়া জঞ্জাল জাল
বসে আছে, দেখে লাগে ভয়!

১০

অতীত সুখের স্মৃতি　　মনোরম প্রতিকৃতি,—
দেখাইয়া, ভুলাইছে সবে,
শৈশব কৈশোর আর　　যৌবন স্ফাটিকাকার
মনে করি ভাসি সুধার্ণবে!

১১

সে হেন সুখের দিনে　　সংসারের কুঞ্জবনে
মুগ্ধ হয়ে খেলিতাম কত!
রজনী প্রভাত হ'লে,　　স্বর্গীয় সুষমা ঢেলে
দিবাকর হইত উদিত!

১২

সুবর্ণ কিরণে তা'র　　হাসিত হই সংসার,
ভাসিত হৃদয় সুধা স্রোতে!
উৎসাহে পূরিত বুক,　　হরষে উৎফুল্ল মুখ,
অন্তরে বাহিরে চারি ভিতে!

১৩

উথলিত সুখ রাশি,　　প্রকৃতি মোহন বাঁশী,
বাজাইত ছড়া'য়ে মাধুরী!
সে সঙ্গীত সুধাপানে　　প্রমত্ত হইয়া প্রাণে,
বেড়াতাম ছুটাছুটি করি!

১৪

এবে ভাবি ধূলা যাহা,　　সুবর্ণ বলিয়া তাহা,
মাখিতাম সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া!
এবে এ রাজ শয়নে　　নিদ্রা না আসে নয়নে,
তৃণপরে শয়ন করিয়া,

১৫

দুর্ভাবনা শূন্য মনে নিদ্রা সুখ আস্বাদনে,
সুখে নিশা প্রভাত হইত!
বিহঙ্গ কাকলী তানে, জাগাইত সযতনে,
দিকচয় আনন্দে ভাসিত!

১৬

সে দিন হ'য়েছে গত দুঃখ শোক প্রতিহত
জড়াজীর্ণ কঙ্কাল ক,খানা—
সংসার শ্মশান পরে এক পার্শ্বে আছে পড়ে
কেহ যেন দেখেও দেখেনা!

১৭

হায়রে অবোধ তোর এখনো মোহের ঘোর
ঘুচিল না, হইল না জ্ঞান?
দিবস অতীত প্রায় রবি অস্তাচলে যায়,
কাল রাত্রি হ'ল আগুয়ান!

১৮

তিমিরে ভরিল বিশ্ব, বিকট কঠোর দৃশ্য—
ঘন জালে ছাইল অম্বর,
হ'তেছে অশনি মন্দ্র, গর্জ্জিয়া জীমূত বৃন্দ
ঢালিতেছে বৃষ্টি ঘোরতর!

১৯

বায়ু বহে ঘোরতর, কাঁপে ক্ষিতি থর থর,
প্রলয় পয়োধি উথলিছে।
দশ দিক অন্ধকার, জল স্থল একাকার!
সমুদয় অতলে ডুবিছে!

২০

যায় বিশ্ব রসাতলে, এহেন শঙ্কট কালে
কে কাহারে করে নিরীক্ষণ?
দারাপুত্র সহোদর, সকলে হয়েছে পর!
কা'র তরে কে ভাবে এখন?

২১

আমার অস্তিত্ব যাবে তাহাদের কি হইবে,
এই ভাবি সকলে কাঁদিবে !
এহেন দারুণ দিনে পরাৎপর হরি বিনে
কেহ নাই তরাইতে জীবে !

২২

অতএব শুন মন, কেন আর অকারণ
"আমার আমার" করি মর ?
অসার সুখের লাগি, অশেষ দুঃখের ভাগী
কেন হও ? বুঝে কার্য্য কর !

২৩

সেই হরি নারায়ণে, সেই সত্য সনাতনে
কর শীঘ্র আত্ম সমর্পণ !
তাঁহা ভিন্ন সে সঙ্কটে কেহ না যা'বে নিকটে
অগতির গতি সেই জন !

২৪

হে হরি করুণাময় তুমি মাত্র সে সময়
একমাত্র আশ্রয় নিধান !
সংসারের মোহ পাশে, ছেদন করিয়া, দাসে
কর নাথ ! অভয় প্রদান।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কি তাহারে বলিবে ভাবিও !

কাজ নাই চিটিও লিখিয়া !
ভাল যদি নাহি লাগে আমার কারণে
প্রতারণা কিহবে শিখিয়া ?
আমি কাঁদি আমি জানি, শুনিয়া আমার বাণী,
কি করিবে তুমি অভাগার,

আমিই মুছিব ধীরে, আমার নয়ন নীরে—
নাহি সাধ আঁচলে তোমার।
ভয় নাই একা ভবে এ অধম বেঁচে রবে,
আপনার কর্ত্তব্য সাধনে,
রবি শশী কাজ করে, আমি তার দুঃখ তরে
ব'সে রবে কিসের কারণে!
কত ফুল একা একা, কত বৃন্তে দেয় দেখা,
একা শেষে আপনারে লয়ে,
ঝরিপড়ে থাকি থাকি পবনে সুবাস রাখি
ধূলি সনে মিশে ধূলি হ'য়ে।
কপোতও শত শত, তরু শাখে হ'য়ে নত,
একা ব'সে কত গান গায়;
কেহই ডাকে না তাকে, কাননের ফাঁকে ফাঁকে
প্রতিধ্বনি মিশাইয়া যায়।
এ সারা জীবন ধরি, আমিও হৃদয় ভরি,
একা গা'বো যা পারি গাহিতে
তবে বলেছিলে মুখে, হবে মোর সুখে দুখে,
সে কথা কি পেরেছ ভুলিতে?
তখন পূরবাকাশে, অরুণ কনকবাসে,
এই সবে উঠিছে জাগিয়া;
টলমল নীলনীর, হাসিয়া চুমিছে তীর,
তারপরে মোরা দাঁড়াইয়া।
আমায় ভুলিয়া গেলে, ফেলে দিলে পায় ঠেলে,
বেশী কিছু হবে না জানিও;
দিবাকরে সাক্ষী রাখি, প্রতিজ্ঞা করেছ সখি,
কি তাহারে বলিবে তাবিও!

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমল।

মহারাজ নন্দকুমার।

(বেঙ্গলী হইতে অনুবাদিত)

মহারাজা নন্দকুমারের নাম ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নহে, এ নাম অপযশের দগ্ধ শলাকায় লাঞ্ছিত—মানবের চক্ষে অনন্ত অভিশাপের বিষয়ীভূত। ইতিহাসের মন্তব্য তাঁহার উপর অতিশয় কঠোর। তিনি যে সকল ঘটনাচক্রের মধ্যে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, সেই সকল ঘটনার ভ্রমজননী কুজ্ঝটিকায়, তাঁহার চরিত্র বিষম কদাকাররূপ ধারণ করিয়াছে এবং যে সকল ইতিহাস-লেখক তাঁহার চরিত্রের সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা নানা কারণে তাঁহার চরিত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া তাঁহাকে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছেন। ঐতিহাসিকের লেখনী সর্ব্ব সময়ে সত্যের অভ্রান্ত পরীক্ষক নহে, যদিও সে লেখনী অনেক সময়েই সত্য এবং ন্যায়ের অনশ্বর রশ্মিমালা বিকীরণ করে, তথাপি মধ্যে মধ্যে ইহা অসঙ্গত তীব্রোক্তির ভ্রববহ্নিও নিঃসরণ করিয়া থাকে। ঐকান্তিক স্বজাতিপ্রীতি, অথবা স্বীয় নায়কের প্রতি অত্যধিক অনুরাগ, অথবা প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি কারণে ন্যায়ের স্বাভাবিক প্রফুল্ল প্রবাহ প্রতিরুদ্ধ হইয়া পড়ে এবং নন্দকুমার সম্বন্ধে এই সকল কারণ স্পষ্টতই বিদ্যমান আছে। পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁহার জীবনের প্রকৃত ঘটনা সমূহ প্রকৃতরূপে অধ্যয়ন করিতে এক্ষণে শিক্ষিত স্বদেশবাসিগণ থাকিতেও নন্দকুমার এইরূপ অকারণ নিন্দাভাজন থাকিবেন এবং তাঁহার স্মৃতি চিরকাল কলঙ্কের ভার বহন করিবে। সয়তান যেরূপ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে, সেও তত কৃষ্ণ নয়। আর নন্দকুমার ত সয়তানের মত ছিলেনই না। নন্দকুমার দুষ্ট লোক ছিলেন, বরং প্রকৃত মনুষ্য বাচ্য ছিলেন, তিনি ঘৃণিত দুর্ব্বৃত্ত ছিলেন না, বরং স্বদেশের কল্যাণকল্পে আত্মজীবন বলিদান করিয়াছিলেন। তিনি অতি পূতিপূর্ণ নৈতিক অধঃপতনের দিনে সংসারে আসিয়াছিলেন এবং সেই সময়ের ন্যায়-দণ্ডে তাঁহার বিচার হওয়া উচিত, এরূপ না হইলে সিজার বা সিপিওর মত পৃথিবীর অনেক বড়লোকই তাঁহাদের মহত্ত্বাংশে অনেক হীন হইয়া পড়িবেন এবং অতি জঘন্য ক্ষুদ্রচেতা অপেক্ষাও ঘৃণিত বিবেচিত হইবেন। সময় আমাদের ভ্রমের সংশোধক এবং সময়ই আমাদের ভ্রম সংশোধন করিতে

এবং ইতিহাসের কঠোর মন্তব্য বিপর্য্যস্ত করিতে সমর্থ। সময় ইতঃপূর্ব্বেই নন্দকুমারের স্বপক্ষে পরিবর্ত্তনের চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছে, এবং তাঁহার চরিত্রের অপক্ষপাত ধারণায় অনেক পথ খুলিয়া দিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বেই একজন বিদেশী নন্দকুমারের পক্ষ সমর্থন করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, কেবল ন্যায় এবং সত্যের প্রতি অনুরাগ বশতঃ তিনিই সর্ব্বপ্রথমে নন্দকুমারের সমর্থনে প্রথম সুর বাঁধিয়াছেন এবং পরিষ্কার সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং প্রশংসনীয় ক্ষমতার সহিত জগতের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে, নন্দকুমারের ফাঁসি বিচারালয়ানুষ্ঠিত নরহত্যা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। অর্থাৎ অবিচারে নন্দকুমারের ফাঁসি হইয়াছে, বিচারকগণ তাঁহার ফাঁসির ব্যবস্থা করিয়া স্বেচ্ছাকৃত নর-হত্যা মাত্র করিয়াছেন। আমরা জজ বিভারিজ প্রণীত 'নন্দকুমারের বিচার' নামক সুন্দর গ্রন্থটি পড়িতে পাঠকগণকে অনুরোধ করি। ঐ উত্তম গ্রন্থখানি নন্দকুমারের জীবনের শেষ পরিচ্ছেদের উপর আলোক প্রবাহ ঢালিয়া দিতেছে, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চরিত্রটি ইহাতে আলোচিত হয় নাই। আমরা নন্দকুমারকে দেবতাতুল্য বলিতে চাহি না, অথবা তাঁহার চরিত্রটিকে সুধা-ধবল করিতেও ইচ্ছা করি না। তিনি যেরূপটি ছিলেন, তাহার কমও নয়, বেশীও নয়, এইরূপ ভাবে আমরা তাঁহাকে দেখাইতে চাই। মনুষ্যের পারি-বারিক জীবন এবং কার্য্য জীবনের ব্যবহারেই তাঁহার চরিত্র পরিস্ফুট হয়। তাঁহার পারিবারিক ব্যবহারই তাঁহার চরিত্রের উত্তম পরীক্ষা, যেহেতু পারি-বারিক জীবনে মানুষ অবাধে এবং অসংযত ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু নন্দকুমারের পারিবারিক চরিত্র পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার কার্য্য জীবনের ঘটনাবলীই যথার্থ ভাবে পাঠ করাই সঙ্গত বিবেচনা করি, যেহেতু এই অংশেই তিনি ঐশী বিভূতির প্রকাশ্য শত্রুগণের সহচর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। বিশৃঙ্খলাগর্ভ, আবর্ত্তভীষণ, বিঘূর্ণমান, অনিবার্য্য গতি, জটিল ঘটনা স্রোতের মধ্যে তাঁহার জীবনের দৃশ্যাবলী নিহিত হইয়াছিল। ইতিহাসে এটি একটি কঠিন সঙ্কট সময়, যখন ধ্বংস এবং গঠন উভয়ের কার্য্যই চলিতে-ছিল—যখন দ্রুত বিশ্লেষণের মধ্য হইতে নূতন সৃষ্টির আবির্ভাব হইতেছিল, যখন অভিনব মিশ্র পদার্থের উৎপত্তি-মুখে বিভিন্ন ধর্ম্মী মৌলিক পদার্থ নিচয়ের ভীষণ সংঘর্ষণ চলিতেছিল, যখন মঙ্গল অনাগতকালগর্ভে নিহিত ছিল এবং অমঙ্গল রাশি তরঙ্গ তুফানে উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। এ হেন সঙ্কুল সময়ে নন্দকুমার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইলেন এবং তাহাতে তিনি কিরূপ অভিনয়

করিয়াছিলেন, তাহা কাহাকেও অনুমান করিয়া লইতে হইবে না। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার কার্য্য প্রণালীর বিষয় কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের লিখিত বিবরণে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল বিবরণই তাঁহার বিরুদ্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ এবং এই সকল বিবরণই তাঁহার আত্মরক্ষার সুদৃঢ় দুর্গ। তাহাদের ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত ব্যাখ্যা লইয়াই সেগুলি তাঁহার বিপক্ষে বা স্বপক্ষে যাইবে। বহির্দর্শী বিচারকের পক্ষে সেগুলি এমন কথা, যাহা তাঁহার চরিত্রে নিষ্ঠুর ক্ষত উৎপাদন করে, কিন্তু শান্তপ্রকৃতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিচারকের চক্ষে সেই গুলিই তাঁহার পক্ষে অস্ত্রক্ষেপপ্রতিকারী চর্ম্ম সদৃশ। তাহাদের প্রয়োগের বিধি অনুসারে সেগুলি সদ্যঃপ্রাণহন্ত্রীবিষ বা ক্ষতনিসূদন প্রলেপের ন্যায় ফলোপধায়ক হইবে। যেহেতু এই গুলিই নন্দকুমার চরিত্র সম্বন্ধে সজীব প্রমাণ, সুতরাং এই বিবরণগুলি তাঁহার উপর কিরূপ আলোক নিক্ষেপ করে, দেখা যাউক।

নন্দকুমার কার্য্যজীবনে সফলতা লাভ করিয়া ক্রমশঃ পদোন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রভুর প্রীতিভাজন হইয়া হুগলীর ফৌজদার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এইখানেই তাঁহার সহিত ইংরাজ বণিকগণের সংস্রবের সূত্রপাত হয়। এ সংস্রব সুমিষ্ট, তিনি ইংরাজ বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদান করিতেন, অন্ধকূপের কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডে তাঁহার বীর হৃদয় ঘৃণায় কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। সে সকল হতভাগ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, তাহাদের প্রতি তিনি প্রকাশ্যভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময়ে কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ নন্দকুমার সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। ১৭৮৬ সালের ৯ই আগষ্ট সিলেক্ট কমিটির অধিবেশনে নন্দকুমার সম্বন্ধে নিম্নরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছিল :—

"ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য স্বার্থের প্রসর কল্পে কলিকাতার কাউন্সিল হুগলির ফৌজদার দেওয়ান নন্দকুমারের আনুকূল্য লাভ করিতে চেষ্টা করা উচিত মনে করেন। অন্ধকূপে যে সকল ব্যক্তি যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল, এই উন্নতমনা হিন্দু তাহাদের জন্য প্রভূত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি বাস্তবিকই অতি উচ্চমনা ব্রাহ্মণ।"

পুনশ্চ ১৭৫৪ সালের ২০শে জুন কর্ণেল ক্লাইব এবং ওয়াট্‌স সাহেব এইরূপ লিখিয়াছিলেন যে, বহুক্ষেত্রে আমরা দেওয়ান নন্দকুমারের নিকট যে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি, তাহা বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে হুগলী, বর্দ্ধমান

এবং নদীয়া জেলার রাজস্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত করা বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করি।

এ পর্য্যন্ত নন্দকুমার ও কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ পরস্পর একযোগে কার্য্য করিতেছিলেন, নন্দকুমার ইংরাজদিগকে সাহায্য করিতেন এবং ইংরাজগণও তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। নন্দকুমার উন্নত হৃদয় ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সহায়তা লাভ কোম্পানীর কর্ম্ম-চারিগণ উপযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। নন্দকুমার যখন স্বীয় প্রভুর বিরাগ-ভাজন হইবার আশঙ্কা সত্বেও অন্ধকূপের বিষাদাত্মক নাটকের অভিনয়ে যে সকল লোক যন্ত্রণা পাইয়াছিল, তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া-ছিলেন, তখন প্রকৃত প্রস্তাবেই তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব স্বতঃই স্ফুরিত হই-তেছে। তিনি ইংরাজদিগকে প্রশ্রয় দিয়াছিলেন কারণ তাহাদিগকে সরল সদভিপ্রায় ব্যবসায়ী বলিয়া জানিতেন। কিন্তু এই সদ্ভাবসূত্র অধিককাল স্থায়ী হয় নাই, যখন ইংরাজগণ অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জনের পথ খুলিতে উদ্যত হইলেন, তখন ইহাতে ভীষণ টান বাজিল। এই সদ্ভাব শীঘ্রই অসদ্ভাবে পরিণত হইল এবং এই অসদ্ভাব ঘনীভূত হইয়া বিদ্বেষে পর্য্যবসিত হইল। ঘোর বিদ্বেষের যৌতুক সমভিব্যাহারে লইয়া বন্ধুত্বের প্রথম মিলন সংঘটিত হইয়াছিল। ইহার পর হইতে নন্দকুমার এবং কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ ক্রমদূরপ্রসারী দুই ভিন্নবর্ত্মে চলিতে লাগিলেন। অতঃপর আমরা দেখাইব, কিরূপে এই বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল এবং ইহাতে নন্দকুমার কিরূপে দোষী।

(ক্রমশঃ) ধী

লালাবাবু প্রসঙ্গ।

(১)

প্রাতঃস্মরণীয় লালাবাবু পৈত্রিক ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া একদা একটী হস্তী ক্রয় করিবার জন্য মাতার অনুমতি প্রার্থনা করেন, উদারচেতা রত্নগর্ভা মাতা যেন কখনও হাতী দেখেন নাই এবং একটী ক্রয় করিলে তাঁহারও কৌতূহল চরিতার্থ হইবে, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া উহা ক্রয় করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করেন। যথা সময়ে একটী হস্তীও ক্রয় করা হয়।

মা কখনও হাতী দেখেন নাই, দেখিলে আনন্দিত হইবেন, এই ভাবিয়া যুবক লালাবাবু হাতীটি সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া মাকে দেখাইবার জন্য খিড়কী-দ্বারে লইয়া যাইতে আদেশ করেন; এবং নিজে জননীর নিকট গিয়া হাতী দেখিবার জন্য তাঁহাকে নিবেদন করেন। স্নেহময়ী মাতাও আনন্দ-সহকারে জানালার নিকট গিয়া তথা হইতে হাতী দেখেন।

হাতী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "বৎস! কৃষ্ণচন্দ্র! এই হাতিটির মূল্য কত?" লালাবাবু উত্তর দিয়াছিলেন, "আজ্ঞে বেশী নয় সাত শত টাকা!" তিনি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "এই জন্তুটা কি খায়? এবং ইহার রক্ষার নিমিত্ত কয়জন লোকের প্রয়োজন?" লালাবাবুও পুনরায় উত্তর দিলেন, "মা হাতীর নিত্য খোরাক, একটী চারা গাছের নরম ডাল ও পাতা এবং এক মণ চাউল; আর উহার তত্ত্বাবধানে জন্য দশ টাকা বেতনের দুইজন লোক মাত্র।"

অতিথিবৎসলা স্নেহময়ী মাতা এইবার আর থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন "কৃষ্ণচন্দ্র! দেখদেখি একটী বন্য জন্তুতে আমার কতগুলি অতিথির অন্ন ধ্বংশ করিতেছে!" লালাবাবুর হাতী পোষার সাধ এই খানেই উদ্‌যাপিত হইল, অতিথি সেবাই যে তাঁহাদের কুলব্রত, তাহা এই ক্ষণ হইতে তাঁহার মনে দৃঢ়রূপে স্থান পাইল এবং তিনি জীবনের মধ্যে কখনও উহা বিস্মৃত হন নাই।

(২)

কাশীক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে মুক্তি হইয়া থাকে, কিন্তু লালাবাবুর মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কাশী দর্শনেও সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। এবং যখন তিনি বৃন্দাবন গমন করিতেছিলেন, তখন কাশীর সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া উল্লিখিত বিশ্বাস প্রযুক্ত ছাতা খুলিয়া আপনাকে আড়াল করিয়া গিয়াছিলেন, কারণ কাশী দর্শনে যদি তাঁহার ভক্তির পথে কোন বাধা উপস্থিত হয়। লালাবাবু মুক্তি বাঞ্ছা করেন নাই, তিনি সনাতন বৈষ্ণব পথের পথিক ছিলেন, পুনঃ পুনঃ শরীর পরিগ্রহ করিয়া প্রতি জন্মেই সাধু সেবা করিবেন, ইহাই তাঁহার ব্রত ছিল। তাঁহাকে শিবদ্বেষী জ্ঞান করা নিতান্ত অজ্ঞের কার্য্য। বৈষ্ণবপথের পথিক কখনই শিবদ্বেষী হইতে পারেন না, তাঁহারা ভগবৎ পারিষদ দ্বাদশ বৈষ্ণবের (শিব, শুক, নারদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বলী,

বিভীষণ, মার্কণ্ডেয়, দাল্‌ভ্য, পরাশর, গরুড়, বিশ্বকসেন।) মধ্যে শিবকে আদি বৈষ্ণবজ্ঞানে ভক্তি করিয়া থাকেন।

(৩)

ব্রজভূমিতে জমিদারী খরিদ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে কর বাড়াইতে আরম্ভ করিলে ব্রজবাসিগণ দুঃখিতান্তকরণে লালাবাবুর গুরুদেব বাবাজী মহাশয়ের নিকট তাঁহার আচরণ বিজ্ঞাপিত করেন, এবং তিনিও শিষ্য-শাসন জন্য আদেশ করেন যে, লালাবাবু যেন তাঁহার কুঞ্জে আসিতে না পান। লালাবাবু ইহা শুনিয়া অপরাধ মার্জ্জনা জন্য দন্তে তৃণ লইয়া গুরুকুঞ্জের দ্বারে সপ্তাহ যাবৎ দণ্ডায়মান থাকেন, তাঁহার গুরুদেবের ক্রোধ শান্তি হয়। লালাবাবুও অতঃপর জমা বৃদ্ধি করিতে বিরত হন।

(৪)

বৃন্দাবনে মাধুকরীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রথমতঃ লালাবাবু ব্রজবাসি-গণের কুঞ্জে আমান্ন দ্রব্য গ্রহণ করিতেন, পরে উহা শ্রীযমুনার জলে ধৌত করিয়া তুলসীদল অর্পণ পূর্ব্বক যুগল কিশোরের যথাবিধি ভোগ লাগাইতেন ও প্রসাদ পাইতেন। কোন ব্রজবাসী স্বভাব-জনিত আচরণে খাইতে খাইতে কোন দ্রব্য তাঁহাকে প্রদান করিতে উদ্যত হইলে তিনি যোড় হস্তে কাকুতি জানাইতেন। ব্রজমায়ীগণও ক্রমে তাঁহাকে আর উচ্ছিষ্ট দিতে অগ্রসর হইতেন না।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে এক দিবস লালাবাবু কোন ব্রজ-বাসীর দ্বারে রাধে! রাধে! বলিয়া ভিক্ষার্থ দণ্ডায়মান হইলে, যে স্থানে কতিপয় ব্রজবালক একত্র ভোজন করিতেছিলেন, ব্রজময়ী ব্রজস্বভাব-জনিত দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের পাত্র মধ্যস্থ এক খণ্ড রোটীকা প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, তিনি যে আমান্ন খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত অন্য খাদ্য গ্রহণ করেন না, ইহা ব্রজমায়ীর স্মরণ করাইয়া দিলে ব্রজমায়ী হস্ত প্রক্ষালন করিয়া অনি-বেদিত খাদ্য যাহা ভাণ্ডারে প্রস্তুত ছিল, তাহাই তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। লালাবাবুও পূর্ব্বানুযায়ী শ্রীযমুনার পূতসলিলে বিধৌত করিয়া ধ্যেয়মূর্ত্তির প্রীতিতে ভোগ নিবেদন করিলে আরাধ্য মূর্ত্তি সেদিন আর তাঁহার ধ্যানস্থ হইলেন না; বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন, কাহাকেও কিছু না বলিয়া

মনের ভাব মনেই গোপন রাখিলেন। উদ্বেগ ক্রমে প্রবল হইতে লাগিল।

অন্য এক দিবস লালাবাবু পূর্ব্বোক্ত ব্রজবাসীর দ্বারে ভিক্ষার্থ উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, পূর্ব্বমত কতিপয় ব্রজবালক একত্র ভোজন করিতেছিলেন এবং তাঁহাদের সহিত নয়নাভিরাম গোলকচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবন-বিহারীও ভোজন কার্য্যে লিপ্ত। লালাবাবুর এতকালের তপস্যার ফল ফলিল, তিনি অন্তরের মূর্ত্তি বাহিরে দেখিলেন। তাঁহার মনের ভ্রম ঘুচিয়া গেল। পরে ব্রজমায়ী অনিবেদিত খাদ্য প্রদান করিতে অগ্রসর হইলে তিনি বালকগণের উচ্ছিষ্ট প্রার্থনা করিলেন। ব্রজমায়ীও তাহাই প্রদান করিলেন এবং সেই দিন হইতে লালাবাবু পূর্ব্ব সঙ্কল্প দূরীভূত করিলেন। তাহার পর তিনি যে বাটীতে যাহা পাইতেন, শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার না করিয়া তাহাই মহাপ্রসাদ জ্ঞানে ভোজন করিতেন।

(৫)

ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণের নিকট তাঁহার একটী প্রার্থনা ছিল যে, মৃত্যুর পর পদদ্বয়ে রজ্জু বন্ধন করিয়া যেন তাঁহার মৃতদেহ ব্রজভূমে টানিয়া বেড়ান হয়। তাহা যে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল, ইহা আমি বালক কালে বৈষ্ণব মুখে শুনিয়াছিলাম।

(৬)

মৃত্যুর পর শরীর ধারণ করিয়া বেড়াইতে লালাবাবুকে দেখিয়াছিলেন, এরূপ বৈষ্ণবের সহিতও আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। লালাবাবু প্রাপ্তভব। লালাবাবু অমর।

(৭)

লালাবাবুর নাম কীর্ত্তনে শ্রীগোবিন্দের অভয়চরণ যুগলে অচলা ভক্তি হউক। একবার সকলে মিলিয়া সমস্বরে বলুন শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রিমার সহিত জয় লালাবাবুকি জয়! জয় লালাবাবুকি জয়! জয় লালাবাবুকি জয়!

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ।

বীরভূম, সিউড়ি।

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী রাজা।

(প্রথম প্রস্তাব।)

বিদ্যা, বিক্রম, ধন, দেশোপকার, বদান্যতা অথবা সাহেব সেবা কিম্বা তোষামোদ প্রভৃতি কারণে এদেশে 'রাজা' বা 'রায় বাহাদুর' উপাধি লাভ করিয়া অনেকে সম্মানিত ও সুপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। ধর্ম্ম, শিক্ষা ও চরিত্র বলে কিম্বা প্রকৃত স্বদেশ হিতৈষিতা গুণে বুদ্ধিমান বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট উপাধি লাভ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়; কিন্তু ধনবান পুরুষ যে কোন প্রকৃতি বা যে কোন ধাতুর লোক হউন, তাঁহার পক্ষে উপাধি প্রাপ্ত হওয়া কঠিন কথা নহে। স্বদেশে পৈত্রিক সম্পত্তির সহায়তায় অথবা স্বোপার্জ্জিত ধনবলে কিম্বা অন্যবিধ কারণে গবর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্র হইয়া উপাধি অলঙ্কার সংগ্রহ করা অনেকেরই পক্ষে সহজসাধ্য, কিন্তু সামান্য অবস্থায় বিদেশে গমন পূর্ব্বক চিরপ্রবাসী হইয়া কঠোর পরিশ্রম, অমিত অধ্যবসায় ও প্রকৃষ্ট প্রতিভা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক রাজা ও প্রজা সাধারণ সমীপে প্রখ্যাত, প্রিয় ও যশস্বী হওয়া দুই একজনের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। স্বদেশে রাজা বা রায় বাহাদুর হওয়া বিশেষ বাহাদুরী নহে, কিন্তু বিদেশে স্বজাতির মুখোজ্জল করিয়া অশেষ গুণপণা দ্বারা যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট সম্মানিত ও প্রজা সাধারণ সমীপে শ্রদ্ধান্বিত হইতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারাই প্রকৃত "স্বনাম ধন্য পুরুষ"। এইরূপ অশেষগুণভূষণ ও সর্ব্বজন প্রশংসিত পুরুষগণ সকল জাতির এবং সকল দেশের অমূল্য অলঙ্কার বলিয়া গণ্য হয়েন। পাঠকেরা শুনিয়া সুখী হইবেন, বঙ্গদেশের বাহিরে বর্ত্তমান যুগে চারিজন বঙ্গবাসী এবম্প্রকারে প্রখ্যাতি লাভ করিয়া স্ব, স্ব বিমল চরিত্র ও অগণ্য সৎগুণ বলে "রাজা" উপাধি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অযোধ্যান্তর্গত লক্ষ্ণৌ প্রবাসী রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কাশীধাম প্রবাসী মনোরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, উড়িষ্যার রাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে এবং বেহার প্রদেশান্তর্ব্বর্ত্তী ভাগলপুরের রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ ইহার সুদৃষ্টান্ত। রাজা মনোরঞ্জন ব্যতীত অপর তিনজনের সম্পত্তি, বংশ ও উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান আছেন; শেষোক্ত দুই রাজা মহোদয় এখন জীবিত। রাজা দক্ষিণারঞ্জন ও রাজা মনোরঞ্জনের জীবন চরিত এবং বংশা-

বলীর বিবরণ প্রভৃতি এপর্য্যন্ত সুন্দররূপে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই নাই, এখনও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত রহিয়াছি, সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহাঁদের নামোল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম। রাজা শিবচন্দ্র ও রাজা বৈকুণ্ঠনাথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া পাঠকদিগের কৌতূহলবৃত্তি কিয়ৎ পরিমাণে চরিতার্থ করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। ইহাঁরা উভয়েই বাঙ্গালী কুলের অমূল্য অলঙ্কার। শিবচন্দ্র জাতিতে ব্রাহ্মণ, বৈকুণ্ঠনাথ জাতিতে তাম্বুলী।

শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃপুরুষগণ নবদ্বীপ জেলান্তর্গত দোগাছিয়া পল্লীতে বাস করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণনগর রাজবাটী হইতে এই পল্লী প্রায় এক ক্রোশ দূরবর্ত্তিনী। দোগাছিয়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ কুলীন এবং অতি প্রাচীন কাল হইতে সম্ভ্রান্ত রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই বংশের কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কৃষ্ণনগরের মহারাজা ভুবনবিখ্যাত কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের মীরমুন্সী (সেক্রেটরি) ছিলেন। নবদ্বীপ রাজবাটী কর্ত্তৃক প্রদত্ত সনন্দ, "মুহুরী" উপাধি, ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া এই বংশের পূর্ব্ব পুরুষগণ বিশেষ প্রশংসিত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। শিবচন্দ্রের পিতার নাম দুর্গাচরণ, পিতামহ শম্ভুচন্দ্র, প্রপিতামহ গোপালচন্দ্র এবং বৃদ্ধ পিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র। ইহাঁদের গোত্র শাণ্ডিল্য, বন্দ্যঘাটি, গরঘর, দাশুসন্তান, অঙ্গমালী। শিবচন্দ্রের পিতা বাবু দুর্গাচরণ এরূপ ধর্ম্মভীরু ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন যে, আদালতে গিয়া সাক্ষ্য দিতে তিনি কখনও সম্মত হয়েন নাই। বিচারালয়ে প্রবেশ করাকে তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিপরীত বিধি বলিয়া বিবেচনা করিতেন। একদা একটা গুরুতর মোকদ্দমায় বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষের লোকেরা তাঁহার নাম সাক্ষীর তালিকা ভুক্ত করিয়া তাঁহার "সাক্ষ্যকে" (evidence) বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল; বিচারক মহাশয় দুর্গাচরণ বাবুর (আদালতে) উপস্থিতি নিতান্ত আবশ্যক স্থির করায় তাঁহাকে তলব করেন। সে কালের ধর্ম্মভীরু ও সাত্ত্বিক হৃদয় লোকদিগের পক্ষে আদালতে হাজির হওয়া, তাম্র-পাত্রে গঙ্গাজল ও তুলসী পাতা স্পর্শ করিয়া শপথ পূর্ব্বক সাক্ষ্য দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য নিতান্ত গর্হিত ও তামসিক বলিয়া গণ্য ছিল। বাবু দুর্গাচরণ এজন্য দোগাছি গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বেহার প্রদেশান্তর্বর্ত্তী ভাগলপুরে পলাইয়া আইসেন। এই নগরে উপনীত হইয়া স্বদেশ প্রত্যাগমনের তিনি আশা রাখেন নাই সুতরাং এই স্থানেই বসৎবাটী নির্ম্মাণ করেন। এই

ধার্ম্মিক দুর্গাচরণের সুযোগ্য ও ক্ষণজন্মা পুত্রের নাম শিবচন্দ্র। ভাগলপুরের মুন্সীগঞ্জ মহল্লার বাঙ্গালীটোলা পল্লীতে ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে শিবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। ষোড়শবর্ষ বয়সে পাটনা কলেজে ইনি প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গৌরবের সহিত পদক, পুরস্কার ও বিশিষ্ট বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এফ, এ, পরীক্ষা এবং ১৮৬৮ অব্দে বি, এ, পরীক্ষায় শিবচন্দ্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ১৮৬৯ অব্দে বি, এল, পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর সাহেবের সুবর্ণ পদক পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। ভাগলপুরে অনেক বর্ষ কাল ব্যাপিয়া প্রভূত যোগ্যতা ও প্রশংসা এবং প্রখ্যাতি সহ ওকালতী ব্যবসা দ্বারা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। এক্ষণে বয়োধিক্য বশতঃ ওকালতী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। প্রায় ত্রিংশ বর্ষ কাল পর্য্যন্ত ইনি ভাগলপুরের মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ও ভাইশচেয়ারম্যান ছিলেন। বেহার প্রদেশের নানাবিধ শুভানুষ্ঠানে শিবচন্দ্র যেমন পরিশ্রম করিয়াছেন, তেমনি প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়া বিশেষ যশস্বী ও প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। বঙ্গদেশেরও বহুবিধ শুভানুষ্ঠানে তিনি উদারতা ও বদান্যতা দেখাইয়া বাঙ্গালী সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। ভাগলপুরের অধিবাসীরা ইহাঁরই যত্ন, পরিশ্রম, উৎসাহ, বদান্যতা ও দেশহিতৈষীতাগুণে কলের জল ব্যবহার করিয়া সহস্র সহস্র কণ্ঠে ইহাঁর যশোগান করিতেছেন। ভাগলপুর নগরের পানীয় জলের কলের জন্য শিবচন্দ্র এক লক্ষাধিক রৌপ্য মুদ্রা দান করিয়াছেন। ১৮৯৮ অব্দের ২০ জুলাই দিবসে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়কে "রাজা" উপাধি দান করেন। রাজা শিবচন্দ্রের আরও অগণ্য সৎকীর্ত্তি এবং অসংখ্য দানের কথা লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে, কিন্তু কেবল প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি জন্য মাসিক পত্রিকায় স্থানাভাব বশতঃ সংক্ষিপ্ত ভাবেই গুণভূষণ রাজার সামান্য বিবরণ লিখিয়াই বিরত হইতে হইল। রাজা শিবচন্দ্র তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী রাণী শিবতারিণীর নামে দাতব্য চিকিৎসালয়, মাতা ঠাকুরাণী মোক্ষদা সুন্দরীর নামে বালিকা বিদ্যালয়, পিতা দুর্গাচরণের নামে স্কুল, ছোটলাট সার রিভার্শটম্‌সনের নামে টাউন হল প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়া অমর কীর্ত্তি রাখিয়াছেন। মহানুভব রাজা মহাশয়ের পুত্রের নাম কুমার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজা শিবচন্দ্রের

পিতা বিশেষ ধনবান লোক ছিলেন না। ভাগলপুরে যাহা কিছু শিবচন্দ্রীয় কীর্ত্তি নামে পরিচিত, তাহা রাজা শিবচন্দ্রের নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি, পরিশ্রম, যত্ন, প্রতিভা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমার্জ্জিত ধনের পরিচায়ক।

উড়িষ্যার রাজা বৈকুণ্ঠনাথের বিবরণ প্রস্তাবান্তরে লিখিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক

"বাঙ্গালা ভাষা পূর্ব্বে শিক্ষিতগণের দৃষ্টির বাহিরে অঙ্কুরিত হইয়া বিকাশ পাইতেছিল, তখন শক্তিশালী কবিগণ নয়নজল ও প্রাণের উষ্ণত্ব দিয়া ইহাকে পুষ্ট করিতেছিলেন; কিন্তু শিক্ষিতগণের হাতে পড়িয়া শব্দাড়ম্বরের প্রতি রুচিপ্রবলতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রেমের প্রভাব তিরোহিত হইল; সংস্কৃত পুঁথির অলঙ্কার ও উপমারাশি দ্বারা ভাষাসুন্দরী সজ্জিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাদের গুরুভারে ভাব নিপীড়িত এবং নির্জ্জীব হইয়া পড়িল। কাশীদাস এই দুই যুগের মধ্যবর্ত্তী; তাঁহার কাব্যে পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের উদ্দীপনা আছে এবং নবযুগের লিপি প্রণালী এবং মার্জ্জিত ভাষাও দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত বিষয়ে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ অপেক্ষা বিশেষ নিপুণ এবং ভাবীযুগের অধিকতর নিকটবর্ত্তী কাশীরাম দাসের বর্ণনাগুলি সুন্দর ও স্বাভাবিক * * * মহাভারতের আদ্যন্ত এইরূপ সুন্দর ও জীবন্ত এক একখানি পত্র এক একটি চমৎকার চিত্রপটের ন্যায়; পড়িতে পড়িতে জগৎ পূজ্য, যুদ্ধবীর, ধর্ম্মবীর ও প্রেমিকগণের মূর্ত্তি মানস চক্ষের সমক্ষে উদ্ঘাটিত হয়; তাহাদের সরল বিবেক, দৃঢ় কামনা, ও চরিত্রের সাহস, কবির সতেজ লেখনীর গুণে ক্ষণকালের জন্য যেন আমাদের নিজস্ব হইয়া পড়ে এবং এই নিঃসম্বল, অর্দ্ধভুক্ত, পররোষ-কটাক্ষে পাণ্ডুরতাপন্ন বাঙ্গালী জাতিও ক্ষণকালের জন্য পৃথিবী-জয়ী, উচ্চ আকাঙ্ক্ষাশালী, অভিমান-স্ফীত পূর্ব্ব পুরুষগণের কাহিনী পড়িয়া স্বীয় ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া গর্ব্ব অনুভব করে।"

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৩০৪-৫ পৃঃ)

কাশীরাম দাস, বঙ্গের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেরই নিকট সুপরিচিত।

তাঁহার রচিত মহাভারত বঙ্গদেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত অধিকাংশ নর নারী কর্ত্তৃক ধর্ম্মগ্রন্থরূপে ভক্তি সহকারে দৈনিক পঠিত হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, কাশীরাম দাস সুশিক্ষিত ছিলেন না—তিনি সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন না; তাঁহার রচনা শক্তি ছিল বলিয়া তিনি মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। এ কথা আদৌ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কাশীরাম দাস স্বীয় মহাভারত মধ্যে যথাযথ অলঙ্কার ও রসাদির সমাবেশ পূর্ব্বক যেরূপ মাধুর্য্যের সহিত সরল ভাষায় বিষয় সমূহের বর্ণন করিয়াছেন, তাহা অল্প শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। যে মহাভারত পাঠ করিয়া বঙ্গভাষায় অধিকার লাভ করিবার নিমিত্ত কত শত ব্যক্তি লালায়িত, সেই মহাভারত-রচয়িতাকে অশিক্ষিত বলিয়া জন সাধারণে প্রচার করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। কাশীরাম দাস মূল সংস্কৃত মহাভারতের অবিকল অনুবাদ করেন নাই; আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক ভাবানুবাদ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু মধ্যে মধ্যে মূল সংস্কৃতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যেরূপ ভাবে যথাযথ আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা সংস্কৃতানভিজ্ঞের পক্ষে একবারে অসম্ভব। কাশীরাম দাস যে কেবল মাত্র কথক ও পুরাণ পাঠকারিগণের মুখে যথেচ্ছা বিচ্ছিন্ন ভাবে মহাভারতান্তর্গত উপাখ্যানমালা শ্রবণ করিয়া ধারাবাহিকরূপে পর্ব্বানুক্রমিক এই বিরাট মহাভারত গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন, এই পুস্তকখানি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে এ কথা কেহই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন না। মূল সংস্কৃত মহাভারতের সহিত কাশীরাম দাসের মহাভারতের পর্ব্ব বিভাগের কি প্রকার মিল আছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

মূল সংস্কৃত মহাভারত	কাশীরাম দাসের মহাভারত
১ আদি, ২ সভা, ৩ বন, ৪ বিরাট	১ আদি, ২ সভা, ৩ বন, ৪ বিরাট
৫ উদ্যোগ, ৬ ভীষ্ম, ৭ দ্রোণ, ৮ কর্ণ	৫ উদ্যোগ, ৬ ভীষ্ম, ৭ দ্রোণ, ৮ কর্ণ
৯ শল্য	৯ শল্য, ১০ গদা।
১০ সৌপ্তিক পর্ব্ব	১১ সৌপ্তিক, ১২ ঐষিক (এই পর্ব্ব মূল সংস্কৃতে সৌপ্তিকের অন্তর্গত)
১১ স্ত্রী	১৩ স্ত্রী বা নারী
১২ শান্তি, ১৩ অনুশাসন	১৪ শান্তি
১৪ অশ্বমেধ	১৫ অশ্বমেধ

১৫ আশ্রমবাসিক	১৬ আশ্রমবাসিক
১৬ মৌষল ও ১৭ মহাপ্রস্থানের প্রথমাংশ	১৭ মৌষল
১৭ মহাপ্রস্থানের উত্তরাংশ ও ১৮ স্বর্গারোহণ	১৮ স্বর্গারোহণ

বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' নামক পুস্তকে কাশীরাম দাস রচিত 'যানপর্ব্ব', 'দাসপর্ব্ব', 'পাশাপর্ব্ব' ও 'কুসুম পর্ব্ব' এই কয়েকটি পর্ব্বের উল্লেখ আছে। আমরা 'দান পর্ব্ব' ও 'দণ্ডীপর্ব্ব' নামক পুঁথি প্রাপ্ত হইয়াছি। সম্ভবতঃ এই গুলি বৃহৎ পর্ব্বান্তর্গত পর্ব্বাধ্যায় মাত্র।

একটা প্রবাদ আছে—"আদি, সভা, বন, বিরাটের কতদুর। ইহা লিখি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর॥" অর্থাৎ কাশীরামদাস বিরাট পর্ব্বের কিয়দংশ মাত্র রচনা করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন। একথা আমরা আপাততঃ যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। "চন্দ্র পক্ষ বান ঋতু শক সুনিশ্চয়। বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়॥" ইহা হইতে কাশীরাম দাস যে ১০১১ সালে সমগ্র বিরাটপর্ব্ব রচনা সমাধা করিয়াছিলেন,তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। এতদ্ব্যতীত গদাধর দাস স্বরচিত "জগন্নাথ মঙ্গল" গ্রন্থ ১০৫৫ সালে সমাপন কালে জ্যেষ্ঠ দুই সহোদর কৃষ্ণদাস ও কাশীরামদাসের যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের নামের পূর্ব্বে "শ্রী" সংযুক্ত রহিয়াছে। তাঁহারা পরলোক গমন করিলে নামের পূর্ব্বে কখনও 'শ্রী' ব্যবহৃত হইত না। "দ্বিতীয় শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবানে। রচিল পাঁচালী ছন্দে ভারত পুরাণে॥" সুতরাং কাশীরাম দাস সমগ্র মহাভারত রচনা করিয়া ১০৫৫ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, একথা অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হইতেছে না।

জয় গোপাল তর্কালঙ্কার অন্যান্য-গ্রন্থের ন্যায় কাশীরাম দাসের মহাভারত গ্রন্থকে মনোমত পরিবর্ত্তন ও শব্দ যোজনা করিয়া তাহার এক নূতন অবয়ব প্রদান করিয়াছেন। প্রচলিত বটতলার মহাভারত এই জয়গোপালের পরিবর্ত্তিত মহাভারত। কাশীরামের খাঁটী মহাভারত উদ্ধারের চেষ্টা জাগিয়া উঠিয়াছে, অচিরে আমরা তাহা দেখিতে পাইব এইরূপ ভরসা আছে।

অন্যান্য গ্রন্থ কাশীরাম দাসের অপর গ্রন্থ "স্বপ্নপর্ব্ব" 'জলপর্ব্ব" এবং 'নলোপাখ্যান" তাঁহার প্রথমাবস্থার রচনা বলিয়া অনুমিত হয়।

কাশীরাম দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদাস, 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ এবং কনিষ্ঠ গদাধর দাস 'জগৎ মঙ্গল' নামক কাব্য রচনা করিয়াছেন। কাশীরামের পুত্র নন্দরাম দাস ও কবিত্বশক্তি সম্পন্ন ছিলেন, তিনি মহাভারতান্তর্গত দ্রোণ পর্ব্বের পদ্যানুবাদ করেন।

(কৃষ্ণদাস, গদাধর দাস, ও নন্দরাম দাস দেখুন)

(পরিষৎপত্রিকা ৬।৭। ৮; বীরভূমি ৪; ভারতী ২৬; জন্মভূমি ৪; বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য; বঙ্গভাষার লেখক)

কাসেম, মহম্মদ—

'সুলতান জমৃজমার পুঁথি' রচয়িতা। এই পুস্তকে মানবের মৃত্যুকালীন ও তৎপরবর্ত্তী কালের কথা বর্ণিত আছে।

(পপ ১০। অতি ১৮৪)

কিরণ দাস—

যাত্রার 'পালা' রচয়িতা।

(প্রবাসী ১।১৭০)

কিশোরী দাস—

"শ্লোকার্থ সিন্দুর বিন্দু প্রকাশ" নামক ক্ষুদ্র পুস্তক রচয়িতা।

এই গ্রন্থখানি ১৭০২ শক বা ১১৮৭ সালে রচিত হয়।

কীর্ত্তিনারায়ণ, লালা—

'সত্যনারায়ণ ব্রতকথা' রচয়িতা।

("আনন্দময়ী দেবী"র বংশ তালিকা ও বংশ পরিচয় দেখুন ১৪ পৃঃ)

কীথ্—

'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' রচয়িতা—

১৮২০ খ্রীঃ এই ব্যাকরণ প্রথম মুদ্রিত হয়। ১৮৫৫খ্রীঃ পর্য্যন্ত এই ব্যাকরণ পনর হাজার খণ্ড বিক্রয় হয়।

(পঃ পঃ ১।১৮৩)

কুমারনাথ মুখোপাধ্যায়—

"শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পদ্য বঙ্গানুবাদক", 'যোগের বৈজ্ঞানিক আভাষ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

ইনি বর্দ্ধমান সরকারী ডাক্তার খানায় কর্ম্ম করিতেন।

কুসুমকুমারী রায়—

'মর্ম্মোচ্ছ্বাস' নামক কবিতা পুস্তক রচয়িত্রী।

(হিন্দুবঞ্জিকা, মাঘ ১৩১১)

কেতকা দাস—

"মনসার ভাসান বা গীতি" রচয়িতা।

কেতকা দাস ও ক্ষেমানন্দ একত্র এই মনসার গীতি রচনা করেন। এই পুস্তকের ৬০টী প্রস্তাবের মধ্যে ২৬টী কেতকা দাস এবং বক্রী ক্ষেমানন্দ রচনা করিয়াছেন।

("ক্ষেমানন্দ" দেখুন)

"যদিও পুস্তকের সর্ব্বত্রই এই দুই কবির ভণিতাযুক্ত পদ পাওয়া যায়, তথাপি মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, পুস্তকের প্রথমার্দ্ধের অর্থাৎ লখীন্দরের বিবাহ পালা পর্য্যন্ত অধিকাংশ স্থল কেতকাদাসের রচনা ও শেষার্দ্ধের অধিকাংশ স্থল ক্ষেমানন্দ বিরচিত। ক্ষেমানন্দ করুন রসে ও কেতকা দাস হাস্যরসে পটু। * * * কবিত্ব দেখাইয়া পাঠকবর্গকে সন্তুষ্ট করা যায়, এরূপ অংশ মনসার ভাসানে বড় বিরল; কিন্তু গল্পের আগাগোড়া পড়িলে পাঠকের চক্ষু মধ্যে মধ্যে অশ্রুপূর্ণ হইতে পারে। * * * পূর্ব্ববর্ত্তী মনসার উপাখ্যানগুলির সঙ্গে তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে, কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দের পুঁথিতে চাঁদসাগরের উন্নত চরিত্র কতকটা খর্ব্ব হইয়াছে, কিন্তু বেহুলার চরিত্র আরও বিকাশ পাইয়াছে।" * * "মানবী বেহুলাকে দেবী বলিয়া বোধ হয়।"

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ৪৪০—৪৪১পৃঃ)

বেহুলা সতী লখীন্দরকে লইয়া যে সকল স্থান দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিলেন, তাহার মধ্যে অধিকাংশ স্থলই বর্দ্ধমান বা তৎসামানা মধ্যে অবস্থিত। গ্রন্থ মধ্যে যে সকল প্রাদেশিক শব্দ দৃষ্ট হয়, তাহা বর্দ্ধমান অঞ্চলেই প্রচলিত। এতদ্ব্যতীত বেহুলা লখীন্দরের বিবাহ উপলক্ষে যে সকল স্ত্রী আচার বা প্রক্রিয়া পদ্ধতির উল্লেখ আছে, তাহা বর্দ্ধমান বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী হুগলীজেলায় প্রচলিত। এই সকল কারণ বশতঃ কবিযুগলকে বর্দ্ধমান জেলার অধিবাসী বলিয়া অনুমিত হয়।

কেতকা দাস ও ক্ষেমানন্দ সম্ভবতঃ কায়স্থ ছিলেন।

"মনসার মহিমা কল্পনা, লখীন্দরের পুনরুজ্জীবন কল্পনা, বাস্তবিকই বাঁকা নদীর (বর্দ্ধমান সীমানা মধ্যে প্রবাহিত) ন্যায় পল্লী প্রান্তর বাহিনী, কিন্তু তাহা হইলেও স্থলবিশেষে সলিল প্রাচুর্য্যে একান্ত সুখ শীতলা"।

(মনসার ভাসানের গল্পাংশ, পরিশিষ্টে দেখুন।)

কেবলকৃষ্ণ বসু—

"কাশীখণ্ড" ও "সত্যনারায়ণ পাঁচালী" রচয়িতা।

কেবলকৃষ্ণ, ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত আটীয়া পরগণা মধ্যে কেদারপুর গ্রামে কায়স্থকুলে বঙ্গীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (অনুমান ১১৫২ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বংশ তালিকা—২১ দশরথ বসু (কান্যকুব্জ হইতে সমাগত)...৮ বিশ্বম্ভর বসু, ৭ প্রভাকর, ৬ রামানন্দ, ৫ রতিনাথ, ৪ লক্ষ্মীকান্ত, ৩ রামবল্লভ, ২ বিজয় রাম, ১ কেবলকৃষ্ণ বসু।

মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত থলসী গ্রামের জমীদার শ্রীবৎস রায়, রামানন্দ বসু মহাশয়কে চন্দ্রদ্বীপ হইতে আনয়ন করিয়া বিষ্ণুপুরে স্থাপিত করেন। কেবলকৃষ্ণের পিতা, বিজয়রাম বসু মহাশয় কেদারপুরে বাস করেন।

শিক্ষা—কেবলকৃষ্ণ, তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত রামনিধি বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি ও ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কেবলকৃষ্ণ, অসাধারণ মেধাশক্তি বলে অচিরেই অধীত বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। বৃদ্ধ রামনিধি বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট যে সকল লোক ব্যবস্থাদি গ্রহণের নিমিত্ত আগমন করিত, তিনি তাহাদিগকে প্রিয়শিষ্য কেবলকৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়া দিতেন, কেবলকৃষ্ণ এই নিমিত্ত যাহাকিছু প্রাপ্ত হইতেন, তৎসমুদয় স্বীয় গুরুদেবকে সমর্পণ করিতেন। কেবলকৃষ্ণ এইরূপে দেশ মধ্যে 'শূদ্র পণ্ডিত' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কেবলকৃষ্ণের শাস্ত্রজ্ঞান এত গভীর ছিল যে, তাঁহার প্রদত্ত ব্যবস্থাদির বিরুদ্ধে কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও কিছু বলিতে সাহসী হইতেন না। কেবলকৃষ্ণ শৈব ছিলেন। শিবমাহাত্ম্য প্রচার উদ্দেশে বৃদ্ধবয়সে

কাশীখণ্ড

অনুমান ৭০ বৎসর বয়সে, ১৭৩৭ শক বা ১২২২ সালে স্কন্দ পুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ড, পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি ছন্দে অনুবাদিত করেন। ১৭৩৭ শকের চৈত্রমাসে (বৃহস্পতিবার, দিবা বারদণ্ডের

সময়) কাশীখণ্ডের রচনা সমাপ্ত হয়। কাশীখণ্ড রচনার জন্য, কেবলকৃষ্ণ বর্ত্তমান ঢাকা (পূর্ব্বে রাজসাহী) জেলার অন্তর্গত রৌহা গ্রাম নিবাসী প্রসিদ্ধ পুরাণজ্ঞ পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাশীখণ্ডে, প্রচলিত পাঁচালী ছন্দ ব্যবহৃত না হইয়া বর্ত্তমান কালের পাঠোপযোগী সরল পদ্যে বিবিধ ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে ছন্দদোষ অতি বিরল, অধিকন্তু বিবিধ রসালঙ্কার সমাবেশগুণে কেবলকৃষ্ণের রচনা অতি সুন্দর হইয়াছে। অনুবাদ সর্ব্বত্রই মূলানুযায়ী, কবি, গুরু, গণেশ, নারায়ণ, মহাদেব, ব্রহ্মা, ভগবতী, লক্ষ্মী, স্বরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর বন্দনা করিয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতের খর্ব্ব হইবার উপাখ্যান হইতে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। পুস্তক খানির আকার (পুঁথির আকারে) ২৫২ পত্র।

কেবলকৃষ্ণের ভাগ্যে পুত্র বা কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। কেবলকৃষ্ণের বাটীতে এখন তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বাস করিতেছেন।

(পরিষৎ পত্রিকা, ৬।২৩৪-৩৯ পৃঃ)

কেরী—

পাদরী কেরী সাহেব ১৮০১ খ্রীঃ বাঙ্গালা ব্যাকরণ এবং ১৮১৫ খ্রীঃ হইতে ১৮২৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে বড় বড় তিন খণ্ডে ইংরাজী অভিধান প্রকাশিত করেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থে ৮০০০০ শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছিল—ইহা সঙ্কলয়িতার ত্রিশ বৎসর ব্যাপী পরিশ্রমের ফল। এই গ্রন্থের মূল্য ১২০্ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

১৮১৯ খ্রীঃ ৪১২ পৃষ্ঠায় গোল্ডস্মীথ-বিরচিত ইংলণ্ডের ইতিহাসের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই ইতিহাসে ১৮০২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত (আমিয়েন্সের সন্ধি পর্য্যন্ত) ঘটনাবলী বিবৃত আছে। গ্রন্থ শেষে পারিভাষিক এবং দুরূহ শব্দের একটী তালিকা প্রদত্ত হইয়াছিল।

ডাক্তার কেরী শ্রীরামপুরের একজন দেশ বিখ্যাত পাদ্‌রী ছিলেন।

(পঃ পঃ ১।১৮২ ; ২।২০)

কেদারনাথ রায়—

বিবিধ বিষয়ক সংগীত রচয়িতা।

জন্ম—কেদারনাথ রায়, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রাণীগঞ্জ সবডিবিজনের

অধীন অণ্ডাল নামক গ্রামে, ৺ রামচন্দ্র রায়ের ঔরসে দয়াময়ী দেবীর গর্ভে ব্রাহ্মণ কুলে ১২৫৭ সালে জন্ম গ্রহণ করেন।

মৃত্যু—১৩০৮ সালে ৫১ বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করেন।

কেদারনাথের পিতা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন, কেবল মাত্র কৃষি কার্য্যের আয়ের দ্বারাই তাঁহার সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। কেদারনাথ বাল্য-কালে রীতিমত লেখা পড়া শিক্ষা করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু তিনি, সহজ কথায় যে সকল সদ্ভাবপূর্ণ গীতাবলী রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্বভাবদত্ত ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কেদারনাথ প্রায় তিন চারি শত পরমার্থ-বিষয়ক সঙ্গীত ব্যতীত, কবির দল, বাউল ও দরবেশী সম্প্রদায় প্রভৃতির জন্য বহু সংখ্যক পদ রচনা করিয়া-ছিলেন। তিনি রহস্য-রচনায়ও সুপটু ছিলেন।

কেদারনাথ শক্তি মন্ত্রোপাসক হইলেও, অপর সাম্প্রদায়িক মতের প্রতি বীতস্পৃহ ছিলেন না। স্বরচিত গীতগুলি তাল লয় সংযোগে গান করাই তাঁহার ভজন সাধনের প্রধান অঙ্গ ছিল; ভগবদ্বিষয়ক গান করিতে করিতে তিনি তন্ময় হইয়া পড়িতেন। ইনি বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি যৎসামান্য আয়ে চিরকাল অঋণী রহিয়াও সমন্দির বিষ্ণু স্থাপন, কূপ ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা এবং নিত্য অন্নদান প্রভৃতি সদনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন।

কেদারনাথের "চল মন আনন্দ কানন কাশী" শীর্ষক গানটি অনেকেই অবগত আছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে কবির চক্ষে জল দেখিয়া কেহ কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে পুত্র দক্ষিণারঞ্জনকে উল্লে[খ] করিয়া এইরূপ গাহিলেন।

মা আমার আনন্দময়ী, আমি নিরাপদে যাব কেনে।
তাঁর আনন্দ সাগরের জলে ডুবেছি শীতল জেনে॥
শ্যামারূপ (আহা মরি, শ্যামা জলদ বরণীরূপে) চক্ষু ভরা,
তাইতে এত বহে ধারা, চিন্‌তে নারি এ সব কারা
এখন মিশেছে তারা তারার সনে॥
ভব বন্ধন সকল বৃথা, যে থাক্‌বার সে থাকলো হেথা,
চল্লো কেদার মা তারা যেথা, সার কথা শুনরে দক্ষিণে॥

(কবির স্বগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কাঙ্গালচন্দ্র নন্দী কর্ত্তৃক সাহিত্য সেবকের নিমিত্ত বিশেষ ভাবে সংগৃহীত বিবরণী)

কেশবচন্দ্র সেন—

'বিধান-ভারত', 'নবসংহিতা' (অসমাপ্ত) ও 'জীবনবেদ' রচয়িতা এবং 'ধর্ম্মতত্ত্ব' (মাসিক পত্রিকা) ও 'সুলভ সমাচার'(সাপ্তাহিক পত্রিকা) প্রকাশক। এতদ্ব্যতীত ইনি ধর্ম্মবিষয়ক ইংরাজী ও বঙ্গভাষায় অসংখ্য বক্তৃতা প্রদান ও প্রবন্ধমালা রচনা করিয়াছিলেন।

জন্ম—১৮৩৮ খ্রীঃ ১৯শে নভেম্বর কলিকাতার বাটীতে সুবিখ্যাত বৈদ্য-বংশে জন্ম গ্রহণ করেন।

মৃত্যু—১৮৮৪ খ্রীঃ ৮ই জানুয়ারী মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯-৫৩ মিনিটের সময় কলিকাতায় মানবলীলা সম্বরণ করেন।

বংশ পরিচয়—হুগলী জেলার অন্তর্গত, গঙ্গাতীরবর্ত্তী গৌরীভা নামক গ্রামে ইঁহাদিগের পূর্ব্ব নিবাস ছিল। কেশবচন্দ্রের প্রপিতামহ হুগলীতে পঞ্চাশ টাকা মাত্র বেতনে সেরেস্তাদারী কার্য্য করিতেন। পিতামহ রাম-কমল সেন ১৮০১ খৃঃ শিক্ষা লাভের নিমিত্ত কলিকাতা আগমন করেন এবং ১৮০৪ খৃঃ ডাক্তার হাণ্টার প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থানী মুদ্রা-যন্ত্রালয়ের কার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮১১ খ্রীঃ ঐ প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তদনন্তর ১৮১৮-১৯ খৃঃ এসিয়াটিক্ সোসাইটির কেরাণীগিরি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য কুশলতাগুণে রামকমল,উক্ত সোসায়িটীর দেশীয় সম্পাদক ও কমিটির সদস্য নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে তিনি টাকশালের দেওয়ান ও বেঙ্গলবেঙ্কের কোষাধ্যক্ষের পদ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনি সর্ব্ববিধ দেশহিতকর কার্য্যে যোগদান করিতেন। রামকমল একখানি উচ্চ অঙ্গের সুবৃহৎ ইংরাজী বাঙ্গালা অভিধান সম্পাদন করিয়াছিলেন; ইহাই তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। কেশবচন্দ্র, যখন পাঁচ ছয় বৎসরের শিশু, রামকমল তখন (১৮৪৪ খ্রীঃ) লোকান্তর গমন করেন। কেশবচন্দ্রের জনক (রামকমলের দ্বিতীয় পুত্র প্যারীমোহন সেন) পরম ধার্ম্মিক নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন এবং সাত্ত্বিকভাবে হিন্দু ধর্ম্মোচিত যাবতীয় ক্রিয়া কলাপ সুসম্পন্ন করিতেন। জননী দেবীও অতিশয় স্বধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। এবম্বিধ জনক জননীর ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া কেশবচন্দ্র, বাল্যকাল অবধিই ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

শৈশব, শিক্ষা—একাদশ বর্ষ বয়সে কেশবচন্দ্র পিতৃহীন হইয়া জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন মহাশয়ের তত্ত্বাবধারণে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান এলবার্ট কলেজ এখন যথায় স্থাপিত রহিয়াছে, পূর্ব্বে সেই স্থানে একটি

পাঠশালা ছিল—কেশবচন্দ্র, শৈশবে এই পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। সাত বৎসর বয়সের সময় (১৮৪৫ খ্রীঃ) হিন্দুস্কুলে ভর্ত্তি হইয়া সেকেণ্ড সিনিয়র শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিলে পর জ্যেষ্ঠতাত হরিমোহন সেন মহাশয়ের আদেশানুযায়ী তিনি খ্যাতনামা রাজেন্দ্রনাথ দত্ত (রাজাবাবু) মহাশয় কর্তৃক নব প্রতিষ্ঠিত (১৮৫৩ খ্রীঃ) মেট্রপলিটন কলেজে প্রবিষ্ট হন। পর বৎসর মেট্রপলিটন কলেজ উঠিয়া গেলে, কেশবচন্দ্র পুনরায় হিন্দু কলেজেই অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। কেশবচন্দ্র পূর্ব্বাবধি গণিতশাস্ত্রের প্রতি তাদৃশ অনুরক্ত ছিলেন না, বিশেষতঃ এইরূপ পরিবর্ত্তনে, তিনি অঙ্ক বিভাগে পশ্চাতে পড়িয়া গেলেন। জনরব এইরূপ যে, তিনি একবার স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষায় অবৈধ উপায়ে প্রশ্নের উত্তরগুলি লিখিতে থাকায় কর্ত্তৃপক্ষ পরীক্ষার স্থান ও কলেজ হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। আত্মমর্য্যাদা-সম্পন্ন কেশবচন্দ্র ইহাতে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভবিষ্যজ্জীবনের উন্নতির পন্থানুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার পর তিনি কলেজে পুনঃ প্রতিষ্ঠ হইলেন এবং গণিতশাস্ত্র ব্যতীত সাহিত্য, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, কাব্য ও দর্শনাদি অতিশয় মনোযোগ সহকারে দুই বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলেন।

বিবাহ

কেশবচন্দ্র, ১৮৫৬ খ্রীঃ ২৭শে এপ্রেল তারিখে বালীগ্রাম-নিবাসী কুলীন বৈদ্য বংশোদ্ভব চন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা গোলাপ সুন্দরীর সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

এই সময় কেশবচন্দ্র আপনাদের কলুটোলার বাটীতে বালকদিগে বিদ্যাশিক্ষা নিমিত্ত একটি নৈশ বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া স্বয়ং তাহাদের অধ্যাপনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। আমেরিকান মিশনরি ড্যাল সাহেব ও স্বনামধন্য পাদরী লং সাহেবের সহযোগে তিনি এই সময়ে British Indian Society নামক একটি সভা স্থাপন করিয়াছিলেন উল্লিখিত নৈশবিদ্যালয়টি এই সভার অন্তর্ভূত ছিল।

কেশবচন্দ্র, বন্ধুবান্ধবের সহিত আমোদ আহ্লাদে সময় ক্ষেপণ না করিয়া নির্জ্জনে ধর্ম্মচিন্তা বা ধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠে অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। তিনি পাদরী বারন্ সাহেবের নিকট বাইবেল গ্রন্থ পাঠ করেন। ১৮৫৭ খ্রীঃ নিজ বাটীতে Good Will Fraternity নামক আর একটি সভা স্থাপন করিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্ম

অনুশীলন ও পূর্ব্বভাব

ভাব স্ফুটতর ভাবে বিকশিত হইতে লাগিল। তিনি ঐ সভায় স্বরচিত ধর্ম্ম বিষয়ক প্রবন্ধাবলী পাঠ অথবা তদ্বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করিতেন; আবার কখনও বা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম যাজকদিগের গ্রন্থ বিশেষ হইতে সন্দর্ভনিচয় সভা মধ্যে পাঠ করিতেন। এই সভায় কেশবচন্দ্র বাগ্মীতার অনুশীলন করিবার যথেষ্ট অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কেশবচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন। এই সভা উপলক্ষে তিনি মহর্ষির সহিত পরিচিত হন—বলিতে কি, সত্যেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মহর্ষি একবার এই সভার সভাপতির কার্য্যও করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র এইরূপে নানা ধর্ম্ম গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া সম্পূর্ণরূপ নিরাকার ও একেশ্বরবাদী হইয়া পড়িলেন এবং ১৮৫৭ খ্রীঃ শেষ ভাগে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন। বলা বাহুল্য, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মান্তর গ্রহণের প্রধান উদ্বোধক ও সহায়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ

১৮৫৮ খ্রীঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্ব্বতবাসে ধ্যানবলে ধর্ম্ম-সমস্যার নব নব রহস্য উদ্‌ঘাটিত করতঃ দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। আসিয়া, প্রিয় সুহৃদ প্যারীমোহনের পুত্র অসাধারণ প্রতিভাশালী বালক কেশবচন্দ্রকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে অনুরক্ত ও সমাজ-প্রবিষ্ট দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। এখন দেবেন্দ্রনাথ একজন কর্ম্মবীর প্রাপ্ত হইয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইবার অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ "ব্রহ্মবিদ্যালয়" নামক একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং এবং কেশবচন্দ্র ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় স্কুল ও কলেজের ছাত্র-বৃন্দকে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। ফলে, অনেক প্রতিভাশালী ছাত্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরক্ত হইতে লাগিল। এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে, কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের সহিত সিংহল পরিভ্রমণ করিয়া কয়েক মাস পর দেশে প্রত্যাগমন করেন। কেশবচন্দ্র দেশে আসিলে তাঁহার অভিভাবকগণ তাঁহাকে অনেক পীড়াপীড়ীর পর মাত্র ত্রিশ টাকা বেতনে বেঙ্গল বেঙ্কে চাকুরীতে নিযুক্ত করিয়া দেন। ইহার অব্যবহিত পরই "Young Bengal, this is for you" প্রভৃতি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ১৮৬০ খ্রীঃ ধর্ম্মালোচনার জন্য নিজ বাটীতে "সঙ্গত-সভা" নামক এক সভা স্থাপন করিয়া তাহাতে সমবেত ব্রাহ্মযুবকগণসহ সপ্তাহান্তে নিজ নিজ ধর্ম্ম জীবন ও উন্নতির

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র

উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ইহাঁদিগের মধ্যে ধর্ম্মভাবের বীজ দ্রুত অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইতে লাগিল। স্বাস্থ্যোন্নতি-কল্পে এই বৎসর তিনি কৃষ্ণনগরে গিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসেন। তদনন্তর Indian Mirror নামক পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন; এতদ্ব্যতীত "কলিকাতা কলেজ" নামক একটি স্কুলও স্থাপনা করা হইল। ১৮৬১ খ্রীঃ কেশবচন্দ্র বিষয় কর্ম্ম ও চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া (১লা জুলাই) একাগ্র মনে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইলেন। এই সময় হইতে ব্রাহ্মমতে বিবাহ, শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থাও অনুসৃত হইতে লাগিল। কেশবের "সঙ্গত-সভার" উৎসাহী ব্রাহ্মণ সভ্যগণ উপবীত ত্যাগ ও সর্ব্বপ্রকারে পৌত্তলিকতার সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন—আত্মীয়-স্বজনের বিরাগভাজন বা তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার আশঙ্কা পর্য্যন্ত তাঁহারা মনে স্থান দিলেন না। এইরূপে কেশবচন্দ্র নব্য-বঙ্গের নেতা হইয়া দাঁড়াইলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্রকে ১৮৬২ খ্রীঃ ১৩ই এপ্রেল (১লা বৈশাখ) "ব্রহ্মানন্দ" উপাধিতে ভূষিত করিয়া কলিকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পদে বরণ করিলেন। ঐ দিন তিনি আপন সহধর্ম্মিণীসহ ঠাকুর বাড়ীতে গমন করেন। বলা বাহুল্য ইহাতে তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলেই অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন; কেশবচন্দ্র এই নিমিত্ত কিছুকাল দেবেন্দ্রনাথের বাটীতেই সস্ত্রীক অবস্থান করিলেন। তদনন্তর তিনি আপন প্রাপ্য পৈত্রিক সম্পত্তির উদ্ধার করিয়া কয়েকমাস পর নিজ আলয়ে গমন করেন। এই সময় তাঁহার প্রথম পুত্র করুণাচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। নূতন ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে এই পুত্রের নামকরণ হইল।

ইহার পর কিছুদিন কেশবচন্দ্র, বিপুল উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত হইলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তিনি কিছুদিন কৃষ্ণনগরে অবস্থান করিয়া তথায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, ফলে তথাকার খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারকগণের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয়। এই নিমিত্ত ১৮৬৩ খ্রীঃ রেভারেণ্ড লালবিহারী দে সম্পাদিত কোন পত্রিকায় ব্রাহ্মদিগের প্রতি অনেক উপহাস, বিদ্রূপ ও কটূক্তি প্রকাশিত হয়। কেশবচন্দ্র এতদুপলক্ষে "ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ সমর্থন" বিষয়াবলম্বনে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। সুপ্রসিদ্ধ পাদরী ডফ্ সাহেব পর্য্যন্ত বক্তার অসাধারণ বাগ্মিতা ও প্রতিভাদর্শনে মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এই বৎসরই কেশবচন্দ্র

অন্তঃপুর মধ্যে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার মানসে "ব্রাহ্মবন্ধু সভা' নামক এক সভা স্থাপন করেন।

১৮৬৪ খ্রীঃ কেশবচন্দ্র, একজন বন্ধু সমভিব্যাহারে, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার নিমিত্ত, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ বিভাগে গমন করেন। এই বৎসর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আন্তরিক অনিচ্ছাসত্বেও, কেশবচন্দ্রের প্ররোচনায় উপবীত-ধারী উপাচার্য্যগণকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া দুইজন উপবীতত্যাগী উপাচার্য্য নিযুক্ত করেন। এদিকে কেশবচন্দ্রের উৎসাহে অসবর্ণ বিবাহও প্রচলন আরব্ধ হইল। এইরূপ সমাজ-বিপ্লব সূচক পন্থাবলম্বনে কি জানি অপ্রস্তুত হইতে হয় এবং কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃত্বভার তাঁহার হস্তচ্যুত হয়, এই আশঙ্কায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার বিভাগকে স্বতন্ত্র করিয়া নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিবার নিমিত্ত "ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভা" নামক একটি সভা সংগঠন করিলেন। এই সময় "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকার পরিচালনভার যুবকদলের হস্তে ন্যস্ত ছিল—পত্রিকার কর্ত্তৃত্বলোপের আশঙ্কায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সৌকার্য্যার্থ "ধর্ম্মতত্ত্ব" নামক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৮৬৪ খ্রীঃ ঝড়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের গৃহ অকর্ম্মণ্য হইলে, কিছুকাল যাবৎ দেবেন্দ্রনাথের বাটীতেই এই সমাজের কার্য্য চলিতে থাকে। কেশব-চন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথের অতিশয় প্রিয় হইলেও, তিনি তাঁহার আমূল সমাজ-বিপ্লবকারী পরিবর্ত্তন প্রথার পক্ষসমর্থন করিতে পারিলেন না। এই নিমিত্ত যে দিন তাঁহার বাটীতে উপাসনা আরম্ভ হয়, সেই দিন উপবীতত্যাগী উপাচার্য্যগণ আগমন করিবার পূর্ব্বেই তিনি উপবীতধারী আচার্য্যগণকে বেদীতে বসাইয়া উপাসনার কার্য্য আরম্ভ করেন। ইহাতে কেশবচন্দ্র প্রভৃতি যুবকদল অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া সে দিন অন্যত্র উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। এইরূপে গৃহ বিচ্ছেদের সূত্রপাত হইল। কেশবচন্দ্র, কলিকাতা সমাজের সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিয়া "প্রতিনিধি সভার" আশ্রয়ে রহিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইলেন। বলা আবশ্যক, এইরূপ বিচ্ছেদসত্বেও দেবেন্দ্রনাথ, এই যুবকদলের প্রকৃত উন্নতিকর কার্য্যে আনন্দের সহিত যোগদান করিতে কখনই বিরত হইতেন না।

গৃহ-বিচ্ছেদ

১৮৬৫ খ্রীঃ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অঘোরনাথ গুপ্তের সহযোগিতায় কেশবচন্দ্র, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান প্রধান

নগরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে বহির্গত হন। তাঁহাদের এই ধর্ম্ম প্রচারে পূর্ব্ববঙ্গে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইল।

কেশবচন্দ্র ইতিপূর্ব্বেই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রতি মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন; এখন হইতে তিনি দ্বিগুণিত উৎসাহে মহিলাগণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার জন্য অধিকতর যত্নপর হইলেন। "ব্রাহ্মবন্ধু সভা" ও ব্রাহ্মিকা সমাজ এই শুভকরী অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইল। ১৮৬৬ খ্রীঃ মাঘোৎসবে সর্ব্বপ্রথম "ব্রাহ্মিকা সমাজের" মহিলাগণ বেদীর নিকট পর্দ্দার আড়ে বসিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। ইহার অব্যবহিত পরই কেশবচন্দ্র মহিলাদিগকে পাদরী রবসনের বাটীতে সান্ধ্যসমিতিতে যোগদানে অনুমতি প্রদান করেন। এ দিকে ঠাকুর পরিবার হইতেও এ বিষয়ে উৎসাহ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। মহিলাগণকে এই প্রকারে অন্তঃপুরের বাহির হইয়া অবাধে প্রকাশ্যভাবে পুরুষগণের ন্যায় বিচরণ করিতে দেখিয়া দেশের লোক একবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল!

১৮৬৬ খ্রীঃ কলিকাতা মেডিকেল কলেজের থিয়েটার গৃহে কেশবচন্দ্র Jesus Christ—Asia and Europe (যীশুখ্রীষ্ট—এসিয়া এবং ইউরোপ) নামক একটি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তার আবেগময় ও আন্তরিকতাপূর্ণ উক্তি শ্রবণে, বিশেষতঃ এই সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতার অংশ বিশেষে যীশুখ্রীষ্টের প্রতি বক্তা যে প্রকার গাঢ় ভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকেই মনে করিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র যথার্থই অচিরে খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিগ্রহ করিবেন। খ্রীষ্টানেরা উল্লাসিত হইল—এদিকে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণও এই নবোদিত ব্রাহ্মদলকে খ্রীষ্টান বলিয়া অপবাদ করিতে ত্রুটি করিলেন না। এই বৎসর, ডিসেম্বর মাসে Great Men ("মহাপুরুষ") নামক একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়া কেশবচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত অপবাদ খণ্ডনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই সকল বক্তৃতা শ্রবণে বড়লাট হইতে সকলেই তাঁহার অসাধারণ শক্তির প্রতি সমধিক শ্রদ্ধান্বিত হন।

অতঃপর এই নবোদিত ব্রাহ্মদলের মফঃস্বলে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইলে এবং তত্রত্য নবগঠিত সমাজ সমূহকে একতাসূত্রে বন্ধন করিবার আবশ্যক হইলে ১১ই নভেম্বর তারিখে উন্নতিশীল নবোদিত ব্রাহ্মদলের মধ্যে "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" নামক একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। এখন হইতে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ "আদি ব্রাহ্মসমাজ" নামে অভিহিত হইতে লাগিল।

"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ"

১৮৬৭ খ্রীঃ হইতে কেশবচন্দ্র নিজভবনে দৈনিক উপাসনা পদ্ধতি এবং খোল করতালসহ সংকীর্ত্তনের প্রথা প্রচলন করেন।

১৮৬৮ খ্রীঃ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নিমিত্ত উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্ত এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া তাহার ভিত্তি স্থাপন করিলেন। পর বৎসর এক মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইংলণ্ড প্রবাস

১৮৭০ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড গমন করেন। এখানে তিনি বিবিধ ধর্ম্ম সম্প্রদায়, বুধমণ্ডলী ও ধনিগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপ সমাদৃত হন। ইংলণ্ড যাইবার সময় কেশবচন্দ্র মাত্র এক মাসের বাসোপযোগী অর্থ সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ইহার পর ছয় সাত মাস কাল অবস্থান করিবার ব্যয় তথাকার ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায় বহন করেন। সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ডাক্তার মার্টিনোর ভজনা-লয়ে কেশবচন্দ্র, "ঈশ্বর প্রাণের প্রাণ" এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন—এই ভজনালয়ে বক্তৃতাকালীন অনেক সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষগণও উপস্থিত ছিলেন। অনন্তর তিনি নানা স্থানে বিবিধ বিষয়াবলম্বনে অনেক গুলি প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সমুদয় বক্তৃতা প্রদান কালে সকলেই তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। "ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য" নামক বক্তৃতায়, ভারতবর্ষীয় নীচশ্রেণীর ইংরাজ-দিগের অত্যাচারের কথা ইংলণ্ডের জনসাধারণের সমক্ষে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের গূঢ়তত্ব আলোচনা করিয়া "খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টধর্ম্ম" নামক একটি বক্তৃতা করিলে সুইডেনবর্গ সভা হইতে তিনি অভিনন্দিত ও পুরস্কৃত হন। ইহার পর তিনি ব্রীষ্টলে আগমন করিয়া মহাত্মা রামমোহন রায়ের সমাধি এবং ষ্ট্রার্টফোর্ডে আসিয়া সেক্সপিয়রের জন্মস্থান দর্শন করেন। এই সময় তিনি কয়েকজন পাদরী কর্ত্তৃক খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে অনুরুদ্ধ হন। অপরাপর কয়েকস্থান ভ্রমণের পর লিভারপুলে গিয়া অসুস্থ হইলেন; এই নিমিত্ত তথায় দুই সপ্তাহকাল বিশ্রামের পর লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার পর তিনি গ্লাসগো ও এডিনবারা গমন করেন। এই সময় তিনি সুবিখ্যাত পণ্ডিত জনষ্টুয়ার্ট মিল, নিউম্যান প্রভৃতি মর্ম্মস্বিগণের সহিত পরি-চিত হইলেন; এবং এই সময়ই অসবর্ণ প্রাসাদে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। মহারাণী কেশবচন্দ্রকে নিজের এক খানি প্রতি মূর্ত্তি ও তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীর দুইখানি জীবনবৃত্তান্ত প্রদান করিয়াছিলেন।

এই পুস্তকদ্বয় মহারাণীর হস্তাক্ষরে সুশোভিত হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র ও এই উপলক্ষে মহারাণীকে আপনার সহধর্ম্মিণীর প্রতিমূর্ত্তি উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশে এইরূপে ছয় সাত মাস কাল ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়া ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্বদেশ যাত্রা করেন।

স্বদেশ প্রত্যাগমন করিয়া কেশবচন্দ্র, নানাবিধ সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ বিবিধ কার্য্য করেন। ১৮৭০ খ্রীঃ ১লা নভেম্বর "ভারত সংস্কার সভা" নামক একটি সভা সংস্থাপন করিয়া ইহার কার্য্য প্রণালী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করেন। যথা—(১) সুলভ সাহিত্য বিভাগ; এই বিভাগ হইতে এক পয়সা মূল্যের "সুলভ সমাচার" নামক একটি সংবাদ পত্র প্রকাশিত করেন। (২) দাতব্য বিভাগ (৩) শ্রমজীবীদিগের শিক্ষা বিভাগ বা নৈশ বিদ্যালয় (৪) স্ত্রী বিদ্যালয় বিভাগ; বয়স্থা মহিলাগণ এই বিভাগ হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন। (৫) সুরাপান নিবারণী বিভাগ; এই বিভাগ হইতে 'মদ না গরল?' নামক একখানি পত্রিকা বিনামূল্যে বিতরিত হইত, ইত্যাদি। এই সভার অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর মধ্যে 'এলবার্ট কলেজ' এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। অপরাপর বিভাগের অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলী অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই।

১৮৭১ খ্রীঃ কেশবচন্দ্র কতকগুলি ব্রাহ্ম পরিবারকে একত্র রাখিয়া দৈনিক উপাসনা ও অন্যান্য সদনুষ্ঠান আচরণ মানসে "ভারত-আশ্রম" নামক একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর বৎসর তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট ব্রাহ্ম বিবাহ পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করিবার জন্য যত্নপর হইলে 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ' কর্ত্তৃক আপত্তি উত্থাপিত হয়। এই নিমিত্ত, ১৮৭২ সালের ৩ আইন নাম দিয়া (Civil Marriage Act) একটি সিভিল বিবাহ বিধি প্রচলিত হইল। এই সময়, মহিলাদিগকে উপাসনা মন্দিরে যবনিকার অন্তরালে বসিবার স্থান প্রদান করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে তিনি অধিকতর অগ্রসর দলের মহিলাগণের জন্য বসিবার স্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন; এতদুপলক্ষে ইতিপূর্ব্বে যে মনোমালিন্য ও স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা আপা- হইয়া লুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু অন্যান্য কারণ বশতঃ কতকগুলি সভ্য বিরোধী করিয়া বেড়লেন এবং "সমদর্শী" নামক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত কেশবচন্দ্রের অবলম্বিত মতের সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন

এই সময়, (১৮৭৬ খ্রীঃ কেশবচন্দ্র, কলিকাতার অনতিদূরে খোড়কপুর গ্রামে "সাধক কানন" নামক একটি উদ্যান-বাটিকা ক্রয় করিয়া আপন শিষ্যসমাজে বৈরাগ্যের উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ "সমদর্শী"-দল সমাজের কার্য্যের নিয়ম-তন্ত্র-প্রণালী সংস্থাপনোদ্দেশে 'ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভা' গঠনে উদ্যোগী হইলেন। এই বৎসর কেশবচন্দ্র তদানীন্তন বড়লাট বাহাদুর লর্ড লিটন মহোদয়ের অনুরোধক্রমে "ধর্ম্মে বিজ্ঞান ও উন্মত্ততা" নামক একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। মান্দ্রাজ বিভাগে এই বৎসর দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে কেশবচন্দ্র, দুস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্য নিমিত্ত বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রেরণ করেন। এই বৎসরই তিনি কলুটোলাস্থিত পৈতৃক ভবন পরিত্যাগ করিয়া "কমলকুটীর" নামক একটি নবক্রীত বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

১৮৭৮ খ্রীঃ কুচবিহারের অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজার সহিত কেশবচন্দ্রের নাবালিকা কন্যার বিবাহ উপস্থিত হইল। এই বিবাহে কুচবিহারাধিপতির কুলরীতি অনুসারে কেশবচন্দ্র জাতিচ্যুত বলিয়া কন্যাকর্ত্তার কার্য্য করিতে পাইলেন না, উপবীতধারী রাজপুরোহিতগণের মন্ত্রপাঠে বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। এতদ্ব্যতীত বিবাহোপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনাদিও হইতে পাইল না। ব্রাহ্মগণ এই সমস্ত কারণে কেশব চন্দ্রের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া তাঁহাকে আচার্য্যের পদ হইতে ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পদ হইতে অপসৃত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। কেশবচন্দ্র ইহা হইতে দিলেন না। এই মতভেদ ও দলাদলি উপলক্ষে অধিকাংশ ব্রাহ্মই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া একটি স্বতন্ত্র ও অভিনব সমাজ সংস্থাপন করিয়া "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" নামে অভিহিত করিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

কেশবচন্দ্র ইহার পর, নিজের সমাজের "নববিধান" নাম দিয়া তাহার সুশৃঙ্খলায় কার্য্য নির্ব্বাহ মানসে নূতন নূতন বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই "নববিধান" সমাজের স্থায়িত্ব কল্পে তিনি ১৮৭৮ খ্রীঃ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পাঁচবৎসর কাল অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ১৮৮১ খৃঃ হইতে দারুণ বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইলেও "নববিধানের" কার্য্যে কিঞ্চিন্মাত্রও শ্লথ হন নাই।

'নববিধান'

১৮৭৯খৃঃ তিনি গঙ্গাবক্ষে সংকীর্ত্তন, গঙ্গাদেবীর অর্চ্চনা ও শারদীয় উৎসব সুসম্পন্ন করেন। মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত কেশবচন্দ্র ইতিপূর্ব্বেই

অতিশয় ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি এই উপলক্ষে কেশবচন্দ্রের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র এই বৎসর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়া রেলওয়ে ষ্টেসনে বিতরণ করেন। সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে "আমি কি প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ?" শীর্ষক নিজের অসাধারণত্ব প্রতিপাদক একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতায় তিনি আপনাকে বালক কাল হইতে নিরামিষাষী বলিয়া অভিহিত করেন। "খ্রীষ্ট কে ?" নামক বক্তৃতাও এই বৎসর প্রদান করেন। নারীজাতিকে জ্ঞান ধর্ম্ম ও গৃহকার্য্যে সুশিক্ষিত করিবার জন্য "আর্য্য নারীসমাজ" এবং ব্রাহ্ম প্রচারকগণের বাসস্থানের নিমিত্ত "মঙ্গলবাড়ী" নামক কয়েকটী গৃহও এই বৎসর প্রতিষ্ঠিত হয়।

অনন্তর কেশবচন্দ্র, নিজ শিষ্যবর্গের মধ্যে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের উপর খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র, গৌরগোবিন্দ রায়ের উপর হিন্দুশাস্ত্র, গিরিশচন্দ্র সেনের উপর মুসলমান শাস্ত্র, অঘোর নাথ গুপ্তের উপর বৌদ্ধশাস্ত্র, এবং ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের উপর সংগীত শাস্ত্র অনুশীলনের বিশেষরূপে ভারার্পণ করিলেন। কিছুদিন পর তিনি স্বদলবল সহ প্রচারার্থ বহির্গত হন। এই সময় হইতে তিনি সমাজে গৈরিক বস্ত্র প্রচলন আরম্ভ করেন এবং হিন্দু আচার ব্যবহারের প্রতি যথেষ্ট অনুরক্ত হন। এই বৎসর তিনি নৈনীতালে গিয়া সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন এবং বাঘাম্বর পরিধান করতঃ সস্ত্রীক ভজন সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। নৈনীতাল হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইংরাজী পুস্তিকা প্রচারিত করেন।

১৮৮০ খ্রীঃ কেশবচন্দ্র প্রচারক সভার 'প্রেরিতদিগের দরবার' এইরূপ নামকরণ করিলেন। এই বৎসরের উৎসবের সময় বেদ, বাইবেল, কোরাণ, ললিতবিস্তর একত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে 'নববিধানের' ধ্বজা উড়াইয়া দলস্থ সকলকেই উহা স্পর্শ করিতে অনুরোধ করিলেন। যাঁহারা করিলেন না, তাঁহারা তাঁহার 'বিধান' ভুক্ত হইতে পারিলেন না। এখন হইতে কেশবচন্দ্র সংসারের যাবতীয় ভার অর্পণ করিয়া কেশমুণ্ডন ও গৈরিক বসন পরিধান পূর্ব্বক ভিক্ষার ঝুলি গ্রহণ করিলেন। "যুগধর্ম্ম মাহাত্ম্য প্রতিপাদক হরিলীলা বা "বিধান ভারত" নামক মহাকাব্য তিনি এই সময় রচনা করেন। "একাধারে নরনারীর প্রকৃতি" নামক উপদেশও এই সময় প্রদত্ত হয়।

১৮০১ খ্রীঃ তিনি বহুমূত্র রোগাক্রান্ত হইয়া স্বাস্থ্যোন্নতি কল্পে দার্জ্জিলিং

গমন করেন। প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল-বিরচিত 'নববৃন্দাবন' নামক একটি নাটকের অভিনয় করেন। বালক কাল অবধি তাঁহার অভিনয় করিবার বাতিক ছিল। 'নববিধান' (New Dispensation) নামক ইংরাজী সংবাদপত্র, পরিচারিকা, বালকবন্ধু, থিয়িষ্টিক কোয়াটারলি রিভিউ প্রভৃতি পত্রিকাও এই বৎসর প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত "ব্রহ্মবিদ্যালয়" ও মহিলাগণের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত ভিক্টোরিয়া কলেজও এই সময় স্থাপন করেন।

পীড়িতাবস্থা। কলিকাতা টাউনহলে ১৮৮২ খ্রীঃ "ইউরোপের নিকট এসিয়ার সংবাদ" নামক একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ইহাই তাঁহার শেষ বক্তৃতা। এই বৎসর বাৎসরিক ব্রহ্মোৎসব সম্পন্ন হইয়া গেলে তিনি সপরিবারে সিমলা শৈলে স্বাস্থ্যোন্নতি মানসে যাত্রা করেন। তথায় গিয়া "নবসংহিতা" (The New Code or the Sacred Laws of the Aryans of the New Dispensation) নামক পুস্তকের পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ লিখিয়া পীড়ার প্রভাব অনুভব করেন। এই পীড়িতাবস্থাতেই আমেরিকার কোন ব্যক্তির অনুরোধে "যোগ" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহাকে প্রেরণ করেন। এই সমস্ত কারণ বশতঃ তিনি একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসকের উপদেশ অনুসারে এই সময় তিনি প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা কাল সূত্রধরের কার্য্য করিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুস্থ হইতেন।

১৮৮৩ খৃঃ কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া নববিধানের জন্য কিঞ্চিৎ সুস্থ দেহেই পরিশ্রম করিতেন। এইরূপে পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কেশব-চন্দ্র, সময় সন্নিকট বুঝিয়া ১৮৮৪ খ্রীঃ বড়সাধের দৈনন্দিন উপাসনা মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া লইলেন।

কেশবচন্দ্র এই বহুমূত্র রোগের মর্ম্মান্তক বেদনায় অনবরত ভয়ানক কষ্ট অনুভব করিতেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের কথা, সময়ক্রমে এই যন্ত্রণার কিঞ্চিৎমাত্র উপশম বোধ করিলে উপাসনা মন্দিরের কথা কহিয়া যেন কতই তৃপ্তিলাভ করিতেন। অনন্তর ৮ই জানুয়ারী ১৮৮৪ খ্রীঃ পূর্ব্বাহ্নে সর্ব্ববিধ

শেষ জ্বালা যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া পুণ্যময় দিব্যধামে চলিয়া গেলেন। ৪৬ বৎসর মাত্র বয়সে অধিকন্তু কর্ম্মময় জীবনের এই রূপে অকালে অবসান হইল।

সাহিত্য-সেবা—কেশবচন্দ্র, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বঙ্গ ভাষার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত

ছিলেন না। ধর্ম্মালোচনার জন্য তিনি আজীবন প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, ধর্ম্মসংস্কার, তাঁহার জীবনের মুখ্যব্রত ছিল; এই সংস্কার করে তিনি বক্তৃতা প্রদান, পুস্তিকা প্রচার, সংহিতা প্রণয়ন প্রভৃতি যে সকল পন্থানুসরণ করিয়াছিলেন, ভাষা তাহাতেই যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রণীত রচনাবলীর ভাব ও ভাষা, তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম দেশ হইতে সমুত্থিত হইত, কখনই তাহাতে অন্তঃসারশূন্যতার লেশমাত্র পরিলক্ষিত হইত না; এই নিমিত্ত তাঁহার বক্তৃতা ও রচনাবলী ক্ষণস্থায়ী না হইয়া সমাদর লাভ করিয়াছে। দুঃখের বিষয়, কেশবচন্দ্রের অধিকাংশ

ইংরাজী

রচনাবলী, নিজ অনুসৃত মতাবলীর বহুল প্রচারোদ্দেশে ইংরাজী ভাষায় রচিত। তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী মহাপুরুষের নিকট বঙ্গভাষা আশানুরূপ পুষ্টিলাভ করিতে পারে নাই, ইহা পরিতাপের বিষয়। কেশবচন্দ্রের ইংরাজী বক্তৃতা ও রচনাবলী, মহা মহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকেও স্তম্ভিত ও চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছিল—

* * * His English was wonderfully pure, his delivery, free and graceful and his finish, at times, almost Ciceronian. It was this faculty that so greatly impressed his English admirers and made him the idol of young Bengal—"The Englishman."

* * * Keshub chundra Sen will stand as an orator in the front rank with men like Gladstone, Bright and Gambella, except that his influence in oratory was devoted [to] religion and culture of the heart, instead of politics and statecraft—"Indian Daily News".

"* * * In his frequent lectures he kept his audience composed of Europeans and educated natives spell-bound. He was versatile to a degree and could discuss any subject shewing a keen and penetrating understanding in all his views."

বাঙ্গালা রচনা

(১) "বিধান ভারত বা যুগধর্ম্ম মাহাত্ম্য প্রতিপাদক হরিলীলা নামক মহাকাব্য"—এই মহাকাব্যের প্রথমোল্লাস ১৮৮০ খ্রীঃ এবং দ্বিতীয়োল্লাস তাহার পর বৎসর প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে কেশবচন্দ্র রচয়িতা বলিয়া আপনার নাম প্রকাশিত করেন নাই। বর্ণিত বিষয়ের আভাষ,

কতকাংশ বুঝিতে পারা যাইবে বলিয়া এই কাব্যের প্রথম ও দ্বিতীয় উল্লাসের নির্ঘণ্ট পত্র উদ্ধৃত হইল। প্রথমোল্লাস—

মঙ্গলাচরণ, পবিত্রাত্মা ও আদ্যাশক্তির বন্দনা, গৃহর্ষি যোগানন্দের আশ্রম, যুগধর্ম্ম মহা প্রলয়, দেবগণ কর্তৃক ভগবানের স্তব, নববিধানের জন্ম, স্বর্গপুরী, ধরাতলে দেব সমাগম, উৎসবমন্দির, দেব সভায় ভগবানের উক্তি, ভগবদ্বাক্যের ব্যাখ্যান, নববিধানের রাজ্যাভিষেক, নববিধানের দিগ্বিজয় যাত্রা, সাধুভোজন, চিরঞ্জীবের সহিত পুরঞ্জনের ধর্ম্মালাপ, দেবাসুরের সংগ্রাম, জয়গীত। এই সপ্তদশ সর্গ।

দ্বিতীয়োল্লাস যথা—

ইষ্ট পূজা, পুরঞ্জনের আত্মবিলাপ, আত্মারামচরিত, চিরঞ্জীবের নগর প্রবেশ, সৃষ্টিলীলা, ভগবত্তত্ব, বিধান শ্রীসঙ্গ, পাষণ্ড দলন, হিমালয়ে যোগ শিক্ষা, মহাযোগ সমন্বয়, শাক্যসিংহ, দেবর্ষি মুশা, যিশু চরিত। এই ত্রয়োদশ সর্গ।

প্রথমোল্লাসে চিরঞ্জীবের সহিত পুরঞ্জনের ধর্ম্মালাপ প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

* * * ওহে মিত্র! হরিলীলা কাব্য,
ভক্তিরস, নহে বুদ্ধি জ্ঞানের গোচর ;
চলিবে যখন ভাব পথে, পাবে স্বাদ
তখন হৃদয়ে ; এবে নম্রভাবে ভজ,
কর পূজা হরিপদ, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ।
কোন ধর্ম্মাবলম্বী নহে ঘৃণাস্পদ
এ জগতে ; জন্মদোষে নহে কেহ পাপী,
সকলেই ভগবতাত্মজ ; তবে ইহা
জানিও নিশ্চয় ভাল মন্দ দুই আছে
সর্ব্ব ঘটে, তুমি আমি সবে অপরাধী।

* * *

নূতন বিধান নহে নিরাপদ, বহু
শত্রুদল, পাছে পাছে ঘুরিছে নিয়ত—
কেহবা প্রকাশ্যে কেহ মিত্র বেশ ধরি।
মঙ্গল বিধাতা হরি করুণা নিধান

(ধন্য ধন্য তাঁর প্রেম লীলা!) কৃপা করি
অবতীর্ণ হইলেন তিনি বঙ্গদেশে,
বিতরিতে প্রেম ভক্তি বিশেষ বিধান;
এমন গুণের হরি প্রাণের সুহৃদে
বাধা দেয় যেই, ঘোর পাষণ্ডী সে জন।
বিধান বিরোধী, অবিশ্বাসী, নাহি পাবে
সহজে নিষ্কৃতি; তার পাপ, অপরাধ
গুরুতর, নাহি তাহে প্রায়শ্চিত্ত বিধি। ইত্যাদি

(২) 'সুলভ সমাচার'—ইতিপূর্ব্বে এদেশে ৫ মূল্যের, বঙ্গভাষায় পরিচালিত সংবাদ পত্রের প্রচার ছিল না। কেশবচন্দ্র, বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ১৮৭০ সালের নভেম্বর মাস হইতে, তদ্দেশীয় পত্রিকার অনুকরণে, 'ভারত সংস্কার সভার' অধীন, সুলভ সাহিত্য প্রচার বিভাগ হইতে সর্ব্ব প্রথম "সুলভ সমাচার" নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করেন। ইহাতে বঙ্গভাষার সুলভ সাহিত্য প্রচারের কার্য্য অনেক সহজ হইয়া যায়। এই পত্রিকা সপ্তাহে তিন চারি সহস্র বিক্রীত হইত। (৩) 'ধর্ম্মতত্ত্ব'—১৮৬৪ খ্রীঃ এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য অগ্রে বর্ণিত হইয়াছে। (৪) 'নবসংহিতা' ইতিপূর্ব্বে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার নিজের সমাজের নিমিত্ত 'অনুষ্ঠান পদ্ধতি' নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ গোলোযোগের আশঙ্কা করিয়া কেশবচন্দ্র, জীবনের শেষাবস্থায় রোগ শয্যায় শয়ান রহিয়াও আপন বিভাগীয় সমাজের নিমিত্ত নূতন বিধি, নূতন সাধন, নূতন প্রণালী প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া নব সংহিতা প্রণয়নে নিযুক্ত হন। এই পুস্তকে বর্ণিত মতামত লইয়া নিজ দলস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে কি জানি দ্বৈধভাব সংঘটিত হয়, এই নিমিত্ত তিনি বলিতেন—'ইহা স্বর্গীয় আদেশ নহে যে ইহার প্রত্যেক অক্ষরই ধ্রুব বলিয়া মানিতে হইবে—ইহা কার্য্যানু-বর্ত্তী হইবার নির্দ্দেশ মাত্র; ইহার ভাবানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলেই চলিতে পারে। কেশবচন্দ্র, এই পুস্তকখানি স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। (৫) 'জীবন বেদ' পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত কেশবচন্দ্রের স্বরচিত জীবনচরিত।

কেশবচন্দ্র বঙ্গভাষায় যে সমুদয় বক্তৃতা বা উপদেশ প্রদান করিতেন, তাহা শ্রবণ করিয়া সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণও ভাষার বিশুদ্ধতা ও ওজস্বিতা দেখিয়া

স্তম্ভিত হইতেন। বক্তৃতা কালীন তিনি আদৌ অঙ্গভঙ্গি করিতেন না—তিনি যাহা কিছু বলিতেন, তাহা হৃদয় ঢালিয়া বলিতেন, সুতরাং তাঁহার মুখ নিঃসৃত বাণী শ্রোতৃবৃন্দের প্রাণে প্রাণে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে অপূর্ব্ব উত্তেজনায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিত।

এতদ্ব্যতীত কেশবচন্দ্র অনেক মনস্বীকে মাতৃ ভাষায় রত্ন আহরণের নিমিত্ত উদ্বোধিত করিতেন। 'শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম' নামক উৎকৃষ্ট পুস্তকখানি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কেশব চাঁদ—

পাঁচালীকার।

(প্রবাসী ১।১১৩)

কেশবমোহিনী দাসী—

"মাধুরী" নাম্নি নাটিকা রচয়িত্রী।

(নব্যভারত ৭।৬১৯)

শ্রীশিবরতন মিত্র।

লৌকিক ব্রত-বিবরণ।

প্রসিদ্ধি আছে, 'লোকাচার শাস্ত্র অপেক্ষা বড়,' কেবল প্রসিদ্ধ নয়, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মতও বটে। এই কারণেই যুগে যুগে সকল সমাজেই শাস্ত্রাপেক্ষা লোকাচারের সমাদর বেশী এবং জগতের প্রায় সকল জাতির মধ্যেই বহুতর শাস্ত্রবহির্ভূত আচার অনুষ্ঠান আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। পবিত্র ধর্ম্মবৃক্ষের অঙ্গে এই গুলি 'আগাছা,' তাহাতে আর সন্দেহই নাই। কিন্তু কথায় বলে 'বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু, তর্কে বহু দূর।' এই সকল অশাস্ত্রিক আচার পদ্ধতি ও বিশ্বাস এবং ভক্তিমণ্ডিত হইয়া অনুষ্ঠাতৃগণের হৃদয়ে তদ্‌সম্পাদনদ্বারা পুণ্য-সঞ্চয়ের বাসনা জাগাইয়া তুলে। দেবতা-বহুল হিন্দু-সমাজে লোকাচারের প্রভাব যত বেশী, অন্য কোন জাতির মধ্যে বোধ হয় তাহার দশমাংশও নাই। শাস্ত্রান্তর্গত তেত্রিশ কোটি দেবতা ভিন্ন আরো যে কত কল্পিত উপদেবতার স্থান হিন্দু-হৃদয়ে বিরাজিত রহিয়াছে, তৎসমাজ বহির্ভূত অন্যের পক্ষে তাহার সম্যক পরিজ্ঞান বড়ই দুর্ঘট। সাধারণতঃ আমরা হিন্দুসমাজে বারমাসে তের পার্ব্বণের কথাই শুনিয়া থাকি,

কিন্তু তাহা ব্যতীত তাঁহাদের মধ্যে আরো অনেক ক্রিয়া কলাপ, বারব্রত প্রচলিত আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা চট্টগ্রামে প্রচলিত হিন্দু-লৌকিক ব্রত গুলির একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

মানুষের হৃদয়বৃত্তির গতিপর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য এই সকল ব্রতের বিবরণ সংগ্রহ একান্ত আবশ্যক। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ আত্মরক্ষণ ও আত্ম-কল্যাণ-কামনায় কালে কালে কত কিছুরই না আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ভাবিয়া দেখিলে, এই জগতে কিছুই আশ্চর্য্য বোধ হয় না।

চট্টগ্রামের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে কি কি লৌকিক ব্রত প্রচলিত আছে, একজনের পক্ষে তাহার সংবাদ সংগ্রহ সহজ নহে। এই পর্য্যন্ত আমরা আনোয়ারা অঞ্চলে প্রচলিত অনেকগুলি ব্রতের নাম ও বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি। নিম্নে ক্রমে সেইগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতেছে।

বেল ভাতা।

ইহার অপর নাম বেলকুমার—কালকুমারের ব্রত। ইহা বৈশাখ মাসের প্রথম দিবস হইতে আরব্ধ হইয়া সংক্রান্তি দিবসে শেষ হয়। ব্রতকারিণীগণকে দিনে দুইবার আহার করিতে হয়। সূর্য্যাস্তের পর শস্য জাত কোন আহার করা নিষিদ্ধ। পুরোহিত ঠাকুর বৈশাখ মাসের যে কোন রবিবারে সূর্য্য পূজা সমাপনান্তে এই ব্রতের 'পূর্ণা' দিয়া থাকেন। সেই দিন ব্রতকারিণীগণ আত্মীয় স্বজন সঙ্গে লইয়া আহার করিতে বসেন। খাইবার পূর্ব্বে একখানি কলাপাতায় কতেক ভাত, যতরকমের তরকারির আয়োজন হইয়াছে, সকল রকম তরকারি ও কিঞ্চিৎ গব্য দিয়া, দুইটা জবাফুলের মালা দুইটী বংশখণ্ডে ঝুলাইয়া কোনও পুকুরের পাড়ে বাড়াইয়া দিতে হয়। ইহাকে বেলভাত বাড়ান বলে। ব্রতকারিণীগণ সে দিন একাহারী থাকেন। 'বেলভাতা' বাড়ানের পর কেহ কেহ দিনে দুইবার আহার করেন, কেহ কেহ করেন না।

বেল বা বেলায় অর্থাৎ সূর্য্য-কিরণে ভাত খাওয়া হয় বলিয়াই ইহার নাম 'বেলভাতা'। এই ব্রত করিলে নাকি ধনে পুত্রে বৃদ্ধি হয়।

শাস্ত্রীয় বা অশাস্ত্রীয় প্রায় প্রত্যেক ব্রতেরই মাহাত্ম্যজ্ঞাপক ব্রত কথা বা পাঁচালী রচিত হইয়াছে, দেখা যায়। কোন্ সময়ে কোন্ ব্রতের সৃষ্টি

হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থসকলের ভাষালোচনা করিলে তাহা অনেকটা অনুমান করা যাইতে পারে। হইতে পারে কোন কোন পাঁচালী ব্রত-সৃষ্টির পরেই বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু বড় বেশী দিন পরে, বলিয়া বোধ হয় না। আলোচ্যমান ব্রতের যে ক্ষুদ্র পাঁচালী পাওয়া গিয়াছে, প্রাসঙ্গিক বোধে এবং রক্ষণার্থে তাহা এখানেই প্রকাশিত করা উচিত। অপরাপর ব্রত সম্বন্ধেও আমরা এই নিয়মের অনুসরণ করিব। এতদ্দ্বারা দুইটি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে,—এক দিকে বিলুপ্তপ্রায় পুঁথিগুলির উদ্ধার, অপর দিকে ব্রতগুলির সম্বন্ধে সম্যক বিবরণ পরিজ্ঞানের সুবিধা। বলা উচিত যে, প্রাচীন সাহিত্য বলিয়া পুঁথিগুলির ভাষা প্রভৃতির সমালোচনার ভার সুধী পাঠকবর্গের উপরেই ন্যস্ত থাকিল। সেই পুঁথিখানি এই:—

কাল-বেল কুমারের ব্রত পাঁচালী।

প্রণমোহ গিরিসুতা-সুতের পদেতে।
প্রণমোহ সূর্য্যদেব বন্দিয়া শিরেতে॥
সরস্বতী দেবী বন্দম ভকতি করিয়া।
গুরুর চরণ বন্দম যুগপাণি হইয়া॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব দুর্গা বন্দিয়া শিরেতে।
ত্রিভুবন দেব বন্দম হইয়া হরসিতে॥
অষ্ট লোক পাল বন্দম করি পরিহার।
মাতা পিতার চরণেতে করি নমস্কার॥
সর্ব্ব দেব চরণে যে শিরেতে বন্দিয়া।
কাল বেল কোয়ারের (১)ব্রত পাচালি রচিয়া॥ ৫
সত্য যুগে এক বিপ্র দুঃখিত আছিল।
পুত্র কন্যা তান (২) ঘরে কিছু না জন্মিল॥
অনেক দেবতা পূজা করে দ্বিজবর।
দেবতার বরে কন্যা জন্মে দ্বিজের ঘর॥
কথ দিন পরে তার দৈবের ঘটন।
অকস্মাৎ ব্রাহ্মণীর হইল মরণ॥

১। কোয়ারের—কুমারের'কুমার স্থলে কোন কোন পুঁথিতে 'কোয়ার' বা 'কোঙর' লেখা গিয়াছে দেখা যায়। (২) তান—তাঁর।

মাও মৈল দেখি কন্যা ব্যাকুল হইল।
বৃদ্ধ পিতা সঙ্গে কন্যা কথ দিন ছিল ॥
প্রাতঃকালে জাএ দ্বিজ ভিক্ষা মাগিবারে।
দিনান্তে কন্যার স্থানে মিলে দ্বিজবরে ॥ ১০
এই মনে কথ দিন আছিল ব্রাহ্মণ।
কন্যারে দেখিয়া দ্বিজ ভাবে মনে মন ॥
বিবাহের যোগ্য হৈল না দেখি উপায়।
কিরূপে হইব বিবাহ ভাবিয়া না পায় ॥
হাহারে দারুণ বিধি ভজিলুম তোমারে।
কন্যার বিবা(হ) হেতু ধন দেও মোরে ॥
এথেক ভাবিয়া দ্বিজ ভিক্ষারে চলিল।
স্বর্গে থাকি বিধাতা এ কৃপাযুক্ত হৈল ॥
বিধাতা আসিল এক সন্ন্যাসীর ভেস (৩) ধরি।
ভিক্ষা মাগিবারে গেলা ব্রাহ্মণের বাড়ি ॥ ১৫
ব্রাহ্মণের কন্যা তবে সন্ন্যাসী দেখিয়া।
ভিক্ষা আনি দিল কন্যা হরসিত হইয়া ॥
কন্যা দেখি সন্ন্যাসী তো কামাতুর হৈল।
বাটির বাহিরে গিয়া পেস্রাপ (৪) করিল ॥
সন্ন্যাসীর পেস্রাবেতে ঋতু পাত হৈল।
রক্ত সাক (৫) অকস্মাত ঋতু জে জর্ম্মিল ॥
গৃহ হোস্তে সেই কন্যা হরসিত হৈয়া
আপনার গৃহে তবে আনিল তুলিয়া ॥
রক্ত শাক খাইলো কন্যা রন্ধন করিয়া।
সেই দিনে গর্ভ কন্যার শুন মন দিয়া ॥ ২০
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা গর্ভ বৃদ্ধি হৈয়া।
* * * * ॥
এক দুই তিন ক্রমে নবম মাস হৈল।
দেখিয়া জে দ্বিজবরে ভাবিতে লাগিল ॥

---

(৩) ভেস—বেশ। (৪) পেস্রাপ—প্রস্রাব।

(৫) 'রক্তশাকে' পাঠ হইবে, বোধ হয়।

এইরূপে সর্ব্বলোকে হৈল কাণাকাণি।
পরস্পরে জানিলেক বৃদ্ধ নৃপমণি॥
রাজাএ পাঠাইল কোটাল ব্রাহ্মণী আনিতে।
কন্তা সমে আন দ্বিজ আমার সাক্ষাতে॥
রাজা বলে সুন কন্তা আমার বচন।
অকুমারী হও কেনে গর্ভের লক্ষণ॥ ২৫
কন্তা বলে সুন রাজা আমার বচন।
বিস্তারিয়া কহি সুন সেই বিবরণ॥
এক দিন সন্ন্যাসী জে ভিক্ষারে জে আইলো।
ভিক্ষা লইয়া বহির্দ্দেশে পেস্রাপ কোরিল (করিল)॥
সেই ভূমে সুন রাজা দৈবের ঘটন।
অকস্মাত রক্ত শাক উঠে ততক্ষণ॥
রক্তশাক দেখিয়া রন্ধন করি খাইলুম॥
সেই দিনে দৈব দোষে গর্ভবতী হইলুম॥
এই বহি (৬) জানি যদি দোহাই তোমার।
বিচার করিয়া দোষ রক্ষহে আমার॥ ৩০
এথ সুনি বোলে রাজা সুন কোটয়াল।
কারাগারে নিয়া কন্তা রাখহ তৎকাল॥
এথ সুনি কারাগারে কন্তারে রাখিল।

লাচারি।

কারাগারে কন্তা তবে কান্দিতে লাগিল॥
কান্দে কন্তা কারাগারে, এথ দুঃখ বিধি মোরে,
কেনে বিধি কৈলা হেন কাজ।
শিশু হৈয়া দুঃখ পাইলুম, পতি মুই না চিনিলুম,
কেন বন্দী কৈল নৃপরাজ॥
হাহা রে দারুণ বিধি, নাহি জানি কোন সন্ধি,
কেনে বিধি এথ দুঃখ মোরে।

(৬) বহি—বই [illegible]

বৃদ্ধ পিতা আছে ঘরে, দোষ কিবা দিব তারে,
বধ দিমু বিধাতা উপর।
এই মতে কান্দে রামা, মনে ভাবি অক্ষেমা, (৭)
নিশি দিশি কান্দে এই মতে।
তার পরে সুভ (শুভ) হইল, দশমাস পূর্ণ হইল,
প্রসব জন্মিল উদরে॥ ৩৫
বিধাতার কৃপা হৈল, বন্ধন খশিয়া গেল,
বৈসে রামা হৈয়া হরসিত।
বন্ধন জে মুক্ত দেখি, হরসিত চন্দ্রমুখী,
মনেতে হইয়া হরসিত॥

এই মতে প্রসব জে বেদনা জর্ম্মিল।
শুভক্ষণেতে দুই শিশু জর্ম্ম জে হইল॥
দেখিতে সুন্দর শিশু জেন চন্দ্রমুখ।
শিশু দেখি কন্যার জে খণ্ডে সর্ব্ব দুখ॥
অদভুত দেখিয়া শিশু সুন মন দিয়া।
ভূমিতে পরিয়া (পড়িয়া) কথা কহেন ডাকিয়া॥
সুন সুন অহে মাতা আমার বচন।
আমার জর্ম্ম কথা করহ শ্রবণ॥ ৪০
সংসারেতে যথ দেব পূজয়ে সকল।
আমার দুহের পূজা নাহি খিতিতল॥
এই আমরা চলিলাম সুনহ বচন।
সকলের কহ মোরার (৮) পূজার কথন॥
কন্যাএ বোলেন সুন আমার বচন।
কোন দেব হও তোরা পূজা জে কেমন॥
এথ সুনি দুই শিশু লাগে বলিবারে।
খাল বেল কোয়র বলি নাম আমরার॥ (৯)

~~(৭) অক্ষেমা—দুঃখ।~~

[illegible]—মোদের। (৯) আমরার—আমাদের।

প্রথম বৈশাখ মাসে ব্রত আরম্ভিব।
সূর্য্য অস্ত পূর্ব্বে সতী দিনে অন্ন খাইব ॥ ৪৫
রাত্রিতে না খাইব অন্ন থাকি উপবাস।
এই মতে খাইব অন্ন সর্ব্ব বৈশাখ মাস ॥
তার পরে সুন মাতা নিবেদি তোমারে।
সর্ব্ব মাস মধ্যে এক দিনে পূজা করে ॥
ঘঠ স্থাপি গণেশাদি পূজিব হরিসে।
কাল বেল বোলি পূজিব বিশেষে ॥
একখান কাষ্টাসনে পুষ্প দূর্ব্বাসনে।
ষোড়শোপচারে পূজা বেদের বিধানে ॥
শুচি হইয়া অন্ন ব্যঞ্জন রান্ধিবে সকল।
আম্র দিয়া রক্ত শাক রান্ধিব সকল ॥ ৫০
দুই ভাগ করি অন্ন উৎসর্গিয়া দিব।
এই ব্রত কথা সব ভক্তি ভাবে কইব ॥
কাল কোয়রের অন্ন জলে সে বারাইব (বারাইব)।
রক্ত পুষ্প মালা ধ্বজ তার সঙ্গে দিব ॥
বেল কোয়রের অন্ন ব্রতী সবে খাইব।
ধনে পুত্রে বর তবে সেই ক্ষণে পাইব ॥
এই ব্রত করে জেই মনে শ্রদ্ধা করি।
ধনে পুত্র বর দিয়া বারাই (বাড়াই) ঠাকুরালি ॥
না করিবে ব্রত শনিবার মঙ্গলবার।
বুধ গুরু শুক্র সোম এই চারি বার ॥ ৫৫
এই চারি বারে জার (বার) মনে ইচ্ছা করে।
শুক্ল পক্ষ বৈশাখেতে এই ব্রত করে ॥
আর এক বাক্য মোর সুনহ শ্রবণ।
এই আমরা চলি জাই রাজার ভুবন ॥
রাজারে কহিয়া স্বপ্ন করিব গমন।
কালুকা হইব তোমার বন্ধন মোহন ॥ (১০)

(১০) মোহন—মোচন।

এথেক কহিয়া শিশু হৈলা অন্তধ্যান (অন্তর্দ্ধান)।
রাজারে কহিতে স্বপ্ন করিলা পয়ান॥
খাটেতে পরম সুখে রাজা নিদ্রা জায়।
কাল বেল কোয়রে গিয়া স্বপ্ন জে বুঝায়॥৬০
সুন মহারাজা বলি তোমার গোচরে।
মোর মাতা বান্ধিয়া রাখিছ কারাগারে॥
বন্দি হোতে মাও মোর করহ মোচন।
নহে ধনে পুত্রে তোমায় করিব নিধন॥
মোর মাএর ঠাই শুন আমার কাহিনী।
সেই মতে ব্রত কর রাজা চূড়ামণি॥
ব্রত যদি কর রাজা শুন দিয়া মন।
ধনে পুত্রে বৃদ্ধি তোমার হইবে রাজন॥
এই কথা কহি তবে অন্তধ্যান (অন্তর্দ্ধান) হইল।
বন্দিশালা হোতে রাজা ব্রাহ্মণী আনিল॥ ৬৫
ব্রাহ্মণীর ঠাই সুনি ব্রত বিবরণ।
সেই মতে রাজরাণী ব্রত আরম্ভন॥
ব্রতের প্রভাবে রাণী পুত্র রত্ন পাইল॥
এই মতে ব্রত তবে সকলে করিল॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আর তান কন্যা রানি (আনি)।
অনেক যে ধন দিয়া তোসেন নৃপমণি॥
ধন লৈয়া বিপ্র গেলো কন্যার সহিতে।
ঘরে গিয়া বাপে ঝিএ রহে হরসিতে॥
এই মতে ব্রত করে সকল সংসার।
ব্রতের প্রভাবে বর পায় সর্ব্ব নর॥ ৭০
অক্ষরা চরণে কহে জোড় করি কর।
মন বাঞ্ছা পূর্ণ কর বেলকাল কোয়র॥
সরস্বতী চরণে বন্দিয়া শিরেতে।
কালবেল কোয়রের ব্রত সাঙ্গ এই মতে॥৭২

"ইতি পাঞ্চালি সমাপ্ত। ইতি সন ১২৩২ সাধ ২২ আশ্বিন॥ শ্রীদুর্গা শ্রীপীতাম্বর দেব শর্ম্মণঃ স্বাক্ষরং পুস্তকঞ্চেতি॥" এই পুঁথির প্রতিলিপিকার

কিছু আধুনিক হইলেও ইহার রচনা তত আধুনিক বলিয়া বোধ হয় না। আলোচনা করিলে আমাদের এই উক্তির সত্যতা কতকটা উপলব্ধ হইবে। শিক্ষিত হস্তের লেখা বলিয়া ইহাতে তত বর্ণাশুদ্ধ দৃষ্ট হয় না। বলা বাহুল্য, ইহার রচয়িতা অভয়াচরণ সম্বন্ধে সকল তথ্য নিবিড় তমসাচ্ছন্নই রহিল।

শ্রীআবদুল করিম।

সমালোচনা।

১। বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক।—১ম ও ২য় খণ্ড। শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র সঙ্কলিত।

পরলোকগত বঙ্গভাষার লেখকগণের ধারাবাহিক জীবনী ইহাতে প্রকাশিত হইতেছে।

বীরভূমির পাঠকগণের নিকট সাহিত্য-সেবকের আর নূতন পরিচয় কি দিব? মাসে মাসে নিয়মিত ভাবে উহা বীরভূমিতে প্রকাশিত হইতেছে। শিবরতন বাবু এক সুবৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। সম্পূর্ণ হইলে ইহা দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের যে বহুকল্যাণ সাধিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 'সাহিত্য-সেবক' আমাদের সমালোচ্য নহে। কেন না, উহা আমাদের নিজের জিনিস। তবে ইহা বলিলে বোধ হয় দোষ হইবে না যে, শিবরতন বাবুর রচনায় মাধুর্য্য আছে, বর্ণনায় সংযম আছে। তাঁহার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান আছে, কর্ম্মে একাগ্রতা আছে, প্রাণে উৎসাহ আছে, সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি আছে। এরূপ লোক সকলেরই নিকট সাহায্য পাইবার অধিকারী।

২। লালাবাবু।—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। এই পুস্তকখানিও 'বীরভূমি' হইতে পুনর্মুদ্রিত। "বীরভূমি" লালাবাবুর পবিত্র জীবনী অঙ্গে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছে। পাঠকগণও পুস্তকাকারে প্রকাশিত 'লালাবাবু' পাঠ করিয়া পুলকিত ও পবিত্র হইবেন, সন্দেহ নাই। লালাবাবুর জীবনী উপলক্ষে শ্রীশবাবু কান্দী (এক্ষণ পাইকপাড়া) রাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়াছেন। ভাষা সরল ও মধুর। মূল্য।০ আনা মাত্র।

৩। বঙ্গে যুগান্তর। মূল্য ৵০। জনৈক স্বদেশ-হিতৈষী বঙ্গবাসী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বর্ত্তমান সময়োপযোগী কয়েকটি প্রবন্ধ লইয়া

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচিত হইয়াছে। ইহাতে বঙ্গ ভঙ্গের কথা আছে, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের অনুরোধ আছে। পদ্য গদ্য দুই আছে। কবিতাগুলি আবেগময়ী, গদ্য অংশ বেশ সরস। স্বদেশ ভক্ত মাত্রেরই পাঠ করা উচিত। এক স্থান হইতে যথেচ্ছ উদ্ধৃত করিলাম।

(৩৩)

গ্রামে গ্রামে যাও কর রে প্রচার,
দেশী দ্রব্য সব কর ব্যবহার,
শপথ করিয়া দেবতা স্থলে ;
দেখিবে তখন কেমন হইবে,
উন্নতির স্রোত উজান বহিবে,
উঠিয়া দাঁড়াবে আপন বলে।

(৩৪)

ভাই সবে ভাই কররে সাধনা,
সাধনা বিহনে হবেনা হবেনা,
সাধনা বিহনে কাহার হয়?
অদম্য উদ্যমে হও বলীয়ান,
প্রিয় ভাই সব বঙ্গের সন্তান,
মায়ের নামেতে গাওরে জয়!

বাস্তবিক দেবতার নিকট স্বার্থ বলি না দিলে কোন ফল হইবে না। এই স্বদেশী আন্দোলনটা ধর্ম্মের সঙ্গে জড়াইয়া ফেলিতে পারিলে বড় কাজ হয়। হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মপ্রাণ। ইঁহারা ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছু বড় গ্রাহ্য করেন না। ইতিহাসও ঐ কথা বলিতেছে। কিন্তু ধর্ম্মের দিকে লোকগুলাকে লইয়া যায় কে? নেতা চাই, নেতা চাই। এখনকার কালে মিলিত বঙ্গের নেতা হইতে পারেন, এমন লোকত দেখিতেছি না। চলুক, এমনি ভাবে এখন চলুক। সময় হইলে, সকলে এক প্রাণে ডাকিলে নেতার অভাব হইবে না। গীতার সেই কথাটা যেন মনে থাকে।

৪। The United Bengal—ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা। বার্ষিক মূল্য ৬৲ টাকা, ৪৯।৪ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। ১ম সংখ্যা মাত্র সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। এক সংখ্যা দেখিয়া বিশেষ কিছু বলা যায় না, তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে কাগজ খানির লেখা ভাল। ইহা সমগ্র বঙ্গের হিতকর প্রবন্ধে পরিপূর্ণ। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

বীরভূমি সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। বীরভূমির আকার ডিমাই আটপেজী পাঁচ ফর্ম্মার কম হইবে না।

২। বীরভূমি প্রতিমাসের প্রথম দশদিনের মধ্যে প্রকাশিত হইবে। মাসের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে আমাদেব পত্র লিখিবেন।

৩। বীরভূমির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা মাত্র। এক খণ্ডের মূল্য ৵১০। নমুনা পাইতে হইলে ৵১০ টিকিট পাঠাইতে হয়।

৪। বিজ্ঞাপনের হার,

মলাটে ১ পৃষ্ঠা মাসিক	৩৲
" ই " "	২৲
বিজ্ঞাপনীর ভিতর ১ " "	২॥০
" ই " "	১॥০

প্রতি লাইনে ৴১০।

বহু দিনের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে আমরা স্বতন্ত্র চুক্তি করিয়া থাকি। বিজ্ঞাপনের টাকা অগ্রিম দেয়।

শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য্য বি, এ,
ম্যানেজার।
কীর্ণহার জেলা বীরভূম।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

এই খণ্ড বীরভূমির ১২শ সংখ্যা গ্রাহকগণের নিকট প্রেরিত হইল। এখনও বহু গ্রাহক মূল্য দেন নাই। গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন অনতিবিলম্বে আপন আপন দেয় মূল্য পাঠাইয়া দেন। অথবা যদি আপত্তি না থাকে, তবে আমরা ভিঃ পিঃ ডাকে কাগজ পাঠাইয়া মূল্য আদায় করিব। যাঁহাদের আপত্তি আছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সত্বর জানাইবেন। ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না। পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ ও জীবন গ্রাহকগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে। ইহা স্মরণ করিয়া গ্রাহকমহোদয়গণ কার্য্য করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য্য, বি, এ,
ম্যানেজার।